বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 681. May, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৮১ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩২৭। মে, ১৯২০। | ১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

প্রাণের ধারা।

অফুরন্ত অবারিত প্রাণের ভাণ্ডার
পৃথ্বী; হেথা আসি নাই মরিবার তরে;
জাগিব অসীম সত্যে; পূর্ণ করি প্রাণ
নেব এ অনন্ত অমৃত উৎস; যে শান্তি
যে আনন্দধারা বয় উদার আকাশে
মত্ত বিহ্বল দখিন বাতাসে, পাখীর
গানে;—
যে প্রাণের তরঙ্গে হিল্লোলিত
আন্দোলিত হয়ে জাগিছে সবুজ পাতা,
নব কিশলয় ফুল ফল; জাগে তারা
জ্বলন্ত অক্ষরে মণ্ডিত করি নীলাকাশ,
জাগে রবি শশি—সেই প্রাণ, সেই গান,
সেই শান্তি—উদার আনন্দ অপরিমাণ,
সৌন্দর্য্য অপরিসীম—নিঃশেষে করি পান
এ মৃত্যুর তীরে অমৃত কিনিবে প্রাণ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

"সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা"।

*	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	বু	শ	ম	শ	ম	শু
শেঃ	৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
	শু	সো	শু	সো	বু	র
	A.	M.	J.	Jy.	Au.	S.
	14	15	15	17	17	17
আঃ	বু	শ	ম	বু	র	বু
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	শু	সো	বু	শ	ম	বু

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭ সাল।
ফসলী ১৩২৭—২৮।
হিজরী ১৩৩৯—৩৮।
খৃষ্টাব্দ ১৯২০—২১।
শকাব্দ ১৮৪২।
সংবৎ ১৯৭৭—৭৮।
মঘী ১১৮২—৮৩।
ব্রাহ্মসংবৎ ৯১—৯২।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ সো	ম	বৃ	শু	র	সো
শেঃ ২৯	৩০	২৯	৩০	২৯	৩১
সো	বু	বৃ	শ	র	বু
O.	N.	D.	Ja.	Feb.	Mar
18	16	16	14	13	14
আঃ শু	সো	বু	শ	ম	ম
শেঃ 31	30	31	31	28	31
র	ম	শু	সো	সো	বৃ

বু	শ	ম	শ	ম	শু
বৃ	র	বু	র	বু	শ
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র
শ	ম	শু	ম	শু	সো
র	বু	শ	বু	শ	ম
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ

§				
১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

সো	ম	বৃ	শু	র	সো
ম	বু	শু	শ	সো	ম
বু	বৃ	শ	র	ম	বু
বৃ	শু	র	সো	বু	বৃ
শু	শ	সো	ম	বৃ	শু
শ	র	ম	বু	শু	শ
র	সো	বু	বৃ	শ	র

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ,	১৩	১৪	১৩	১০	৯	৭
পূঃ,	২০	১৮	১৭	১৪	১৩	১২
কৃঃএঃ	২,৩১	২৯	২৮	২৫	২৩	২২
অঃ,	৫	৪	২,৩১	২৯	২৭	২৬

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শুঃএঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ—পূর্ণিমা
কৃঃএঃ—কৃষ্ণ একাদশী অঃ—অমাবস্যা।

.*. ১৩ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ও ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার শুক্ল একাদশী, ২০শে বৈশাখ সোমবার ও ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার পূর্ণিমা।

২রা ও ৩১শে বৈশাখ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার এবং ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার কৃষ্ণ একাদশী, ৫ই বৈশাখ রবিবার ও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ—বৈশাখ, বুধবার আরম্ভ ও ৩১শে শুক্রবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A এপ্রেল, আরম্ভ বৃহস্পতিবার, শেষ ৩০শে শুক্রবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই জুন ১লা আষাঢ় ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ বুধবার, ২রা বৃহস্পতিবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ২রা রবিবার ইত্যাদি

বৈশাখ বুধবার, } ১,৮,১৫,
জ্যৈষ্ঠ শনিবার } ২২,২৯

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ,	৬	৭	৬	৭	৬	৭
পূঃ	১০	১১	১০	১০	১০	১০
কৃঃএঃ,	২০	২১	২০	২১	২১	২২
অঃ,	২৪	২৫	২৫	২৫	২৫	২৬

.*. ৬ই কার্ত্তিক শনিবার ও ৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার শুক্ল একাদশী। ১০ই কার্ত্তিক বুধবার ও ১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার পূর্ণিমা।

২০শে কার্ত্তিক শনিবার ও ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার কৃষ্ণ একাদশী। ২৪শে কার্ত্তিক বুধবার ও ২৫শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

নব বর্ষের গান।

ভৈরবী—একতালা।*

মম সাধনার রাণী,
এস ওগো বাণী,
　　এস-গো নব বরষে !
রুদ্ধ মন্দির-দুয়ার মম
　　খুলিবে তোমার পরশে।
চরণ-নখর-আলোকে নাশি'
চির-সঞ্চিত তিমিররাশি,
মম—অবস প্রাণে
　　বীণার তানে
জাগাও বিপুল হরষে।

প্লাবি' মেদিনী সাগর অম্বর,
স্বরগ-সঙ্গীতে অমিয়-নির্ঝর
　　ঢাল অবিরল,
　　কোটী শতদল
ফুটিবে মানস-সরসে ;
নব নব ভাব, নূতন ভাষা,
অঞ্চলে বাঁধি আন গো আশা,
　　তব—স্নেহ নিরমল
　　করুণা শীতল
যেন—তাপিত ভূতলে বরষে ॥

রচনা—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

	২´				৩				০				১			
II	সা	সা	মা	।	দা	দা	পা	।	পা	পা	-া	।	পণা	দা	পা	I
	ম	ম	সা		ধ	না	র		রা	ণী	০		এস	ও	গো	

	২´				৩				০				১			
I	মা	-া	জ্ঞা	।	সা	ঋা	-া	।	সঋা	জ্ঞমা	জ্ঞঋা	।	সা	-া	-া	I
	বা	০	ণী		এ	স	০		গো০	নব	বর		ষে	০	০	

	২´				৩				০				১			
I	সা	-া	সা	।	ণা	দা	ণা	।	সা	জ্ঞা	-া	।	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	I
	রু	০	দ্ধ		ম	ন্দি	র		দু	য়া	র		ম	ম	০	

* গীত-রচয়িতা এই গানটীতে "বসন্তবাহার" সুর এবং "তেওরা" তাল দিয়াছেন। আমি গানটীকে "ভৈরবী" সুরে ও "একতালা" তালে গাহিয়াও আনন্দানুভব করিয়া থাকি। সঙ্গীতপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা 'মম সাধনার রাণী'কে একবারটি আমার সুরে এবং তালেও আবাহন করিবেন কি ? শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
I সা ঋা সা । ঋা জ্ঞা মা । মা জ্ঞা সা । -া -া -া II
খু লি বে তো মা র প র শে ০ ০ ০

অন্তরা।

২ ৩ ০ ১
II দা দা দা । দা ণা ণা । ণা র্সা সা । র্সা -া র্সা I
চ র ণ ন খ র আ লো কে না ০ শি

২´ ৩ ০ ১
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা । র্সা র্সা -া । ণা র্সর্জ্ঞা র্ঋা । র্সাঃ র্সঃ র্ঋর্সা I
চি র স ঞ্চি ত ০ তি মি০ র রা শি মম

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা । র্ঋা -া র্সা । ণা ণা দা । দা -া পা I
অ ব শ প্রা ০ ণে বী ণা র তা ০ নে

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা মা -জ্ঞা । ঋসা ঋা মা । জ্ঞা ঋা সা । -া -া -া II
জা গা ও বি০ পু ল হ র ষে ০ ০ ০

সঞ্চারী ও আভোগ।

২´ ৩ ০ ১
II সা^ণ -া ণা । ^ণদা ^ণদা ণা^স । সা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা মা জ্ঞা I
প্রা ০ বি' মে দি নী সা গ র অ ম্ব র

I সা ঋা সা । সা ঋা মা । জ্ঞা মা জ্ঞা । ঋা সা সা I
স্ব র গ স ঙ্গী তে অ মি য় নি র্ঝ র

২´ ৩ ০ ১
I সা দা দা । পা দা পা । পা ণা দা । পা মা মা I
ঢা ল অ বি র ল কো টি শ ত দ ল

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা মা মা । জ্ঞা ঋা সা । -া -া -া I
ফু টি বে মা ন স স র সে ০ ০ ০

২ ৩

I দা পা দা । দা -া পা । ণা র্সা র্সা । র্সা সা -া I
অ ঞ্চ লে বাঁ • ধি আ ন গো আ শা

২ ৩ ০ ১

I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্ঋা -র্সা । ণা র্সা র্জ্ঞা । র্ঋাঃ র্সঃ র্ঋর্সা I
ন ব ন ব ভা ব নূ ত ন ভা ষা তব

২´ ৩ ০ ১

I র্সর্ঋা র্সা র্সা । র্সা র্ঋা র্সা । ণা ণা ণা । পা পা -পপা I
স্নে• হ নি র ম ল ক রু ণা শী ত লযেন

২´ ৩ ০ ১

I মা পা মা । জ্ঞা মা জ্ঞমা । জ্ঞা ঋা সা । -া -া -া II II
তা পি ত ভূ ত লে• ব র ষে • • •

ৎস্না।

কনক আয়ুধে কাটি তিমিরের রেখা
ধীরে ধীরে সুধামুখি, তুমি দিলে দেখা!
অমন মধুর হাসি—স্বরগের আলোরাশি
আলো করি দশদিক্ উজলে সংসার;
মধুময় ধরাতল, আলোময় সর্ব্বস্থল;—
নিখিল ভরিয়া জাগে মধুর ঝঙ্কার!
এস দেবি, এস কাছে; কহিবার কি বা আছে
এস শুধু দুইজনে মিলি মনে মনে;
জগৎ জাগিয়া থাক্ অথবা ভাঙিয়া যাক্,
দেখিব না, মিশি শুধু র'ব দুইজনে।

শ্রী মা—।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য।

বিধাতা মানব-প্রকৃতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি একভাগ অশন, বসন, শয়ন, সন্তান-পালন প্রভৃতিতে বিধিপূর্ব্বক নিয়োগ করিয়া মানবকে সুখী হইবার ইঙ্গিত জানাইতেছেন; আর একভাগে তিনি মনুষ্যকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন করিতে করিতে দেবলোকের উপযুক্ত হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এ অধিকার কেবল তাঁহার মানব-সন্তানগণকেই তিনি প্রদান করিয়াছেন।

প্রথমতঃ জ্ঞান।—অনেকের ধারণা যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরাই জ্ঞানলাভ করিবেন, আমরা জ্ঞানের কি জানি, কি বুঝি!—আমাদের দ্বারা

জ্ঞানের সাধন অসম্ভব। 'জ্ঞান'-মানে জানা। এ জগতে জানার কি অন্ত আছে? জ্ঞানীর সম্মুখেও যেমন জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র, মূর্খের সম্মুখেও তেমনি জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র! ইহার সীমা নাই, পার নাই;—অপার, অনন্ত অতলস্পর্শ! জ্ঞানিগণ অনেক অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া (আমরা) মূর্খেরা কি হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিব! কিছু জানার জন্য যত্ন করিব না, সাধন করিব না! চেষ্টা করিব না! যদি বড় পিপীলিকারা খাদ্যের বড় বড় টুক্‌রা লইয়া যাইতেছে দেখিয়া ছোট পিপীলিকারা মনে করে, 'আমরা আর কত টুকু লইতে পারিব?' এবং এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে ত ছোট পিপীলিকাদের আর শীতকালের জন্য আহার-সংগ্রহ করা হয় না। তেমনি যদি জ্ঞানিগণ অনেক তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা মূর্খেরা জ্ঞান-অর্জ্জনে হতাশ হইয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদেরও দেবলোকের পাথেয় কিছুই সংগ্রহ করা হইবে না। অনেকে প্রাকৃতিক জ্ঞানের অনন্তত্ব অনুভব করিয়া প্রাকৃতিক জ্ঞান-অর্জ্জনে নিরস্ত হইয়া থাকেন। আবার কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিও ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্তত্ব অনুভব করিয়া এখনও বলেন এবং পূর্ব্বেও বলিয়া গিয়াছেন, "কেন মিছে মাথা বকান, কেন তর্ক-বিতর্ক? যাঁকে জান্‌বার কোন উপায় নাই, তাঁকে জান্‌তে কেন বৃথা চেষ্টা করা!" এই ভাব হইতে অজ্ঞেয়বাদের সৃষ্টি। অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বস্তু নহেন, তিনি অজ্ঞেয়, তাঁকে কোন প্রকারে জানা যায় না।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম-এই তিনের সাধনেরই সরল ও বক্র দুই বিভিন্ন পথ আছে। একজন ঋষি ব্রহ্মজ্ঞানের সরল পথ অবলম্বন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "তাঁকে জানি যে এমনও নহে, না জানি যে এমন ও নহে।" এই ঋষিবাক্য অবলম্বন করিয়া আমরা যেন ব্রহ্ম-জ্ঞানের সরল পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকি; তাঁকে জানিবার উপায় নাই বলিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া যেন বসিয়া না থাকি।

দ্বিতীয়তঃ ভক্তি।—এই ভক্তিও অনন্ত। ইহারও বিশালতা ও দুরবগাহতা, এবং অতলস্পর্শতা আমাদের ন্যায় সাধারণ সাধক-গণের অনুভবের বিষয় নয়! এই ভক্তি-সাধনের সরল ও বক্র পথ আছে। যাঁহারা ভক্তির বক্র পথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা কখনও গম্য স্থানে উপনীত হইতে পারেন কি না সন্দেহ। জীবনের সমস্ত দিবস বক্র পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহারা জীবনের সন্ধ্যায় দিশাহারা হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছি-বার আশা পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ-হৃদয়ে রোদন করিতে থাকেন। এই বক্র পথের পথিক যাঁহারা, তাঁহারা কেবলই নিজ জীবনের ও জীবমাত্রেরই জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া ভগবদ্ভক্তির হেতু অন্বেষণ করেন। তাঁহারা অহেতুকী ভক্তি কি, তাহা কখনই অনুভব করেন নাই। আর যাঁহারা ভক্তির সরল পথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা অহেতুকী ভক্তির অমৃত সেকে আত্মাকে সুশীতল করেন। পূর্ব্বকালের কয়েকজন মহাত্মা অহেতুকী ভক্তির অমৃত-রসে সপ্লাবিত ও বিগলিত হইয়া যে সকল মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"আমার নিজ ইচ্ছা নাহি কিছু,
তব ইচ্ছা হউক পূরণ।"
"ইহ পর ইষ্ট তরে,
না ডাকি বিভু তোমারে।"
"স্বর্গে বা নরকে থাকি,
তোমাতেই ভক্তি রাখি।"
"ওগো যেন প্রভু তোমার চরণ পাই,
ঐশ্বর্য্য সম্পদ্, সম্মান গৌরব—
কিছুই প্রার্থনা নাই।"
"হউক্ জনম মম অমর লোকেতে,
কিংবা মম জন্ম হোক্ কীটের যোনিতে,
তুষ্টি, রুষ্টি, সুখ, দুঃখ নাহি মম তাতে
যদি মগ্ন থাকিতে পাই তোমার প্রেমেতে।"

এই সকল পরম বিস্ময়জনক, সুমধুর, ত্রিতাপহারী, মুক্তিপ্রদ বাক্যগুলি অহেতুক-ভগবদ্ভক্তির জলন্ত, জীবন্ত নিদর্শন। আমরাও যেন এইরূপ অাহেতুক-ভক্তির সরল পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারি। বক্রপথে নানা বিঘ্ন, নানা অন্তরায়।

তৃতীয়তঃ কর্ম্ম—কর্ম্ম-সম্বন্ধেও মানবগণ বক্র ও সরল দুই বিভিন্ন পথের পথিক। যাঁহারা বক্র পথের পথিক, তাঁহারা কর্ম্মের অনন্তত্ব ও কর্ম্মের ফলাফল,এবং কর্ম্মের লাভ-ক্ষতি মীমাংসা করিয়া করিয়া, ও কর্ম্মজনিত সুফল-লাভে বারংবার বঞ্চিত হইয়া, ক্রমে কর্ম্মত্যাগী অথবা সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন।

'কর্ম্ম' মানে 'সেবা'; কর্ম্ম সেবারই নামান্তরমাত্র। আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন, তাহা হয় মাতাপিতার, না হয় স্বামি-সন্তানের, অথবা তাহা স্ত্রীর, সন্তানের, প্রভুর, দরিদ্রের, কিংবা স্বদেশের সেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সেবাতে অবহেলা করাও যা, আর কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করাও তাহাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "আমার কোন অভাব নাই, তবুও আমি সততই কর্ম্ম করি।" ভগবান্ নির্লিপ্ত হইয়াও প্রকৃতির সহিত সংলিপ্ত ও ওতপ্রোত থাকিয়া সতত কর্ম্ম করিতেছেন। এই প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি। বিজ্ঞানও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌরজগৎ একই অজ্ঞাত মহাশক্তির ক্রিয়া বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি ভিন্ন নহে, তেমনি ভগবান্ ও ভগবানের শক্তি বা প্রকৃতি ভিন্ন নহে। একথা গীতা প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। আমারও ইহা যথার্থ বলিয়াই মনে হয়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্যের রশ্মি কত ক্রিয়াই সমাধা করিতেছে!—মহাসাগর ও সমস্ত জলাশয় হইতে বাষ্প উত্তোলন করিয়া মেঘের সৃষ্টি করিতেছে, তাহার দ্বারা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে, উদ্ভিদ-জগতে ও প্রাণিজগতে নানা বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি করিতেছে! এক কথায়, এই সূর্য্য রশ্মি জড়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের প্রাণ হইয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু এই সূর্য্য-রশ্মি কি সূর্য্য হইতে ভিন্ন? কখনই নহে। তেমনি ভগবানের শক্তি বা প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছে বলিলেই ভগবান্ কর্ম্ম করিতেছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়! যাঁহার কোন অভাব নাই, সেই ভগবানই যখন সতত কর্ম্ম করিতেছেন, তখন কর্ম্মময়ই জগৎ, কর্ম্মই জগতের নিয়ম, কর্ম্মই জগতের লীলা। কর্ম্ম না করিলে মানবের শারীরিক—মানসিক ও

আধ্যাত্মিক মঙ্গল নাই। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য-সাধনই মানব-জন্মের সফলতা।

আমরা যেন চিরজীবন জ্ঞানের অর্থাৎ জানিবার জন্য ব্যস্ত হই,—জানার অন্ত নাই জানিয়া, এবং জ্ঞানিগণ অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া যেন নিরাশ না হই। অনন্ত জ্ঞানজ্যোতির অসীম প্রসার ও ভয়াবহ প্রখরতা নিরীক্ষণ করিয়া আমরা ভীত না হইয়া, অনন্ত জ্ঞানজ্যোতির প্রাণ হইয়া যিনি অধিষ্ঠিত, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া যেন তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে পারি। আবার ভক্তিও অনন্ত! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অহেতুকী ভক্তিতে বিগলিত হইয়া কত মহাত্মা কত মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন। আমরা যেন ভক্তির সরল পথে তাঁহাদেরই অনুগমন করি। তাঁহারা অহেতুকী ভক্তির অসীম ও অতলস্পর্শ সমুদ্রে স্নাত হইয়া কতই না অবাক্ত আত্মপ্রসাদ, কতই না পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন! আমরা সহস্র সহস্র বিপদ্‌ ও শোক-দুঃখ ভগবান্‌ হইতে প্রাপ্ত হইলেও তাহার কোন গূঢ় কারণ আছে জানিয়া যেন অহেতুকী ভগবদ্ভক্তি হইতে কখনও বিচলিত না হই। পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজন, বা মহাত্মগণের দ্বারা যদি তাঁহাদের অজ্ঞাতে, অলক্ষিতে, বা ঘটনাচক্রে আমরা সহস্র প্রকারে কষ্ট পাই, তবুও যেন, তাঁহারা ইহলোকেই থাকুন, আর পরলোকেই থাকুন, তাঁহাদিগকে অহেতুকী ভক্তি প্রদান করিতে আমরা কখনও বিরত না হই। তারপর কর্ম্ম। আমাদের দেশের বহু পূর্ব্বতন পূজ্যপাদ আরণ্যক ঋষিগণ, সন্ন্যাসিনীগণ ও মহাত্মগণ প্রভৃতি আমাদের পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভাজন হইলেও তাঁহারা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য জীবনে দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সাংসারিক-কর্ম্ম-ত্যাগী হইয়া পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ও আত্মীয়-স্বজনের প্রাণে দারুণ বেদনা প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু আবার আমাদের এই দেশেরই পূর্ব্বতন পূজ্যপাদ গৃহস্থ ঋষিগণ ও দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী, উভয়ভারতী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্যনারীগণ, এবং আধুনিক কালের মহাত্মা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি পরলোকগত মহাত্মগণ, দেবী অঘোর-কামিনী, কমলকামিনী, রাণী স্বর্ণময়ী কৃষ্ণ, ভাবিনী প্রভৃতি পরলোকগতা মহীয়সী রমণীগণ জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন্।

গীতাকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, কর্ম্মই বন্ধন ও মুক্তির কারণ। আসক্তি-পরবশ হইয়া ও ফলের আশা করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই বন্ধনের কারণ; এবং যাহা আসক্তি বা মোহ-শূন্য হইয়া—সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরব্রহ্মের আদেশ জানিয়া-পরব্রহ্মেতেই সমর্পণ করা হয়, তাহাই মুক্তির কারণ হয়। আমরাও যেন গীতার উপদেশ মত সকল কর্ম্ম ব্রহ্মের আদেশ জানিয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া সকল কর্ম্ম তাঁহাকেই সমর্পণ করি। যদি জগতে আমাদিগের কর্ম্মের প্রশংসা না থাকে, যদি আমাদিগের কর্ম্ম সকলে নগণ্য বলিয়া মনে করেন্, যদি আমরা কর্ম্ম করিয়াও এ পৃথিবীতে কাহারও চিত্ত আকর্ষণ করিতে না পারি,

তাহা হইলেও আমরা যেন কর্ম্ম পরিত্যাগ না করি।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের কথা, যাহা আলোচিত হইল, তাহার মধ্যে ভক্তির কথায় অনেকে বলিতে পারেন, 'মানব-হৃদয়ের প্রেম, দয়া, স্নেহ প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌বৃত্তির কথা না বলিয়া কেবল ভক্তির কথাই বলা হইল কেন? এ সমস্ত হৃদয়বৃত্তিগুলিও ত মনুষ্য-চিত্তকে উন্নতির পথে লইয়া যায়!'—তাহার কারণ এই যে, যেমন সমকালীন পুষ্প-কোরকগুলির মধ্যে সূর্য্যাভিমুখী কোরকটী অগ্রে প্রস্ফুটিত হইলেই ক্রমে ক্রমে সমস্তগুলি প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি এক অহেতুকী ভগবদ্ভক্তির বিকাশেই হৃদয়ের সমস্ত সদ্‌বৃত্তিই ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

সকল মানবেরই জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই তিনের সামঞ্জস্য-রক্ষাই মানব-জীবনের সফলতা, সার্থকতা ও সারবত্তা। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের যিনি জন্মদাতা, তিনি আমাদের জীবনে এই তিনের সামঞ্জস্য-রক্ষার সহায় হউন্, ইহাই তাঁহার কাছে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীবসন্তকুমারী বসু।

জপজী।

নানকের মহা আরতি।

রাগ ধনশ্রী—

মহলা ১

অর্থাৎ প্রথম গুরু নানকের উক্তি।—

গগন মৈ থালু, রবি চন্দ দীপক বনৈ,
তারিকা মণ্ডল জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিলো, পবণ চউর করে,
সগল বনরায় ফুলন্ত জ্যোতি।
কৈসি আরতি হোই, ভবখণ্ডনা তেরি আরতি
অনহতা শবদ বাজন্ত ভেরি। ১

গগনরূপ থালে রবি চন্দ্র দীপস্বরূপ হইয়াছে,
এবং তাহাতে তারকারাজি মতির ন্যায়
শোভা পাইতেছে।
মলয়-পবন ধূপস্বরূপ হইয়াছে এবং পবন
চামর-ব্যজন করিতেছে।
সমস্ত পৃথিবীর ফুটন্ত ফুলরাজি তাঁহার মহিমা
ব্যক্ত করিতেছে।
হে ভবখণ্ডন, তোমার একি মহান্ আরতি
হইতেছে!
অনাহত শব্দ ভেরির ন্যায় যোগি-হৃদয়ে
বাজিতেছে!

রহাউ

ছেদ

সহস তব নয়ন, নন নয়ন হহি তেহিকৈ,
সহস মূরতি ননা এক তোহি।
সহস পদ বিমল, নন এক পদ,
গন্ধ-বিনু, সহস তব গন্ধ ইব চলত মোহি। ২

তোমার সহস্র নয়ন, কিন্তু একটীও তোমার
নয়ন নাই।
সহস্র তোমার মূর্ত্তি, কিন্তু তোমার
কোন মূর্ত্তি নাই।

তোমার সহস্র বিমল পদ, কিন্তু একটীও
তোমার পদ নাই।
তোমার গন্ধ নাই, কিন্তু তোমারই গন্ধে সমস্ত
জগৎ আমোদিত করিতেছে।
সভ মহি জ্যোতি হৈ সোই,
তিসদৈ চানন সভমহি চানন হোই।
গুরু সাক্ষী জ্যোতি পরগট হোই।
যো তিস্ ভাবৈ সু আরতি হোই ॥ ৩
সকল জ্যোতির মধ্যে তোমারই জ্যোতি।
তোমারই সৌন্দর্য্যে সকল সৌন্দর্য্য।
গুরুকৃপা হইলে সেই জ্যোতির প্রকাশ হয়।
তিনি যাহাকে কৃপা করেন, সেই তাঁহার
আরতি করিতে পারে। ৩
হরিচরণ-কমল-মকরন্দ লোভিত মনো
অনদিন মোহিয়হি পিয়াসা।
কৃপা-জল দেহি নানক সারিংগকো
হোই যাতে তেরৈ নায় বাসা ॥ ৪
হরিচরণ-কমল-মকরন্দ-লোভে আমার মন
অনুদিন পিপাসিত।
হে প্রভু, নানক-মৃগকে কৃপাজল প্রদান কর,
যাহাতে তোমার নামেরই মধ্যে আমার চির-
বাস হয় ॥৪

ওঁ সত্যনাম কর্ত্তাপুরুষ নির্ভয় নির্ব্বৈর অকালমূর্ত্তি অযোনিসৈভং গুরু প্রসাদি জপু।

গুরু নানক প্রথমেই মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন্। গায়ত্রী যেমন ব্রাহ্মণ-সাধারণের মন্ত্র, সেইরূপ নানক-পন্থীদিগের ইহা সাধারণ মন্ত্র। ইহা ব্যতীত গুরুদত্ত অন্য মন্ত্র সাধক পাইতে পারেন, কিন্তু ইহা গুরুনানক-দত্ত সর্ব্বসাধারণের মন্ত্র। মানুষ যে-সকল বাক্য সম্বন্ধ করিয়া ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে, এই মন্ত্রে তাহা সম্যক্ প্রকারে আছে। এই মন্ত্র এরূপ অসাম্প্রদায়িক যে, সকল ধর্ম্মের সহিতই ইহার ঐক্য রহিয়াছে। কাহারও মতের সহিত অনৈক্যবশতঃ ইহার অনাদর হইবার সম্ভাবনা নাই।

[ওঁকার—ব্রহ্মের সকল নামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম। অ, উ, ম-সংযোগে ওঁকার শব্দ হইয়াছে; এই শব্দের অর্থ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা।

"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি
সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি, তত্তে পদং
সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি
তস্য তৎ ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥"
—কঠোপনিষৎ।

অর্থাৎ, সমুদায় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে, সমুদয় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানার্থিগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি—তিনি এই ওঁকার।

এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহা তাহার হয়।

ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্য এই অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বন উচ্চতর; এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন্ ॥

সত্যনাম—সত্যস্বরূপ।

কর্ত্তাপুরুষ—সৃষ্টিকর্ত্তা।

নির্ভয়—ভয়রহিত। তাঁহারই ভয়ে সকলে ভীত; তিনি সকলের উচ্চ; কাহা হইতেও তিনি ভীত নহেন্।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"
কঠোপনিষৎ

ইঁহার ভয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, এবং ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু এই পাঁচটী ধাবিত হইতেছে, অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য-সম্পাদন করিতেছে।

নির্বৈর—বৈররহিত! কাহারও সহিত তাঁহার শত্রুতা নাই।

অকালমূর্ত্তি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যিনি একরূপই থাকেন্।

অযোনিসৈভং—জন্মরহিত। যোনি অর্থে কারণ;—যাঁহার উৎপত্তি কোনও কারণ-সাপেক্ষ নহে; যিনি নিত্য ও স্বপ্রকাশ।]

অর্থ—"তিনি ওঁকার-পদবাচ্য; তিনি সত্যস্বরূপ, সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি ভয়রহিত, বৈররহিত; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে তিনি একরূপই থাকেন; তিনি জন্মরহিত।

গুরুপ্রসাদি—সেই পরমাত্মাকে কিরূপে জানা যায়? উত্তর—গুরু-কৃপায় তাঁহাকে জানা যায়।

উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন্—

""উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

—হে জীবগণ, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে উত্থান কর, জাগ্রৎ হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের নিকট যাইয়া পরমাত্মাকে জ্ঞাত হও।

প্রশ্ন—গুরু কৃপা করিয়া কিরূপ উপদেশ দেন্? উত্তর—**জপু**—অর্থাৎ, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নাম প্রত্যেক শ্বাসে শ্বাসে জপ কর।

শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিতে পারিলে, কোন সময়ই তাঁহার স্মরণ ব্যতীত বৃথা যায় না। এইরূপ নিরন্তর ভগবদ্ভাবনায় রত থাকিয়া সাধক সিদ্ধ হন্।

প্রশ্ন—যে পরমেশ্বরের নাম জপ করিবার উপদেশ হইল, তাঁহার স্বরূপ কি?

উত্তর।—**আদি সচু, যুগাদি সচু, হৈ ভি সচু। নানক হোসিভি সচু॥**

[**আদি সচু**—জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, তিনি সত্য, অর্থাৎ সদ্রূপ পরমেশ্বর। **যুগাদি সচু**—আবার যখন যুগ আরম্ভ হইল, অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ হইল তখন ও তিনি সদ্রূপে বর্ত্তমান। **হৈভিসচু**—যিনি এই সৃষ্টি পালন করিতেছেন, সেই সদ্রূপ তিনিই। **নানক হোসি ভিসচু**—নানক বলিতেছেন, আবার যখন পরমেশ্বর এই সৃষ্টির সংহার করিবেন্, তখনও তিনি সদ্রূপে বর্ত্তমান থাকিবেন।]

অর্থ—**"সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই সত্য-স্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন, যুগারম্ভেও তিনি বিদ্যমান ছিলেন; এবং বর্ত্তমানেও তিনি বিদ্যমান আছেন্। নানক বলিতেছেন্, ভবিষ্যতেও তিনি চিরবিদ্যমান থাকিবেন্।"**

১

শোচি শোচ ন হোবই যে শোচি লখবার।
চুপৈ চুপ্য ন হোবই যে লায় রহা লিবতার।

ভুখ্যা ভুখ ন উতরি যে বন্যা পুরিয়া ভার।
সহস স্যানপা লখ হোহি ত ইক ন চল্লৈ নাল।
কিব সচ্যারা হোইয়ৈ কিব কুড়ে তুট্টৈ পাল।
হুকম রজাই চলনা নানক লিখিয়া নালি।

অর্থ—লক্ষবার শরীরকে নির্ম্মল অর্থাৎ ধৌত করিলেও পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় না, মনকে লাগাইয়া মৌন হইয়া বসিয়া থাকিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য বস্তুর ভার মস্তকে বহন করিলেও বিষয়-তৃষ্ণা মিটে না। সহস্র চতুরতা করিলেও, একটীও সঙ্গে যাইবে না।

কি প্রকারে তবে সত্যকে লাভ করিব? কি প্রকারে মিথ্যার বাঁধ পার হইব? নানক বলিতেছেন,—সেই পরমেশ্বরের আদেশ মানিয়া চল, তাঁহাকে প্রীতি কর, তাহা হইলে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে।

[শুচ্ ধাতুর অর্থ নির্ম্মল করা। স্নানাদি-দ্বারা শরীরকে যতই কেন নির্ম্মল করা হউক না, তাহাতে মনের মলা দূর হয় না। মনের মলা দূর না হইলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। চুপ্ শব্দের অর্থ মৌন বা স্থির। **চুপ্পৈ চুপা ন হোবই**—মৌন হইয়া থাকিলেই মন স্থির হয় না। লিব-অর্থে দৃষ্টি। **লিবতার**—অর্থে একদৃষ্টি! বক বা বিড়ালের ন্যায় মৌন ও একদৃষ্টিতে থাকিলেই যে তাঁহাতে মনঃস্থির হইবে, এমন নহে। মনের চঞ্চলতা দূর হইলেই, তাহাকে যথার্থ মৌন অবস্থা বলে। **পুরিয়া**—অর্থে সপ্ত-পুরী। পুরিয়া ভার—সপ্তপুরীর ভোগ্যবস্তু। **ভুখিয়া**—যাহার বাসনারূপ ক্ষুধা রহিয়াছে। **ভুখ ন উতরি**—ভোগ-বাসনার নিবৃত্তি হয় না। যে—যদিও। **বন্যা**—বাঁধিয়া রাখে, অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়। স্যানপা—চতুরতা। সহস—অসংখ্য (সহস্র); **লখ হোই**—সহস্র যদি লক্ষ হইয়া যায়। **লাখ**—অর্থে লক্ষ। তাঁ—তাহার; সেই চতুরতার। **ইক ন চল্লৈ নাল**—মৃত্যুকালে একটীও সঙ্গে যাইবে না।

কিব—কি প্রকারে; **সচ্যারা**—সত্য। হোইয়ৈ—প্রাপ্ত হইব। **কুড়ে**—মিথ্যা। **পাল**—বাঁধ। তুট্টৈ—উত্তীর্ণ হইব।

হুকুম—আদেশ। পরমেশ্বরের আদেশ স্মৃতি ও শ্রুতিতে নিবদ্ধ। সেই আদেশ বা গুরুবাক্য মানিয়া চলিতে হইবে।

রজাই—প্রীতি করা। **চলনা**—চলিতে হইবে।

নানক লিখিয়া নালি—নানক বলিতেছেন, পরমেশ্বর মানুষের জন্মকালেই লিখিয়া দিয়াছেন, এই শরীরের চিন্তা করিও না। নালি—সঙ্গে; অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে।]

গুরু-বাক্যানুযায়ী শ্বাসে শ্বাসে ভগবানের নাম প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিলে, মিথ্যার বাঁধ কাটিয়া যায়, সত্য লাভ হয়। নতুবা অন্য কোন উপায়-দ্বারা বিষয়বাসনা দূর হয় না; পরমেশ্বরকে লাভ করাও যায় না।

২

হুকমী হোবন অকার, হুকম ন কহিয়া যাই।
হুকমী হোবন জীয়, হুকম মিলৈ বড়িয়াই॥
হুকমী উত্তম নীচ, হুকমী লিখ দুঃখ সুখ পাইয়হি।
ইক্‌না হুকমী বখসিস, ইক্ হুকমী সদা ভবাই অহি।
হুকমৈ অন্দর সভকো, বাহর হুকম ন কোই
নানক হুকমৈ যে বুঝৈ, ত হউ-মে কহৈ ন কোই॥

[হুকুমী হোবন অকার—অকার অর্থে সৃষ্টি। তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়। হুকুম্ অর্থে ইচ্ছা ইচ্ছাই সেই ভগবানের মায়া।

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা। সইমাঁল্লোকানিসৃজৎ॥"

হুকুম ন কহিয়া যাই—সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপিণী মায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না।

এক দিবস অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনা-তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন্—'হে ভগবন্! আপনার মায়া একবার আমাকে দেখান্। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন্—হে অর্জ্জুন! তুমি জলে ডুব দাও, তাহা হইলেই মায়া দেখিতে পাইবে। অর্জ্জুন জলে ডুবিবামাত্র দেখিলেন্, তিনি পাতালে চলিয়া গিয়াছেন্। সেখানকার রাজার মৃত্যু হওয়াতে সকলে তাঁহাকে রাজা করিল। সেখানে তাঁহার রাণী হইল। তিনি রাণীর সহিত বহুকাল আনন্দ উপভোগ করিলেন্। তৎপরে রাণীর মৃত্যু হইল। রাণীর মৃত্যুতে শোকে কাতর হইয়া অর্জ্জুন রাণীর সহিত সহমরণে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সহমরণের পূর্ব্বে স্নান করা বিধি, ইহা জানিয়া অর্জ্জুন স্নান করিতে ডুব দিলেন। ডুব হইতে উঠিবামাত্র তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান তখন তাঁহার মায়া দূর হইয়া গেল। অর্জ্জুন সেই একমুহূর্ত্তমাত্র সময় ডুব দিয়া মায়া-প্রভাবে শত বৎসরের ঘটনা-সকল ভোগ করিলেন্। এইরূপ ভগবানের মায়ার প্রভাব! তাই নানক বলিতেছেন্, তাঁহার মায়ার ব্যাখ্যা করা যায় না।

হুকুমী হোবন জীয়—তাহারই ইচ্ছায় জীবের উৎপত্তি।

হুকুমী মিলৈ বড়িয়াই—বড়িয়াই অর্থে যশঃ। তাঁহারাই ইচ্ছায় মানুষ যশোলাভ করে।

হুকুমী উত্তম নীচ—তাঁহারই ইচ্ছায় কেহ বা উত্তম কেহ বা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

হুকুমী লিখ দুঃখ সুখ পাইয়হি—তাঁহারই ইচ্ছায় মানুষের কপালে লেখা হয় এবং সেই অনুসারে মানুষ দুঃখ বা সুখ পায়।

ইক্না হুকুমী বখ্সিস—ইক্না অর্থাৎ কাহাকেও। হুকুমী—তাঁহার ইচ্ছায়। বখ্সিস—পুরস্কার। অর্থাৎ কাহাকেও সাংসারিক সুখ দেন। পুরস্কার অর্থে—প্রাক্তন, বা পূর্ব্ব-কর্ম্মের ফল।

ইক হুকমী সদা ভবাইয়হি—ইক্ অর্থাৎ কাহাকেও। হুকমী, তাঁহার ইচ্ছায়। সদা—সতত। ভবাইয়হি—সংসারে আসা যাওয়া করিতে হইতেছে।

হুকম অন্দর সভকোই—সকল মানুষই তাঁহার ইচ্ছার অধীন।

"ন প্রাণেন পণেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥"

বাহর হুকম ন কোই—তাঁহার ইচ্ছা কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

নানক হুকম যে বুঝে—নানক বলিতে-ছেন যে, সাধক বুঝিয়াছে যে সকলই ভগবদি-চ্ছায় হইয়া থাকে, মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না।

ত হউমে কহৈ ন কোই—হউ—অহংকার। সে আর অহঙ্কারের কোন কথা

বলে না। অর্থাৎ তাহার আর “আমি করিতেছি”—এই জ্ঞান থাকে না। সে জানে, যাহা কিছু হইতেছে, সকলই ভগবদিচ্ছায় হইতেছে। “আমি”, “আমার” ইত্যাকার জ্ঞানই “অহংকার।”]

অর্থ—ভগবানেরই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়। তাঁহার সেই ইচ্ছারূপিণী মায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁহারই ইচ্ছায় জীবের উৎপত্তি, তাঁহারই ইচ্ছায় মানুষ মহত্ত্ব লাভ করে। তাঁহারই ইচ্ছায় কেহ বা উত্তম কেহ বা নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারই ইচ্ছায় মানুষের কপালের লেখা হয়, এবং সেই অনুসারে মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কেহ বা তাঁহার ইচ্ছায় সাংসারিক সুখ লাভ করে, আবার কেহ বা তাঁহার বিধানে সংসারে আসা যাওয়া করিতে থাকে। সকল মানুষই তাঁহার ইচ্ছার অধীন। তাঁহার বিধান কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। নানক বলিতেছেন যে, সাধক বুঝিয়াছে যে সকলই ভগবদিচ্ছায় হইয়া থাকে, মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না; সে আর ‘আমি করিতেছি’ বলিয়া অহঙ্কারের কথা কিছু বলেন না।

গাবৈ কো তান, হো বৈ যি সৈ তান।
গাবৈ কো দাত, জানৈ নিশান ॥
গাবৈ কো গুণ বড়াইয়া চার।
গাবৈ কো বিদ্যা বিষম বিচার ॥
গাবৈ কো সাজ করৈ তন খেহ।
গাবৈ কো জীয় লৈ ফির দেহ ॥
গাবৈ কো জাপৈ দিসৈ দূর।
গাবৈ কো বে খৈ হাদরা হদুর ॥
কথন কথি ন আবৈ তোটি।
কথি কথি কথি কোটি কোটি কোটি ॥
দেদা দে লৈদে থকি পাহি।
যুগ যুগান্তর খাহি খাহি।
হুকমি হুকম চলায়ে রাহ।
নানক বিগসৈ বে পর বাহ ॥৩॥

গাবৈ কো তান।—প্রশ্ন—কে তাঁহার মহিমা বিস্তার করিয়া গাহিতে পারে? কো—কে। তান—বিস্তার করিয়া গান করা। গাবৈ—গান করিতে পারে। হো বৈ যিসৈ তান—উত্তর—(এখানে ‘তান’ অর্থে বিশাল বুদ্ধি) যে পুরুষের বিশাল বুদ্ধি, সেই তাঁহার শক্তির মহিমা বিস্তার করিয়া গাহিতে পারে। যিসৈ—যাহার। হোবৈ—হয়। ভগবানের মহিমা গান নারদ প্রহ্লাদ প্রভৃতি করিয়াছিলেন।

গাবৈ কো—আর কে তাঁহার গান করিতে পারে? দাত জানৈ নিশান—যে সেই পরমেশ্বরের ‘দাত্’ অর্থাৎ ‘দানের’ চিহ্ন পাইয়াছে। দ্রৌপদী ও কুন্তী যখনই বিপদে পড়িয়াছেন, সুকৃতিগুণে ভগবানের স্মরণ লইয়াছেন, ভগবান্ তখনই উপস্থিত হইয়া অভয়দান করিয়াছেন। যে জীবনে এই দান ধরিতে পারিয়াছে, সেই তাঁহার মহিমা গান করিতে পারে। গাবৈ কো গুণ বড়াইয়া—সেই পরমেশ্বরের গুণ এবং যশ কে গান করিতে পারে?

চার—উত্তর হইল,—চারি বেদ তাঁহার গুণগান করিতেছে।

গাবৈ কো বিদ্যা—সেই পরমেশ্বরের তত্ত্ব কে বর্ণনা করিতে পারে? বিদ্যা অর্থে তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ।

বিখম বিচার—উত্তর—সেই পরমেশ্বরের স্বরূপের বিচার করা অত্যন্ত 'বিষম' অর্থাৎ কঠিন। যথা—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" উপনিষৎ।

গাবৈ কো সাজ করৈ তন খেহ—যে পরমেশ্বর এই শরীরকে সাজাইয়া সৃষ্টি করেন্, আবার ইহাকে ভস্মে পরিণত করেন্, তাঁহার গুণ কে গান করিতে পারে?

তন—শরীর; সাজ—সাজাইয়া; করৈ—করেন; খেহ—ভস্ম।

গাবৈ কো জীয় লৈ ফির দেহ—যে পরমেশ্বর জীবনকে লইয়া আবার ফিরাইয়া দেন্, সেই পরমেশ্বরের গুণ কে গান করিতে পারে? লৈ—লইয়া; ফির দেহ—ফিরাইয়া দেন।

গাবৈ কো জাপৈ—সেই পরমেশ্বরের গুণ কে গান করিতে পারে; আর, কে তাঁহার জপ করিতে পারে? দিসৈ দূর—যে তাঁহাকে দূরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিতে দেখে।

গাবৈ কো—আর কে তাঁহার গান করে?

বেখৈ হাদরা হদুর—যে নিষ্কাম ভক্ত তাঁহাকে "হাদরা হাদুর" অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে দেখিতে পায়। "হাদরা হাদুর" অর্থে 'হৃদয়-মধ্যে'ও বলা যাইতে পারে।

কথ না কথি ন আবৈ তোট—"তোট অর্থে অন্ত"। তাঁহার কথা বেদ, পুরাণ প্রভৃতি এবং ভক্তগণ কত বলিতেছেন্ কিন্তু তাঁহার কথার অন্ত নাই।

কথি কথি কথি কোটি কোটি কোটি—কোটি কোটি বার তাঁহার কথা বলিলেও তাহার শেষ হয় না। অসংখ্য ঋষি মুনি তাঁহার গান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কথার অন্ত নাই।

দে দাদে লৈ দে থক পাহি—তাঁহার দান অনবরত দিতেছেন; লৈ দে—মানুষ লই-তেছে; থক পাহি—লইতে লইতে ক্লান্ত হইতেছে।

যুগ যুগান্তর খাহি খাহি—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, অর্থাৎ কত কত জন্মে ভগবানের দত্ত অন্ন মানুষ ভোজন করিতেছে। এক দিনের জন্য আমরা ভাবিয়া আকুল হই, কি প্রকারে অন্ন-সংস্থান হইবে; কিন্তু অসংখ্য জীবের জন্মে জন্মে সেই পরমেশ্বরই আহার যোগাইতেছেন।

হুকমী হুকম চলায় রাহ—হুকমী অর্থাৎ যাঁহার হুকুমে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, সেই পরমেশ্বরের হুকম—আজ্ঞা; চলায়—চলাই-তেছে; রাহ—রাস্তা; অর্থাৎ তাঁহারই আদেশে জীব নিজ নিজ পথে চলিতেছে।

নানক বিগসৈ বে পরবাহ—নানক বলিতেছেন, সেই পরমেশ্বর বিগসৈ—প্রসন্ন হইয়া রহিয়াছেন; বে পরবাহ—কারণ-সাপেক্ষ নহে। অর্থাৎ সেই পরমাত্মা আনন্দময় পুরুষ; কিন্তু তাঁহার আনন্দ কোন কারণ হইতে উৎপন্ন নহে। যথা,

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,

ইত্যাদি। উপনিষৎ]

অর্থ:—সেই তাঁহার মহিমা বিস্তার করিয়া গাহিতে পারে, যে পুরুষের বিশাল বুদ্ধি আছে। তাঁহার দয়ার মহিমা সেই গান করিতে পারে, যে তাঁহার দানের চিহ্ন বুঝিতে পারিয়াছে। চারি বেদ তাঁহার গুণ এবং যশোগান করিতেছে! কেহ বা কঠিন ব্রহ্ম-বিদ্যার বিচার করিয়া গাহিতেছে। কেহ বা গাহিতেছে, ভগবান্ এই শরীরকে সৃষ্টি

করেন্ আবার ইহাকে ভস্মে পরিণত করেন। কেহ বা গাহিতেছে, ভগবান্ মৃতকে আবার বাঁচাইতেছেন্। কেহ বা গাহিতেছে, ভগবান্ বৈকুণ্ঠে আছেন; তাঁহার নাম জপ করিতে হয়। কেহ বা গাহিতেছে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে দর্শন দিতেছেন। তাঁহার কথা বলিয়া শেষ হয় না, যদি কোটি কোটি বারও বলা যায়। তিনি দিতেছেন, মানুষ লইতেছে; তিনি এত দিতেছেন যে মানুষ গ্রহণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইতেছে; যুগযুগান্তর ধরিয়া অর্থাৎ কত কত জন্ম মানুষ তাঁহার দত্ত অন্ন খাইতেছে; যাঁহার আদেশে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, তাঁহারই আদেশে জীব নিজ নিজ পথে যাইতেছে। নানক বলিতেছেন, সেই পরমাত্মা আনন্দময়, কিন্তু তাঁহার আনন্দ কারণ-সাপেক্ষ নহে।

৪

সাচা সাহিব, সাচা নাউ, ভাখ্যা ভাউ অপার।
আখহি মগহি দেহি দেহি, দাতি করে দাতার॥
ফেরি কি অগ্গে রাখিয়ে যিত্ দিশে দরবার?
মুহো কি বোলন বোলিয়ৈ, যি তু শুনি ধরে প্যার?
অমৃত বেলা সচ নাউ, বড্যাই বিচার।
করমি আবৈ কপড়া নদরি মোখ-দুয়ার।
নানক, এবে জানিয়ৈ সভ আপে সচয়ার॥৪॥

সাচা—সদ্রূপ; সাহিব—প্রভু; সাচা—সত্য; নাউ—তাঁহার নাম; ভাখ্যা—কত কত ভাষায়; ভাউ—প্রেম দেখাইতেছে; অপার—কত প্রকারে। আখহি—কতপ্রকার নামে তাঁহাকে ডাকিতেছে; মগহি দেহি দেহি—কত কত লোক "দাও, দাও" বলিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। দাতি করে দাতার—সেই মহান্ দাতা, দান করিতেছেন্। ফের—ভেঁট অর্থাৎ পূজা; অগ্গে—তাঁহার সম্মুখে; কি রাখিয়ে—কি রাখিব? যি তু—যাহাতে; দরবার—তাঁহার স্থান; দিশে—দর্শন পথে আসে। আর যদি দর্শন পাই, তবে সেই প্রভুর সম্মুখে কি বলিব? মুহো—মুখে; কি বোলন—কি প্রকার স্তুতিবাক্য, বোলিয়ৈ বলা উচিত; যি তু—যাহা; শুনি—ভগবান্ শুনিয়া; করে প্যার—কৃপা-দৃষ্টি করেন্। শেষে প্রশ্নের উত্তর হইল—অমৃত বেলা—ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠিয়া; স চ নাউ=সেই সত্যনাম অর্থাৎ গুরুদত্ত মন্ত্র জপ কর। বড্যাই বিচার—এবং সেই মহান্ ভাবের আলোচনা কর।

করমি—বহুজন্মের কর্ম্মফল; আবৈ কপড়া—কপড়া—"দেহ"; অর্থাৎ মনুষ্য-দেহ পাইয়াছে; নদরি—এখন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া; মোখ-দুয়ার—মোক্ষের দ্বারে অগ্রসর হও। নানক—নানক বলিতেছেন; এবে জানিয়ৈ—হে মানব, এখন জানিতে শিক্ষা কর; সভ আপে সচয়ার—সকল কার্য্যই আপনি সেই পরমেশ্বর করাইতেছেন্, মানুষের কোনও সামর্থ্য নাই।]

অর্থ:—তিনি সত্যস্বরূপ, তাঁহার নাম সত্য; তাঁহার ভাষায় অপার প্রেম। মানুষ কত প্রকার নামে তাঁহাকে ডাকিতেছে, কত প্রার্থনা করিতেছে, আর সেই মহান্ দাতা দান করিতেছেন্। তাঁহার সম্মুখে কি পূজা রাখিব, যাহাতে তাঁহার দর্শনপথে আসে? মুখে তাঁহার কি প্রকার স্তুতিবাক্য বলিব, যাহাতে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করেন্? হে সাধক! ব্রহ্মমুহূর্ত্তে সেই গুরুদত্ত নাম জপ কর, আর তাঁহার মহিমার বিচার কর। বহু জন্মের

কর্ম্মফলে এই দেহ পাইয়াছ, এখন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া মোক্ষ-দ্বারে অগ্রসর হও। নানক বলিতেছেন, এখন জানিতে শিক্ষা কর, সকল কার্য্যই ভগবান্ করাইতেছেন, মানুষের কোনই হাত নাই।

৫

থাপিয়া ন যাই, কিতা ন হোই।
আপে আপি নিরঞ্জন সোই॥
যিন সেবিয়া তিন পাইয়া মান।
নানক গাবিয়ৈ গুণী নিধান॥
গাবিয়ৈ শুনিয়ৈ মন রাখিয়ৈ ভাউ।
দুঃখ পরহর সুখ ঘরলৈ যাই॥
গুরুমুখ নাদং গুরুমুখ বেদং।
গুরুমুখ রহিয়া সমাই॥
গুরু ঈশ্বর গুরু গোরখ বরমা।
গুরু পার্‌বতী মাই॥
যে হৌ জানা, আখা নাহি।
কহ না কথন ন যাই।
গুরু হক দেহি বুঝাই।
সভন জীয়া কা ইক দাতা।
সো মৈ বিসরি ন যাই॥

[থাপিয়া=স্থাপন; ন যাই—করা যায় না। তাঁহাকে কেহ স্থাপন করিতে পারে না, অর্থাৎ তিনি কাহারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহেন্। কিতা—সৃষ্ট; ন হোই—হন্ না; অর্থাৎ তিনি কাহারও দ্বারা সৃষ্ট নহেন্। আপে আপ—আপনিই আপনার মহিমাতে অবস্থিত। নিরঞ্জন—অঞ্জন অর্থে মলা বা অজ্ঞান; অজ্ঞানরূপ-মলা-রহিত যিনি, তিনি নিরঞ্জন পুরুষ। যথা—

"ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে, নচেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।"

তাঁহার কোন স্বামী নাই, কেহ তাঁহার প্রেরক নহে, তাঁহার কোন চিহ্ন বা শরীর নাই। 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।'—তিনি নিরবয়ব, ক্রিয়ারহিত, শান্তরূপ, উৎপত্তি-নাশ-রহিত, এবং অবিদ্যা-রূপ-মলরহিত।

যিন সেব্যা—যে ব্যক্তি তাঁহার উপাসনা করিয়াছে; তিন পায়া মান—সেই সম্মান পাইয়াছে। নানক—নানক বলিতেছেন। গাবিয়ৈ—গুণগান করা কর্ত্তব্য; শুনিয়ৈ—শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; মন রাখিয়ৈ ভাউ—ভাউ অর্থাৎ ভাব বা প্রেম, মনে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ভগবানের প্রতি প্রেম রাখিলে কি হয়, তাহাই বলিতেছেন। দুঃখ—ত্রিতাপ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ; পরহর—পরিহার করিয়া, এড়াইয়া; সুখ—শান্তিসুখ; ঘর—অন্তঃকরণরূপঘরে; লৈযাই—উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন—সেই ভগবৎ-প্রেম কিপ্রকারে লাভ হয়?

উত্তর—গুরুর উপদেশ মানিয়া চলিলেই ভগবৎপ্রেম লাভ হয়। গুরুমুখ—গুরুবাক্য; নাদং—ওঁকার-শব্দ; বেদং—গুরুবাক্যই বেদ; রহা সমাই—সমাধি; গুরু ঈশ্বর—গুরুই শিব; গোরখ—বিষ্ণু (গো অর্থাৎ পৃথিবীকে যিনি পালন করেন); মাই—মাতা; অথবা মা—লক্ষ্মী; ই—সরস্বতী। যে হৌ জানা আখা—যত কিছু নাম জানা আছে, সকলই তাঁহাতে সাজে। নাহি কহ না=তথাপি তাঁহার বিষয় বলা যায় না। গুরা—হে গুরু; ইক দেহি বুঝাই—সকলই যে এক পরমেশ্বর, এই জ্ঞান দাও। সভনা জীয়াকা ইক দাতা

—সকল জীবের প্রতিপালক এক তিনিই; সো মৈ বিসরি ন যাই—তাঁহাকে আমি যেন ক্ষণমাত্র ভুলিয়া না থাকি।

অর্থ:—"সেই ভগবান্ কাহারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহেন্; তিনি কাহারও দ্বারা সৃষ্ট নহেন। সেই নিষ্মল দেবতা আপনিই আপনার মহিমাতে অবস্থিত। যে সাধক তাঁহার উপাসনা করে, সেই সম্মানিত হয়। নানক বলিতেছেন, সেই গুণনিধান পুরুষের গান করা কর্ত্তব্য, তাঁহার কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য; তাঁহার গুণগান শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; তাঁহার প্রতি প্রেম রাখা কর্ত্তব্য; তাঁহার প্রতি প্রেম করিলে ত্রিতাপ দূর হয়, অন্তঃকরণে শান্তি বিরাজ করে। গুরুদত্ত মন্ত্রই বাণী, তাহাই বেদ, তাহাই সমাধি; গুরুই শিব, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই পার্ব্বতী, গুরুই লক্ষ্মী, গুরুই সরস্বতী। যত কিছু নাম জানা আছে, সকলই তাঁহাতে সাজে, তথাপি তাঁহার বিষয় বলা শেষ হয় না; কারণ, তিনি অব্যক্ত পুরুষ। হে গুরো, সকলই যে এক, এই জ্ঞান দাও; সকল জীবের যে এক প্রতিপালক, তাঁহাকে যেন ক্ষণমাত্র ভুলিয়া না থাকি।"

৬

তীরথ নাবাঁ, যে তিস ভাবাঁ, বিন ভানে কি
নাই করি।
যেতি সিরঠি উপাই বেখা, বিন্ করমা কি
মিলৈ, লই।
মতি বিচি রত্ন জবাহর মাণিক, যে ইক গুরুকি
শিখ শুনি।
গুরা ইক দেহি বুঝাই,
সাভনা জীয়াকা ইক দাতা, সো মৈ বিসরি ন
যাই॥

[তীরথ নাবা—তাহাই প্রকৃত তীর্থ-স্নান; যে তিস ভাবা—যদি তাঁহাকে প্রীতি করি। বিন ভানে—যদি তাঁহাকে প্রীতি করিতে না পারি; কি নাই করি=তীর্থস্নান করিয়া তবে কি ফল? যেতি সিরঠি উপাই বেখা—যত সৃষ্ট বস্তু দেখিতেছি; বিন্ করমা কি মিলৈ—কর্ম্মফল বিনা কি তাহার সহিত সংযোগ হয়? লৈ—তবে আমি তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কেন কর্ম্মফল আবার সঞ্চয় করিব? মতি বিচি—জীবের বুদ্ধিরূপ প্রকোষ্ঠে; রত্ন জবাহর মাণিক—কত রত্ন জমাহির মাণিক দৃষ্ট হয়। যে ইক গুরু কি শিখ শুনি—যদি এক গুরুর উপদেশ শুনিয়া সাধক চলে। গুরা ইক দেহি বুঝাই—হে গুরো, সেই এক অখণ্ড জ্ঞান প্রদান কর। সভ্না জীয়াকা ইক দাতা, সো মৈ বিসরি ন যাই—সকল জীবের যিনি এক প্রতিপালক, তাঁহাকে যেন ক্ষণমাত্র ভুলিয়া না থাকি।]

অর্থ:—"যদি ভগবানের উপর প্রীতি করিতে পারি, তাহাই প্রকৃত তীর্থস্নান; তাঁহাকে প্রীতি করিতে না পারিলে তীর্থস্নানে কি ফল? যত সৃষ্ট বস্তু দেখিতেছি, কর্ম্মফল বিনা কি তাহার সহিত সংযোগ হয়? তবে আমি তাহার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কেন কর্ম্মফল আবার সঞ্চয় করিব? এই হৃদয়-মধ্যে কত রত্ন, জমাহির, মাণিক দেখিতে পাওয়া যায়, যদি সাধক গুরুর উপদেশ মানিয়া চলে। হে গুরো, সেই এক অখণ্ড জ্ঞান প্রদান কর। সকল জীবের যে এক প্রতিপালক, তাঁহাকে যেন আমি ক্ষণমাত্র ভুলিয়া না থাকি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

কাংড়া-পথে ।

এই আমার হাতে খড়ি, ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও কিছু লিখি নাই। ভগবান্ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কত সুন্দর করিয়া আশ্চর্য্য বিচিত্র নয়নমুগ্ধকর কারুকার্য্য-দ্বারা চিত্রিত করিয়া তাঁহার শিল্প দক্ষতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া, সে বিষয়ে অল্প কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠিকাভগিনীগণ এই লেখায় যে ত্রুটী লক্ষিত হইবে, তাহা দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে লাহোর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত কাংড়া-নামক পাহাড়ে বেড়াইতে যাইব ঠিক্ করিলাম। "শুভস্য শীঘ্রং," এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই আমরা কাংড়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

মঙ্গলবার রাত্রি ৯টার ট্রেণে যাত্রা করিলাম; সঙ্গে সামান্য কিছু জিনিষ-পত্র ও একটী পাহাড়ী চাকর। ট্রেণে উঠিয়া দেখি আমাদের পার্শ্বের কামরায় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও তিনটী ছেলেমেয়ে লইয়া উঠিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারা এখন পাঠানকোটে যাইতেছেন এবং তথা হইতে কুল্লুর নিকটবর্ত্তী মণ্ডি-নামক কর্ম্মস্থানে যাইবেন। ভগবানের কৃপায় বেশ সঙ্গী জুটিল।

বাটী হইতে সে রাত্রির আহার সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছিলাম, সেজন্য ট্রেণ ছাড়িলে শয্যা বিছাইয়া শয়ন করিলাম। ট্রেণ ভোর চারিটার সময় পাঠানকোট-নামক ষ্টেসনে আমাদিগকে পৌছাইয়া দিল। তখনও আকাশ অন্ধকার। প্রভাতের আলোক দেখা দিতে বিলম্ব আছে দেখিয়া 'ওয়েটিং রুমে' গিয়া বসিলাম। সকাল হইবামাত্র অশ্বযানের অন্বেষণে বাহির হইলাম, কিন্তু সে-দিন একখানিও গাড়ী পাওয়া যাইল না, এবং পাওয়া যাইবেও না, জানিলাম।

অনেক গুর্খা সৈন্য অসুস্থতা-বশতঃ ডালহাউসী (Dalhousie) পর্ব্বতে যাইতেছে, সেজন্য টম্‌টমও পাওয়া গেল না। গুর্খাসৈন্যেরা যে টম্‌টমে গিয়াছে, সেই টম্‌টম ফিরিয়া আসিলে তবে আমরা যাইতে পাইব। অগত্যা শেষকালে বাধ্য হইয়া সেখানকার ধরমশালায় আশ্রয় লইতে হইল। ধরমশালাটিও ষ্টেসন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। অনন্যোপায় হইয়া পদব্রজেই চলিলাম; সঙ্গে কুলিরা জিনিষ পত্র লইয়া চলিল। টম্‌টম বা অন্য গাড়ী না পাওয়ায় চারিদিন পাঠানকোটে ধরমশালায় থাকিতে হইল।

পাঠানকোটে যে চারিদিন ছিলাম, আমাদের বেশ আনন্দে দিন কাটিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই পাঞ্জাবী সঙ্গীদের লইয়া সকলে একত্র হইয়া বেড়াইতে যাইতাম, এবং সকলে এক সঙ্গেই প্রায় এক মাইল দূরে স্নান করিতে যাইতাম। বিদেশে এই বিদেশী বন্ধুদের পাইয়া দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিয়া যাইল। পাঞ্জাবী সঙ্গিগণ একদিন পূর্ব্বে চলিয়া গেলেন। তৎপরদিন সন্ধ্যাবেলায় দুইটি টম্‌টম পাইলাম এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া আমরা কাংড়া-অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

টম্‌টমগুলি অতিপুরাকালের; গদিগুলি জীর্ণ, তালি দেওয়া; গাড়ীর চারি কোণে চারিটি সরু বাঁশের খুটি বাঁধিয়া তাহার উপর একখণ্ড পুরাতন oilcloth (অয়েল ক্লথ) দিয়া গাড়ীর মস্তকের আচ্ছাদন করা হইয়াছে। ঘোড়া গুলিরও অবস্থা সেইরূপ; তাহারা যেন স্বয়ং অশ্বিনী-নন্দন! একটি গাড়ীতে দুই জনের বেশী লোক ধরে না। একটিতে চাকর ও মালপত্র বোঝাই করিয়া, আর একটীতে আপনি উঠিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া রওনা হইলাম।

পাঠানকোট হইতে কাংড়া ৫৬ মাইল দূর। মাঝে মাঝে ১২।১৪ মাইল অন্তর একটী করিয়া 'পাড়াও' অর্থাৎ চটি আছে। উপরের পাহাড় হইতে দরিদ্র ও ভদ্রলোকদিগের সর্ব্বদা যাওয়া আসার সুবিধার ও আরামের নিমিত্ত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন দুই একটী করিয়া দ্বিতল বাড়ী ও তাহার নিকট দুই একটী খাবারের দোকান ও জলপানের জন্য একটি করিয়া কূপ আছে। ইহারই নাম পাড়াও।

পাঠানকোট হইতে ১৭ মাইল দূরে "নুরপুর"-নামক একটি বড় পাড়াও বা চটি আছে। পাঠানকোট হইতে "নুরপুর" পর্য্যন্ত সমতল ক্ষেত্র; তৎপরে "নুরপুর" হইতে কাংড়া যাইতে হইলে ক্রমশ: পাহাড়ে উঠিতে হয়। নুরপুরে একটি পুরাতন কেল্লা আছে, কিন্তু সেটী সমস্তই ভগ্নপ্রায়। আমরা সন্ধ্যার সময় "নুরপুর" পৌছিলাম। সঙ্গে রাত্রির খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলাম। টম্‌টম হইতে নামিয়া একটি পোড়ো ঘরে বসিয়া আহার সমাপ্ত করিয়া পুনরায় টম্‌টমে উঠিয়া বসিলাম। অশ্বচালক ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিল; কারণ, এখানকার চড়াই অত্যন্ত সঙ্কটজনক।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিল, আমরা প্রথমে সে দিকে বড় লক্ষ্য করিলাম না। গাড়ী চলিতেই লাগিল। ক্রমশঃ মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হঠাৎ পশ্চিমাকাশে যমদূতাকৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একখণ্ড মেঘ উদিত হইল; তাহা দেখিয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ ক্রমশঃ ঘনঘটার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে লাগিল; পথে জনমানবের চিহ্ন নাই, সাড়া-নাই, শব্দ নাই; আকাশ ঘোর অন্ধকার! আর শন্ শন্ শব্দে ঝড় বহিতেছে! কেবল আমাদের দুইখানি গাড়ী সেই প্রলয়কাণ্ডের মধ্য দিয়া চলিয়াছে।

অশ্বপদ স্খলিত হইলেই নীচে খাদে পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।—শকট-চালক বেগতিক দেখিয়া আমাদের এক সামান্য চটীতে নামাইয়া দিল। চটিতে নামিয়া দেখি, জনকয়েক লোক নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের জাগাইয়া অতিকষ্টে দুইখানা খাটিয়া জোগাড় করিয়া শয়ন করিবামাত্র আকাশ হইতে প্রবলবেগে বারিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। অতিকষ্টে সে রাত্রির অবসান হইল। প্রভাতে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইল, এমন কি শেষে রোদও উঠিল।

পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া আমরা চলিলাম; তখন প্রকৃতিদেবী কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছেন! ছোট ছোট ঝাক্‌ড়া ঝাক্‌ড়া গাছগুলির পাতা হইতে টোপে টোপে বৃষ্টির জল ঝরিয়া পড়িতেছে, পাহাড়ের গা বহিয়া

নানাস্থান হইতে ঝরণার ন্যায় নালা বাহির হইয়া হু হু-শব্দে জল নীচের দিকে বহিয়া যাইতেছে! আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া নানা রং-বেরংয়ের পাখীর দল আনন্দের সঙ্গে কলরব করিতেছে! এই দৃশ্য কি চমৎকার! পাহাড়ে থাকিতে থাকিতে, আমরা এই পাহাড় প্রদেশের আর একটী বৈচিত্র্য দেখিয়াছি।—কোথাও কিছু নাই, দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল, চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল; দশ-পনের মিনিট পরেই সব পরিষ্কার; আর প্রলয়ের চিহ্নমাত্র নাই! এই বৃষ্টি, এই রৌদ্র! আমাদের বাঙ্গালা-দেশে এমনতর দেখা যায় না।

বেলা প্রায় ১০টার সময় "কোটলা"-নামক একটী বড় পাড়াওতে পৌঁছিলাম। সেখানে দুগ্ধ এবং অল্প কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। অল্প দূর যাইয়া একটী বৃহৎ সেতু পার হইতে হইল, সেতুর নিম্নে চাহিয়া দেখি, একটী প্রকাণ্ডকায়া নদী আঁকা-বাঁকা দেহে অতিদ্রুত গতিতে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। নদীটী দেখিয়া আমার এই সঙ্গীতটী মনে পড়িল—

"নির্ম্মলসলিলে বহিছ সদা
তটসালিনি সুন্দরি যমুনে!"

গানটী গাহিতে গাহিতে চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, আমাদের গাড়ীর অগ্রে অনেকগুলি গাড়ী যাইতেছে। অপ্রশস্ত পথ বলিয়া গাড়ীগুলির এক লাইনে চলা অসম্ভব; এজন্য গাড়ীগুলি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বৃক্ষলতাপূর্ণ পাষাণময় পথে চলিতে চলিতে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া দেখি, অগ্রগামী অশ্বগণ ক্রমেই খর্ব্বকায় ধারণ করিয়াছে; ঠিক্ যেন মনে হইতেছিল, ছেলেখেলার পুত্তলিকার গাড়ী চলিয়াছে!

অশ্বগণ কোথাও সমতলভূমি পাইলে সানন্দে ছুটিয়া চলে, চড়াইয়ের স্থানে বা অসমতল ভূমিতে বেগ মন্দীভূত করে। এইরূপে চারি পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা সাপুর-নামক আর একটী পাড়াওতে পৌঁছিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া একটী দেশী হোটেলে বসিয়া গরম গরম রুটী, ডাল ও একটী তরকারী দিয়া খুব তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলাম এবং অদূরে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে জল আনাইয়া পান করিয়া আবার গাড়ীতে আরোহণ করিলাম।

সাপুর হইতে কাংড়া ১২ মাইল। এখান হইতে কাংড়া যাইবার পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতিমনোহর! আমরা যে সময় যাইতেছিলাম, তখন ঠিক্ গরম পড়ে নাই; বসন্ত কালের হাওয়া তখনও আছে। পথে দুই পার্শ্বে আম্রবৃক্ষ; বৃক্ষসকলের ফলগুলিতে তখন পক্ব হইবার জন্য রং ধরিয়াছে; সেই পক্কফল-সংবলিত বৃক্ষশাখায় নানাপ্রকার বিচিত্রবর্ণের বিহঙ্গগণ সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিতেছে। কোথাও বা পাপিয়া তাহার পিউ পিউ স্বরে পথিকের মন হরণ করিতেছে, কোথাও বা বুলবুলি তাহার স্বভাবমধুর স্বরে সেই পথ মুখরিত করিতেছে! এই দৃশ্য দেখিয়া গাহিতে ইচ্ছা হইল—

"জয় ভবকারণ জগতজীবন জগদীশ জনতারণ হে!
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে?

বিহঙ্গমগণ মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশ
গায় হে!"

ইচ্ছা হইতেছিল, যত প্রিয়জনকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখাই। এ সৌন্দর্য্য একা দেখিয়া তৃপ্তি নাই। এই অপরূপ দিব্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমাদের গাড়ী প্রায় সন্ধ্যার সময় রাংড়ায় আসিয়া পৌঁছিল। এখানে আসিয়া দেখি একপার্শ্বে অভ্রভেদী সুমেরু-পর্ব্বত এবং তাহারই নীচে কিছু দূরে বিস্তৃত বিশাল সমতলক্ষেত্র! কি অপূর্ব্ব সুন্দর মহান্ গম্ভীর দৃশ্য! বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম, এমন সময় শকট-চালক গাড়ী হইতে আমাদিগকে নামিয়া যাইতে বলিল।

(ক্রমশঃ)

লীনার শিক্ষা

(১)

বৈকালের সাড়ে পাঁচটার ট্রেণ আসিতে তখনও কিছু দেরী ছিল। বেহারের ছোট সহর 'শ—' ষ্টেশনের কাছে গাছ-পালার ছায়ায় ঢাকা, একটা নিভৃত ছোট বাগানের মাঝে, লোহার বেঞ্চিতে ঠেস্ দিয়া দুইটি সুন্দরী যুবতী বসিয়াছিল। দুইজনেরই বেশ-ভূষা ইউরোপীয়-মহিলাজনোচিত। চেহারায় দুইজনের ভিতর পার্থক্যটা কিছু বেশী;—মিশনরী মেম মিস্ পার্সন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে, চোখ, চুল এবং গায়ের রং'এ খাঁটি বিলাতী;—কিন্তু ফিরিঙ্গী-কন্যা লীনা আকৃতিগত ক্ষীণতায়, আর চোখ চুলের রং'এ, ষোল আনা না হইলেও দু আনা রকমের দেশী বটে। লীনার মাথায় রঙিন্-পালক-দেওয়া বাহারে টুপি;—পার্সনের কোঁকড়ানো-ছাঁটা চুল ঢাকিয়া প্রকাণ্ড সোলা হ্যাট মাথার উপর বিরাজমান।

পার্সনের হাতে একটা লাল রং'এর মলাট দেওয়া চটি-বই ছিল; লীনা পড়িতেছিল ইংরেজি খবরের কাগজ। পার্সন নিঃশব্দে পড়িতেছিলেন, লীনা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে দুই একটা 'রসাল' হুজুগ, দুই-চারিটা 'ঝাঁঝালো' সম্পাদকীয়-মন্তব্য পার্সনকে শুনাইয়া সুমিষ্ট কৌতুকে হাসিতেছিল। পার্সনও নিজের পাঠ্য হইতে মুখ তুলিয়া, ক্ষণিকের জন্য হাসিয়া লইতেছিলেন,—সম্পাদকের কোন কোন বিষয়ের ঝাঁঝালো মন্তব্যের উপর তিনিও মৃদুভাবে 'সারালো' টিপ্পনী বর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু অতি অল্প ভাষায়! আবার তখনই নিজের পাঠ্যের দিকে মন দিতেছিলেন।

হঠাৎ লীনা মিনিট-দশেকের জন্য থামিয়া, স্তব্ধ কৌতূহলে দুই কলম লেখা এক টানে পড়িয়া, ব্যগ্রভাবে বলিল, "রাখুন রাখুন পার্সন, আপনার Comprehensive History of the Religion of the Hindus রাখুন। ওটা নেহাৎ পুরোণো অতীতের মৃত-কঙ্কাল! বর্ত্তমান যুগের সজীব ধর্ম্মের সংবাদ নেন, কেরোসিন তেলে উপর্য্যুপরি কি চমৎকার ধর্ম্মসাধন-যজ্ঞ চল্‌ছে, পড়ুন; সদ্যঃ সদ্যঃ সাক্ষাৎ সত্যধর্ম্ম-জ্ঞান উপলব্ধ হয়ে যাবে!"

পার্সন নিজের বই বন্ধ করিয়া কোলের উপর ফেলিলেন; লীনার মুখ-পানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন, "চটাবার মত্‌লবে আছেন না? কিন্তু নিষ্ফল! আমার রাগরোষে বর্ত্তমান যুগের কেরোসিনে আত্মহত্যাকারিণী তদ্ধর্ম্মাবলম্বিনীদের বা তাদের ঐ অপূর্ব্ব সুন্দর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির-উত্তেজক পৃষ্ঠপোষকদের স্বধর্ম্মপালনে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবে না', সেটা নিশ্চয় জানবেন! বর্ত্তমান যুগের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম—বিশেষ করে, বাংলাদেশের হিন্দু-ধর্ম্মের খবরটা নেওয়া, আমার পক্ষে আপাততঃ কিছুমাত্র সুবিধাজনক নয়; ওর চেয়ে পুরাতন যুগের ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্ম্মের সন্ধান নেওয়া ঢের নিরাপদ্, ঢের শিক্ষাপ্রদ! ছিঁড়ে ফেলুন মিসেস্ পিকক্, খবরের কাগজখানা ছিঁড়ে ফেলুন, আপদ্ চুকে যাক্!"—পার্সনের মুখ বিরক্তি-গম্ভীর হইয়া উঠিল!

লীনা অপ্রস্তুত ভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সংযতস্বরে বলিল, "না পার্সন,—আমাদের অনধিকার-চর্চ্চার অধিকার-সীমা একটু বাড়িয়ে নিতে চাই; চুপ করে থাকা আর চল্‌ছে না,—নারী, সকল দেশেরই সমান নারী,—"

বাধা দিয়া পার্সন বলিলেন, "ভুল, মিসেস পিকক্, ভুল আপনার ঐখানেই; প্রচণ্ড জবরদস্তীর উপর যে দেশের নারীদের সকল শক্তিকে দাবিয়ে রেখে,—অন্ধভাবে পরনির্ভর-শীল করে গড়ে তোলা হয়েছে, পায়ে হোঁচট্, মাথায় ঠোক্কর খেতে খেতে, অন্ধকারে পথ চলাই যা'দের জীবন যাত্রার প্রধান অবলম্বন, তা'রা যখন একমাত্র আশ্রয়দাতাদের কাছে পর্য্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়ন লাভ কর্‌তে থাকে, আর এদেশের চিরাচরিত প্রথা-মতে পারিপার্শ্বিক জনসাধারণ যখন সহানুভূতি-লেশ-বর্জ্জিত-চিত্তে—

কৌতুক দর্শন তরে
দাঁড়ায় পীড়িতে ঘিরে
গোপনে ভ্রূভঙ্গে করে ব্যঙ্গ বরিষণ—

তখন অতি-বড় ধৈর্য্যশীল পণ্ডিতেরই ধৈর্য্য লোপ হয়ে যায়,—তা এই এদেশের শিক্ষা-দীক্ষাহীন জড়বুদ্ধি নারীদের সহিষ্ণুতা! মিসেস্ পিকক্, প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও যখন এই রকম অল্পশিক্ষিত মানুষদের যথেচ্ছাচার-পীড়িত অসভ্য বর্ব্বরতার যুগ এসেছিল, তখন 'silence is the best ornament of a woman' (মৌনতাই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, নীতিকে মেয়েরা শোভার খাতিরে আর মাথায় করে রাখ্‌তে পারেন নি,—পুরুষদের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত অস্থির হয়ে, সংসার-জীবন ছেড়ে মঠে গিয়ে সন্ন্যাসিনী-জীবন গ্রহণ সুরু করে দিয়েছিল। তাঁদের পুণ্যের ফল আজ আমরা পবিত্র শান্তির সঙ্গে ভোগ কর্‌ছি, অন্ততঃ আমি তো একজন বটেই!—"কথাটা শেষ করিয়াই পার্সন প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল নয়নে লীনার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে বলিলেন "কিছু মনে কর্‌বেন্ না, মিসেস পিকক্, পিকক্ দম্পতীর আদর্শ-প্রেমপূর্ণ দাম্পত্য-জীবন অবশ্য আমি খুবই প্রীতির চক্ষে দেখি, এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের জীবন যেন চির-দিনই এইরকম সুখময় থাকে।"

সুখের গর্ব্বে লীনার পাণ্ডুর ম্লান মুখ উৎফুল্ল সুন্দর হইয়া উঠিল; পার্সনের শুভ কামনার উত্তরে ভদ্রতাসূচক ধন্যবাদ

জানাইয়া স্ফূর্ত্তির উচ্ছ্বাসে হঠাৎ বন্ধু-প্রীতির দাবী-ভরা আবদারের স্বরে বলিয়া উঠিল, "কত দিন আর এমন সঙ্গিহীন জীবন যাপন কর্‌বেন, মিস্ পার্সন? এবার একটা বিয়ে-থাঁ করে সংসার পেতে সুখী হন্ না, দেখে আমাদেরও সুখ হোক্!—

পার্সন পরিহাস-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, আপনি একটা বর খুঁজুন!"

লীনা সলজ্জ হাস্যে অনুযোগ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আপনার সকল-তাতেই ঠাট্টা! কিন্তু যদি কিছুদিন বাঁচি, তবে দেখ্‌ব দেখ্‌ব, কতদিন আপনার মত ঠিক্ থাকে তাও দেখব! মহাজনের উক্তি জানেন্ তো?— "শীতের বাতাস আর নারীর মন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল!—"

হাসিয়া পার্সন বলিলেন, "মহাজনের জয় হোক্! হতাশ প্রণয়ী যুবকেরা মহাজনের ঐ উক্তিটার জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকবে; আহা, ভাল মানুষ বেচারীদের বড় আশার কথা! কিন্তু আমি ঐ মহাজনটিকে সম্মান দেখাতে রাজী থাক্‌লেও, তাঁর উক্তিটিকে কিন্তু আদৌ পছন্দ কর্‌তে পারছি না! মাপ্ করুন্ মিসেস্ পিকক্। প্রসঙ্গটা ঐ পর্য্যন্ত থাক্; ট্রেন্ আস্‌বার সময় হয়েছে, চলুন ষ্টেশনে যাওয়া যাক্।"

পার্সন বই হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অগত্যা লীনা এবং উঠিলও পার্সনের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু যতই জারিজুরী করুন্, ভালবাসার হাতে একদিন আপনাকে ধরা পড়তেই হবে—"

বাধা দিয়া প্রসন্ন হাস্যে পার্সন বলিলেন, "ধরা পড়া ছেড়ে, খোস্ মেজাজে আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত করে দিয়েছি। মিসেস্ পিকক্, সে জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন!"

সবিস্ময়ে লীনা বলিল, "সে কি, এঁ্যা! বলেন্ কি, মিস্ পার্সন!"

শান্ত স্বরে পার্সন বলিলেন, "কেনও যে ভালবাসার আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে ফাদার ডামিয়ন কুষ্ঠ রোগীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সেই অপরূপ মহিমময় ভালবাসার পূজায় আত্ম-নিয়োগ করা এতই কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, মিসেস্ পিকক্?"

লীনা স্তব্ধ! এরূপ অদ্ভুত উত্তরের প্রত্যাশা সে মোটেই করে নাই! কিন্তু উত্তর শুনিয়া এখন তাহার মনে পড়িল, পার্শনের নিকট হইতে ইহা ছাড়া অন্য কিছু উত্তর প্রত্যাশা করাই তাঁহার মূঢ়তা!

লীনাকে স্তব্ধ নিরুত্তর দেখিয়া পার্সন একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া লীনার কাঁধ চাপড়াইয়া অতিশয় শান্ত-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "সুখাভিলাষটাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়, তার অপেক্ষাও উচ্চতর উদ্দেশ্য নরনারীর জীবনে আছে। চলুন, ঐ গাড়ী আসবার ঘণ্টা বাজছে।"

ঘাড় হেঁট করিয়া পার্সনের পাশে পাশে চলিতে চলিতে লীনা সন্তর্পণে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মিস্ পার্সন, আপনার মত মহৎ হৃদয় যাদের, জীবনে মহৎ-উদ্দেশ্য-পোষণের যোগ্যতা শুধু তাদেরই আছে; আপনার দিকে যখন ভাল করে চেয়ে দেখি, তখন আমার বড়ই আনন্দ বোধ হয়।—"শেষ কথায় লীনার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, নিঃশ্বাস জোরে পড়িতে আরম্ভ করিল।

গমনরতা পার্সন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লীনার কাঁধ ধরিয়া মৃদু ঝাঁকানি দিয়া অতিশয় স্নেহভরা ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "হুঁ, টের পাচ্ছি,—heart'এর palpitation বাড়িয়ে ফেলছেন! কিন্তু ওটা এখন চল্‌বে না, সংযত হোন্। মিঃ পিকক্ আপনাকে অসুস্থ দেখ্‌লে বড়ই অসুখী হবেন, ওটি কর্‌বেন না। আপনার মার্‌সীর খবর নেবার সময় আপনাকে আমি খুব সুস্থ স্বচ্ছন্দ দেখ্‌তে চাই। কথা বন্ধ করে ধীরে হাঁটুন ; খুব ধীরে।"

ম্লান হাস্যে, ক্লান্ত স্বরে লীনা বলিল, "তাই যাচ্ছি, চলুন।" উভয়ে নীরবে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

জাহাজ ডুবি।

(উপন্যাস)

(১)

সুসজ্জিত কক্ষ ; উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। উদ্যানস্থ হাস্‌নাহানা কুসুমের মৃদু গন্ধ বাতায়ন-পথ দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কৃষ্ণত্রয়োদশী তিথি ; রজনী গভীর অন্ধকার। আকাশময় নক্ষত্রগুলা ছড়াইয়া পড়িয়া যথাশক্তি মিটি মিটি করিয়া তাহাদের আলোক বিতরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের সেই আলোকে রজনীর গাঢ় অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিতেছিল মাত্র! জোনাকিগুলা গাছ-পালায় ইতস্ততঃ চারিদিকে ঝিকি মিকি করিয়া জ্বলিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা পেচক বিকট চিৎকার করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছিল। আজিমগঞ্জের জমিদার-বাটীতে নবীন জমিদার অক্ষয়কুমার একাকী কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি পথের ধারে একটী বাতায়ন-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেই ঘনান্ধকারে বাহিরের কিছুই দৃষ্ট হইল না। কেবল দূরে ভাগীরথীর অপর পারে একটা শবদাহ হইতেছিল, সেই চিতালোক মধ্যে মধ্যে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, আবার ম্লান হইয়া পড়িতেছিল, ইহাই দেখা যাইতেছিল। অমরকুমার কিছুক্ষণ অনন্যমনে এই চিতাগ্নির দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয় আজ গভীর চিন্তামগ্ন। অন্ধকার রজনী, পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু অমরকুমারের হৃদয়-মধ্যে যেন আজ তদপেক্ষাও ঘোরতর অন্ধকাররাশি বিরাজ করিতেছিল। অমরকুমার চিন্তিতান্তঃকরণে আবার কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পরে কক্ষ-মধ্যস্থ একটা মর্ম্মর-প্রস্তরের টেবিলের নিকটে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। ভিত্তি-গাত্র-স্থিত বড় ক্লক-ঘড়িটায় টং টং

করিয়া দশটা বাজিয়া গেল; অমরকুমার একবার অন্যমনস্কভাবে ঘড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপরে ইংরাজী, বাংলা পুস্তক, অ্যাল বাম, ব্লটিং প্যাড ইত্যাদি সজ্জিত ছিল; গজদন্ত নির্ম্মিত দোয়াত-দানে রূপার দোয়াত-কলম শোভা পাইতেছিল; আর একটী গজদন্তনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর অথচ ক্ষুদ্র বাক্স সেই টেবিলের উপর স্থাপিত ছিল। অমরকুমার একবার বাক্সটাকে সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া আবার পরক্ষণেই সেটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিলেন। তাহার পর এ বই সে বই করিয়া একখানা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া একটু দেখিয়া, আবার সেখানা রাখিয়া দিয়া শেষে রবিবাবুর একখানি 'রাজা ও রাণী' লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পাঠের পর তাহাও আর ভাল লাগিল না; পুস্তকখানি সরাইয়া রাখিয়া টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়া দুই হস্ত কপোল-দেশে সংস্থাপন করিয়া, আবার তিনি অনন্যমনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ কাহার কোমল করপল্লব দ্বারা তাঁহার চক্ষু-যুগল আবৃত হইল। অমরকুমারের মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাঁহার হৃদয় হইতে সকল চিন্তা দূর হইয়া গেল। অমরকুমার সস্নেহে দুই হস্তে পত্নীর হস্ত দুইখানি ধরিয়া সহাস্যে কবির সুরে বলিলেন—

"এলি কি পাষাণি!
পড়েছে কি মনে?
হ'ল সারা—
যত ছিল গৃহ-কাজ?

অমরকুমারের পত্নী অমরকুমারেরই শিক্ষিতা শিষ্যা; হটিবার পাত্রী নয়। সেও কবির সুরে বাকি উত্তরটুকু দিল—

তোমারি সে গৃহ নাথ!
তোমারি সে কাজ!
তোমারে যে ছেড়ে যাই
সে তোমারি প্রেমে!

অমরকুমার পত্নীকে সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন; তাহার পর দুই হস্তে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরে সস্নেহে বলিলেন, "চিরদিন এমনি ভাল বাস্‌তে পারবে ত, লতা? কোন দিন এর হ্রাস হবে না ত?"

আশালতা বলিল, "আমরা তো আর পুরুষমানুষ নই যে, আমাদের ভালবাসা বাড়বে কমবে?"

ঈষৎ হাসিয়া অমরকুমার বলিলেন, "তোমাদের কাছে পুরুষগুলোর ভালবাসার কোন মূল্য নেই, নয়? সমস্ত জীবনটা ঢেলে দিলেও নয়, কেমন?"

আশালতা পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল, "জীবন ঢালার বেগ কত! বউ না মরতে মরতেই আবার বিয়ের জন্যে অস্থির। কোন কোন মহাপুরুষ আবার একটী স্ত্রী থাকতে থাকতেই আবার একটা বিয়ে করে বসেন। এ ভালবাসার যে মূল্য কত, একটু ভেবে দেখ্‌লে তোমরাই বুঝ্‌তে পারবে।

অমরকুমার বলিলেন, "তা' বলেছ মিথ্যা নয়! পুরুষ-জাতটা সত্যিই বড় স্বার্থপর। যত নিগ্রহ এই মেয়েদের! আহা, বড় কষ্ট! নয়?"

আশালতাও হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়!"

দুই একগাছি কেশ বাতাসে উড়িতে উড়িতে আশালতার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল, অমরকুমার সযত্নে সেগুলি সরাইতে সরাইতে বলিলেন, "সে-কথা যাক্, তোমার ভালবাসা আমি চিরদিন এমনি ভাবে পাব ত? কখনও এর হ্রাস হবে না ত? এই মনে কর, হঠাৎ আমি যদি খুব গরিব হয়ে পড়ি, আমার যদি ঘর-বাড়ী, বিষয় আশয়, টাকা কড়ি, কিচ্ছুই না থাকে, সব যায়,—আমি হঠাৎ যদি কোন কারণে নিরাশ্রয় পথের ভিখারী হয়ে পড়ি, তা হ'লে তখনও আমাকে এই রকম ভাল বাস্তে পারবে ত?"

মুখ ফিরাইয়া আশালতা বলিল, "অমন অলক্ষণে কথা মুখে এ'ন না!"

অমরকুমার বলিলেন, "না, না, এই কথার কথা বল্‌ছি! যদিই হয়! হতে পারে না কি? এ-সংসারের সমস্তই ত' ভোজ-বাজী। অবস্থার বিপর্য্যয় কিছু বেশী আশ্চর্য্যের কথা নয়! মনে কর, হঠাৎ যদি কোন কারণে আমার সব যায়,—তখন? তখন আমাকে গরিব বলে ঘৃণা কর্‌বে না ত? তখনও আমাকে এই রকম ভালবাস্‌তে পারবে ত?"

এবার আশালতার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। স্বামী এখন পরিহাস করেন নাই, ভবিষ্যতের কথা বলিতেছেন! এখন প্রকৃত উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। আশালতা স্বামীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ঈশ্বর করুন্, তা যেন কখনও না হয়। কিন্তু 'যদির'—কথা বল্‌ছ?—যদি—যদি, ভগবান্ সেরকম দুর্দ্দিনে কখনও ফেলেন, তবে আমি এখনও যেমন তোমার দাসী আছি, তখনও তোমার এমনি দাসী থাক্‌ব। আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, স্বামী ধনী হোন্ দরিদ্র হোন্, স্বামী আমাদের ইষ্ট দেবতা, ইহপরকাল!"

অমরকুমার হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ-ভরে আশালতাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "লতা! সত্যই আমি দীনহীন কাঙ্গাল, সত্যই আমার কিছুই নেই! এসমস্ত বিষয়-সম্পত্তি যা দেখ্‌ছ. তা সব পরের! যে ভুলে এতদিন কেটে গেছে, সে ভুল আমি যখন জান্‌তে পেরেছি, তখন তোমারও জানা দরকার, তাই আজ তোমাকে এ কথা বল্‌ছি। এই দেখ তার প্রমাণ! এই বলিয়া অমর কুমার সেই হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বাকস্‌টি খুলিয়া একখানি চক্‌চকে বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া আশালতার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই খাতাখানা পড়ে দেখ, তা হ'লেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

আশালতা স্বামীর হস্ত হইতে কম্পিতকরে খাতাখানি গ্রহণ করিয়া টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া খাতাখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে লেখাছিল—"১২৯৭ সালে বেড়াইবার অভিপ্রায়ে আমি সস্ত্রীক আমার বন্ধু জগদীশপ্রসাদের নিকটে নোয়াখালিতে গিয়াছিলাম। উক্ত বন্ধু তথাকার জজ-কোর্টের জনৈক খ্যাতনামা উকিল। তিনি নোয়াখালিতে অনেক বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছেন, খাতিরও দেখিলাম, তাঁহার যথেষ্ট! জগদীশ আমার বাল্যবন্ধু। বরাবর আমরা একসঙ্গে পড়িয়াছি। তাহার পর বড় হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমরা দুই বন্ধুতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি। বারংবার তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আমি আমার স্ত্রী নবদুর্গা, একমাত্র পুত্র অমরকুমার এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া নোয়াখালি যাত্রা করিলাম। তখন নোয়াখালিতে রেলপথ হয় নাই; নোয়াখালি যাত্রার পথ তখন অত্যন্ত দুর্গম ছিল। কখন নৌকা, কখনও ষ্টীমার, কখনও বা আবার ট্রেণ, এইরূপে দুই তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত ওঠা-নামা করিতে করিতে, তবে নোয়াখালিতে উপস্থিত হইতে পারা যাইত। আমাদিগকে দেখিয়া আমার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন; অতিশয় যত্নের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম যত্ন দেখিয়া আমরাও অত্যন্ত প্রীত হইলাম। দিন-কতক বেশ মনের সুখে কাটিল। বন্ধুর সঙ্গে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতাম। সন্ধ্যার পর 'টাউন্ হলে' বসিয়া দশজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্পগুজব করিতাম। কখনও কখনও বা বাটীতে তাস, পাশা প্রভৃতি খেলাও চলিত। আমি একজন বাংলা-দেশের জমিদার শুনিয়া সকলেই আমাকে বেশ খাতির যত্ন করিতেন। অনেকে অনেক বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বাধ্য হইয়া খাতিরে পড়িয়া তাঁহাদের চাঁদার খাতায় সহি করিয়া দিলাম। কিন্তু হায়! কি অশুভক্ষণেই নোয়াখালিতে পদার্পণ করিয়াছিলাম! নোয়াখালিতে গিয়া আমার যে এমন সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। ওঃ! এখনও সে বিষাদ-কাহিনী স্মৃতিপটে উদিত হইলে, হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সে দিন যে আমার বিনামেঘে অশনি-সম্পাত ঘটিয়াছিল!

"শঙ্কর আমার পিতার আমলের পুরাতন ভৃত্য। তাহার দেহে অসুরের ক্ষমতা ছিল। মনে পড়ে, আমার বাল্যকালে শঙ্কর এবং তাহার ভাই মনোহর ত্রিশজন দস্যুকে হটাইয়া দিয়া আমাদের রক্ষা করিয়াছিল। বৃদ্ধ হইয়া মনোহর কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রভুভক্ত শঙ্কর আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। আমাদের পরিজনের মত আমাদেরই গৃহে বাস করিতেছিল। আমার পিতা মৃত্যুকালে আদেশ করিয়া যান, "শঙ্কর যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের ত্যাগ করিয়া না যায়, তবে কখনও তাহাকে ত্যাগ করিও না। বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য বলিয়া কখনও তাহাকে অবহেলা করিও না। সহোদর ভাইয়ের মত শঙ্করকে প্রতিপালন করিও। শঙ্কর আমার বহু উপকারী, তাহার ঋণ আমি সমস্ত জীবনে পরিশোধ করিতে পারিলাম না। তুমি যেন কোন দিন তাহাকে অবজ্ঞা বা অযত্ন করিও না। সে কার্য্যে অশক্ত হইলে তাহাকে পরিশ্রম করিতে দিও না।" পিতার এই শেষ আদেশ পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম; শঙ্করকে কোনও কার্য্যভার দিই নাই। মাত্র সে আমার শিশু-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ-ভার স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিল। খোকা সমস্ত দিন শঙ্করের কাছে থাকিত। শঙ্কর তাহাকে একদণ্ড চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিত না। বৃদ্ধ সারাদিন খোকার সহিত খেলা করিত, তাহাকে দুই বেলা খাওয়াইত, দুইবেলা বেড়াইতে লইয়া যাইত এবং অবসর মত তাহাকে লাঠিখেলা

শিখাইত। এহেন শঙ্কর আমার নয়নের মণির রক্ষক, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু হায়! অচিরে আমার এ সুখশান্তি চিরদিনের মত দূর হইল। হায়, ভগবন্। এমন কি পাপ করিয়াছি,যাহার জন্য আমাকে এরত্ন দান করিয়া অপহরণ করিলে? নোয়াখালিতে আসিয়াও শঙ্কর প্রতিদিন আমার অমরকে লইয়া বেড়াইতে যাইত; নিত্য নূতন নূতন দৃশ্য দেখাইয়া বাটী ফিরিত। কোন দিন রাত্রি হইয়াও যাইত। কিন্তু কোন দিন ইহার জন্য তাহাকে নিষেধ করি নাই। সে তাহার খেলার সাথী, বেড়াইবার সঙ্গী, গৃহে বন্ধু, সে পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য। তাই রাত্রি পর্য্যন্ত বেড়াইবার জন্য কোন দিন বিরক্ত হই নাই বা নিষেধ করি নাই। একদিন, অহো! সে-কথা মনে হইলে এখন পর্য্যন্ত আমার হৃৎকম্প হয়, দেহের উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া যায়, হস্ত হইতে লেখনী খসিয়া পড়ে! সে হৃদয়-বিদারক ভীষণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া কোনও ফল নাই জানি, তথাপি কেন যে ইহা লিখিতেছি, তাহা—তাঁহা বলিতে পারি না! ইহা আমার বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ-বাক্যের ন্যায় অর্থহীন ভাষামাত্র। আমার এ মর্ম্মভেদী বিষাদ-কাহিনী তো লোকসমাজে প্রকাশ করিবার নহে, তাই • কাগজে-কলমে লিখিয়া রাখিয়া হৃদয়ভার কিঞ্চিৎ লঘু করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। কেন যে এ-কথা লোকসমাজে প্রকাশ করিতে আমি অসমর্থ, কেন যে নিদারুণ পুত্রশোক অতিযত্নে হৃদয়ের গুপ্ততম প্রদেশে লুকাইয়া রাখিয়াছি, তাহা পরে লিখিতেছি।

"একদিন এই প্রকার বেড়াইতে গিয়া আমার প্রাণাধিক অমর, আমার প্রিয় পুত্র অমর আর গৃহে প্রত্যাগত হইল না; শঙ্করও না! সে-দিন অমাবস্যার রাত্রি। কার্ত্তিক মাস; কালীপূজার দেওয়ালী। রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়া গেল তাহারা তবুও ফিরিল না। আমার স্ত্রী নবদুর্গা অস্থির হইয়া পড়িলেন; উৎকণ্ঠিতচিত্তে বারংবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ গা এতটা রাত্ হয়ে গেল, আমরকে নিয়ে শঙ্কর কেন এখনও এল না?" আমি কিছু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "এত ভয় কিসের? সে ত আর একলা যায় নি, শঙ্কর রয়েছে সঙ্গে; তবে আর তোমার ভাবনার কারণ টা কি?"

"ক্রমে রাত্রি আরও অধিক হইল। নবদুর্গা আমার আশ্বাস-বাক্যে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া জগদীশের জনৈক ভৃত্যকে অমরের অনুসন্ধান করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। ভৃত্য ডেপুটি-বাবুর বাসা, ডাক্তারবাবুর বাসা, অন্যান্য উকিলবাবুদিগের বাসা, টাউন হল, কাছারী প্রভৃতি যে সকল স্থানে শঙ্করের অমরকে লইয়া বেড়াইবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সমস্ত স্থানই খুঁজিয়া আসিল; কিন্তু কোথাও তাহাদের দেখিতে পাইল না। শেষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল। তখন আমরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। জগদীশ তাহার দুই তিন জন লোককে আবার তাহাদের সন্ধানে পাঠাইয়া দিল। তাহারাও সমস্ত সহরময় খুঁজিয়াও কোথাও তাহাদের দেখিতে পাইল না। তখন জগদীশ বলিল, "না, আর চুপ

ক'রে বসে থাকলে চলছে না, এ তো ভাল কথা নয়! চল, আমরা দু'জনে যাই।"

"উড়ানিখানা গায়ে ফেলিয়া ছড়ি হাতে করিয়া আমরা দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমেই তৃতীয় ডেপুটি উপেন্দ্রকিশোর বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সহিত আমার বেশ আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমারই সমবয়স্ক এবং সমনামধারী। লোকটি বেশ সদালাপী, সদা প্রফুল্ল, গর্ব্ব-বিরহিত। তিনি সমস্ত ঘটনা শুনিয়া খুব চিন্তিত হইলেন; বলিলেন "এ তো ভাল কথা নয়! আপনার ছেলের গায়ে কিছু গয়না আছে কি?" আমি বলিলাম, "বেশী কিছু নেই, তবে গলায় একছড়া হীরের হার আছে।" তিনি এ কথা শুনিয়া একেবারে চমকাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তবেই ত বল্লেন ভাল! ঐ এক ছড়া হারের দামই বোধ হয়, দশ পনের হাজার টাকা হবে?" আমি বলিলাম, "বেশি। কিছুদিন পূর্ব্বে পঁচিশ হাজার টাকাতে কিনে দিয়েছিলুম।" ভীত কণ্ঠে উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! গহনাই হ'ল ছেলেদের শত্রু! ঐ হার-ছড়াটার লোভে চাকর-ব্যাটাই বা কোন রকম কিছু করলে?" জগদীশও অত্যন্ত ভীতভাবে বলিলেন, "আশ্চর্য্য কি?" আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, "শঙ্কর খুব বিশ্বাসী চাকর, আমি নিজকে যেমন বিশ্বাস করি, তাকেও সেই রকম বিশ্বাস করে থাকি। শঙ্কর হ'তে আমার কোনও অনিষ্ট হ'বার সম্ভাবনা নেই। সে আমার ছেলেকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। তারই কোলে আমার ছেলে মানুষ হ'য়েছে।" চিন্তিত ভাবে উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তবে বুড়ো ছেলেটাকে নিয়ে গেল কোথায়? চলুন, দেখি একবার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যাওয়া যাক্, তিনি কি বলেন।"

"আমরা তিনজনে পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি খাস বিলাতী সাহেব। কিন্তু লোকটির কথাবার্ত্তা শুনিয়া বেশ ভাল লোক বলিয়াই অনুমান হইল। তিনিও সমস্ত শুনিয়া ডেপুটি-বাবুর কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন মাত্র; বলিলেন, "বাবু, গহনাই ছেলেদের শত্রু। ছেলেদের গায়ে গহনা পরিয়ে সাজিয়ে বেড়াতে পাঠান, অতি অন্যায় কার্য্য। কত সময়ে এই গহনার জন্যই ছেলেচুরি এবং খুন হইয়া গিয়াছে!" তখন আমার আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল,—তবে কি আমার অমর নাই? হীরার হারের লোভে কেউ কি তাকে মেরে ফেল্লে? মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিলাম, 'হে ভগবান্! আমার অমরকে রক্ষা কোরো!" অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলাম, "তবে কি হবে?" সাহেব বলিলেন, "দেখি, কতদূর কি করতে পারা যায়।"

"তিনি সত্বর 'ইউনিফরম' পরিয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সাহেবের সঙ্গে সব-ইনেস্‌পেক্টার যোগীন্দ্রবাবু এবং জন-কয়েক কনষ্টেবলও চলিল। তাহাদের সকলের হাতেই এক একটা লণ্ঠন ছিল। সেই অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার নিশীথে লণ্ঠন লইয়া সমস্ত সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, বন-জঙ্গল ঝোপ্-ঝাপ্, পথ ঘাট দেখিতে দেখিতে আমরা সহর পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে

আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রান্তর-মধ্যে প্রকাণ্ড একটা দীঘি ছিল। আমরা সেই দীঘির নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলাম। শঙ্কর রুক্তাক্ত কলেবরে পথের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন সমস্ত আলোক নিভিয়া গেল। আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। শঙ্করের দেহের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। তাহার সে দশা দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্ত আমার প্রাণাধিক পুত্রের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। ডেপুটীবাবু ও ইনস্পেক্‌টারবাবু শঙ্করকে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন শঙ্করের দেহে জীবনের কোন চিহ্নই নাই। হতভাগ্যের দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া তাহার জীবন-বিহঙ্গ বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। তাহার দেহের দুই তিন স্থানে গুলির আঘাতের চিহ্ন। একটা গুলি পৃষ্ঠদেশ দিয়া বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, তাহাতেই হত-ভাগ্যের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তাহার চিরসঙ্গী লাঠি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই! পুলিশ-সাহেব পরামর্শ করিয়া গরুর গাড়ী আনাইয়া লাশ চালান দিলেন। কিন্তু অমর! আমার অমর-কুমারের ত কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া গেল না। আমার অমর কোথায় গেল? তাহার তবে কি হইল? শঙ্করের দেহ দেখিয়া সকলে অনুমান করিলেন, অমরের গলার হীরার হারের জন্তই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কোনও দস্যুগণ অমরের হীরার হার চুরি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, শঙ্কর তাহাকে রক্ষা করিবার জন্তই আত্মবলিদান দিয়াছে। শঙ্কর বিদ্যমানে হার লইবার সুযোগ না পাইয়াই অবশেষে দস্যুরা গুলির আঘাতে শঙ্করকে হত্যা করিয়াছে; তাহার পর অমর-কেও হত্যা করিয়া হার লইয়া গিয়াছে। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে-স্থানে অমরকে হত্যা করিবার কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। নিকটবর্ত্তি বন-জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইল। পরে সেই রাত্রিতেই জেলে ডাকাইয়া দীঘিতে জাল ফেলিয়া দেখা হইল, অমরের দেহ জলে পাওয়া যায় কি না। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও অমরের কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না। চারি-ধার বেড়িয়া দীঘিতে বড় বড় জাল ফেলা হইল, অনেক বড় বড় মাছ ও কাছিম উঠিতে লাগিল, কিন্তু অমরের দেহ বা তাহার বস্ত্রাদি কিছুই পাওয়া গেল না। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, "অমরকে দস্যুরা এখানে হত্যা করে নাই। শঙ্করকে হত্যা করিয়া আর তাহারা এখানে অমরকে হত্যা করিতে সাহস করে নাই। ধরা পড়িবার ভয়ে পলাইয়াছে; অবশ্য হারের লোভে অমরকে লইয়াই পলাইয়াছে।" এখন তাহারা কোথায় পলাইল তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখা গেল, দীঘির পাড়ে শ্যাম দূর্ব্বাদলরাশি মনুষ্য-পদ-পিষ্ট হইয়া দলিত হইয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারা গেল, দস্যুগণের সহিত অবশ্যই শঙ্করের একটা ক্ষুদ্র রকমের যুদ্ধ হইয়াছিল। অমরকে রক্ষা করিবার জন্ত অবশ্যই শঙ্কর প্রাণপণ করিয়াছিল; শেষে নিজের জীবন দান করিয়া যুদ্ধ প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া

গিয়াছে। পুলিশ-সাহেব একখণ্ড ক্ষুদ্র হীরক তথা হইতে কুড়াইয়া পাইলেন এবং আমার হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "দেখুন্ দেখি বাবু, এই রকম হীরা আপনার ছেলের হারে ছিল কি না? আমি কম্পিত-হস্তে সাহেবের নিকট হইতে হীরকখণ্ড লইয়া আলোর নিকটে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলাম, "হাঁ, এই সেই হীরাই বটে!" রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, অমরের কোন সন্ধান না পাওয়াতে সকলেই গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন, অমরকে এখানে হত্যা করে নাই। এখান হইতে তাহাকে লইয়া গিয়াছে। পরে তাহাদের ইচ্ছামত এবং সুবিধা-মত, হয় ত, হত্যা করিয়াছে। সে সময় আমার মনের অবস্থা যে কি প্রকার হইয়াছিল, তাহা এখন আমি লিখিয়া প্রকাশ করিতে অসমর্থ। ডেপুটী বাবু ও জগদীশ দুই জনে আমার দুইটা হাত ধরিয়া একপ্রকার টানিতে টানিতে আমাকে জগদীশের বাটীতে লইয়া আসিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

নববর্ষের প্রার্থনা।

(পিলু বারোয়াঁ।)

মাঝে মাঝে
ভুলবো যবে
জাগিয়ো তুমি
ব্যথায়;

দুঃখে সুখে
অবসাদে
জাগিয়ো তুমি
ব্যথায়!

সুখের দিনের
হাসির মাঝে
যবে দুঃখ-বাঁশী
নাহি বাজে,—

রাখ্‌বো তোমায়
পাছে পাছে—
জাগিয়ো তুমি
ব্যথায়!

কাজের মাঝে
ভুল্‌বো যবে
জাগিয়ো তুমি
ব্যথায়;

ভোগের মাঝে
রইবো ডুবে,
জাগিয়ো তুমি
ব্যথায়!

জাগিয়ো আমায়
তোমার মাঝে,
জাগিয়ো আমায়
তোমার কাজে;

সাজিও আমায়
বীরের সাজে—
সাজিও তুমি
ব্যথায়॥

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক, ৩১ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

Reg. No. C. 134

৫৭ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭—জুন, ১৯২০।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।০ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 682. June, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৮২ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭। জুন, ১৯২০। | ১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

নিবেদন।

তোমার চরণ-তলে'
দয়াময়! আরবার
আমি যে দাঁড়াতে চাই
মুছিয়া নয়ন-ধার।
ভুলে তোমা মন-ভুলে গিয়েছিনু দূরে চলে,
আপনা হারাতে হায়, ধরণীর কোলাহলে!
শুধু ঘৃণা-অনাদরে
ভরে গেল সারা বুক,
জগৎ নিঠুর বড়,
চাহে না দীনের মুখ!
টুটিয়াছে ভুল আজি, চিনেছি ভুবনখানি,
আর ত সহে না, নাথ! আর ত সরে না বাণী!
এইটুকু বল আজি
দাও মোরে ভগবান্!
সব ছেড়ে সব ভুলে
তোমাতে জুড়াই প্রাণ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গানের স্বরলিপি।

সিন্ধু-বারোয়াঁ—তাল একতালা।

সব দুখ মোর হবে শতদল
তুমি যদি রও কাছে !
জীবনের ভার কুসুমের হার,
তুমি যদি রও কাছে !
আকাশের চাঁদ হাতে পাব আমি
তুমি যদি রও কাছে—
গোলাপের বন বুকে রবে মোর,
তুমি যদি রও কাছে !
মিটিবে গো তৃষা সুধা-সরোবরে
তুমি যদি রও কাছে—
ডুবিব অতল অমৃতের হ্রদে,
তুমি যদি রও কাছে !
পর্ণ-কুটীরে রাজা হয়ে র'ব—
তুমি যদি রও কাছে।
স্বরগ নামিবে এ ধরণীতলে,
তুমি যদি রও কাছে ॥

রচনা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

অস্থায়ী।

২´
[ণ্া সা রা] ৩ ০ ১
II {সা সা সা। রা জ্ঞা া। রা জ্ঞমা জ্ঞা। রা সা া} I
স ব দু খ মোর ০ হ বে শ ত দল ০

২´ ৩ ০ ১
I র্রসা র্সা পা। ধা পধপা া। মা -গা পমা। -া -া -া I
তু মি য দি র০ও ০ কা ০ ছে ০ ০ ০

২´　৩　০　১
I পা পনা না। র্সা র্সর্রা ।। র্সা ণা ধা। -পা মা । I
জী ব নে র ভার ০ কু সু মে র হার ০

২´　৩　০　১
I মা পা ধা। পা পধপা ।। মা -গা পমা। -া -া -া II
তু মি য দি র০ও ০ কা ০ ছে০ ০ ০ ০

অন্তরা।

২´　৩　০　১
II {সপা পা পা। -া পা -া। পা পা পা। পা পা পা I
আ০ কা শে র চাঁ দ হা তে পা ব আ মি

২´　৩　০　১
I পা পা পা। পা পধা ।। না -া র্সা। -া -া -া} I
তু মি য দি রও ০ কা ০ ছে ০ ০ ০

২´　৩　০　১
I না র্সা রা। া র্জ্ঞা । । র্রা র্মা র্জ্ঞা। র্রা র্সা । I
গো লা পের ০ বন ০ বু কে র বে মোর ০

২´　৩　০　১
I র্রা র্সা ণা। ধা পা মা। পর্সা -না র্সা। -া -া -া I
তু মি য দি র ও কা০ ০ ছে ০ ০ ০

২´　৩　০　১
I সা জ্ঞা রা। -াজ্ঞ রজ্ঞা । । রা মা জ্ঞা। রা সা । I
গো লা পের ০ বন ০ বু কে র বে মোর ০

২　৩　০　১
I র্সর্সা র্সা ণা। ধা পধা পা। মা -গা পমা। -া -া -া II
তু মি য দি র০ ও কা ০ ছে০ ০ ০ ০

সঞ্চারী।

২´　৩　০　১
II সা র্সর্সা র্সা। র্সা র্সর্রা । । র্সা ণা ধা। পা মমা । I
মি টি বে গো তৃষা ০ সু ধা স রো বরে ০

২´ ৩ ০ ১
I মা পা পা। ধা পধপা ।। মা -গা পমা। -া -া -া I
তু মি য দি র০ও ০ কা ০ ছে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। রা জ্ঞা ।। রা মা জ্ঞা। রা মা সা I
ভু বি ব অ তল ০ অ মৃ তে র হৃ দে

২´ ৩ ০ ১
I ন্‌া ন্‌া প্‌া। প্‌া ন্‌া ।। ন্‌াস -া সা। -া -া -া II
তু মি য দি রও ০ কা ০ ছে ০ ০ ০

আভোগ।

২´ ৩ ০ ১
II {সা -া পা। পা পা -া। পা পা পা। পা পা পপা I
প ০ র্ণ কু টী ০ রে রা জা হ য়ে রব

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা। পা পধা ।। না -া র্সা। -া -া -া} I
তু মি য দি রও ০ কা০ ০ ছে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা। র্রা র্রা র্জ্ঞা। র্রর্সা র্জ্ঞা র্রা। -া র্সা র্সা I
স্ব র্গ গ না মি বে এধ র ণী ০ ত লে

২´ ৩ ০ ১
I র্রা র্সা পা। ধা পমা ।। পর্সা -না র্সা। া- -া -া I
তু মি য দি রও ০ কা০ ০ ছে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা র্জ্ঞা জ্ঞা। রা জ্ঞা জ্ঞা। রমা জ্ঞা রা। -া সা সা I
স্ব র্গ গ না মি বে এধ র ণী ০ ত লে

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা পা। ধা পধপা ।। মা -গা পমা। -া -া -া II II
তু মি য দি র০ও ০ কা ০ ছে০ ০ ০ ০

জাহাজ ডুবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমার স্ত্রী সকল কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতহইয়া পড়িলেন; কিছুতেই তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার করিতে সমর্থ হইলাম না। জগদীশ ডাক্তার-সাহেবকে লইয়া আসিল। ডাক্তার-সাহেব সমস্ত দিন ধরিয়া নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তবে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনে সমর্থ হইলেন। ডাক্তার সাহেব বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু আমার বিপদ্ সম্পূর্ণ রূপে কাটিল না। আমার স্ত্রী চৈতন্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তির বিলোপ হইয়া গেল; এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ-গ্রস্তা হইয়া গেলেন। নোয়াখালিতে আর এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠান আমার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। শ্বশুরের হত্যাকারীর এবং অমরকুমারের পুলিশ-অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। পুলিশসাহেব আমার এজাহার লিখিয়া লইয়া গেলেন। আমি সকল ভার জগদীশের উপর দিয়া পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি লইয়া উন্মত্তা সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে করিয়া কোঁদায় চড়িয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। জগদীশ ও তাঁহার পত্নী সাশ্রু-নয়নে আমাদের বিদায় দিলেন। জগদীশের একজন অনুচর আমাদের ষ্টীমারে তুলিয়া দিবার জন্ম আমাদের সহিত কোঁদায় উঠিল।

"আসিয়াছিলাম চারি জন। দুইজনকে জন্মের মতন নোয়াখালিতে রাখিয়া ফিরিতেছি মাত্র দুই জন। তাহাও একজন আবার সংজ্ঞাহীনা উন্মাদিনী। জানি না, কোন্ অশুভ-ক্ষণে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। কোঁদায় উঠিয়া দুই পার্শ্বে পাণিফলের পাতা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কোঁদা এক একটা বৃহৎ ঝাউবৃক্ষ কুঁদিয়া নৌকার আকারে নির্ম্মাণ করা হয়। তাহা দৈর্ঘ্যে বার চৌদ্দ হাত বা তদপেক্ষাও বড় হইয়া থাকে, কিন্তু প্রস্থে এক-জন মানুষ বসিতে পারে মাত্র। মাথার উপর নৌকার ন্যায় ছাপর আছে। ইহার এক মুখ সরু, অপর মুখ অপেক্ষাকৃত কিছু চওড়া। এই যানকে এ-প্রদেশে 'কোঁদা' বলিয়া থাকে। এই কোঁদায় চাপিয়া 'লাকসামে' আসিয়া ট্রেনে উঠিলাম। উন্মাদিনী ভার্য্যাকে লইয়া অতি অল্প সাবধানে সতর্কভাবে চলিলাম। আকাশে অল্প মেঘ দেখা দিল; গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। ট্রেণে একটী কামরা রিজার্ভ করা ছিল। তাহার চারিপার্শ্বের সার্সী তুলিয়া-দিলাম, কেবল নিজে যেখানে বসিয়াছিলাম সেই দিক্‌টা খুলিয়া রাখিলাম। দুই পার্শ্বে ধান্যের ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চলি-লাম। যথাসময়ে পত্নীকে সাবধানে নামাইয়া মেঘনা-পদ্মা পার হইবার নিমিত্ত ষ্টীমারে উঠিলাম। বড় ভয় করিয়াছিলাম, কেমন করিয়া এ উন্মাদ-রোগগ্রস্তাকে লইয়া নামা উঠা করিব। কিন্তু একটা আমার সৌভাগ্য যে, প্রত্যেকবারই নামিতে উঠিতে তিনি কোনও বাধা দেন নাই; সহজ মানুষের ন্যায় কোঁদা হইতে ট্রেণে, ট্রেণ হইতে ষ্টীমারে উঠিয়াছিলেন। এখন যাহা হউক, ভগবৎকৃপায় আর একবার

নামা উঠা করিয়া বাটী পৌছিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। ভাবিলাম, যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা শেষ হইয়া গেল। জগদীশের লোকটী আমাদের ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া বিদায় লইয়া ফিরিয়া গেল। আমি নবদুর্গার হাত ধরিয়া প্রথম-শ্রেণীর একটা কামরায় প্রবেশ করিলাম। এতক্ষণ নবদুর্গা নীরবে ধীরভাবে আমার অনুসরণ করিতেছিলেন। এইবার কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জোর করিয়া আমার হাত হইতে হাতটা ছিনাইয়া লইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "কি আক্কেল তোমার! এত রাত পর্য্যন্ত ছেলেটা ঘরে এল না, একটুও ভাবনা নেই? আশ্চর্য্যি হয়ে যাচ্ছি তোমার কাণ্ড দেখে! দেখ না একবার অমর কোথায় গেল?"

দিবা তখন দ্বিতীয় প্রহর। আমি কষ্টে অশ্রু ও হৃদয়ের শোক দমন করিয়া বলিলাম, "বন্ধু যে অমরকে খুঁজতে গেছে, এখনি এসে পড়ে এই! বন্ধু জগদীশের জনৈক ভৃত্যের নাম। আমার কথা শুনিয়া আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া বিরক্ত ভাবে মুখটা ভার করিয়া নবদুর্গা শুইয়া পড়িলেন। পুত্রহারা অভাগিনীর চক্ষে আজ তিন দিন নিদ্রা নাই; আহার নাই। আমি তাহার মাথার কাছে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম, কতক্ষণে বাড়ীতে পৌছাইব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা মানব-বুদ্ধির অগোচর। আমি অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম; হঠাৎ একটা কলরব কর্ণে প্রবেশ করিতে আমার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইয়া পড়িল! ব্যাপার কি জানিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলাম; দেখিলাম নদীতে একটা ঘূর্ণি বাতাস উঠিয়া মেঘনার মেঘবর্ণ প্রবল বারিরাশি সগর্ব্বে স্ফীত হইয়া যেন আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য ছুটিতেছে; জাহাজ তোলপাড় করিতেছে; চালক কিছুতেই তাহা স্থির রাখিতে সমর্থ হইতেছে না। কাপ্তেন-সাহেব নিজ কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কম্পাস-দ্বারা চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সারেং, খালাসি, বয় প্রভৃতি সকলে "টর্ণেডো" "টর্ণেডো" বলিয়া ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। আরোহিগণের মধ্যে সভয় চকিত আকুল আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। ষ্টিমার বুঝি জলমগ্ন হয়! সে জাহাজে অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। পূজার বন্ধের পরে কেহ কার্য্যস্থলে যাইতেছিলেন, কেহ স্থানান্তরে যাইতেছিলেন, কেহ স্থানান্তরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, গৃহে ফিরিতেছিলেন; কেহ বা বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া ফিরিতেছিলেন। সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাণের মায়া বড় মায়া। কেহ বিপদ্ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন, কেহ হরির লুট, পীরের সিন্নি মানিতে লাগিলেন। আমি নীরব, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকার। আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিল অমর, সে যখন নাই, তখন এ জীবন থাকিলেই বা কি, আর যাইলেই বা কি! পতি-পত্নী একত্রে আছি, একত্রেই জীবলীলা সমাধা হইয়া যাইবে, ক্ষতি কি? মৃত্যু আর আমাদের অধিক অনিষ্ট কি করিতে পারিবে? বাঁচিয়াই বা আর আমাদের সুখ কি? প্রবল বাত্যায় জাহাজের মাস্তল ভাঙ্গিয়া গেল, তলদেশ ভাঙ্গিয়া জাহাজে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। জাহাজ-মধ্যে জালিবোট বেশী ছিল

না। যাহা দুই চারিখানা ছিল, তন্মধ্যে লোক তুলিয়া কাপ্তেন-সাহেব তাহা দিগকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিতে লাগিলেন। উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া মেঘনা যেন রণোন্মত্তা পাগলিনী হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। সে কি বিকট ভয়ঙ্কর শব্দ! তেমন শব্দ আমি জীবনে কোন দিন শুনি নাই। আরোহি-দলের মধ্যে একটা কাতর ক্রন্দন ও হাহাকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। স্ব স্ব জীবন রক্ষার জন্য সকলেই ব্যস্ত, সকলেই কাতর! জালিবোটে অসম্ভব লোক জোর করিয়া উঠিয়া পড়িতে লাগিল। এত লোক জালিবোটে উঠিলে তাহাদের জীবন নিরাপদ্ না হইয়া বিপন্ন হইবারই অধিক আশঙ্কা বলিয়া কাপ্তেন-সাহেব আরোহীদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু এ আসন্ন মৃত্যুর সময় কে তাহা শুনিবে? মৃত্যুর করাল ছায়া বিভীষিকা-রূপে তাহাদের সম্মুখে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছিল। কেমন করিয়া তাহারা স্থির হইয়া থাকিবে! আমি নবদুর্গার হাত ধরিয়া ডেকের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সৌভাগ্যের বিষয় নবদুর্গা কোন প্রকার গোলযোগ না করিয়া উদাস-নেত্রে সেই জনতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর অল্পক্ষণ মাত্র! জাহাজ জলমগ্ন হয় হয়! কোন কোন ব্যক্তি ষ্টীমারে বসিয়া মরা অপেক্ষা জলে ঝাঁপ দিয়া মরা ভাল বলিয়া মেঘনার অগাধ বারিরাশির মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। আমি নবদুর্গার হাত ধরিয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে আমাকে ধীর স্থির প্রশান্ত-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কাপ্তেন সাহেব খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আমার নিকটে আসিয়া ইংরাজিতে বলিলেন, "ধন্যবাদ, বাবু, আপনি যথার্থ বুদ্ধিমান্! মানুষের মৃত্যু অনি-বার্য্য; যে প্রকারে হউক্, মৃত্যু তো একদিন অবশ্যই ঘটিবে। তার জন্য মানুষের সর্ব্ব-দাই প্রস্তুত হয়ে থাকা আবশ্যক। মৃত্যুকে সম্মুখ দেখিয়া বৃথা কান্নাকাটী চিৎকার করিয়া লাভ কি?" আমিও ইংরাজীতে উত্তর করিলাম, "ঠিক্ কথা।" জাহাজ ক্রমশঃ নামিয়া যাইতে লাগিল, ডেকের উপরেও জল উঠিল। দুই একজনের দেখাদেখি ক্রমে অনেকেই জলে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। জাহাজ জলমগ্ন হইতে দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে 'সাম্পেন'-ওয়ালারা 'সাম্পেন' লইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। 'সাম্পেন' অতিক্ষুদ্র পান্সীর আকার। প্রবল সমুদ্র-মধ্যেও তাহা নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে পারে এবং জলমগ্ন ব্যক্তিদিগকে জলদেবতার ন্যায় রক্ষা করিয়া থাকে। যখন ডেকের উপর হাঁটু-প্রমাণ জল উঠিল, তখন আমিও আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। অপরাপরের মত আমিও নবদুর্গার হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উভয়ে জলে পড়িলাম। বাল্যকালে আমার খুব সাঁতার কাটার অভ্যাস ছিল, সেই সাহসে আমি এমন অসম-সাহসের কাজ করিয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, কিছু দূর সাঁতার কাটিয়া গিয়া একখানা সাম্পেন ধরিব, কিন্তু আমার ভ্রম! নিরীহ গঙ্গা-বক্ষে বা দীঘি-পুষ্করিণীতে সাঁতার দেওয়া আর প্রবল তরঙ্গময় পদ্মা-মেঘনায় সাঁতার দেওয়াতে যে কত স্বর্গ-মর্ত্ত প্রভেদ, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। তাহাতে আবার আমি একা নই! সাধ্য কি

যে সেই উত্তাল তরঙ্গের হস্ত অতিক্রম করিয়া দুইটী জীবন রক্ষা করি? সাম্পেন ধরিব বলিয়া যতই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ততই আমাকে হঠাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ আমার হস্তপদ যেন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল; ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লোপ পাইতে লাগিল। পরে কি হইল, তাহা আর আমার মনে নাই। যখন বেশ জ্ঞান লাভ করিলাম, তখন দেখিলাম আমি ও নবদুর্গা একখানা সাম্পেনে রহিয়াছি। মনে বড় আনন্দ হইল। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলাম। যে আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একাগ্রচিত্তে মৃত্যুর কামনা করিতেছিলাম, এখন সেই আমিই মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি ভাবিয়া যথার্থই বড় আনন্দিত হইতেছিলাম। মানুষের জীবন অত্যন্ত লোভনীয়। মানুষ সংসারের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিবসে সহস্রবার মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু মৃত্যু যখন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিয়া থাকে। সাম্পেন-ওয়ালারা আমাদের চাঁদপুরের ঘাটে নামাইয়া দিল। সাম্পেন-ওয়ালারা সে-দিন নিজ নিজ সাম্পেন-সাহায্যে অনেকেরই জীবনরক্ষা করিয়াছিল। আমরা চাঁদপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কিছু দূরে অপর একজন সাম্পেনওয়ালা একটী ক্ষুদ্র বালককে তাহার নাম, ধাম, তাহার পিতার নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কিন্তু বালক কোন কথারই উত্তর-দানে সমর্থ হইতেছে না। দূর হইতে আমি বুঝিতে পারিলাম, এ অপর কেহ নয়, এ আমারই হারানিধি। দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম। কিন্তু শিশু আমার বক্ষে আসিয়া শান্ত হইল না। তখন তাহাকে ধীরে ধীরে বক্ষ হইতে নামাইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতেই দেখিলাম, এ কি? এ ত আমার অমর নয়! ঠিক্ তাহারই মত দেখিতে বটে; কিন্তু শারীরিক গঠনে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য! অতি অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য। দুইটি মানুষের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য কখনও দেখি নাই। এমন কি যমজ-ভাইয়ের মধ্যেও এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। আমি মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। পরে আরও দেখিলাম, বালকটীর পৃষ্ঠদেশে উল্কি দিয়া লেখা রহিয়াছে—"অমরকুমার বসু।" তখন আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। 'অমরকুমার বসু'!—এ যে আমারই পুত্রের নাম। যাহা হউক্, প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিলাম, আমার ন্যায় আর কোনও হতভাগ্য বা হতভাগিনী আজ মেঘনা-গর্ভে এ অমূল্য নিধি হারাইয়াছে। দুই শিশুর মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়া মনে মনে তৎক্ষণাৎ এক মতলব আঁটিলাম। সত্বর বালকটিকে লইয়া নবদুর্গার নিকটে গিয়া বলিলাম, "এই নাও, তোমার অমর এসেছে।" নবদুর্গা সানন্দে বালকটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া বালকের মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আজ কোথায় বেড়াতে গেছ্‌লি বাবা? এত রাত্ হয়ে গেল, আমি ভেবে মরছিলুম।" বালক নবদুর্গার বুকে মুখ

গুঁজিয়া রহিল; কোন উত্তর করিল না। তাহার আয়ত চক্ষুর্দ্বয় হইতে দুই বিন্দু অশ্রু কপোল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য দেখিয়া আমারও দুই চক্ষু শুষ্ক রহিল না। আমি দুই হস্তে আমার চক্ষু-দুইটা মুছিয়া ফেলিলাম। নবদুর্গার ধারণা এ যেন সেই কাল রাত্রি, আর অমর যেন অধিক রাত্রিতে গৃহে ফিরিয়া আসিল। সাম্পেন-ওয়ালারা দেখিয়া শুনিয়া মনে করিল ছেলেটি আমারই, তাই তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু ছেলেটি আপ্‌নার?" আমার মুখ দিয়া চট্‌ করিয়া বাহির হইল, 'হাঁ'। একজন হাত পাতিয়া বলিল, "বাবু বখশিস্?" অপর একজন রোষ-কশায়িতলোচনে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছি-ছি! বখ্‌শিস্ চাইচিস্ কি বলে? দেখচিস্ না, বাবুও জলে ডুবে গেছ্‌লেন্!" নীচজাতীয় লোকের এবং-প্রকার মহত্ব দেখিয়া বাস্তবিক বড় আনন্দিত হইলাম। আমার হাতে কয়েকটা হীরকাঙ্গুরীয় ছিল, তাহাই খুলিয়া আমি তাহার হাতে দিলাম। তাহারা সানন্দে আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বালকটীকে লাভ করিয়া আমার স্ত্রীর উন্মত্ততা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত এবং আনন্দিত হইলাম; কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসে নাই। বালকটি যে তাঁহার গর্ভজাত নহে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিতে আমারও আর ইচ্ছা হইল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম—'ছেলেটি আমার, এই মিথ্যা কথা বলিলাম, প্রবঞ্চনা করিলাম; লোকে আমার নিন্দা করিবে, করুক্। আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতারক বলিবে বলুক্; আমি এ-রত্ন অপরকে দিতে পারিব না। আমার উন্মাদিনী পত্নীর বক্ষ হইতে যদি কেহ এ রত্ন কাড়িয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে অভাগিনীর মৃত্যু ঘটিবে।' বিধাতা আমার বুকের ধন কাড়িয়া লইয়াছেন, আমি অপরের বুকের ধন কাড়িয়া লইলাম। না, না, কাড়িয়া লই নাই; বিধাতা আমার পরীক্ষার নিমিত্ত এ-রত্ন আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু আমি এমনি স্বার্থপর যে নিজের সুখের জন্য অনায়াসে অপরের ধন নিজের বলিয়া দখল করিয়া লইলাম। বিধাতার পরীক্ষায় জয়লাভ করিতে সমর্থ হইলাম না, লোভ-সংবরণ করিতে পারিলাম না। হয় ত চেষ্টা করিলে বালকটীর পিতা-মাতার অনুসন্ধান পাওয়া যাইত, কিন্তু আমি তাহা করিলাম না। নিজের পত্নীর বুকে তাহাকে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। নিজের সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম; পরের মুখ চাহিলাম না। আমি ঘোর স্বার্থপর নিষ্ঠুর মহাপাতকী। হে ভগবন্! তোমার অধম সন্তানকে মার্জ্জনা কর। যথাসময়ে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি নবদুর্গা ও ছেলেটীকে লইয়া পুনরায় অন্য ট্রেনে উঠিলাম। দেখিলাম, নবদুর্গা ছেলেটিকে খাবার খাওইয়া দিতে দিতে হাসিয়া হাসিয়া কি কথা বলিতেছেন। বালকটীও তাহার বাল-সুলভ সুকোমল মধুমাখা স্বরে তাহার কথার উত্তর প্রদান করিতেছিল। তাহা দেখিয়া আমার সন্তপ্ত হৃদয় অনেক শীতল হইল। নিদারুণ পুত্রশোক যেন অনেক পরিমাণে লঘু হইল বলিয়া মনে হইল।

"তাহার পর কতদিন কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কাহারও নিকটে কোনওদিন এ রহস্য ভেদ করি নাই। বালকটিকে নিজ-পুত্রের মতনই জ্ঞান করিয়াছি, পুত্রের মতনই প্রতি-পালন করিতে লাগিয়াছি। তাহাকে পাইয়া যথার্থই আমি পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আর নবদুর্গা ত জানিতেই পারিলেন না যে, বালকটী তাঁহার গর্ভজাত নয়। কোন দিন আমি একথা বলিও নাই! বালকটিও জানিতে পারিল না যে, আমরা তাহার জনক জননী নই। বালকের সরল অন্তঃকরণ নিজের পিতামাতা ও জন্মভূমির কথা সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে এ রহস্য জানি কেবল আমি। কিন্তু এ জীবনে এ রহস্য কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে পারিব না; পত্নী স্বর্গগতা হইয়াছেন, আমারও জীবনদীপ নির্বাপিতপ্রায়; এ রহস্য সংসারে প্রকাশ হইবার আশঙ্কাও আর বড় একটা নাই। কিন্তু কেন কি জানি, এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি কোন দিন আমার হারানিধি ফিরে আসে, যদি সে বাঁচিয়া থাকে! হায়! তাহা হইলে সে যে দীন ভিখারীর মতন তাহার গৃহদ্বার হইতে ফিরিয়া যাইবে! তাহার নিষ্ঠুর পিতা যে তাহাকে তাহার সকল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সে আসিলে তাহাকে কেহ চিনিতেও পারিবে না। যদি তাহার শৈশবের কথা মনে থাকে,—আমার মৃত্যুর পরে যদি সে কখনও আসিয়া আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়ায়, তাহা হইলে সকলে তাহাকে চোর, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে, কিন্তু সে চোর নয়, চোর আমি; ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক সে নয়, ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক শঠ আমি। তাহার পায়ে ছয়টী আঙ্গুল ছিল। চিহ্নের মধ্যে শুধু এই।

শ্রীউপেন্দ্র কিশোর বসু,
জমিদার,
আক্রিমগঞ্জ।"

আশালতা খাতাখানা টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। অমরকুমার সপ্রেমে পত্নীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব; উভয়েরই হৃদয়-মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব বহিয়া যাইতেছিল। উভয়ের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সস্নেহে পত্নীর মুখখানি দুই হস্তে তুলিয়া ধরিয়া গদগদ-স্বরে অমর বুঝাইয়া বলিলেন, "পিতৃ-মাতৃহীন অজ্ঞাত-কুলশীল, দীন ভিখারী, একটা কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে আমি,—আর এই হতভাগ্য তোমার স্বামী! লতা, বল দেখি, একে পারবে কি শ্রদ্ধা করতে?"

আশালতা তাহার দক্ষিণ হস্তখানি স্বামীর মুখের উপর চাপা দিয়া কৃত্রিম কোপ-সহকারে বলিল, "ফের ঐ কথা?"

(২)

উপরি উক্ত ঘটনার পরদিবস দিবা দ্বিতীয়প্রহরকালে একটা প্রশস্ত কক্ষ-মধ্যে আশালতা একাকী বসিয়াছিল। তাহার মনটা বড়ই অস্থির! অমরকুমার কি একটা কার্য্য বশতঃ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন। একাকী আশালতার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না; সব যেন ফাঁকা ফাঁকা শূন্য শূন্য বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। দাস-দাসী-পৌরজন-মণ্ডিতা বৃহৎ পুরী যেন আজ তাহার পক্ষে খাঁ খাঁ

করিতেছিল! একদিন পূর্ব্বে কত যত্নে কত আগ্রহে সে এই গৃহে গৃহিণী-পণা করিয়াছিল, আর একটা মাত্র কথা জ্ঞাত হইয়া একদিনের মধ্যেই যেন তাহার জীবনের সব পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। তাহার সে যত্ন সে আগ্রহ যেন কোথায় বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতের ইহাই কি নিয়ম? আজ কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, 'এ-সব কাহার? এ পরের গৃহ পরের সম্পত্তি, এ সকল স্পর্শ করিবার তাহার অধিকার নাই।' স্পর্শ করিবার স্পৃহাও তাহার আর ছিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল,—এ প্রাসাদতুল্য পুরী পরিত্যাগ করিয়া কোন নির্জ্জন প্রদেশে সামান্য পর্ণকুটীরে স্বামীর সহিত বাস করিতে পারিলে, ইহাঅপেক্ষা সে সহস্রগুণ শান্তি লাভ করিবে। জগতে একমাত্র স্বামীই যে তাহার আপনার। স্বামী ভিন্ন এ পৃথিবীতে তাহার ত আর কেহ নাই, কিছু নাই। এ যে পরের গৃহ, পরের সম্পত্তি, পরের পরিজন! তবে কাজ কি এ সকলে? কাজ কি এ পরস্ব-উপভোগে? তাহার হাতে একখানা কাশীরাম দাসের মহাভারত ছিল। সে দময়ন্তীর উপাখ্যান পাঠ করিতেছিল; ভাবিতেছিল, নলরাজা দ্যূতপণে রাজ্যসম্পত্তি সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভ্রাতাকে সকল দান করিয়া বনে চলিয়া গিয়াছিলেন, রাণী দময়ন্তীও ত তাহা দেখিয়া তাঁহার পরিধেয় বসন ভূষণ সব পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছিলেন। পরের গৃহে বাস করা, পরান্ন ভোজন করিয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা বনবাস সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। যে-ধনে কোনও দাবি-দাওয়া নাই, যে সম্পত্তিতে আইন বা ধর্ম্মতঃ কোনও অধিকারও নাই, যাহা পরের স্বেচ্ছাকৃত দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে, এমন ওজন-করা কৃপার আকাঙ্ক্ষাকে আশালতা বড় হেয় জ্ঞান করে। তেমন কৃপার ভিখারিণী সে নয়। কিছুক্ষণ মহাভারতখানা লইয়া পাঠ করিয়া, আর তাহা ভাল লাগিল না; মহাভারত রাখিয়া সে বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বাতায়নের নিম্নে বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান। এই উদ্যানটী অমরকুমারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কত পুষ্পবৃক্ষ অমরকুমার ও আশালতা উভয়ে স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন; কাহার গাছে আগে ফুল ফোটে তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা নিজের নিজের গাছটীকে কত যত্ন করিয়াছেন, স্বহস্তে জল ঢালিয়াছেন! সে এক অকৃত্রিম আনন্দের দিন গিয়াছে। সে-দিন আর ফিরিবে না! উদ্যানটী বৃহৎ। উদ্যান-মধ্যে ছোট বড় দেশী বিলাতী, নানা-জাতীয় পুষ্প ও ক্রোটনের গাছ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সজ্জিত। প্রত্যেক বৃক্ষের তলদেশে শ্বেত-উপলখণ্ডদ্বারা বৃক্ষের নাম লেখা। মধ্যে মধ্যে মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিতা বেদী! সেই বেদীর উপরে স্থাপিত মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত নরনারীর মূর্ত্তি! মূর্ত্তিগুলি কোনও সুদক্ষ ভাস্কর-শিল্পি-দ্বারা নির্ম্মিত; হঠাৎ দেখিলে যেন জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। অতি সুন্দর! মনোমুগ্ধকর! কোনও মূর্ত্তির হস্তে ফুলের সাজি; একটা কৃত্রিম পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়নে উদ্যত। কোনও মূর্ত্তির হস্তে কৃত্রিম পুস্তক; মূর্ত্তিটি একাগ্রমনে অধ্যয়নে রত। একটী নারী-মূর্ত্তির হস্তে একটী কৃত্রিম কাকাতুয়া;

রমণী সহাস্যে পাখীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন; তাঁহার পাদ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া একটী ক্ষুদ্র উলঙ্গ শিশু;—শিশু একহস্তে রমণীর বসনাগ্রভাগ ধরিয়া, অপর হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া পক্ষি-শাবকটী গ্রহণের জন্য ব্যগ্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আবার কোন কোন নর-নারী মূর্ত্তি নতজানু হইয়া কর জোড়ে উর্দ্ধ-মুখে ভগবানের ধ্যানে বিভোর! দেখিলে মনঃপ্রাণ স্বতঃই ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী কৃত্রিম উৎস। কলটি টিপিয়া দিলে রৌপ্য-নির্ম্মিত ব্যাঘ্র-মুখ হইতে অজস্র বারি-ধারা নির্গত হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তরের বসিবার বেদী। বেদীর ধারে ক্ষুদ্র লতাকুঞ্জ। কুঞ্জের শ্যামল ছায়ায় প্রখর গ্রীষ্মের সময়েও সমস্ত উদ্যানটী বেশ স্নিগ্ধ থাকে। উদ্যানতল নবশস্পাস্তরণে আবৃত; ঠিক্ যেন প্রকৃতিরাণী উদ্যানের শোভা-বৃদ্ধি-হেতু হরিদ্বর্ণের একখানা গালিচা বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন! উদ্যানের চতুর্দ্দিক্ দৃঢ় প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশদ্বারে দুই পার্শ্বে কারুকার্য্য-বিশিষ্ট দুইটা স্তম্ভ। স্তম্ভের মস্তকে দুইটা সিংহ-মূর্ত্তি বদন-ব্যাদান করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। স্তম্ভগাত্রে আলোক-লতার গাছ উঠিয়া স্তম্ভ-দুই টাকে যেন স্বর্ণ-বর্ণে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আশালতা বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে উদ্যানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অতীত কালের কত কাহিনীই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল, সেই যখন একাদশ-বর্ষবয়ঃক্রমকালে চেলীর কাপড় পরিয়া মুকুট মাথায় দিয়া নববধূরূপে প্রথম এ গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন সে এ সমস্ত তাহার নিজের বলিয়াই ভাবিয়াছিল। নিজের ঘর-সংসার নিজের শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়, বন্ধু, পরিজন, সমস্তই তাহার নিজের বলিয়াই সেই পর্য্যন্ত সে জানিত। আজ একদিনে এক কথায় এত দিনের সেই সমস্তই পর হইয়া গিয়াছে। একটা কথায় সে সকলের নিকট হইতে দূরে—অতিদূরে গিয়া পড়িয়াছে। সে দূরের পরিমাণ অনন্তগগনস্পর্শী! তাহার সীমা নাই সংখ্যা নাই! এ কুলের ত সে কেহ নয়ই, তা ছাড়া সে যে কোথায় কোন্ গৃহের, কোন্ কুলের বধূ তাহারও স্থিরতা নাই। তাহার আরও মনে হইতে লাগিল, শ্বশুর-শাশুড়ীর অগাধ অপরিসীম স্নেহ! কি আশ্চর্য্য, পরের পুত্রকে পরের বস্তুকে মানুষ কি এমন অকৃত্রিম ভালবাসিতে পারে? এমন মর্ম্মস্পর্শী প্রাণ-ঢালা ভালবাসা! এমন অপরিসীম স্নেহ, এত যত্ন! আশালতা নিজের পিতা মাতার কাছেও বোধ হয়, কোন দিন তাহা পায় নাই। এই স্নেহময় শ্বশুর-শাশুড়ী তাহার নিজের নয়! এ-কথা ভাবিতেও আশালতার কষ্ট হইতে লাগিল। তাহার চক্ষু-দুইটী জলে ভরিয়া আসিল। মনে মনে সে বলিয়া উঠিল, 'না না, তোমরা যেই হও—আপনার হও, পর হও—তোমরা এখন স্বর্গবাসী! বাবা, মা, মাগো! তোমরা আমার চির-আরাধ্য, নমস্য পূজনীয়। আমি চিরদিন তোমাদের দেবতার মত শ্রদ্ধা করিব; মনে মনে চিরদিনই তোমা-দের এইভাবে পূজা করিব। আমি তোমা-দের কোন দিন পর ভাবিতে পারিব না।'

আশালতা বাতায়ন-পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসিল। অমরকুমারের জন্য তাহার মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কতক্ষণে অমরকুমার গৃহে ফিরিয়া আসিবেন্ সেই প্রতীক্ষায় সে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। একাকী বসিয়া বসিয়া তাহার মনটা যেন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সে পিয়ানোটী লইয়া বাজাইতে বসিল এবং পিয়ানোর সঙ্গে গাহিতে লাগিল—

সুখে আমায় রাখ্‌বে কেন ?
রাখ তোমার কোলে,
যাক্ না গো সুখ জ্বলে।
যাক্ না পায়ের তলার মাটি,
তুমি যখন ধর্‌বে আঁটি
তুলে নিয়ে দোলাবে ঐ
বাহুর দোলার দোলে।
সেখানে ঘর বাঁধ্‌ব আমি,
আসে আসুক্ বান,
তুমি যদি ভাসাও মোরে
চাই নে পরিত্রাণ।
হার মেনেছি মিটেছে ভয়,
তোমার জয় তো আমারি জয়,
ধরা দেব তোমায় আমি
ধর্‌বো যে তাই হলে।

ক্রমে সুর পঞ্চমে মিশিল। গানের সহিত নিজের সত্তা মিশাইয়া দিয়া আশালতা তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিল। এমন সময় অমরকুমার আশালতার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আশালতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রেমপূর্ণ অনিমেষ-দৃষ্টিতে আশালতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে স্বর্গীয় হাসি, হৃদয়ে বিমল আনন্দ! আশালতার চম্পককলিকাবৎ অঙ্গুলিগুলি কেমন পিয়ানোর তালে তালে নৃত্য করিতেছিল, কাল মেঘের মতন কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ কেমন তাহার কপোল-দুইখানি আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। কতকগুলি কেশ পৃষ্ঠ দেশ দিয়া শোফার উপর পতিত হইয়া কুণ্ডলীকৃত কৃষ্ণসর্পের মত দেখাইতেছিল। অমরকুমার তন্ময়চিত্তে বিভোর হইয়া প্রিয়তমার রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। আশালতা আপন মনে গাহিতেছিল। স্বামীর আগমন সে মোটেই জানিতে পারে নাই। আরও কতক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইত বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ অমরকুমারের নিষ্ঠুর কাশি বৈরিতা সাধন করিল। আশালতা ত্রস্তে ফিরিয়া চাহিয়া প্রিয়তমকে দেখিবামাত্র লজ্জায় যারপর নাই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার সুন্দর মুখখানি একেবারে ঘোর সিন্দূরবর্ণ হইয়া উঠিল। অমরকুমার মৃদু হাসিয়া আশালতার একখানা হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "আমার কাছে এত লজ্জা কেন, আশা? বেশ সুন্দর ত গাইতেছিলে, আর একটু গাও না, শুনি!"

আশলতা অভিমান-ভরে অমরকুমারের হস্ত হইতে নিজের হাতটা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বলিল, "চুরি ক'রে আমার গান শোনা হচ্ছিল!"

অমরকুমার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর উচ্চ হাস্যে ঘর পূর্ণ করিয়া বলিলেন, "বেশ! উচ্চ বিচারপতি বটে! বলি কাল কি না! নিজের জিনিষ নিজে উপভোগ কর্‌লে মানুষ বুঝি চোর হয়? তোমাকে গান-বাজনা শিখিয়েছিলুম কেন? শুন্‌ব বলেই

ত আমি ত আর লুকিয়ে পর-স্ত্রীর গান শুনি নি!"

আশালতা আর কোন উত্তর করিতে সমর্থ হইল না; পরাজিতা হইল। অমর-কুমার বিজয়ী বীরের মত সগর্ব্বে সাদরে পত্নীকে বক্ষে ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"বড়বাবু আসছেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

নবোঢ়া

সরম-কম্পিত বক্ষ, চকিত, সভয়,
মৃদু-ভাষ, ধীর-গতি, দৃষ্টি মধুময়!
ফুটে কি না ফুটে হাসি অধরে মিলায়,
প্রাণ কেড়ে লয় তবু অমিয়া বিলায়!

উষায় সবার আগে মেলিয়া নয়ন
বন্দিয়া আনত-শিরে পতির চরণ
কক্ষে কক্ষে গৃহকর্ম্মে আপনা বিলায়
নাহি শান্তি, নাহি ক্লান্তি, বিশ্রাম কোথায়!

নিশীথে পতির বক্ষে আত্ম-সমর্পণ
আশা-আকাঙ্ক্ষার কত নিবিড় মিলন!
চুম্বনে শিহরে কভু, কভু আলিঙ্গনে
মেনে লয় নারীজন্ম সার্থক ভুবনে!

অচেনা অজানা জনে করিয়া আপন
বরষে কল্যাণ-শান্তি আনন্দে কেমন!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

কাংড়া-পথে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কাংড়ায় আমাদের একজন বিশেষ আত্মীয় পূর্ব্বেই পরিবার সহ গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের জন্য ওখানকার ভাওয়াল দেবীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটী ছোট বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা যাইয়া উঠিলাম। সে রাত্রির আহার সেই আত্মীয়ের বাটী হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিল। পথশ্রমে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কোন ক্রমে আহার-সমাপন করিয়া শয়ন করিবামাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আরামদায়িনী ক্লান্তি নাশিনী নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম পাইয়া সকল ক্লান্তি দূর হইল। নিদ্রার ন্যায় এমন সুখকর আর কিছুই নাই, মানুষ যতই পরিশ্রম করিয়া আসুক না কেন, একবার নিদ্রিত হইলে তাহার সকল ক্লান্তি দূর হইবে।

আমাদের বাড়ীটী ভাওয়াল-দেবীর মন্দিরের সম্মুখেই ছিল। প্রাতঃকালে নহবতের

বাদ্য এবং পূজা হইত, বেলা ১২ টার সময় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া দেবীর ভোগ দেওয়া হইত এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় নহবৎ বাজাইয়া পূজা ও আরতি হইত। তৎপরে অনেক লোক মিলিয়া সঙ্গীতের স্বরে মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করিত।

ভাওয়াল-মন্দির একটী পীঠস্থান। এখানে দেবীর কোন এক অঙ্গ পড়িয়াছিল। সেই-জন্য এই মন্দিরে সর্ব্বদাই মহা ধূমধাম দেখি-লাম। কত দূর দেশ-দেশান্তর হইতে দলে দলে শত শত লোক পূজা দিতে আসিতেছে! লোকের কোলাহলে সর্ব্বদাই মন্দির পরিপূর্ণ।

১৯০৫ সালে কাংড়ায় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে কাংড়ায় একটি বাড়ীরও চিহ্ন ছিল না; সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, দুইধারে ভগ্ন মন্দির-সমূহের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন ভূমিকম্পে বাড়ী ঘর পড়িয়া যায়, তখন এই ভাওয়াল-দেবীর মন্দিরও পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মন্দিরটী সমস্তই প্রায় পড়িয়া গিয়াছিল, কেবল দেবী-প্রতিমার কোন ক্ষতি হয় নাই। এক্ষণে নূতন মন্দির তৈয়ার হইতেছে। মন্দিরটী অনেকটা ভুবনেশ্বরের ন্যায় গঠিত হইতেছে। মন্দির-সংলগ্ন অনেকগুলি ধরমশালা প্রস্তুত আছে; তাহাতে যাত্রী দিগের কোন কষ্ট হয় না। দোকান-পাটও মন্দির-সংলগ্ন, এজন্য যাত্রী-দের সবিশেষ সুবিধা।

এখানকার বাড়ীগুলি কোনটি বা দ্বিতল কোনটি বা ত্রিতল। দেওয়ালগুলি প্রস্তরের ইষ্টকে নির্ম্মিত। দরজা, জানালা কাষ্টের দ্বারা নির্ম্মিত। বড় বড় শ্লেট পাথর বিছাইয়া তাহার উপর মাটি ফেলিয়া এক-তালার ছাদ প্রস্তুত; দ্বিতলের ছাদ করোগেট্ আয়রণ দ্বারা নির্ম্মিত। এ-স্থানে গ্রীষ্মকালে তেমন গরম নাই; প্রায়ই বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হইলে পথে কাদা হয় না; কারণ উঁচু নীচু পথ, জল গড়াইয়া খাদে পড়িয়া যায়।

বাজারের পথগুলি প্রস্তর দিয়া বাঁধান; বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অদূরে নদীর শব্দ শোনা যাইত। কি ভীষণ শব্দ! ভূমিকম্পের পর বহু লোক পুরাতন কাংড়া ছাড়িয়া এই ভাওয়ালে আসিয়া বাড়ী-ঘর প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেছে। এস্থানে হাঁসপাতাল, ছেলেদের স্কুল, একটী মেয়েদের স্কুল, একটী জন্তুদের হাঁসপাতাল ও কাছারী ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

লোকদিগের যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত এখানকার নদীতে মাঝে মাঝে সেতু নির্ম্মিত আছে; যেখানে সেতু নাই, সে-স্থানের লোকেরা মসকে চড়িয়া নদী পার হয়।

আমরা ভাওয়ালে দুই মাস ছিলাম। এখানে যেমন মন্দির, তেমনি কুণ্ডও আছে। এক-একটী মন্দিরের সঙ্গে এক একটী করিয়া কুণ্ড আছে। কুণ্ডগুলির নাম—সূর্য্যকুণ্ড, চক্রকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, রামকুণ্ড, ইত্যাদি। সূর্য্যকুণ্ডের জল ভাওয়ালের লোকেরা পান করে। কুণ্ডগুলিতে জল অল্পই আছে। আমাদের দেশের বড় চৌবাচ্চার মতন ইহার চারি দিক্ পাথর দিয়া বাঁধান; তলায় মাটি আছে; সেখান দিয়া বুড় বুড় করিয়া সর্ব্বদাই জল উঠিতেছে।

কুণ্ডগুলির জল এত পরিষ্কার যে তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমরা প্রতিদিনই কুণ্ডে

স্নান করিতে যাইতাম। জল অপরিষ্কার হইবে বলিয়া তাহার ভিতরে নামিয়া স্নান করা নিষেধ; এজন্য সকলেই জল তুলিয়া স্নান করে। আমরা মুনিকরণ-নামে একটী কুণ্ড দেখিলাম; শুনিলাম, সেই কুণ্ড-সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে তাহার চারিধারে মুনি-ঋষিরা বসিয়া তপস্যা করিতেন; এজন্য তাহার নাম মণিকরণ দেওয়া হইয়াছে। এই কুণ্ডটি হইতে এত জল উঠিতেছে যে, দুইটী পাথরের বাঘের মুখের ভিতর দিয়া কুণ্ড হইতে অনবরত জল বহিয়া নদীতে গিয়া পড়িতেছে। এই বাঘের মুখের নীচে স্নান করিবার নিমিত্ত পাথর দিয়া বাঁধান আছে। এ-স্থানে স্নান করিয়া অত্যন্ত আরাম হইল।

ভাওয়াল হইতে পুরাতন কাংড়া প্রায় এক মাইল নীচে। এখানে একটী দুর্গ দেখিলাম। সেই দুর্গ ভূমিকম্পে প্রায় ভূমিসাৎ হইয়াছে। যে ভগ্নাবশেষ গুলির চিহ্ন আছে, তাহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুর্গের ফটকটী লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত; ফটকটী আজিও অটুটভাবে দণ্ডায়মান হইয়া দুর্গটীর পূর্ব্বকালের ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। একটী বৃহৎ নদীর দ্বারা দুর্গটীর চারিদিক্ বেষ্টিত, দেখিলাম। এই সকল চিহ্ন অতীত ইতিহাসের কত কথাই মনে করিয়া দিল! পুরাতন কাংড়ায়, শুনিলাম, রামচন্দ্রের সময়ের অতিপুরাতন সুন্দর সুন্দর ছবি, টাকা ও পুরাকালের আরও অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়াছে!

এখানকার পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা বহু দূর হইতে মন্দিরে পূজা দিতে আসে। এই সকল স্ত্রীলোকেরা পথে সকলে মিলিয়া সঙ্গীত করিতে করিতে পর্ব্বতের উপর উঠে। সেই সঙ্গীত করিবার একটু বৈচিত্র্যও দেখিলাম। স্ত্রীলোকেরা একটু করিয়া উপরে উঠে, আর তিন-চারিজনে মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইয়া দুই লাইন গান গাহে, আবার চলিতে আরম্ভ করে। এইরূপ করিয়া ইহারা পাহাড়ে চড়ে। ইহাতে পাহাড়ে, চড়িতে উহাদের কোনও কষ্ট হয় না। স্ত্রী, পুরুষ, সকলে মিলিয়া যখন 'জয় ভাওয়াল মাইকি জয়' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে, তখন বড়ই সুন্দর লাগে।

পাহাড়ী স্ত্রীলোকদের পোষাক বহু রং-বেরংয়ের। এই পোষাককে "পেষওয়াজী পোষাক" বলে। একটী পুরা হাতের কুর্ত্তা ও পা-পর্য্যন্ত পাজামা; ইহার উপর বুক হইতে পা পর্য্যন্ত ঘাঘ্‌রা। তাহার উপরে মস্তক ও সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করিয়া ওড়্‌না। আমার বাড়ীর দ্বিতলের উপর বসিয়া সর্ব্বদা ইহাদের যাতায়াত দেখিতাম এবং বেশ ভাল লাগিত। প্রায় দুই মাস শেষ হইয়া আসিল তথাপি এখান হইতে ফিরিতে ইচ্ছা হইত না, এমন সুন্দর মনোহর স্থান!

ভাওয়ালের সম্মুখে এক সুবিশাল পর্ব্বত। তাহার উচ্চশৃঙ্গ বরফে আচ্ছন্ন! এই পর্ব্বতের নাম সুমেরুপর্ব্বত। শীতের সময় সুমেরুপর্ব্বত বরফের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া জল হইয়া নদীর স্রোতের বৃদ্ধি করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একটী নূতন মাধুরী পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

পুনরায় লাহোরে ফিরিবার আয়োজন

করিতে লাগিলাম। ১লা সেপ্টেম্বর লাহোরে পৌঁছিতে হইবে। সেজন্য তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই বাহির হইতে হইল। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বপ্রকৃতির যে মহাদৃশ্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিয়াছিলাম, ইচ্ছা না থাকিলেও জোর করিয়া মনকে তথা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিতে হইল। সংসারী মানুষের ইহাই শাস্তি।

যে পথ দিয়া আসিয়াছিলাম, সেই পথ দিয়া যাওয়া হইবে; সে-জন্য সবই জানা ছিল। আবার দুই মাস পরে একদিন মধ্যাহ্ন ২ টার সময় সেই নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ দিয়া দুইখানা জীর্ণ টম্‌টম চড়িয়া আমরা ফিরিয়া চলিলাম; মনটা অত্যন্ত খারাপ হইল। সেই সুন্দর পথ, পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেক লোকের বাড়ী, তুষারাচ্ছন্ন অভ্রভেদী সুমেরু পর্ব্বত এবং পর্ব্বতের মধ্য দেশে সমুন্নত সুন্দর শ্রী-সম্পন্ন বৃক্ষরাজী দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইলাম!

এবার ফিরিবার পথে সবই জানা ছিল, সেজন্য তেমন কষ্ট হয় নাই; একদিন পরেই লাহোরে গিয়া পৌঁছিলাম [

যেটী যেমন করিয়া বলিলে ভাল হইত, যেটী যে ভাবে বর্ণনা করিলে ঠিক কথাটী ও ভাবটী প্রকাশ হইত, দুর্ব্বল লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না, আর যে রকম করিয়া দেখালে ঠিক্ দেখা হইত, তাহাও আমার মোটেই হয় নাই।

চারিদিকে কি সুন্দর স্বর্গের দৃশ্য, পরমেশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য মহিমা দর্শন করিলাম, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নয়। এখন সে দিনের কথা যখন মনে করি, সব যেন স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়।

শ্রীবিভূবালা মিত্র।

প্রেমময়ী

যত আশা আছে মোর লইয়া তোমায়
মিটিবারে চায়,
যত ব্যথা আছে মোর তোমার ছায়ায়
জুড়াইয়া যায়,
যতই উদ্বেগ মম সান্ত্বনার আশে
চাহে তব পানে,
যতই ব্যর্থতা মম সিদ্ধি পথে পশে
তোমার আহ্বানে।
অমিয় করহ মম গরল হিয়ার
অমৃত রূপিণি!
ঐশ্বর্য্য করহ যত দীনতা আমার
হে পরশ-মণি!

বেসুর মরমে মম তব সুর বাজে
মধুর ঝঙ্কারে,
হৃদয়ের শূন্য কক্ষে তব হিয়া রাজে
পূর্ণ করিবারে।
যা কিছু আছিল তব কর্ম্মফল সহ
তুলি' ধরি' দিয়া
আপনা ভুলিবে কিসে ভাব অহরহঃ
আমার লাগিয়া!
শত জনমের দুখ মনে নাহি গণি'
সাধি' তপস্যায়
দুর্লভ দেবত্ব আনি' ওগো তপস্বিনি!
দিতেছ আমায়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

জপজী।

যে যুগ চারে আরজা হোর দশুণী হোই।
নবাঁ খণ্ডা বিচ জানিয়ৈ, নাল চলৈ সভ্ কোই॥
চঙ্গা নাউ রখায়কৈ, যশ কীরতি জগ লেই।
যে তিস্ নদরি ন আবই, ত বাত ন পুছৈ
কেই॥
কীট অন্দরি কীট করি, দোসী দোষ ধরে।
নানক, নিরগুণী গুণ করে, গুণবস্ত্যা গুণ দে॥
তেহা কোই ন সুঝই,যি তেন গুণ কোই করে॥

[যে=যদি (কাহারও তপস্যা-হেতু); যুগচারে—চারি যুগ ব্যাপিয়া; আরজা= পরমায়ু; হোর—আরও; দশুনী=দশগুণ; হোই—হয়।

নবাঁ খণ্ডা বিচ—নব-খণ্ডযুক্ত পৃথিবীর মধ্যে সকলেই; জানিয়ৈ—তাহাকে জানে নাল চলৈ সভ্ কোই—সকলে তাহার অনুবর্ত্তী হয়।

চঙ্গা নাউ রখায়কৈ—যদি তাহার ভাল নাম রাখে; যশ কীরতি জগ লেই=জগতে যশ ও কীর্ত্তি লাভ করে। যে তিস্ নদরি ন আবই—যদি তাহার দৃষ্টি ভগবানে পতিত না হয়। ত বাত ন পুছৈ কোই=তাহা হইলে তাহার কথা আর কেহই জিজ্ঞাসা করে না।

কীট অন্দরি কীট করি—তখন তাহার অতিনীচ কীট-যোনিতে জন্ম হয়। দোষী দোষ ধরে=পাপীরাও তখন তাহার নিন্দাবাদ করে।

নানক—নানক বলিতেছেন। নিরগুণী গুণ করে—তিনি ত্রিগুণাতীত পুরুষ, অথচ তিনি গুণের আধার; গুণবন্ত্যা গুণ দে— ভক্তকে তিনি ভোগৈশ্বর্য্য দেন। তেহা কোই ন সুঝই=কিন্তু এ-সংসারে এমন কাহাকেও দেখি না। যি তিস্ গুণ কোই করে—যে সেই ভক্তকে ভোগৈশ্বর্য্য-সংশ্লিষ্টি-হেতু মায়াতে নিপাতিত করিতে পারে।]

অর্থ—"যদি কাহারও তপস্যা-হেতু চারি যুগ ব্যাপিয়া অথবা তাহারও দশগুণ পরমায়ুঃ হয়, যদি নবখণ্ডযুক্ত পৃথিবীর মধ্যে সকলেই তাহাকে জানে এবং সকলে তাহার অনুবর্ত্তী হয়, যদি তাহার উৎকৃষ্ট নাম রাখা হয়, এবং যদি সে জগতে যশ ও কীর্ত্তি লাভ করে, কিন্তু এ-সকল লাভ করিয়াও যদি তাহার দৃষ্টি ভগবানের উপর পতিত না হয়, তাহা হইলে তাহার কথা আর কেহই জিজ্ঞাসা করে না; তখন তাহার অতিনীচ কীট-যোনিতে জন্ম হয়, এবং পাপীরাও তখন তাহার নিন্দাবাদ করে। নানক বলিতেছেন, সেই ব্রহ্ম গুণাতীত পুরুষ, অথচ তিনি গুণের আধার; ভক্তকে তিনি ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান করেন; কিন্তু এ সংসারে এমন কাহাকেও দেখি না, যে সেই ভগবদ্ভক্তকে ভোগৈশ্বর্য্য-সংশ্লিষ্টি-হেতু মায়াতে নিপাতিত করিতে পারে। অর্থাৎ ভগবানের দিকে দৃষ্টি থাকিলে তাহার আর কোন ভয়ের কারণ থাকে না।"

৮

শুনিয়ৈ সিধ পীর সুরনাথ।
শুনিয়ৈ ধরতী ধবল আকাশ॥
শুনিয়ৈ দীপ লোহ পাতাল।
শুনিয়ৈ পোহি ন সকৈ কাল॥

নানক ভগতা সদা বিকাশ।
শুনিয়ৈ দুঃখ পাপকা নাশ ॥

[পরমেশ্বরের নাম-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে। শুনিয়ৈ=পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া। সিধ=সিদ্ধ; পীর=পীর; সুর=দেবতা; নাথ=গুরু গোরখ-নাথের পন্থায় যোগিগণ; ইহারা আপন আপন পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শুনিয়ৈ ধরতী ধবল আকাশ=পরমেশ্বরের নামের প্রভাবে পৃথিবী, ধবল অর্থাৎ ধবল বৃষ যাহা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে এবং আকাশ নিরাধার অবস্থিতি করিতেছে। শুনিয়ৈ দীপ লোহ পাতাল=ভগবানের নাম স্মরণ করায় ভগবদ্ভক্তের সপ্তদ্বীপের, সপ্তলোকের এবং সপ্তপাতালের সমস্ত পদার্থের জ্ঞানলাভ হয়। শুনিয়ৈ পোহি ন সকৈ কাল =ভগবানের নাম স্মরণ করায়, কাল ভগবদ্ভক্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। নানক =নানক বলিতেছেন। ভগতা=তাঁহার ভক্ত; সদা=সদাই; বিকাশ=প্রফুল্ল। শুনিয়ৈ দুঃখ পাপকা নাশ=ভগবানের স্মরণে সাধকের দুঃখ এবং অনেক জন্মের পাপ দূর হইয়া যায়।]

অর্থ—"ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সিদ্ধ, পীর, দেবতা এবং নাথ-যোগিগণ, সকলে আপন আপন পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরমেশ্বরের নামের প্রভাবে, পৃথিবী, ধবল বৃষ (যিনি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন) এবং আকাশ নিরাধার অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। ভগবানের নাম স্মরণ করায় ভগবদ্ভক্তের সপ্তদ্বীপের, সপ্তলোকের, এবং সপ্তপাতালের সমস্ত পদার্থের জ্ঞানলাভ হয়। ভগবানের নাম স্মরণ করায়, কাল ভগবদ্ভক্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। নানক বলিতেছেন, ভগবানের ভক্ত সদাই প্রফুল্ল। ভগবানের স্মরণে সাধকের দুঃখ এবং অনেক জন্মের পাপ দূর হইয়া যায়।"

৯

শুনিয়ৈ ঈশর বরমা ইন্দ।
শুনিয়ৈ মুখি সালাহন মন্দ ॥
শুনিয়ৈ যোগ যুগতি তনি ভেদ।
শুনিয়ৈ শাসত্র সিমৃতি বেদ ॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
শুনিয়ৈ দুঃখ পাপকা নাশ ॥

[শুনিয়ৈ ঈশর বরমা ইন্দ—ভগবানের নাম স্মরণে শিব, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রতাপবান্ হইয়াছেন্। শুনিয়ৈ মুখি সালাহন মন্দ—ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া "মন্দ" অর্থাৎ নীচ জাতিও ভক্তিলাভ করে ও ভগবানের স্তুতিগান করে। যথা গীতায়—"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে-মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥"

শুনিয়ৈ যোগ যুগতি তনি ভেদ—ভগবানের নাম স্মরণ করায় সাধক আপনা হইতেই যোগফল-লাভ করিয়া থাকে ও তাঁহার "তনিভেদ" অর্থাৎ ষট্‌চক্রভেদ হইয়া থাকে। যথা পাতঞ্জলে—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা"। শুনিয়ৈ শাসত্র সিমৃতি বেদ—ভগবানের নাম-স্মরণে শাস্ত্র, স্মৃতি এবং বেদের জ্ঞান আপনা হইতেই ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হয়। নানক—নানক বলিতেছেন্। ভগতা সদা বিকাশ—ভক্ত-হৃদয় সদাই বিকশিত, অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। শুনিয়ৈ দুঃখপাপকা নাশ—ভগবানের নাম স্মরণ করায় দুঃখ এবং জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নষ্ট হইয়া যায়।]

অর্থ—ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া শিব, ব্রহ্মা, ও ইন্দ্র প্রতাপবান্ হইয়াছেন। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া নীচজাতিও ভক্তিলাভ করে ও ভগবানের স্তুতিগান করে। ভগবানের নাম স্মরণ করায় সাধক আপনা হইতেই যোগফল লাভ করিয়া থাকে ও তাহার ষট্‌চক্রভেদ হইয়া থাকে। ভগবানের নাম-স্মরণে শাস্ত্র, স্মৃতি এবং বেদের জ্ঞান আপনা হইতেই ভক্ত-হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। নানক বলিতেছেন, ভক্তহৃদয় সদাই বিকশিত, অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। ভগবানের নাম স্মরণ করায় দুঃখ এবং জন্মজন্মান্তরের পাপ কাটিয়া যায়।

১০

শুনিয়ৈ সৎ সন্তোষ জ্ঞান।
শুনিয়ৈ অঠ্‌সিঠিকা ইস্‌নান॥
শুনিয়ৈ পঢ়ি পঢ়ি পাবহি মান।
শুনিয়ৈ লাগৈ সহজি ধিয়ান॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
শুনিয়ৈ দুঃখ-পাপকা নাশ॥

[শুনিয়ৈ সৎসন্তোষিজ্ঞান—ভগবানের নাম শ্রবণে সত্য, সন্তোষ এবং জ্ঞানলাভ হয়। শুনিয়ৈ অঠ্‌সঠিকা ইস্‌নান—ভগবানের নাম শ্রবণে ৬৮ তীর্থ-স্নানের ফললাভ হয়। পঢ়ি পঢ়ি পাবহি মান—ভগবানের নাম শ্রবণে গ্রন্থপাঠ করিয়া সম্মানলাভ হয়। শুনিয়ৈ লাগৈ সহজি ধিয়ান—ভগবানের নাম-শ্রবণে সহজে ধ্যান-ধারণা হয়।]

অর্থ—ভগবানের নাম-শ্রবণে সত্য, সন্তোষ ও জ্ঞানলাভ হয়; তাঁহার নাম-শ্রবণে ৬৮ তীর্থস্নানের ফললাভ হয়; তাঁহার নাম-শ্রবণে গ্রন্থপাঠ করিয়া সম্মান-লাভ হয়; তাঁহার নাম-শ্রবণে সহজে ধ্যান-ধারণা হয়; নানক বলিতেছেন, ভগবদ্ভক্তের হৃদয় সদাই বিকসিত; ভগবানের নাম শ্রবণে দুঃখ ও জন্ম জন্মান্তরে পাপ দূর হয়।"

১১

শুনিয়ৈ সরাঁ গুনাকে গাহ্।
শুনিয়ৈ সেখ পীর পাতসাহ্॥
শুনিয়ৈ অন্ধে পাবহি রাহ।
শুনিয়ৈ হাথ হোবৈ অসগাহ॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
শুনিয়ৈ দুঃখ-পাপকা নাশ॥

[সরাঁ গুণাকে—সর্বগুণের আধার সেই ভগবানের; গাহ—গাথা, গান; শুনিয়ৈ—ভক্তগণ শ্রবণ করিয়া থাকেন্।

শুনিয়ৈ সেখপীর পাতসাহ—তাঁহার গুণ-শ্রবণে সেখ, পীর এবং বাদশাহ পদবী পাইয়াছেন।

শুনিয়ৈ অন্ধে পাবহি রাহ—তাঁহার গুণ-গান শ্রবণে মোহান্ধ ব্যক্তিগণও কল্যাণ মার্গ প্রাপ্ত হ'ন্। শুনিয়ৈ হাথ হোবৈ অসগাহ—তাঁহার গুণগান-শ্রবণে সংসার-সমুদ্র এক হাত মাত্র বোধ হয়, এবং ভক্ত তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়।]

অর্থ—সর্ব্বগুণের আধার সেই ভগবানের গান ভক্তগণ সদা শ্রবণ করিয়া থাকেন্; তাঁহার গুণগান শ্রবণে সেখ, পীর, এবং বাদসাহগণ মহান্ পদবী পাইয়াছেন। তাঁহার গুণগান-শ্রবণে মোহান্ধ ব্যক্তিগণও কল্যাণ-মার্গ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার গুণগান-শ্রবণে অকূল সংসার-সমুদ্র অতিক্ষুদ্র হইয়া যায় ও ভক্ত তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়। নানক বলিতেছেন, ভগবদ্ভক্তের হৃদয় সদাই বিক-

সিত ; তাঁহার গুণগান-শ্রবণে দুঃখ এবং জন্ম-জন্মান্তরের পাপ দূর হয়।"

১২

মংনেকি গতি কহি ন যাই।
যে কো কহৈ পিছৈ পছতাই॥
কাগদি কলম ন লিখন হার।
মংনেকা বহি কর ন বিচার॥
এয়সা নাম নিরঞ্জন হোই।
যে কো মন জানৈ মনকোই॥

[মংনে কি গতি-নাউকে মংনেকি গতি—নামে মন লাগাইয়া থাকার যে অসংখ্য ফল ; কহি ন যাই—তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না।

যে কো কহৈ পিছৈ পছতাই—যদি কেহ সেই ফল ব্যক্ত করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে শেষে অনুতাপ করিতে হয়, অর্থাৎ ব্যক্ত করা অসম্ভব ; অথবা ইহাও অর্থ হইতে পারে—"আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা।"

কাগদি কলম ন লিখন হার—যে ফল কাগজ-কলমে লিখিয়া ইয়ত্তা করা যায় না।

মংনেকা বহি কর ন বিচার—ইহার ফল কোন পুস্তক বিচার করিতে পারে নাই। এয়সা নাম নিরঞ্জন হোই—সেই নিরঞ্জন পুরুষের নামের গুণ এইপ্রকার অব্যক্ত। যেমন পতিব্রতা স্ত্রীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন্, আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না, এবং অপরকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়াও যায় না, সেইরূপ নামজপের ফল, যিনি জপ করেন্, তিনিই জানেন্, অপরে বুঝে না, বা অপরকে তাহা বুঝানও যায় না।

যেকো মন জানৈ মনকোয়—যে মনে সেই আনন্দ বুঝিয়াছে, সে হৃদয়কোষে সেই আনন্দ ভোগ করে।]

অর্থ—"নামে মন লাগাইয়া থাকার যে অসীম ফল, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না; যদি কেহ সেই ফল ব্যক্ত করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার অসমর্থতা-হেতু সে অনুতাপ করে ; কাগজে লিখিয়া সে ফলের ইয়ত্তা করা যায় না, এবং ইহা কোনও পুস্তকেও বিচার করিতে পারে নাই। সেই নিরঞ্জন পুরুষের নামের গুণ এই প্রকার অব্যক্ত। যে সাধক মনে সেই নামানন্দ বুঝিয়াছে, হৃদয়কোষে সেই আনন্দ সে উপভোগ করে।"

১৩

মংনৈ সুরত হোবৈ মন বুদ্ধি।
মংনৈ সগল ভবনকী সুদ্ধি॥
মংনৈ মুহি চোটাঁন খায়।
মংনৈ যমকি সাথ ন যায়॥
এয়সা নাম নিরঞ্জন হোয়।
যে কো মন জানৈ মন কোয়॥

[মংনৈ=নামে মন লাগাইয়া থাকিলে। সুরত=একাগ্রতা। মন বুদ্ধি=মনে জ্ঞানের সঞ্চার। হোবৈ=হয়। সগল=সমস্ত। ভবনকী=ভুবনের, অর্থাৎ ত্রিভুবনের এবং তদন্তর্গত সমস্ত বস্তুর॥ সুদ্ধি=জ্ঞানলাভ হয়। মুহি=মুখে। চোটা=আঘাত। ন খায়=পায় না। যমকি সাথ ন যায়=যম-দ্বারে যাইতে হয় না।]

অর্থ :—"ভগবানের নামে মন লাগাইয়া থাকিলে মনে একাগ্রতা ও জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তাঁহার নামে মন লাগাইয়া থাকিলে ত্রিভুবনের ও তদন্তর্গত সমস্ত বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়। তাঁহার নামে মন লাগাইয়া

থাকিলে মুখে আঘাত পাইতে হয় না, এবং যমের সঙ্গে যাইতেও হয় না। সেই নির্ম্মল পুরুষের নামের এমনই গুণ। যে তাঁহার নামানন্দ বুঝিয়াছে, সে হৃদয়কোষে সেই আনন্দ উপভোগ করে।"

১৪

মংনৈ মারগ ঠকি ন পায়।
মংনৈ পতস্যো পরগট যায়॥
মংনৈ মগন চলৈ পংথ।
মংনৈ ধর্ম্মসেতী সমবংধ॥
এয়সা নাম নিরঞ্জন হোয়।
যে কো মন জানৈ মনকোয়॥

[মংনৈ = নামে মন লাগাইয়া থাকিলে। মারগ = রাস্তায়, অর্থাৎ সাধন-পথে। ঠকি = বাটা। ন পায় = পায় না। পতস্যো = সম্মানের সহিত। পরগট = সংসার-সমুদ্রের পরপারে। মগন = ভগবদ্ভাবে মগ্ন হইয়া। চলৈ পংথ = সাধন-পথে চলিতে থাকে। ধর্ম্মসেতী = ধর্ম্মের সঙ্গে। সমবংধ = সম্বন্ধ হয়।]

অর্থ।—ভগবানের নামে মন লাগাইয়া থাকিলে, সাধন-পথে বাধা পাইতে হয় না। তাঁহার নামে মন লাগাইয়া চলিলে সংসার-সমুদ্র সম্মানের সহিত পার হওয়া যায়। তাঁহার নামে মন লাগাইয়া থাকিলে ভগবদ্ভাবে মগ্ন হইয়া সাধক সাধন-পথে চলিতে থাকে এবং ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়। সেই নিরঞ্জন পুরুষের নামের এমনই গুণ! যে তাঁহার নামানন্দ বুঝিয়াছে, সে হৃদয়কোষে সেই আনন্দ উপভোগ করে।"

১৫

মংনৈ পাবহি মোথ-দুয়ার।
মংনৈ পরবারৈ সাধার॥
মংনৈ তরে তারৈ গুরুশিখ।
মংনৈ নানক ভবহি ন ভিখ॥
এয়সা নাম নিরঞ্জন হোয়।
যে কো মন জানৈ মন কোয়॥

[পাবহি = প্রাপ্ত হয়। মোথ-দুয়ার = মোক্ষের দ্বার অর্থাৎ সৎসঙ্গ। পরবারৈ = সমস্ত পরিবারের। সাধার—উদ্ধারের কারণ হয়। (যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদ সমস্ত পরিবারের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।) তরে = তরিয়া যায়। তারৈ = তরাইয়া দেয়। গুরুশিখ = গুরুশিষ্য উভয়কেই। নানক = নানক বলিতেছেন। ভবহি ন ভিখ = তাহাকে আর পার্থিব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা বা আয়াস করিতে হয় না; ভগবান্ নিজেই তাহাকে যোগ-ক্ষেম প্রদান করেন।]

অর্থ :—"ভগবানের নামে মন লাগাইয়া থাকিলে মোক্ষদ্বার অর্থাৎ সৎসঙ্গ লাভ হয়। তাঁহাতে যে মন লাগাইয়া থাকে, সে পরিবারস্থ সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্বকে ধ্রুব-প্রহ্লাদের ন্যায় উদ্ধার করে। তাঁহাতে মন লাগাইয়া থাকা হেতু গুরুশিষ্য—উভয়েরই উদ্ধার হয়। তাঁহাতে মন লাগাইয়া থাকিলে কিছুরই অভাব থাকে না। সেই নিরঞ্জন-পুরুষের নামের এমনই গুণ! যে মনে তাঁহার নামানন্দ বুঝিয়াছে, সে হৃদয়কোষে সেই আনন্দ উপভোগ করে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত॥

মুগ্ধা।

(১)

বারণ ক'রে আয়না তোরা,
আজকে সখি অমন ক'রে,
কানন পথে বাজায় বাঁশী
প্রাণ মাতান করুণ স্বরে ;

(২)

হতাশ প্রাণের রুদ্ধ ব্যথা,
গুঞ্জরিয়ে বাঁশীর তানে,
কাহার হৃদয় লক্ষ্য করি
চাল্‌ছে কে আজ আকুল প্রাণে ?

(৩)

ফুলগুলি সব শিউরে উঠে,
পড়্‌ছে ঝরে বকুল মূলে,
আপন হারা মুগ্ধ তরু
লতার সোহাগ গেছে ভুলে ;

(৪)

পাগল হাওয়া নিচল নীরব
যায়নিক' সে লতার পাশ,
তাদের সনে ক'রতে খেলা,
ক'রতে চুরি ফুলের বাস ;

(৫)

পাপিয়া তার গেছে ভুলে,
চোক্ গেল সেই মধুর গান,
নীরব তাহার কণ্ঠবীনা
বাঁশীর তানে মুগ্ধ প্রাণ ;

(৬)

অবশ আমার মুগ্ধ হিয়া,
নিরালা ওই শ্যাম কাননে,
সকল বাঁধন তুচ্ছ ক'রে
পড়বে লুটে তার চরণে।

(৭)

বারণ ক'রে আয়লো তোরা,
আজকে তোদের ধরি পায়,
উদাস বাঁশীর করুণ তানে,
ঘরে থাকা হলো দায়॥

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

প্রসূতি ও সন্তান মঙ্গল।

শিশুদের মঙ্গলের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

(বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-কমিশনারের প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি হইতে গৃহীত)।

প্রসূতির কল্যাণের সহিত শিশুর কল্যাণ বিজড়িত। শিশুর স্বাভাবিক বর্দ্ধন প্রসূতির স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। প্রসূতি-রক্ষার সুব্যবস্থা না করিলে সন্তান-রক্ষা হইতে পারে না। প্রসূতির স্বাস্থ্য-রক্ষার সুব্যবস্থার উপর জাতির উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে।

কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর শিশুর মঙ্গল নির্ভর করে ?

১। জনক-জননীর স্বাস্থ্য ও সদ্ভাবে জীবন যাপন।

২। সন্তান-প্রসবের সময় সমাগত হইলে প্রসূতির অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা, তাহার

আহার অপ্রচুর না হওয়া, তাহার মানসিক বিরক্তির কোন হেতু না ঘটা।

৩। গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান-প্রসবের পরে প্রসূতি যতদিন শয্যাশায়িনী থাকেন ততদিন তাহার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিযুক্ত করা

৪। প্রসবান্তে প্রসূতি যতকাল শয্যাশায়িনী থাকিবেন ততদিন তাঁহার যথোচিত সেবা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকা।

৫। সন্তান যাহাতে মাতৃস্তন্যে পুষ্ট হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।

৬। সন্তান যাহাতে সর্ব্বদা গৃহে বুদ্ধিমতী জননীর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

মাতৃত্ব।

মাতৃত্ব পরম পবিত্র। যে-দিন সন্তান জন্মলাভ করে, উহার ৯ মাস পূর্ব্বে যে কোন সময়ে প্রসূতির কোন প্রকার অনিষ্ট হইলে অজাত মাতৃজঠরবাসী সন্তানকেও সেই ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। প্রসবকালে কোন প্রকার অযত্ন হইলে উহার দ্বারা জননী ও সন্তান উভয়ের অনিষ্ট হয়। প্রসবান্তে সন্তান যত দিন স্তন্যপানে জীবন ধারণ করে ততদিন তাহার স্বাস্থ্য জননীর স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

শিশু-মৃত্যু।

বঙ্গদেশে প্রত্যেক বৎসর যত শিশু জন্মে, উহাদের মধ্যে ৩ লক্ষ এক বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই পরলোক যাত্রা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই লক্ষ শিশুর বয়স ১ মাস না হইতেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। অনেক শিশুই এমন রুগ্ন, এমন ক্ষীণ, এমন অবসন্ন ভাবে জন্মে যে তাহারা অনেকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারে না। সন্তানের এইরূপ দুর্ব্বলতার কারণ এই যে, গর্ভাবস্থায় প্রসূতির স্বাস্থ্যের বিন্দুমাত্র যত্ন করা হয় নাই। সুতরাং এই দেশের ভয়াবহ শিশু-মৃত্যু নিবারণ করিতে হইলে প্রসূতিদের স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সন্তান-ধারণ-ক্লেশ।

বঙ্গদেশে প্রত্যেক বৎসর প্রসব-ক্লেশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাধিতে ২৫।৩০ হাজার প্রসূতি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন।

সন্তান-প্রসবের পরে অনেক প্রসূতি জ্বরে মরিয়া থাকেন্! এই জ্বর নিবার্য্য। অশিক্ষিতা "দাই"দের দোষে প্রসূতিদের এই জ্বর হয়।

বঙ্গের ১ শত কি ৮০ জন প্রসূতির মধ্যে ১ জন প্রসব কালে প্রাণত্যাগ করেন। এই দেশের প্রসূতিরা যত সন্তান প্রসব করেন, উহাদের ২০ সন্তানের মধ্যে ৩ কি ৪টি ১মাস মধ্যে মরিয়া থাকে।

এমন প্রাণ ক্ষয় হয় কেন?

বঙ্গদেশে এমন ভাবে সন্তান ও প্রসূতিরা প্রাণ হারাইতেছেন। প্রসূতিদের তত্ত্বাবধানের জন্য যাবৎ শিক্ষিতা ধাত্রী পাওয়া না যাইবে, তাবৎ এইরূপ মৃত্যু নিবারিত হইবে না।

প্রসূতির যত্ন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই (১)প্রসূতির স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধানের নিমিত্ত সুশিক্ষিত চিকিৎসক, সেবিকা ও ধাত্রীর সহায়তা পাওয়া দরকার।

(২) প্রসূতিকে পুষ্টিকর খাদ্য এবং প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত।

(৩) প্রসূতিকে প্রচুর পানীয় এবং পরিস্কৃত জল পান করাইবে।

(৪) প্রসূতির যেন কোষ্ঠ-কাঠিন্য না হয়।

(৫) প্রসূতি যেন প্রত্যহ স্নান করিয়া সর্ব্বাঙ্গ পরিচ্ছন্ন রাখেন।

(৬) প্রসূতির বিশ্রাম ও নিদ্রা প্রচুর হওয়া চাই।

(৭) প্রসূতি একেবারে অলস হইয়া থাকিবেন না। তাঁহার সামান্য কার্য্য করা উচিত।

(৮) প্রসূতির উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্রাদি থাকিবে। তাহার মন ভাল রাখিবার জন্য আমোদের ব্যবস্থা থাকা বিধেয়।

(৯) প্রসূতি যাহাতে বাহিরের বিশুদ্ধ হাওয়ায় বেড়াইতে পারে, অথবা তাহার শয়ন-গৃহে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর চলাচল হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

গর্ভাবস্থায় তত্ত্বাবধান।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ প্রসূতিই গর্ভাবস্থায় শিক্ষিতা ধাত্রীর পরামর্শ পাইতেছেন না। শিক্ষিতা ধাত্রী এই দেশে দুর্লভ, কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ প্রসূতি ও শিশুদের মঙ্গলের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এই বিষয়ের প্রতি সকলের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। যাহাতে প্রত্যেক নগর ও পল্লীর জননীরা গর্ভাবস্থায় শিক্ষিতা ধাত্রীর সহায়তা পাইতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে আমরা ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে অন্ততঃ ৭ দিন কাল প্রসূতিকে শয্যাশায়িনী হইয়া বিশ্রাম করিতে দিবে। এইরূপ বিশ্রাম না করিলে (১) তাহার শরীর সারিবে না;

(২) রক্তস্রাব থামিবে না;

(৩) শিশুর পানের উপযোগী দুগ্ধ জন্মিবে না। জননী যাহা ভক্ষণ করেন, উহাই স্তন্যরূপে সন্তান গ্রহণ করে। জননী যদি কঠিন পরিশ্রম করিয়া সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করেন, তাহা হইলে সন্তান দুগ্ধ পাইবে না।

(সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত)

বর্ষা।

ছুটির সুরে দাও গো ভরে
আজকের এই আকাশখানি,
বাদল দিনে ব্যাকুল হাওয়ায়
শুনি যেন মধুর বাণী!
একলা বসে ঘরের কোণে
কাহার কথা পড়ে মনে;
সজল কালো আঁখির ভাষা,
বাজায় প্রাণে কিসের ধ্বনি!

ম্লান দিবসের নীরবতা
ছড়িয়ে পড়ে লতায় পাতায়,
তবু কি সে বীণা বাজে,
তবু কি সে মনকে মাতায়।
আজি কাহার অনুরাগে
বর্ষা প্রাতে পুলক জাগে,
ফোটে কুসুম হৃদয়-বনে?—
জীবন আমার ধন্য মানি!

শ্রীঅমিয়া চৌধুরী।

জীবনের রঙ্।

রক্তরাগ জীবনের রঙ্ বলে প্রসিদ্ধি ও গৌরব লাভ করে এসেছে; কিন্তু জীবনের প্রকৃত রঙ্ লাল নয়। লাল হচ্ছে রক্তের রঙ্। কিংবা জীবন যেখানে অত্যাচার সহ্য করে লোকের চক্ষের গোচর হয়েছে, তারি রঙ্। আর যদি লাল জীবনেরই রঙ্ হয়, তবে সেই জীবনের, যার মর্ম্ম-কথা চাপা আছে, চাপা হয়ে লোকের নয়ন-মনের গোচর হয় নি। রক্তরাগ জীবনের গোপনতার রঙ্, তার প্রকাশের চিহ্ন নয়। এ এমন একটা জিনিষ যার প্রকৃত দাম তার গোপনতায়। অপ্রকাশিত রক্ত-চাঞ্চল্যে শরীরে যে রঙ্ ফুটে উঠে, সেইটাই যথার্থ জীবনের রঙ্।

এ মিশ্র বর্ণটি বিশ্বের বর্ণ-বৈচিত্রের মধ্যে আপনাকে মিশিয়ে রেখেছে, কখনও বিশেষ করে ধরা দেয় নি। এর বিশেষ সৌন্দর্য্য হচ্ছে এর শুভ্রতা, কিন্তু সে শুভ্রতা দুগ্ধফেন-নিভ নয়, ধূসরতা—কিন্তু পৃথিবীর জমাট ধূসরতা এতে নেই, রক্তাভ—কিন্তু সূর্য্যাস্ত বা উষা-রবির রক্তরাগ এর মধ্যে নেই। ইহা স্বচ্ছ কিন্তু পদ্মদলের স্বচ্ছতার কাছে হার মেনেছে। এর মধ্যে সেই স্বর্ণাভা আছে যা সকল বর্ণের অন্তরতম, সেই না যায় ধরা, না যায় ছোঁয়া বর্ণাভা। আমাদের দেশের পথে প্রান্তরে পল্লী-নগরে এই রঙ্ সময়ে-সময়ে আমরা দেখ্‌তে পাই। প্রকৃতির শোভা-ভাণ্ডারে এটার অভাব নাই। আমাদের দেশে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংস্রব বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলে দেশের লোক কাল হলেও তার মুখে জীবনের সেই রঙের আলো এখনও আছে। জীবন যেখানে আপনাতেই পূর্ণ সেইখানেই তার যথার্থ বিকাশ, ব্যর্থ জীবনের কালিমলিপ্ত হতাশার কিংবা ব্যভিচারগ্রস্ত মর্ম্মপীড়িত জীবনের রঙে আমরা অপূর্ণতা দেখি। শুধু লোকের শরীরে নয়, জাতির শরীরে যখন সেই রঙ্ দেখা যায়, তখন বুঝ্‌তে হ'বে তা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।

পল্লীতে আমরা যা দেখি, সেই রঙ্‌টী সহরে সব সময়ে আমাদের চ'খে পড়ে না। তার সভ্যতা ও ভব্যতার বত্রিশ বন্ধনের চাপ পেয়ে জীবনের অন্তর রস শুকিয়ে উঠে; প্রসার লাভ কর্‌তে পায় না। জীবন ত বন্ধন নয়, মুক্তির উদারতার মধ্যে তার স্ফূর্ত্তি ও ব্যক্তি; তাই যখন আপনার হাতে-গড়া দেয়ালের মায়া ছেড়ে মানুষ যথার্থ জীবনের পথে বেরিয়ে পড়ে, সেই সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণীর প্রাঙ্গণ-তলে মানব-মনের সুগভীর মিলনের মধ্যে আমরা জীবনের প্রকৃত রঙের আভাস পাই,—সেই স্বর্ণাভ শুভ্রতা, সেই রক্তাভ ধূসরতা, যার মধ্যে বিশ্বের বর্ণ-বৈচিত্র ইঙ্গিতে আপনাকে প্রকাশ করে। কিন্তু সব চেয়ে সুন্দরভাবে জীবনের রঙ্‌টী আমরা দেখি শিশুর মুখে—তার নিটোল অনাবৃত স্বর্গীয় দেহে। তার হাসি-খেলা, তার সকল চাঞ্চল্যের মধ্যে একটা প্রশান্তি আছে এবং সেই প্রশান্তি জীবনের পূর্ণতার মধ্যেই জন্মলাভ করে। এই পূর্ণতাই তার দেহ-মন ছাপিয়ে আপনাকে যখন প্রকাশ করে, তখনই আমরা জীবনের

রঙ্‌টীকে দেখি। কিন্তু সেই পর্যান্ত। সংসারকে যে-দিন সে বুদ্ধির চোখ্ দিয়ে দেখে, তখন আর তাকে চেনা দায় হবে,—তার চোখের কোণে কালী পড়্‌বে, শ্যাম দেহের সৌম্য প্রশান্ত রঙ্‌টি ক্রমে ধূসর ও ধূসর থেকে ক্রমে পীতের দিকে অগ্রসর হবে, সেই মৃত্যুর দিকে।

নারীর মুখে আমরা এই রঙ্‌টিকে দেখেছি। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে নারী কল্যাণময়ী লক্ষ্মী-মূর্ত্তিতে সংসারে বিরাজ কচ্ছেন্; স্নেহ প্রেম করুণার অমৃত রসে তাঁদের মন সিক্ত, তাই মুখে সেই ভাবটা চিরদিনই ফুটে থাকে। সংসারে কল্যাণ-কামনা ক'রে এমন তাঁদের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, তার কাছ থেকে অপমান সহ্য করে ফিরে তাকে ভালই বেসেছেন—সকল, অপমান অবহেলা ও অবজ্ঞার আবর্জ্জনা সরিয়ে তাঁরা শুধু শান্তি ও সুখ বিতরণ করেন এবং সেইখানেই তাঁদের জীবন সার্থকতা লাভ করেছে। তাই জীবনের সত্য রঙ্‌টি তাঁদের মুখে সব সময়ে দেখ্‌তে পাই।

কিন্তু শ্রীমতী Alice Keynell বলেছেন যে, তাঁদের দেশে সব সময়ে এ রঙ্‌টি পাওয়া যায় না;—সেখানকার নারী-জীবনের মধ্যে প্রেম বাৎসল্য করুণার যে অভাব আছে, তা নয়; কিন্তু জীবন-সংগ্রামে অবিরাম ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যোগ দেওয়ার দরুণ তাঁদের জীবন সবটুকু আর চাপা নেই; সামাজিক রাষ্ট্রিক প্রভৃতি নানা আন্দোলনের মধ্যে তাঁদের জীবনের আব্‌হাওয়া অনেকটা বদ্‌লে গেছে, তাই গোপনতার আবরণ ভেদ করে যে লাল রং মুখে দেখা দেয়, তা রক্তের রঙ্,, জীবনের পূর্ণতার রঙ্ নয়।

এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, আমরা যে পথ অবলম্বন করেছি সে পথ জীবনের পূর্ণতার নয়, মৃত্যুর—রিক্ততার দিকে চলেছে। বন্ধন-গ্রস্ত হিসেবী জীবন অতি-নিয়মচারিতার অত্যাচারে মলিন ও জর্জ্জর হয়ে উঠেছে;—দেহে আর জীবনের রঙ্ প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাই একটা প্রশ্ন উঠেছে, এ রঙ্‌টীকে আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে কি না? প্রকৃতি যেমন করে পীতের জায়গায় সবুজ প্রতিষ্ঠিত করে, তেমন করে মানুষকে যদি পুরাণ বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে যথার্থ মানবতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে কাজটা খুবই সহজ হয়ে উঠে। মানুষ যা তৈরী করে, তা অনেক সময় জোড়া-তালি দিয়ে খাড়া করে রাখ্‌তে হয়। কিন্তু জীবন ত আর কল নয়; এ যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত রসাধার। অব্যাহত উদারতা যেখানে, সেইখানেই এ সত্য ও সুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিন্তু জীবন যেখানে নিজত্ব হারিয়ে দলের মধ্যে মাথা গুঁজে দাঁড়িয়েছে, সেখানেই তার সম্পূর্ণ বিকাশে বাধা পড়েছে; দলের মধ্যে ঠেলা-ঠেলিতে দেহ হয় ত সবল হয়েছে, প্রাণ-বস্তুর কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নি। আমরা চোখে দেখি, প্রাণে কাণা—তাই জীবনের পূর্ণ রূপটী আমাদের চোখের বাহিরে চিরকাল থেকে যাচ্ছে। কাজকে আমরা এত বড় করে দেখি যে, মানুষ এখন কাজের হয়ে পড়েছে, কাজ আর মানুষের নেই; আর সেই কাজের অবিরাম সংঘর্ষের ফলে তার সর্ব্বাঙ্গ টোল খেয়ে গেছে, নিজের মধ্যে

সুন্দর ভাবে গড়ে উঠ্তে পারে নি। তাই দেহের যে রঙ্ আমরা সচরাচর দেখ্ছি তা রক্তের রঙ, পীড়িত জীবনের রঙ্, পূর্ণতার আভাস মাত্রও তাতে নেই।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে যথার্থ শিল্পীর চোখ্ দিয়ে জীবন দেখা, শিল্পীর মন দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করা। সু-ব্যবস্থ-ভাবে সাজান ঘরের রেশ্মী পর্দ্দা ঠেলে যদি দুষ্ট বানর ঢুকে পড়ে, তবে ঘরের যেমন অবস্থা হয়, আমাদের জীবনের শান্তির পর্দ্দা ঠেলে কাজ তেমনি করে ঢুকে যে কুৎসিৎ নৃত্য জুড়ে দিয়েছে, তার অনাবশ্যক চাঞ্চল্যে জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির পথে বাধা পড়েছে। আমাদের দেখ্তে হবে, যাতে এই হাকাহাঁকি ছুটাছুটি প্রভৃতি কাজের উপসর্গ ও উপদ্রব মনের প্রসারের পথে বাধা না দেয়। কাজ আমরা কর্ব, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে শিল্পীর মত আনন্দের প্রেরণায়, আর কোন হিসাবের তাগিদে নয়। পর্ব্বতের অচল স্থৈর্য্য, আকাশের অবাধ উদাস বিস্তার ও সাগরের উপরকার সমস্ত চাঞ্চল্যের নীচে অগাধ স্তব্ধতার মধ্যে যে শান্তি, যে সুবিপুল বিরতি, আমাদের জীবনকে সেই বিরতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর্তে পার্লে, তাকে যথার্থ-ভাবে উপলব্ধি করা হবে। কারণ, জীবনের অন্তরতম বাণী তারই মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছে। ভোগের আয়োজন বাড়িয়ে জীবনকে খাটো করে নয়, জীবনকে ভিতরে ও বাহিরে অবাধ প্রসার লাভ কর্তে দিয়ে, ভোগকে খাট করাই জীবন-যাত্রা; তার পথ সত্যের দিকে, সুন্দরের দিকে, আনন্দের দিকেই প্রয়াণ করেছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

১। ইউরোপীয়-মহাযুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার জন্য লণ্ডনে এক ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এই ফণ্ড কমিটির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। লণ্ডন হইতে ব্রিটিশ রাজ্যের সর্ব্বত্রই এই ফণ্ড হইতে দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রদানের জন্য ব্যবস্থা হইবে।

২। সম্প্রতি গারট্রুড-বসার নাম্নী একজন স্ত্রীলোককে বার্লিনের স্কুল বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে আর কোনও স্ত্রীলোক এরূপ পদ পান নাই।

৩। ইউরোপের মধ্যে ফরাসী জাতি বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে সমগ্র জাতির অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে, এখন ফরাসীগণ যদি পূর্ব্বের ন্যায় বিলাসিতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে ফরাসী জাতি আর গড়িয়া উঠিতে পারিবে না; সেই জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফরাসী জাতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আইন জারি করিয়াছেন যে, সখের জিনিষ, বিলাসিতার জিনিষ আর ফরাসী রাজ্যের মধ্যে আমদানী হইতে পারিবে না। বিদেশ হইতে আনীত পালিশের কাজ করা জিনিষ, হীরার গহণাদি, চিকণ কাপড়, পশমী ও

রেশমী দ্রব্যাদি, তামাক প্রভৃতি আর ফরাসী দেশে আসিতে পারিবে না।

৪। সম্রাট্ জননী রাণী আলেক্জান্দ্রা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জন্ম অনেকেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

৫। পুনাতে যেমন অধ্যাপক কার্ভের প্রতিষ্ঠিত নারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, গুজরাটে মেয়েদের সেইরূপ একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার কথা হইতেছে। সার ভিটলদাস থ্যাকার্সে মহোদয় এই কার্য্যে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

৬। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বপ্রথম যে দুইজন মহিলা এম,এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীমতী কঙ্কালক্ষীমা পাঠোদ্দেশ্যে বিলাত যাইতেছেন। পাঠোদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের গোঁড়া ব্রাহ্মণ মহিলাদের ভিতর ইনিই প্রথম বিলাত যাইতেছেন। মহীশূর গভর্ণমেণ্ট ইহাকে ৩০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করিবেন।

৭। গত ২১মে শুক্রবার রাত্রি প্রায় নয়টার সময় প্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়ী বাবু ভুতনাথ পাল মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

৮। সম্প্রতি মার্কিন দেশের একটী অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী মেয়ের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মেয়েটীর যখন চারিবৎসর বয়স তখন সে ভার্জ্জিলের লাটিন ভাষার কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিল। নয় বৎসর যখন ইহার বয়স, তখন ইহাকে লিল্যাণ্ডষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মেয়েটীর বয়স এখন ১৭ বৎসরের বেশী নয়। এই বয়সেই সে ১৭ খানি বই লিখিয়াছে, দশহাজারের বেশী কবিতা রচনা করিয়াছে। মেয়েটীর একখানি ডাইরী-পুস্তক আছে, এই পুস্তক সে দুই বৎসর বয়স হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মেয়েটী ১৭ রকম ভাষা জানে, অনেকগুলি কাগজে সে নিয়মিত লিখে, অভিনয়ে নায়িকা সাজে এবং সুন্দর বক্তৃতাও দিতে পারে। দুই বৎসর বয়সের সময় সে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল, চারি বৎসর বয়সের সময় সে তার বাপ-মার সহিত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিল; এই সময়ে সে লাটিন ভাষায় একটী বই অনুবাদ করে, এবং ইহা ব্যতীত কয়েকটী সুন্দর ভ্রমণ-কাহিনীও লিখিয়াছিল। মণ্ট-রিয়েল ও নিউইয়র্কের অনেক হাঁসপাতালে আহত ও অসমর্থ সৈনিকদিগের সেবা দুই বৎসর ধরিয়া করিয়াছিল। মেয়েটীর দেহের উচ্চতা প্রায় চারি হাত ও ওজন দেড় মণের কিছু বেশী। সম্প্রতি একজন পুরুষ মানুষের সহিত তাহার বচসা হওয়ায় সে রাগিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। বই রচনা করিয়া সপ্তাহে ২৫০৲, ৩০০৲ টাকা উপার্জ্জন করে। মেয়েটীর নাম মিস্ টৌনার। সাহিত্যচর্চ্চায় মিস্ টৌনার এমন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে যে, মার্কিন দেশের লোকে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতেছে। কুমারী বলিতেছেন, "এইবার বিবাহ করিব, স্বামীকে কেমন করিয়া মানুষ করিতে হয় তাহা দেখাইব এবং ছেলেমেয়েদের খুব বুদ্ধিমান্ করিয়া গড়িয়া তুলিব।

৯। কুচবিহারের রাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন।

১০। মিঃ আর্ণল্ড ম্যাল্যাবার নামে এক ইংরাজ সম্প্রতি কলম্বো সহরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্য শীঘ্রই ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

১১। আমেরিকায় রে নামে এক রকম সামুদ্রিক মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। ইহার ন্যায় প্রকাণ্ড মৎস্য আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। মৎস্যটী ওজনে একশত বার মণ। ইহাকে জল হইতে ডাঙায় টানিয়া আনিতে ছয়টা বলদ ও বাইশ জন লোকের দরকার হইয়াছিল এবং নয় ঘণ্টা কাল ধরিয়া মৎস্যটী মানুষ ও বলদের সহিত টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছিল। ইহার ল্যাজের ঝাপটায় সমুদ্রের জল ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত ছিট্‌কাইয়া উঠিয়াছিল।

স্বরগের ঠিকানা

(অন্তিম রোগ-শয্যায় লিখিত।)

স্বরগের ঠিকানা আমার
কেহ কি বলিতে পার ভাই?
বহুদিন গেছেন জনক
স্নেহ-লিপি আজো পাই নাই!

২

আশা-পথ চাহিয়া চাহিয়া
দিন মোর বৃথা কেটে যায়,
পূরে না-ক প্রাণের বাসনা
অশ্রু নিতি ঝরে নিরাশায়।

৩

ছিনু তাঁর হৃদয়ের ধন,
রাখিতেন নয়নে নয়নে,
ক্ষণকাল হলে বিষাদিত
ভুলাতেন সুমিষ্ট বচনে।

৪

ক্ষণতরে হ'লে অদর্শন
হইতেন কি আকুল হায়!
সারা প্রাণ উঠিত কাঁদিয়া
কত যে অশুভ ভাবনায়!

বুকে ক্ষত আজি যে বিষম,
প্রাণ মোর করে হায়, হায়!
তাঁর কি গো গলে না হৃদয়!
হায় পিতঃ! রয়েছে কোথায়?

৬

আছ কেবা সুহৃদ্ এমন
বলে দিবে ঠিকানা তাঁহার,
দূরে যাবে তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস
ও-চরণ লভিলে আবার?

৭

আর আমি ছাড়িয়া জনকে
নাহি চাহি রহিতে ধরায়,
কেগো আছ দয়ালু তেমন
নিয়ে যাবে আমারে সেথায়?

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ এ বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

প্রথম বিভাগ।

১। সত্যবতী দুবে—ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌টিটিউসন্।
২। ননীবালা বসু „
৩। মায়া রায় „
৪। উষাবালা মিত্র „
৫। হেমলতা বসু—ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়।
৬। শান্তিবালা সেন „
৭। স্নিগ্ধপ্রভা দত্ত „
৮। প্রকৃতি গুপ্তা „
৯। অপর্ণা সান্যাল „
১০। সুলতা বসু „
১১। বীণাপাণি সিংহ „
১২। আয়েসা খাতুন „
১৩। চারুবালা বসু „
১৪। আশালতা বসু „
১৫। মালতী বসু—মহারাণী স্কুল, দার্জ্জিলিং।
১৬। কমলাক্ষী রায়—ইউনাইটেড মিশনরী গার্লস্।
১৭। কনকলতা বিশ্বাস „
১৮। সুরুচিকুমারী দাসগুপ্তা „
১৯। কমলিনী রুদ্র „
২০। কনকলতা চট্টোপাধ্যায় „
২১। হেমলতা বসু—ইউ, এফ, সি, হাইস্কুল।
২২। পরিমল দাস „
২৩। সুধা মজুমদার—বেথুন স্কুল
২৪। বীণাপাণি বসু „
২৫। সুশোভা মজুমদার „
২৬। সুধাময়ী সেন—বেথুন স্কুল।
২৭। কমলা রায় „
২৮। উষারাণী বসু „
২৯। লিলিয়ান মিত্র—ক্রাইষ্টচার্চ্চ হাইস্কুল।
৩০। শান্তিময়ী দে—ডাওসেশন স্কুল।
৩১। সীতা সিংহ „
৩২। বাণী ঠাকুর „
৩৩। ইলিয়াম্মা টমাস্ „
৩৪। জুলেখা বাণো „
৩৫। রমা মৈত্র „
৩৬। কল্যাণী মুখার্জ্জি „
৩৭। সুধীরা বসু „
৩৮। লীলাবতী গ্রেসবক্‌স—প্রাইভেট।
৩৯। অমিতা দত্ত „
৪০। উমালতিকা হালদার „
৪১। প্রেমলতা ঘোষ „
৪২। সরোজবালা ধর „
৪৩। সাবিত্রী দত্ত—ঢাকা ইডেন স্কুল।
৪৪। শোভারাণী ঘোষ „
৪৫। আশালতা দাসগুপ্তা „
৪৬। নিরঞ্জনকুমারী বৈরাগী—ঢাকা ইডেন স্কুল।
৪৭। উষাবালা দত্ত „
৪৮। নীহারবালা দাসগুপ্তা „
৪৯। লীলাবতী সেন „
৫০। সরোজিনী দে „
৫১। তারাকিঙ্করী বিশ্বাস „

৫২ আশালতা সরকার—ঢাকা ইডেন স্কুল

৫৩। কর্ত্রী এম, এস, গুইনস্—প্রাইভেট।

৫৪। অনসূয়া রায়—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

৫৫। উমাতারা রায়—মহারাণী গার্লস্ স্কুল দার্জ্জিলিং।

৫৬। সুমতিবালা রায়—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস্ স্কুল।

৫৭। স্নেহপ্রভা রায় "

৫৮। পুণ্যপ্রভা রায় "

৫৯। মৃণালবালা নন্দী "

৬০। কণিকা গুপ্তা "

৬১। কিরণশশী দত্ত "

৬২। জ্যোতির্ম্ময়ী দাস "

৬৩। পঙ্কজিনী চক্রবর্ত্তী "

৬৪। কনকপ্রভা বিশ্বাস "

৬৫। জ্যোৎস্না দত্ত—প্রাইভেট।

৬৬। চারুবালা রায় "

৬৭। জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী—চট্টগ্রাম ডাক্তার খাস্তগিরী বালিকা বিদ্যালয়।

৬৮। সুনীতিবালা আইচ "

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। অমিয়াবালা ঘোষ—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

২। লীলা দত্ত। "

৩। প্রবাহিণী রায় "

৪। মুক্তপ্রভা বসু—মহারাণী স্কুল, দার্জ্জিলিং।

৫। বিনোদিনী মল্লিক—ইউনাইটেড মিশনরী গার্লস্ স্কুল।

৬। স্নেহলতা বিশ্বাস—ইউ, এফ, সি, হাই স্কুল।

৭। যামিনীপ্রভা বসু "

৮। ইন্দুবালা রায়—ক্রাইষ্ট চার্চ্চ।

৯। হেমনলিনী দে "

১০। সরস্বতী সুভদ্রজী এডেক—ইউ, এফ, সি, হাইস্কুল।

১১। গৌরী ঘোষ—ডাওসেসন স্কুল।

১২। মার্গারেট, এল, জন "

১৩। শোভা সরকার "

১৪। সুভদ্রাবাই দুবে—প্রাইভেট।

১৫। সুনীতি দত্ত "

১৬। নলিনী মহলানবিশ "

১৭। বীণাপাণি সান্যাল "

১৮। মাধুরী চৌধুরী "

১৯। সাবিত্রীবালা দাসগুপ্তা—ঢাকা ইডেন স্কুল।

২০। হৃদয়বালা চৌধুরী—চট্টগ্রাম ডাক্তার খাস্তগিরী বালিকা বিদ্যালয়।

২১। লীলা খাস্তগীর—প্রাইভেট।

২২। এলেন পেরিরা "

২৩। উর্ম্মিলা ব্যানার্জ্জি—চট্টগ্রাম ডাক্তার খাস্তগীরী বালিকা বিদ্যালয়।

তৃতীয় বিভাগ।

১। উষাঙ্গিনী মণ্ডল—ইউ, এফ, সি, হাইস্কুল।

২। করুণাময়ী মাইতী—প্রাইভেট।

৩। হিমাংশুবালা চক্রবর্ত্তী "

৪। বাসন্তীকুসুম নাগ—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস্ স্কুল

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫৭ বর্ষ

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আষাঢ়, ১৩২৭—জুলাই, ১৯২০।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৵০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 683. —— July, 1920

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৮৩ সংখ্যা।	আষাঢ়, ১৩২৭। জুলাই, ১৯২০।	১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

কে জানে—

(গান)

ভৈরবী।

এই যে মোহন বিশ্ব-ছবি—
এর অর্থ কিবা
কে জানে—কে জানে—কে জানে!
এই আকাশ আলো চন্দ্র রবি—
এর অর্থ কিবা
কে জানে—কে জানে—কে জানে!
এত যে ফুল ফোটাও বনে,
পাঠাও দখিন সমীরণে,
এত যে সুর জাগাও মনে,—
এর অর্থ কিবা
কে জানে—কে জানে—কে জানে!

এত যে ঢেউ তোল বুকে
কভুও সুখে—কভুও দুখে,
অশ্রু-হাসি ফোটাও চোখে,—
এর অর্থ কিবা
কে জানে—কে জানে—কে জানে!
এতই গন্ধ, এত যে গান,
এতই ছন্দ, এত যে তান,
এত আনন্দ, এত যে প্রাণ,—
এর অর্থ কিবা
কে জানে—কে জানে—কে জানে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

জপজী।

১৬

পংচ পরবান পংচ পরধান।
পংচে পাবহি দরগহি মান॥
পংচে শোহে দর রাজান।
পংচকা গুরু একহি ধিয়ান॥
যে কো কহৈ করৈ বিচার।
করতে কৈ করণৈ নহি সুমার॥
ধৌল ধরম দয়াকা পুত।
সংতোষ থাপি রখ্যা যিন সুত॥
যে কো বুঝৈ হোবৈ সচিয়ার।
ধবলৈ উপর কেতা ভার॥
ধরতী হোর পরৈ হোর হোর।
তিসতে ভার তলে কোন জোর॥
জিয়জন্ত রঙ্গাকে নাব।
সভ না লিখা বড়ি কলাম॥
এহ লেখা লিখি জানৈ কোয়।
লেখা লিখিয়া কেতা হোয়॥
কেতা তানি সুয়ালি রূপ।
কেতা দাতি জানৈ কোন কুত॥
কেতা পসাউ একো কবায়ো।
তিস্তে হোয় লেখ দরিয়াউ॥
কুদরত কবন কহা বিচার।
বরিয়া ন যাবা একবার॥
যো তুধ ভাবৈ সোই ভলিকার।
তু সদা সলামত নিরঙ্কার॥

সাধুর মহিমা ব্যাখ্যাত হইতেছে।—

পঞ্চ—সত্য, সন্তোষ, দয়া, ধর্ম্ম এবং শৌচ, এই পাঁচটী গুণযুক্ত পুরুষকে পঞ্চ কহে। পরবান—পবিত্র। পরধান—প্রধান অর্থাৎ মাননীয়।

পঞ্চে=উক্তপ্রকার সাধুপুরুষগণ। পাবহি—পাইয়া থাকেন। দরগহি=হরির গৃহের দ্বারে। মান—সম্মান। শোহে=শোভিত হয়। দর—দ্বারে। রাজান=রাজরাজেশ্বর ভগবানের। পঞ্চকা=উক্তপ্রকার সাধুপুরুষগণের। গুরু একহি ধিয়ান—গুরুই সকলের একমাত্র ধ্যেয়।

যে=যদি। কো=কেহ। কহৈ—সাধুর মহিমা ব্যাখ্যা করিতে যায়। করৈ বিচার—সাধুর মহিমা বিচার করিতে যায়। করতে কৈ—সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের। করণৈ=কার্য্যের, অর্থাৎ সাধুদিগের মধ্যে যে সকল অপার গুণ একত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার। নহি সুমার=সংখ্যা নাই।

ধৌল—পবিত্রতা। দয়াকা পুত—দয়ার পুত্র। দয়া হইতেই পবিত্রতা এবং ধর্ম্মের উৎপত্তি, অর্থাৎ দয়া সকল ধর্ম্মের মূল। সুত=সূত্র, সন্তোষরূপ সূত্রে। থাপি—গ্রথিত। যিন রখ্যা—যিনি রাখিয়াছেন।

যে কো=যাহারা। বুঝৈ—বুঝিয়াছে। হোবৈ—হইয়া যায়। সচিয়ার=সত্যজ্ঞানী। নানক ভগবানের অনন্ত শক্তির আভাস দিতেছেন।—

ধবলৈ উপর কেতা ভার—ধবল বৃষ, যিনি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার উপর কত ভার রহিয়াছে! ধরতী হোর পরৈ হোর হোর—এই পৃথিবীর পরে অন্য পৃথিবী। তাহার পরে আবার অন্য অন্য পৃথিবী, এই প্রকারে অসংখ্য পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ রহিয়াছে।

তিস্তে তার তলে কোন জোর—এই সকল ভাবের মূলে কাহার শক্তি সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে!!

জিয় জন্ত রঙ্গকে নাব=এই অসংখ্য জগৎ-মধ্যে অসংখ্য জীব, অসংখ্য জন্ত, অসংখ্য তাহাদের রং, অসংখ্য তাহাদের নাম রহিয়াছে।

সভনা লিখা বড়ি কলাম—সভনা=এই সকল অনন্ত জীবের। লিখা=প্রারব্ধ লেখা। বাড়=বড় অর্থাৎ কঠিন। কলাম=লেখা।

এহু লেখা লিখি জানৈ কোই=যদি কেহ এই সকলের হিসাব আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুসারে লিখিতে থাকে।

লেখা লিখিয়া কেতা হোয়!=বল দেখি, সে লেখা কত অনন্ত লেখা হয়! কেতা তানি সুয়ালিরূপ—কেতা=কত। তানি=তাঁহার শক্তি। সুয়ালি=সুন্দর। রূপ=রূপ। সেই ভগবানের কি অপার শক্তি, কি সুন্দর রূপ!

কেতা দাতি জানৈ কোন কুত:—কেতা=কত যে। দাতি=দিতেছেন। জানৈ কোন=কে জানে! কুত=পরিমাণ।

কেতা পসাউ একো কবায়ো:—কেতা পসাউ=সেই ভগবান্ আপনার মায়াশক্তির কি বিস্তার করিয়াছেন! একো কবায়ো=এক পরমেশ্বর বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া বহুরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন।

তিস্তে হোয় লখ দরিয়াউ:—তাঁহা হইতেই লক্ষ অর্থাৎ অনন্ত 'দরিয়াউ' অর্থাৎ সাগরের (অথবা ব্রহ্মার) উৎপত্তি। দরিয়াউ=প্রলয়-সমুদ্রে যিনি উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করেন—অর্থাৎ ব্রহ্মা।

কুদরত কবন কহা বিচার?—কুদরত=তাঁহার অনন্ত শক্তির। কবন=কতদূর। কহা=কে। বিচার=বিচার করিবে?

বরিয়া ন যাবা একবার—বরিয়া=শ্রেষ্ঠত্ব। ন যাবা=ব্যাখ্যা করা যায় না। একবার=একবারও।

যো তুধ ভাবৈ=হে প্রভু, যাহা তুমি ভালবাস। সোই ভলিকার=তাহাই ভাল। তু সদা=তুমি সদাই। সলামতে=নির্বিকার, নির্লিপ্ত। নিরস্কার=নিরাকার পুরুষ। যদিও তুমি মায়াশক্তিতে অসংখ্যজগৎ সৃষ্টি করিতেছ এবং আপনি এক হইয়া বহুরূপে প্রকাশ হইয়াছ, তথাপি তুমি সেই এক নির্বিকার এবং নিরাকার পুরুষ নির্লিপ্ত ভাবে বিরাজমান আছ।

প্রথমে নানক সাধুর মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন—'পঞ্চ' অর্থে সত্য, সন্তোষ, দয়া, ধর্ম এবং শৌযুক্ত সাধুপুরুষ। এইপ্রকার সাধুপুরুষগণ পবিত্র এবং মাননীয় হয়েন। তাঁহারা হরির গৃহদ্বারে সম্মান পাইয়া থাকেন। তাঁহারা রাজরাজেশ্বর ভগবানের দ্বারে শোভিত হন। তাঁহাদের গুরুই একমাত্র ধ্যেয়। যদি কেহ সাধুর মহিমা ব্যাখ্যা করিতে যায়, যদি কেহ তাঁহার মহিমার বিচার করিতে যায়, সে বুঝিতে পারে যে সেই সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর সাধুদিগের মধ্যে যে সকল অপার গুণ একত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই ভগবান্ এই সাধুদিগের মধ্য দিয়া, সন্তোষ এবং পবিত্রতা একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

তৎপরে তিনি ভগবানের অনন্ত শক্তির আভাস দিতেছেন...

যাহারা সেই ভগবানের শক্তির একটু-

যাহারা বুঝিয়াছে, তাহারা সত্যজ্ঞানী হইয়াছে। ধবল বৃষ, যিনি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার উপর কত ভার রহিয়াছে! এই পৃথিবীর পরে অন্য পৃথিবী, তাহার পরে আবার অন্য পৃথিবী, এই প্রকারে পর পর অসংখ্য পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্টজগৎ রহিয়াছে। এই সকল ভারের মূলে কাহার শক্তি সকলকে ধারণ করিয়া আছে! এই অসংখ্য জগতের মধ্যে অসংখ্য জীব, অসংখ্য জন্তু, অসংখ্য তাহাদের রং, অসংখ্য তাহাদের নাম। এই অসংখ্য জীবের প্রারব্ধ-লেখা কত কঠিন!!

যদি কোন মানুষ এই সকলের হিসাব আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুসারে লিখিতে থাকে, বল দেখি, তাহা হইলেও সে লেখা কত অনন্ত লেখা হয়!

সেই ভগবানের কি অসীম শক্তি! আবার কি তাঁহার মধুর রূপ। তিনি যে জীবকে কত দান করিতেছেন, তাহার কি কেহ পরিমাণ করিতে পারে? সেই পরমেশ্বর এক হইয়া বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া, আপনার মায়া শক্তির বিস্তার করিয়াছেন এবং বহুরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। তাঁহা হইতেই অনন্ত জগতের উৎপত্তি। তাঁহার অনন্ত শক্তির কে কতটুকু বিচার করিবে? তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব একবারও ব্যাখ্যা করা যায় না। হে প্রভু! যাহা তুমি ভালবাস, তাহাই ভাল। হে প্রভু! যদিও তুমি আপনার মায়াশক্তিতে অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে এক তুমি বহু হইয়া বিরাজমান আছ, তথাপি তুমি সেই এক নির্বিকার নিরাকার পুরুষ নির্লিপ্ত ভাবেই রহিয়াছ, জগৎসৃষ্টিতে তোমার ভাবের কোন ব্যত্যয় হয় নাই।

১৭

অসংখ্য জপ অসংখ্য ভাউ।
অসংখ্য পূজা অসংখ্য তপতাউ॥
অসংখ্য গ্রন্থ মুখি বেদ পাঠ।
অসংখ্য যোগ মন রহ্হি উদাস॥
অসংখ্য ভগত গুণ গিয়ান বিচার।
অসংখ্য সতী অসংখ্য দাতার॥
অসংখ্য সুর মুহ ভখসার।
অসংখ্য মৌনি লিবলাই তার॥
কুদরতি কবন কহা বিচার।
বরিয়া ন যাবা একবার॥
যো তুধ ভাবৈ সোই ভলীকার।
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার॥

অর্থ—হে প্রভো! অসংখ্য সাধক তোমার নাম জপ করিতেছেন, অসংখ্য সাধক তোমাকে প্রেম (ভাউ) করিতেছেন। অসংখ্য প্রেমিক ভক্ত তোমার পূজা করিতেছেন; অসংখ্য প্রকারে অসংখ্য সাধক তোমার তপস্যা করিতেছেন। অসংখ্য সাধক তোমার উপাসনার উদ্দেশ্যে অসংখ্য গ্রন্থপাঠ করিতেছেন ও বেদ কণ্ঠস্থ করিতেছেন। এই সংসারে কত কত সাধক চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া সংসার-সুখে উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন। অসংখ্য ভক্ত তোমার গুণের ও জ্ঞানের সমালোচনা করিতেছেন। অসংখ্য সতী স্ত্রী, অসংখ্য দাতা, অসংখ্য ধর্ম্মবীর, মুখে সংসারের সার যে তোমার নাম,তাহারই ভাষণ করেন। আবার অসংখ্য মৌনী সাধক তোমার ধ্যানে চিত্তবৃত্তিকে একাকার করিয়া লাগাইয়া রাখে।

হে প্রভো! তোমার অনন্ত শক্তির কে কতটুকু বিচার করিবে! তোমার শ্রেষ্ঠত্ব

একবারও ব্যাখ্যা করা যায় না। হে প্রভো! তুমি যাহা ভালবাস, তাহাই ভাল। হে নিরাকার পুরুষ, তুমি সদাই একভাবে বিরাজ করিতেছ, তোমার কোনও পরিবর্ত্তন নাই।

১৮

অসংখ্য মূরখ অন্ধ ঘোর।
অসংখ্য চোর হারামখোর॥
অসংখ্য অমর করি যাহি জোর।
অসংখ্য গলবড় হতিয়া কমাহি ?
অসংখ্য পাপী পাপ কর যাহি।
অসংখ্য কুড়িয়ার কুড়ে ফিরাহি॥
অসংখ্য মলেছ মল ভখ খাহি।
অসংখ্য নিংদক শির করাহি ভার॥
নানক, নীচ কহৈ বিচার।
বরিয়া ন যাবা একবার॥
যো তুধ ভাবৈ সেই ভলিকার।
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার॥

অর্থ—ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য মূর্খ রহিয়াছে, অসংখ্য ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে; অসংখ্য চোর এবং অসংখ্য বিশ্বাসঘাতক রহিয়াছে। এই জগতে রাবণাদি অসংখ্য অমর নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করিয়া জগৎকে উৎসন্ন করিয়া গিয়াছে। এ সংসারে অসংখ্য ব্যক্তি অপরের গলা কাটিয়া নরহত্যা করে, অসংখ্য পাপী পৃথিবীতে পাপ করিয়াই চলিয়া যায়; অসংখ্য মিথ্যাবাদী মিথ্যাই বলিতে থাকে; অসংখ্য ম্লেচ্ছ অভক্ষ্য ভোজন করিতেছে; অসংখ্য নিন্দক পরের নিন্দা করিয়া নিজের শির ভার করিতেছে। নানক বলিতেছেন, ভগবানের এই মায়িক সৃষ্টির মধ্যে অনন্ত নীচ রহিয়াছে, আমি কত তাহার বিচার করিব। তাঁর মায়া-শক্তির বিচার আমার দ্বারা সম্ভবে না। হে প্রভো! যাহা তুমি ভালবাস তাহাই ভাল; হে নিরঙ্কার পুরুষ, এত সৃষ্টি সত্ত্বেও, তুমি সর্ব্বদা একভাবেই বিরাজ করিতেছ।

১৯

অসংখ্য নাব অসংখ্য থাব।
অগম্য অগম্য অসংখ্য লোয়॥
অসংখ্য কহাহি শিরভার হোই।
অখরী নাম অখরী সালাহ॥
অখরী গিয়ান গীতগুণ গাহ॥
অখরী লিখন বোলন বাণী।
অখরা শির সংযোগ বখানি॥
যিন এহ লিখে তিস্ শির নাহি।
যিব ফুরমায়, তিব তিব পাহি॥
যেতা কীতা তেতা নাউ।
বিন নাবৈ নাহি কো থাউ॥
কুদরতি কবন কহা বিচার।
বরিয়ান যাবা একবার॥
যো তুধ ভাবৈ সোই ভলিকার।
তু সদা সলমতি নিরঙ্কার॥

অর্থ—"হে অনন্ত পরমেশ্বর! তোমার অসংখ্য নাম এবং অসংখ্য তোমার স্থান, অর্থাৎ তুমি সর্ব্বব্যাপী। কত কত অসংখ্য অগম্য লোক তোমার সৃষ্ট রহিয়াছে। তোমার অসংখ্য সৃষ্টির কথা বলিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। অক্ষরেই তাঁহার নাম, অক্ষরেই তাঁহার নামের স্তুতি। অক্ষর-দ্বারাই বাণী এবং শব্দ। অক্ষর-দ্বারাই মস্তকে সংযোগ-বিয়োগের প্রারব্ধ লেখা হয়। যিনি সকল জীবের এইরূপ সংযোগ-বিয়োগরূপ প্রারব্ধ লিখিতেছেন, সেই পরমেশ্বরের মস্তকে কোন প্রারব্ধ লেখা নাই। তিনি কর্ম্মবন্ধন-

রহিত। যেমন যেমন সেই পরমেশ্বরের আজ্ঞা হয়, তেমনি তেমনি জীব নিজ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর যত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলেরই নাম দিয়াছেন। নামহীন কোন স্থান নাই। অর্থাৎ সকলই নামরূপ-দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই পরমেশ্বরের মায়াশক্তির কে বিচার করিবে? তাঁহার শরণ বিনা সেই মায়া হইতে ক্ষণমাত্র কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না। (শুকদেব সেই মায়ার ভয়ে গর্ভ হইতে নির্গত হইতে ভীত হইতেছিলেন)। হে প্রভো! তুমি যাহা মঙ্গল বিবেচনা কর, আমার পক্ষে তাহাই মঙ্গলকর। হে প্রভো! জগতে এত মায়ার প্রকাশ সত্ত্বেও তুমি নিত্য একভাবে বিরাজমান আছ॥

২০

ভরিয়ৈ হথ পৈর তনু দেহ।
পানি ধোতৈ উতরস সেহ॥
মুত পলিতী কপড় হোই।
দেহ সাবন লইয়ে উহ ধোই॥
ভরিয়ৈ মতি পাপকে সঙ্গ।
উহ ধোপৈ নাবৈ কৈ রঙ্গ॥
পুন্নী পাপী আখন নাহি।
করি করি করনা লিখ লে যাহি॥
আপে বীজে আপে হি খাহ।
নানক, হুকমী আবহু যাহ॥

অর্থ:—এই স্থূল, শরীরের হস্ত পদ বা শরীর যদি মল-দ্বারা মলিন হয়, জলের দ্বারা সে মলিনতা দূর করা যায়।

মলমূত্র দ্বারা-যদি বস্ত্র অপবিত্র হয়, সাবান-দ্বারা তাহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায়।

যাহার বুদ্ধি পাপসঙ্গে ভারাক্রান্ত হইয়াছে, নামের রঙ্গে তাহা পবিত্রীকৃত হয়।

যে ভগবানের নিষ্কাম ভক্ত, সে পাপ-পুণ্য হইতে অতীত। যে সকামী পুরুষ, সে সকাম কর্ম্ম করিয়া করিয়া, সেই সেই কর্ম্ম-সংস্কার আপনার বুদ্ধিতে লিখিয়া জন্মজন্মান্তর আপনার সঙ্গে লইয়া যায়। সেই সকামী পুরুষ আপনিই বীজ বপন করে, আপনিই তাহার ফলভোগ করে।

নানক বলিতেছেন্, পরমেশ্বরের হুকুমেই জীব নিজ কর্ম্ম অনুসারে এক যোনি হইতে অপর যোনিতে জন্ম লইতে থাকে। নামজপ বিনা আসা-যাওয়া ঘুচে না॥

২১

তীরথ তপ দয়া যতু দান।
যে কো পাবৈ তিলকা মান॥
শুনিয়া মন্নিয়া মন কিতা ভাউ।
অন্তর গতে তীরথ মল নাউ॥
সভি গুণ তেরে মৈ নাহি কোই।
বিন্ গুণ কিতে ভগতি ন হোই॥
স্বস্তি আথি বাণী বরমাউ।
সৎ সুহান সদা মন চাউ॥

কোন সুবেলা, বখত কৌন, কোন তিথি কৌন বার। কৌন সিরুতী, মাহ কৌন, যিত হোয়া আকার॥ বেল ন পাইয়া পণ্ডিত, যি হোবৈ লেখ পুরাণ। বখত ন পাইউ কাদিয়া, যি লিখন লেখ কোরাণ॥ তিথি বার ন যোগী জানৈ, রুতী মাহ না কোই। যা করতা সিরঠি কউ সাজে, আপে জানৈ সোই॥ কিব করি আখাঁ, কিব সালাহী, কিউ বরণী, কিব জানা। নানক, আখনি সভকো আখৈ, ইক দু ইক সিয়ানা॥ বড়া

সাহিব, বডী নাঁহি, কিতা থাঁকা হো বৈ। নানক জেকো আপৌ জানৈ, অগৈ গয়া ন সোহৈ॥

অর্থঃ—গঙ্গাদি-তীর্থসেবা, কৃচ্ছ্র, তপস্যা, দয়া, সংযম, দান,—ইহার কোন একটী সামান্ত পরিমাণে (তিলকা মান) অবলম্বন করিলেও ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। ইহার কোন একটী অবলম্বন করিয়া ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ, তাঁহাকে মনন এবং মনে তাঁহার প্রতি প্রেম রাখিতে হইবে। উত্তম অধিকারী সাধকগণ, শরীরাভ্যন্তর্গত যে তীর্থ তাহাতেই স্নান করেন। যথা

তপস্তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং ধ্যানতীর্থমনুত্তমম্॥ এতানি পঞ্চতীর্থানি সত্যং ষষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্। দেহে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বস্ত তেষু স্নানং সমাচরেৎ॥ তপস্যা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়দমন, সর্ব্বভূতে দয়া, ধ্যান এবং সত্যবাক্য—ঐ ছয় তীর্থ শরীর-মধ্যে রহিয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য।

হে প্রভো, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণই তোমাতে বর্ত্তমান, অথচ তোমাতে কোন গুণই নাই, অর্থাৎ তুমি ত্রিগুণাতীত। আবার তোমাতে গুণ আরোপণ না করিলে ভক্তি-লাভ হয় না, অর্থাৎ সগুণ উপাসনাই ভক্তির অঙ্গ।

সুয়সতি—স্বস্তিপূর্ণ, অর্থাৎ কল্যাণরূপ। বরমাউ—ব্রহ্মার। আথবাণী—বেদরূপ বাণী। সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মার দ্বারা বেদরূপ বাণী প্রকাশ করিয়াছেন।

সৎ—তিনি সদ্রূপ। সুহান—তিনি চেতনস্বরূপ। সদা—নিত্য। মনচাউ—আনন্দস্বরূপ। তিনি সত্যস্বরূপ, চেতনস্বরূপ, নিত্য ও আনন্দস্বরূপ।

কৌন সুবেলা—সে সময়ে কোন ছিল। বখত কৌন—দিবসের কোন ভাগ ছিল। কৌন তিথি কৌন বার-কোন্ তিথি এবং কোন্ বার ছিল; কৌন সিরুতি—কোন্ ঋতু ছিল? মাহ্ কৌন—কি মাস ছিল; যিত হোয় আকার—যে সময় সেই নিরাকার পুরুষ হইতে এই সাকার জগৎ উৎপন্ন হইল। সেই নিরাকার পুরুষ হইতে যখন এই সাকার জগৎ উৎপন্ন হইল, সে কাল, সে সময়, সে তিথি, সে বার, সে ঋতু, সে মাস কি ছিল?

বেল ন পাইয়া পণ্ডতি—পণ্ডিতেরাও সে সময় নিরূপণ করিতে পারেন নাই। যি হোবে লেখ পুরাণ—যদি পণ্ডিতেরা জানিতেন, তাহা হইলে পুরাণে তাহা লেখা হইত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

গান।

(সিন্ধু মিশ্র—তেতালা)

আজি মম জীবনের সুন্দর এল—!
　জ্যোছনা-রাতে—তারকা সাথে
　এ মম জীবনের সুন্দর এল!
ফুটন্ত ফুলে,——তটিনী-কূলে
নদী-জল-কল্লোলে—সুন্দর এল—!
　দুয়ার খুলিয়া,—আপনা ভুলিয়া,
　প্রেম-ডালি সাজা মন, সুন্দর এল!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র—একতালা।

সারা জীবন ধরে কাঁদতে হবে—
সেই তো ভালো—সেই তো ভালো!
ধুয়ে যাবে মোর সকল কলঙ্ক—
সেই তো ভালো—সেই তো ভালো!

গলবে রে মোর প্রাণ
গাইবে করুণ বুক-চেরা গান,
তুলবে গভীর নীরব তান—
সেই তো ভালো—সেই তো ভালো!

আমার অশ্রু-জলের কমলগুলি,
তোমার চরণ-তলে পড়বে ঢুলি;
মুক্তা-সম ঝলসিবে—
সেই তো ভালো—সেই তো ভালো!!

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
II সা সা সা | সা -দা দা | দা পা -া | ণা দা পমজ্ঞরসা I
সা রা জী ব ন ধ রে কাঁ দ্ তে হ বে • ০ • ০

২´ ৩ ০ ১
I ণ্া -া সা | জ্ঞা জ্ঞাম -া | মা -া পা | মা পা -া I
সেই • তো ভা লো • সে ই তো ভা লো •

২´ ৩ ০ ১
I পা পা ণা | ণা র্সা র্সা | র্সা র্দা ণা | র্সা -ণদপমা -জ্ঞরসাণ I
ধু য়ে যা বে মোর স কল ক ল ঙ্ক • • • • • • •

২´ ৩ ০ ১
I ণ্া -া সা | জ্ঞা জ্ঞাম -া | মা -া পা | মা পা -া II
সেই. • তো ভা লো • সে ই তো ভা লো •

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II পা -া পা | ণা ণা -া | র্সা -া -র্রা | -া -ণা -র্সা I
গ ল্ বে রে মো র প্রা • • • • ণ

২´ ৩ ০ ১
I ণা -া ণা | র্সা র্সা -র্ঋা | র্সা -া ণা | দা পা -া I
গা ই বে ক রু ণ বু ক্ চে রা গা ন

২´ ৩ ০ ১
I পা -া দা | দা দণা -র্সা | ণা দণা -দা | পমজ্ঞা -ঋসা -া I
ডু ল্ বে গ ভী॰ র নী র॰ ব তা॰॰ ॰॰ ন

২´ ৩ ০ ১
I ণা -া সা | জ্ঞা জ্ঞাম -া | মা -া পা | মা পা -া II
সেই ॰ তো ভা লো ॰ সে ই তো ভা লো ॰

আভোগ।

২´ ৩ ০ ১
II পা পা পা | ণা ণা ণা | -র্সা র্সা র্সা | র্ঋা -ণা র্সা I
আ মার অ শ্রু জ লে র ক মল গু ॰ লি

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা ণা | ণা -া র্সা | র্ঋা ণা র্সা | র্সণা ণদা পা I
তো মার চ র ণ ত লে পড়্ বে দু ॰ লি

২´ ৩ ০ ১
I পদা -া দা | দা দণা -র্সা | দা দাণ দা | পমা -জ্ঞঋা -সা I
মু ক্ তা স ম॰ ॰ ঝ ল সি বে॰ ॰॰ ॰

২´ ৩ ০ ১
I ণ্ া -া সা | জ্ঞা জ্ঞাম -া | মা -া পা | মা পা -া II II
সেই ॰ তো ভা লো ॰ সে ই তো ভা লো ॰

জাহাজ ডুবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৃদ্ধ রাধাগোবিন্দবাবু বহুদিনের পুরাতন দেওয়ান। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পিতার আমল হইতে তিনি এই কার্য্য করিতেছেন। সৌম্য, সরল, উদার, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী এই দেওয়ানকে ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকেই অসাধারণ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তিনি উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া লোকে উপেন্দ্র-

বাবুকে 'বাবু', এবং দেওয়ান রাধাগোবিন্দ বাবুকে "বড়বাবু" বলিয়া ডাকিত। স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোরবাবুও তাঁহাকে কর্ম্মচারীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন না; নিজের অগ্রজের ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার পর উপেন্দ্রকিশোরবাবুর মৃত্যুর পরে অমরকুমার যখন বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইলেন, তখন অমরকুমার রাধাগোবিন্দবাবুকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন; সকল কার্য্যভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কোন দিন কোন কাজ তাঁহার অনভিমতে অমরকুমার করিতেন না। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর গৃহে রাধাগোবিন্দবাবুর অবারিতদ্বার ছিল। তিনি যেন এই গৃহেরই কেহ, ঠিক্ এমনি ভাব ছিল। তিনিই আসিতেই ভৃত্য চলিয়া গেলে পর, অমরকুমার আশালতাকে বলিলেন। "আমি জেঠা-মশাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম; তাঁকে সমস্ত কথা বলে, তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করে জমিদারীর প্রকৃত মালিকের অনুসন্ধান করতে হবে। আমি বলিয়েছি, তাঁকে পাওয়া গেলে, যাঁর বিষয় তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে, আমি চলে যাব। এ পরের বোঝা বইতে আর আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আমি যে দিন থেকে জানতে পেরেছি, আমি জমিদার উপেন্দ্রকিশোর বাবুর ঔরসজাত পুত্র নই, সেই দিন থেকে এ সকল বিষয়-সম্পত্তি যেন আমার প্রাণে সূচের মতন বিঁধ্‌ছে।"

আশালতা চুপ করিয়া রহিল। আশালতাকে নীরব দেখিয়া অমরকুমার বলিলেন, "কষ্ট হচ্ছে তোমার? বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে যাব বলে, তোমার মনে দুঃখ হচ্ছে কি, আশা? এ-সব যাঁর তাঁকে যদি দিয়ে যাই, তা হ'লে তোমার কষ্ট হবে কি? আমার সঙ্গে দারিদ্র্য-ভোগ করতে পারবে না?"

তাড়াতাড়ি আশালতা বলিল, "না না, আমার কিসের দুঃখ? আমার কষ্ট হবে কেন? তুমি যেখানে থাক্‌বে আমিও সেই খানে থাক্‌ব। তুমি যেখানে থাক্‌বে, সেই আমার অমরাবতী! তোমার সঙ্গে যদি আমার বনে বাস কর্‌তে হয়, তাতেও আমার সুখ! কাজ কি আমার এ পরের সম্পত্তিতে! সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার আর এখানে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না। সব যেন কেমন কেমন বলে মনে হচ্ছে।"

সাগ্রহে অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি বল্‌ছ ত, লতা?"

আশালতা বলিল, "সত্যি নয় ত' কি মিথ্যে কথা বল্‌ছি তোমার কাছে? কোনও দিন কি বলেছি?"

বৃদ্ধ রাধাগোবিন্দবাবু একটু কাসিয়া সাড়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমাকে ডেকেছ, অমর?" বৃদ্ধের আগমনে অবগুণ্ঠন টানিয়া আশালতা অন্য দ্বারপথে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অমরকুমার সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ! আসুন, বসুন!" ইহা বলিয়া অমরকুমার একখানা চেয়ার টানিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। "থাক্, থাক্'—এই যে বস্‌ছি।" বলিতে বলিতে রাধাগোবিন্দবাবু উপবেশন করিয়া বলিলেন, "কোন বিশেষ দরকারি কথা আছে কি?"

অমরকুমার বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ! দরকারও আছে বটে! বিশেষ রহস্যযুক্তও বটে!" বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে অমর-

কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "ব্যাপারটা কি বল দেখি ?"

অমরকুমার একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কাঁর ঔরসজাত পুত্র জানেন্ ?"

অমরকুমারের এইরূপ অত্যদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অমরকুমারের প্রশ্নের ভাবার্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে বলিলেন, "কেন বল দেখি, অমর, এমন কথা বল্‌ছ ?"

অমরকুমার বলিলেন, "আপনি বিজ্ঞ প্রাচীন ব্যক্তি। বহুদিন হতে এই বসু-বংশের সহিত আপনার ঘনিষ্ঠতা আছে, এ বংশের অনেক কাহিনীই আপনি জ্ঞাত আছেন, তাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি।"

রাধাগোবিন্দবাবু অনেকক্ষণ ভাবিয়া কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না। তিনি কথাটা অন্য ভাবে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "হঠাৎ আজ এ-কথা কেন তোমার মনে হ'ল, অমর ? কেন, এ সন্দেহের কারণ কি ?"

অমরকুমার প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন, "সন্দেহ নয়, জেঠা-ম'শাই, প্রমাণ পেয়েছি।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিয়া উঠিলেন, "প্রমাণ ? তুমি ভুল বুঝেছ অমর! তোমার স্বর্গীয়া জননী যথার্থই সতী লক্ষ্মী ছিলেন। ও-সব কথা তুমি মনে এনো না!"

রাধাগোবিন্দবাবু যে অমরের কথাটা অন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া অমর অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন "না, না, আমি সে কথা বলি নি। আপনি বুঝ্‌তে পারেন্ নি; জেঠা-ম'শাই! আমি বল্‌ছি যে, আমি এ বসু বংশের ছেলে নই। এ বংশে আমার জন্মই নয়।"

তবুও রাধাগোবিন্দবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি রকম ? তোমার জন্ম তো আজিমগঞ্জেই হয়! সে ত এই সে-দিনের কথা! তোমার আট্‌কৌড়ের দিন বাজনা বাজিয়ে রামা ঢুলি শালের জোড়া নিয়ে গেছ্‌ল। সে, বোধ হয়, এখনও বেঁচে আছে। ওঃ সে কি আনন্দের দিন! 'ছেলে হবে না, হবে না; ক'রে কর্ত্তার অনেক বয়সে তোমার জন্ম হয় কি না, তাই গরিব দুঃখী, চাকর, লোক-জন যে যা চেয়েছিল কর্ত্তা তাকেই তাই দিয়ে ছিলেন। আর সেই জন্যেই কর্ত্তা তোমার নাম রেখেছিলেন 'অমর'!"

মৃদু হাসিয়া অমরকুমার উত্তর করিলেন, "সে আমি নই, জেঠা-ম'শাই! সে অন্য এক অমর!" এই বলিয়া অমরকুমার সেই গজদন্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বাক্সটী খুলিয়া উপেন্দ্রকিশোরবাবুর লিখিত সেই খাতাখানি রাধাগোবিন্দবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "এইখানা পড়ে দেখুন, তা হলেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন।"

রাধাগোবিন্দবাবু খাতাখানি লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাহা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

অমর কুমার বলিলেন, "কি বুঝ্‌লেন, জেঠা মশাই ?"

মাথা নাড়িয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "কিছুই নয়, বাবা! দেখ অমর! আমার মনে হচ্ছে, এ কোন শত্রু-পক্ষের লোকের কাজ।"

অমর কুমার বলিলেন "না, জেঠা ম'শাই, এমন শত্রু আমার কে আছে, যে এ রকম অদ্ভুত কথা লিপিবদ্ধ করে আমার ঘরে রাখ্‌বে? তা'তে তা'র লাভই বা কি!"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "তোমরা ছেলেমানুষ, সংসারের লোকচরিত্র জান্‌তে এখনও তোমাদের ঢের দেরি! তুমি জান না অমর, এ-সংসারে এমন লোক আছে, তারা ভালর ভাল দেখ্‌তে পারে না। আমার ধারণা, তোমাকে অপদস্থ কর্‌বার জন্যই কেউ এ কাজ করেছে।"

অমরকুমার একটু দৃঢ়তার সহিত বলি-বলিলেন, "না জেঠা ম'শাই! তা কখনো হ'তে পারে না। এই দেখুন, এ বাকসটার কল খুব ভাল, এ বাক্‌স বাবার শোবার ঘরে, তাঁর দেরাজের ভিতর একটা গুপ্ত ড্রয়ারের মধ্যে অতিযত্নে লুকান ছিল। দেখেছেন্ তো বাবার ব্যবহারি জিনিষগুলি আমি তাঁর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ অতিযত্নে নিজের হাতে ঝেড়ে মুছে যত্ন করে রাখি। কোন দিন কা'কেও কিছু দিইও নি, নিজেও তাঁর কোন জিনিষ ব্যবহার করি নি। বাবার আমলে যেমন তাঁর জিনিষগুলি তাঁর ঘরে সাজানো গুছোনো থাক্‌ত, আমি ঠিক্ তেমনি করে রেখে দিয়েছি। সে-দিন তাঁর সমস্ত কাপড়-চোপড় রোদে দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে যখন তুলে রাখি, তখন হঠাৎ এই গুপ্ত ড্রয়ারটার উপর নজর পড়্‌লো। এত দিন তো লক্ষ্য করি নি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তা খুল্‌তে পার্‌লুম না। নাড়া চাড়া কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ একটা স্প্রীং যেমন একটু নুয়ে পড়ল, অমনি টপ্ করে ড্রয়ারটা বেরিয়ে পড়্‌ল। দেখ্‌লাম, তা'র ভিতরে এই সুন্দর বাকস্ টা একখানা কাগজে-মোড়া অতিযত্ন করে তুলে রাখা হয়েছে। বাক্‌সের ভিতর কি আছে দেখ্‌তে কৌতূহল হ'ল। কিন্তু বাক্‌সর চাবি কোথাও খুজে পেলুম না। একবার মনে কর্‌লুম, 'থাক্, যা আছে, বাবা যেমন যত্ন করে রেখে দিয়েছেন্, তেমনি যত্নকরে তুলে রেখে দিই, কিন্তু বাক্সটার সম্বন্ধে আমার এতকৌতূহল-বৃদ্ধি হলো তা' আর আপনাকে কি বল্‌ব? বাবার টাকা-কড়ি মূল্যবান্ আসবাব, হীরে জহরত, দলিল দস্তাবেজ যা কিছু ছিল, সমস্তই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমাকে দিয়ে গেছ্‌লেন, তাঁর আলমারি সিন্ধুক আয়রেন চেষ্টের চাবি, সব তিনি অনেক দিন হ'তেই আমাকে দিয়ে ছিলেন এবং কোন্ খানে কি আছে তা সমস্তই আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু কই বাক্‌সটার কথা তো তিনি একদিনও আমার কাছে বলেন্ নি! এ বাক্‌সর ভিতর কি এমন জিনিষ এত যত্ন পূর্ব্বক গোপন ক'রে রেখে-ছেন, দেখবার ইচ্ছাটা আমি কিছুতেই দমন কর্‌তে পার্‌লুম না। তাই মিস্ত্রী ডাকিয়ে বাক্‌সটি খুলিয়ে নিলুম্। নিয়ে দেখি বাক্‌সটি শূন্য। দেখে আশ্চর্য্য হলুম্। শূন্য বাক্‌সটি এত যত্ন করে রাখ্‌বার বাবার কি এত দরকার। কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম্ না। বাক্‌সটিও ম্যাজিক বাক্‌সের মতন কত রকম খাঁজ-কাটা। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে শেষে এই খাতাখানি বাক্‌সতে দেখ্‌তে পেলাম। খুলে দেখ্‌লুম্, তাঁর নিজের হাতের লেখা; পড়ে দেখ্‌লুম— আমারই একপ্রকার জীবন-কাহিনী। তাঁর গুপ্ত সম্পত্তি বাহির করে পাপ করেছি কি না জানি না, কিন্তু পিতার অবর্ত্তমানে যখন সকল

ত্রব্যই আমার, তখন এ বাক্সটীও আমার, সেই ভাবেই খুলেছিলুম। তখন ত আর জানতুম্ না, আমি এ-বংশের কেউ নই।” কিছু ক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন। তাহার পর অমরকুমার বলিলেন, “এই দেখুন্ লেখা তাঁর নিজের হাতের।”

বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ, লেখাটা ঠিক্ তাঁর হাতের লেখার মতনই বটে! কিন্তু লেখা ত অনায়াসে কেউ জাল করতে পারে!”

অমর। এই দেখুন্ নীচে তাঁর নামযুক্ত মোহর করা রয়েছে।

রাধাগোবিন্দবাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন। অমরকুমার বলিলেন, ‘আপনি কি তাঁর কাছে আমার সম্বন্ধে কোন দিন কোন কথা শোনেন্ নি?”

মাথা নাড়িয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “না। তিনি আমার কাছে ত কোন দিন কোন কথা গোপন করতেন না। কিন্তু এ কথা ত আমি এক দিনের জন্য ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। তাই ত আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ লেখা তাঁর নিজের হাতের কি না!”

অমরকুমার বলিলেন, “না জেঠা ম’শাই; সন্দেহের কোন কারণ নেই; এই লেখা যে তাঁর নিজের হাতের সে বিষয়ে কোন ভুল নেই! যে কারণে এ-কথা তিনি গোপন করেছিলেন তা ত নিজে লিখেই রেখেছেন্। তবে আপনি যখন সকল বিষয় জানেন্, তখন আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পেরেছিলেন কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম।”

রাধাগোবিন্দবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, “অমর রাগ কোরো না বাবা! আমি বুঝতে পাচ্ছি না, তোমার মাথা বিগড়েছে, কি তাঁর মাথা বিগড়েছিল, কিংবা তিনি কোনও উপন্যাস রচনা করছিলেন? হয় ত বা এ তাঁ’রই উপকরণ!”

অমর। আপনি জানেন্ কি, তিনি কখনও নোয়াখালিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন কি না?

রাধা। হ্যাঁ, তা জানি। গেছলেন। সে কথা আমার বেশ মনে রয়েছে।

অ। নোয়াখালিতে তাঁর কোনও উকিল বন্ধু ছিলেন?

রাধা। হ্যাঁ তা ছিলেন, জগদীশবাবু। তিনি এখানেও কতবার এসেছিলেন। তাঁকে দেখেওছি। পাতলা একহারা ছিপ্ছিপে লম্বা হেন লোকটি।

অ। শঙ্কর বলে তাঁর কোনও পুরোণো চাকর তাঁর সঙ্গে গেছল নোয়াখালিতে?

রা। হ্যাঁ গেছল!

অ। সে বাবার সঙ্গে ফিরে এসেছিল কি?

রা। না।

অ। কেন আসেন্ নি সে কথা তিনি এসে কিছু বলেন নি?

রা। হ্যাঁ বলে ছিলেন—বেচারা নোয়াখালিতে গিয়ে হঠাৎ মারা পড়ল। আহা বুড়োর নোয়াখালিতে মাটী কেনা ছিল আর কি?

অমরকুমার রাধাগোবিন্দবাবুর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া পিঠের জামাটী তুলিয়া বলিলেন, “দেখুন দেখি, আমার পিঠে কিছু লেখা আছে কি না?”

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ, তোমার

নাম লেখা রয়েছে। বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে "শ্রীঅমরকুমার বসু।"

অমরকুমার ফিরিয়া বলিলেন, "তবে জেঠামশাই, একথা মিথ্যা উপন্যাসমাত্র বলছেন কি করে? আর যদি এ উপন্যাস হয়, তা হলে এ উপন্যাসের প্রধান নায়ক হয়েছি আমি।"

রাধাগোবিন্দবাবু অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! মানুষ এমন করে কি পুত্রশোক চেপে রাখতে পারে? এ প্রহেলিকা-ভেদ করা মানুষের অসাধ্য।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর অমরকুমার বলিলেন, "আচ্ছা, জেঠামশাই, ছোটবেলায় সে অমর-কেও দেখেছেন, আমাকেও দেখেছেন, দেখে কি তখন আপনাদের মনে কোনও সন্দেহ হয় নি?"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "না বাবা! তুমি যদি যথার্থই সে অমর না হও, তা হলে তোমাদের উভয়ের যমজ-সহোদরের মত আকৃতিগত অতিসৌসাদৃশ্য! যা অপরে দেখলে হঠাৎ বুঝতে পারে না। সুতরাং তুমি যে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে নও, তা কেমন করে বুঝব? সে সন্দেহ কেমন করে করব? উপেন্দ্রকিশোরবাবু তাকেও যেমন ভাবে রাখতেন, তোমাকেও ঠিক্ তেমনি ভাবে রাখতেন, তাকেও যেমন একমুহূর্ত্তের জন্যে চক্ষের অন্তরাল হতে দিতেন না, তোমাকেও সেই রকম একমুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের অন্তরাল করতেন না। কোন ভাব-পরিবর্ত্তনের বৈলক্ষণ্যও ত দেখিনি! মানুষ নিজের সন্তান হারিয়ে পরের সন্তানের প্রতি যে এমন প্রাণ ঢেলে ভালবাসা দিতে পারে, তা বাপু, আমাদের এতখানি বয়েস হল, আমি তা কল্পনাতেও আনতে পারি না। একমাত্র-পুত্রশোক মানুষ যে এমন করে প্রাণের ভিতর চেপে লুকিয়ে রাখতে পারে, এও জীবনে কখনও শুনি নি।"

কৃতজ্ঞভরে অমরকুমার বলিলেন, "হাঁ, তাঁর মহত্ত্বকে ধন্যবাদ! যথার্থই তিনি আমাকে নিজের ঔরসজাত পুত্রের মতন ভাল বাসতেন। তাঁ'দের সে স্নেহ ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করতে পারব না। তবে মনে কচ্ছি, তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্র অমরকুমারের সন্ধান করে তাঁর সম্পত্তি তাঁর হাতে দিয়ে আমার স্বর্গীয় মহানুভব প্রতিপালকের প্রেত আত্মাকে সন্তুষ্ট করব।"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন "অমর! তুমি ছেলেমানুষ, এ বুড়োর কথা শোন। কোন দিনও বাবা, তুমি আমার অমতে কোন কাজ কর নি, তবে আজ আর আমার শেষ-দশায় আমার কথা ঠেলে আমার মনে কষ্ট দিও না।"

অ। সে কি কথা জেঠা মশাই! আপ-নার মনে কষ্ট দোব! আমি যার ছেলেই হই না কেন, ছেলে-বেলায় আমাকে যে স্নেহ যত্ন করেছেন, আজ পর্য্যন্ত আমাকে যে-রকম ভালবাসেন, আমি কি সে-কথা ভুলে যাব? সে রকম কৃতঘ্ন আমি নই। কি বলবেন বলুন!

রা। আমার কাছে যা বল্লে তা' বল্লে, কিন্তু এ-কথার আর কোনও উত্থাপন করো না। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, উপেন্দ্র-কিশোরবাবু জীবিত-কালে যখন এ-কথা প্রকাশিত হয় নি, তিনি যে কালে এ কথা

প্রকাশ করেন নি, তখন এ-কথা নিয়ে ব্যস্ত হ'বার তোমার কোনও দরকার নেই।

অ। দরকার নেই! বলেন কি জেঠা-ম'শাই? যে-দিন থেকে আমি এ-কথা জানতে পেরেছি, সেই দিন থেকে আমার সুখ-শান্তি কিছুই নেই। আমি অন্যায়রূপে এ বিষয় ভোগ কচ্ছি। যাঁর এ সম্পত্তি, তাঁর হাতে বুঝিয়ে দিতে পার্‌লে, তবে আমি শান্তি পাব। তা হলেও জান্‌ব, আমার স্বর্গগত আশ্রয়-দাতার স্নেহের ঋণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে শোধ হল।

রা। কথাটা যদি সত্যই হয়, তা হ'লে তুমি মনে কচ্ছ কি অমর, সে বেঁচে আছে? বেঁচে যদি থাক্‌ত, তা হলে এতদিন অবশ্যই কোন রকম না কোন রকমে তা'র সন্ধান পাওয়া যেত!

অ। আমার বিশ্বাস, তিনি বেঁচে আছেন। শঙ্করের হত্যাকারীরা যদি তাঁকে হত্যা কর্‌ত, তা হ'লে সেইখানেই কর্‌ত। তা যখন করে নি, সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে পালিয়ে গেছ্‌ল, তখন নিশ্চয় তাঁর প্রাণবধ করে নি।

রা। তাই যদি হয়, তা হলেও আর তাকে পাওয়া যাবে না, অমর! তার যদি দেশভুঁই, বাপ-মাকে মনে থাক্‌ত, ত তা হ'লে কি এই পঁচিশ বছরের মধ্যে সে ফিরে আস্‌ত না! বুড়োর কথা শোন, অমর! মনকে স্থির কর, বৃথা ছেলে-মানুষী কোর না। এ-বিষয়ে আর উচ্চ-বাচ্য কোরে কাজ নেই।

অ। আমি মনে কচ্ছি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দোব। দেশে দেশে তাঁর অনুসন্ধানে লোক পাঠাব। যেমন করে হোক্‌, তাঁর অনুসন্ধান আমি কর্‌ব। আপনি বল্‌ছেন যে এতদিন তাঁর কোনও খবর পাওয়া যায় নি। কিন্তু আমার প্রতিপালক পিতা নিজের পুত্রের কোনও অনুসন্ধান করেছিলেন কি? তিনি পিতার কর্ত্তব্য পালন করেন নি। আমাকে নিয়ে তিনি পুত্রশোক এক রকম বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁর সে ত্রুটি আমি সংশোধন কর্‌বো। আমাকে আর আপনি নিষেধ কর্‌বেন্‌ না। প্রাণপণ চেষ্টা করেও যদি তাঁর কোনও অনুসন্ধান কর্‌তে না পারি, যথার্থই যদি তিনি হত হয়ে থাকেন, তখন যা উচিত হয় কর্‌ব। কিন্তু এখন এ বিষয়-সম্পত্তিতে আমার কোনও অধিকার নাই।

মাথা নাড়িয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "অমর! তুমি সংসারানভিজ্ঞ বালক! তাই কাজটাকে এত সহজ মনে কচ্ছ! কিন্তু যত সহজ ভেবেছ, কাজটা তত সহজ হবে না। তুমি নিজের উদার মনটির মত সমস্ত জগৎ-টাকে দেখ্‌ছ! জান না তো বাপু, কত জাল জোচ্চুরি, ঠকামি, ফেরাবাজী এর ভেতর আছে! তুমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটি বা'র করবামাত্র রাশি রাশি লোক বিষয়ের লোভে ছুটে এসে বল্‌বে—"আমি উপেন্দ্র-কিশোরবাবুর ছেলে, তখন?"

একটু চিন্তা করিয়া অমরকুমার বলিলেন, "সেটা অবশ্য আমাদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে হবে।"

রাধাগোবিন্দবাবু একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অমর! পঁচিশ বছর তোমাকে নিয়ে ঘর কচ্চি, নিজের ছেলের মতন তোমার উপরে মায়া পড়েছে, তোমার

মতন মহৎ উদার সরল যুবক এ-সংসারে খুব কম দেখেছি। তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাবে এ-কথা ভাবতে গেলেও বুকটা ফেটে যায়। তোমাকে বঞ্চিত করে কি শেষে একটা চোচ্চোর এসে এতটা বিষয় ভোগ কর্‌বে?—হা ভগবান্! এমন অঘটন ঘট্‌বে, এ যে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি!—আবার বল্‌ছি অমর এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু নির্গত হইল। তাহা দেখিয়া অমরকুমারের চক্ষের কোণ দুইটাও যেন কেমন একটু ছলছল্ ভাব হইয়া আসিল। কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহার সংকল্প অটুট।—তাঁর সেই একই কথা। "বার বার আপনার কথার প্রতিবাদ কচ্ছি, সে জন্যে ক্ষমা কর্‌বেন। কিন্তু এ-কথা ঠিক্ জান্‌বেন, আমি যখন এ পরিবারের কেউ নই, তখন এ-ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্‌বার আমার কোনও অধিকার নেই। তখন আর আমাকে এখানে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বেন্ না। আপনারা আমার জীবনকে সে ভাবে গঠিত করেন নি।" অমরকুমারকে কিছুতেই যখন তাঁহার সংকল্প-চ্যুত করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা ক্ষুন্নমনে অমরকুমারের নিকটে বিদায় লইয়া রাধাগোবিন্দবাবু গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(৩)

অপহৃত অমরকুমারের কোনও প্রকার অনুসন্ধান নোয়াখালির পুলিশ অফিসারগণ জানিতে পারিয়াছিলেন কি না এবং শঙ্করের হত্যাকারীদিগের কোনও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি-না, তাহা জানিবার নিমিত্ত অমরকুমার নোয়াখালিতে জগদীশবাবুর নামে এক পত্র লিখিলেন। জগদীশপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানীপ্রসাদ কৃতবিদ্য হইয়া তৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়া জজ-আদালতে ওকালতি করিতেছিলেন। অমরকুমারের প্রেরিত পিতার নামাঙ্কিত পত্রের উত্তর দান তিনিই করিলেন;—লিখিলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম, উপেন্দ্রকিশোরবাবু তাঁহার-অপহৃত পুত্র অমরকুমারকে পাইয়াছিলেন। আজ শুনিতেছি, তিনি পালক পুত্র! শুনিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শঙ্করের হত্যাকারীর পুলিশ কোন অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হয় নাই। ইত্যাদি।" পত্র পাঠ করিয়া অমরকুমার কিছু হতাশ হইলেন; কিন্তু নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। বিজনকুমার মিত্র নামক জনৈক ভদ্র যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিয়া পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি যদিও নবীন কর্ম্মচারী কিন্তু তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া অনেক প্রবীণ কর্ম্মচারীও ঈর্ষাপূর্ণনেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে যে যে-কার্য্যভার প্রদান করিত, অতি বিচক্ষণতার সহিত তিনি সত্বর সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার অদ্ভুত মেধা-দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে যেখানে জটিল রহস্য-যুক্ত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইত, সেইখানেই কার্য্য-ভার দান করিলেন। সম্প্রতি একটা মানুষ-চুরির ব্যাপারে তিনি এরূপভাবে তদন্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার শক্তি ও সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত দেশবাসী 'ধন্য ধন্য' করিতেছিল। তাঁহার নাম, যশঃ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি এই ব্যাপারে দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িল। তাঁহার

কার্য্যদক্ষতা-দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অমরকুমার মনে করিলেন, উপেন্দ্রকিশোর বাবুর অপহৃত পুত্রের উদ্দেশের জন্য এই বিজনকুমারের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। একদিন অপরাহ্নে অমরকুমার বিজনবাবুর বাটিতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সকল কথা বলিলেন। বিজনকুমার সকলকথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া বলিলেন. "বহুদিনের পুরাতন ঘটনা, কৃতকার্য্য হইতে পারব কি না বল্‌তে পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখ্‌ব। আমার সাধ্য-মত আমি ত্রুটি কর্‌ব না।" অমরকুমার তিন-হাজার টাকার তিনখানি নোট তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এ-কাজে আপনাকে অনেক কষ্ট কর্‌তে হবে, আপনার অনেক পরিশ্রম হবে, অনুগ্রহ করে এই নোট-তিনখানি গ্রহণ করুন্।"

বিজনকুমার নোট-তিনখানা দেখিয়া বলিলেন, "টাকা এখন আপনি রেখে দিন্। কাজ কর্‌বার আগে টাকা নেওয়া আমার অভ্যাস নয়।"

ক্ষুণ্ণ হইয়া অমরকুমার বলিলেন, "এ-কাজের জন্য আপনাকে অনেক যায়গায় যেতে হবে, রাস্তা-খরচও হবে; পথখরচ-স্বরূপ এটা নিন্।

বি। আগে আপনার কাজ উদ্ধার করে দেই, তারপর যা অভিরুচি হয় দেবেন।

অ। প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে পাওয়া গেলে আমি স্থির করেছি, তাঁর স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাব। তখন আর আমার কোনও হাত থাক্‌বে না, কেমন ক'রে আপনাকে টাকা দোব?

বি। তা' না হয় যিনি বিষয় গ্রহণ কর্‌বেন, তাঁ'র কাছ থেকেই টাকাটা নোব।

অমরকুমার কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'আপনাকে কাজের ভার দিচ্ছি আমি. তিনি যদি টাকা দিতে কুণ্ঠিত হন, তাহলে আমি লজ্জিত হব। অথচ তখন আমার কোনও হাত থাক্‌বে না।

মৃদু হাসিয়া বিজনবাবু বলিলেন,"অমরবাবু তখন যদি আপনার কোনও অধিকার না থাকে, তা হলে এখনও ত এ-টাকা দান বা ব্যয় কর্‌বার অধিকার আপনার নাই! আপনি ত রক্ষকমাত্র।

অপ্রতিভ হইয়া অমরকুমার বলিলেন, "না না, রক্ষক ঠিক্ নয়! আমার মহানুভব প্রতিপালক আমাকেই তাঁর পুত্রবলে জন-সমাজে প্রচার করেছিলেন, তাঁর সর্ব্বস্ব আমাকেই দিয়ে গেছেন। দৈবক্রমে প্রকৃত ঘটনা জান্‌তে পেরে আমি স্বেচ্ছায় তাঁর পুত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি।"

বিজনকুমার বলিলেন, "মাপ কর্‌বেন। আমি পরিহাস কচ্ছিলাম। আপনার মহত্ত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মানুষ বিষয়-সম্পত্তির জন্যে সহোদর ভাইকেও বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌লে ছাড়ে না। এই ধন-সম্পত্তির জন্যে লোকে মারামারি, নালিস-মোকদ্দমা, এমন কি খুনোখুনি পর্য্যন্ত করে। আপনি স্বেচ্ছায় এই বিপুল সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চাইছেন!"

অমরকুমার বিদায়-গ্রহণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাই হোক্, আপনি

খরচের জন্তে টাকাটা অগ্রিম নিলে কিন্তু আমি বড় সুখী হতাম্।"

বিজনবাবু বলিলেন, "আপনি মনে কর্বেন না যে, টাকা নিলাম না বলে আপনার কাজে আমি অবহেলা কর্‌ব। আমার যথাসাধ্য আমি আপনার আদেশানুযায়ী কাজ করবার চেষ্টা কর্‌ব।"

অমরকুমার শিষ্টাচার জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরদিন অমরকুমার সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন—"প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল আজিমগঞ্জের মৃত জমীদার ৺উপেন্দ্রকিশোর বসুর পুত্র শ্রীযুক্ত অমরকুমার বসু সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিরুদ্দিষ্ট হ'ন। তাঁহার গলায় একছড়া বহুমূল্য হীরক-হার ছিল। লোকের অনুমান, সেই হারের জন্ত কেহ তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। যদি কেহ তাঁহার সংবাদ বলিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং এখানে আসিয়া তিনি যে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র তাহা প্রমাণ করিতে পারিলে, তাঁহার পিতার বিষয়-সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তাঁহার পায়ে ছয়টা আঙ্গুল ছিল।"

সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর অনেকেই এ গুপ্ত রহস্য জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত হইল। জনরব সংস্রমুখে ক্রমে ক্রমে একথা রাষ্ট্র করিল যে, অমরকুমার উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র নহেন, এবং উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্রকে পাওয়া গেলে অমরকুমার বিষয় সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। দরিদ্র প্রজাগণ প্রমাদ গণিল। এমন দয়ালু প্রজারঞ্জক দরিদ্রপালক জমীদারের পরিবর্ত্তে কোন্ নিষ্ঠুর আততায়ী তাহাদের জমীদার হইয়া বসিবে, তাহা ভাবিয়া তাহারা কাতর হইল। একবার সজল চক্ষে করযোড়ে দাঁড়াইয়া নিজের দুঃখ জানাইতে পারিলেই তাহাদের খাজানা মকুব হইয়া যাইত, তাহা ছাড়া কিছু বখ্‌শিসও মিলিত। অভুক্তকে অন্ন, রোগক্লিষ্টকে পথ্য, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে অর্থদান এমনটি আর কে করিবে! তাহারা 'হায় হায়' করিতে লাগিল। অমরকুমারের শ্বশুর আশালতার পিতা নিশাদলের রাজার ম্যানেজার ছিলেন। ম্যানেজার নামমাত্র, তাঁহাকেই প্রকৃত রাজা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, রাজা পুত্রহীন। তিনি বিষয়-কার্য্যের কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন না। সমস্ত ভার ম্যানেজারের উপর অর্পণ করিয়া তিনি স্বয়ং সস্ত্রীক তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। জনপ্রবাদ, ম্যানেজার অবনীভূষণের কনিষ্ঠ পুত্রকে মহারাজ পোষ্য-পুত্র রূপে গ্রহণ করিবেন। অবনীবাবু রাজপ্রতিনিধি হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার মান-সম্ভ্রম, চাল-চলন, অখণ্ড প্রতাপ ঠিক্ রাজার মতনই ছিল। লোকে বলিত, তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী। হঠাৎ একদিন একখানা কাগজে অমরনাথের এই বিজ্ঞাপনের উপর অবনীবাবুর দৃষ্টি পতিত হইল। বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। অমরকুমার যে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র নহেন, এ-কথায় তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; এবং ক্রোধে তিনি দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইলেন। উপেন্দ্রবাবুর জীবদ্দশায় যখন এ-কথা প্রকাশ পায় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরেও যখন

অমরকুমার তাঁহার পুত্ররূপে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিয়া রীতিমত শ্রাদ্ধ-শান্তি করিয়াছিলেন, তখন এতদিন পরে হঠাৎ কেন যে অমরকুমার ইহা প্রচার করিতেছেন, সে-কথার মর্ম্ম তিনি অবগত হইতে পারিলেন না। ইহা অমরকুমারের কিরূপ উন্মত্ততা, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। কথাটা যদি সত্যই হয়, তবে উপেন্দ্রবাবু যখন এতদিন কথাটা গোপন রাখিয়াছিলেন, তখন অমরের এখন তাহা প্রকাশ করিয়া অতটা সম্পত্তি পরকে ডাকিয়া বিলাইয়া দেওয়া তিনি উন্মত্ততা মনে করিলেন। অদম্য ক্রোধ, বিস্ময় এবং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একদিন তিনি আজিমগঞ্জে জামাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আসিয়াই ক্রোধপূর্ণ স্বরে অমরকুমারকে বলিলেন, "তোমার হয়েছে কি? মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে না কি? এ-সব কাণ্ডখানা কি তোমার?"

শ্বশুরের এই অকারণ ক্রোধ দর্শনে অমরকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কেন বলুন্ দেখি? কি করেছি আমি?"

অবনীবাবু তেমনিভাবে বলিলেন, "উপেন্দ্রবাবুর পুত্র নও বলে তুমি বিজ্ঞাপন দিয়েছ?"

বিনীতভাবে অমরকুমার বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছি।"

অবনী। এতে তোমার লাভ?

ধীর প্রশান্ত ভাবে অমরকুমার উত্তর করিলেন, "লাভালাভ বুঝি না, যা কর্ত্তব্য বোধ করেছি, তাই করেছি।"

অব। কর্ত্তব্যটাই বা তোমার কি রকম শুনি! বিয়ে করেছ সেটা মনে আছে?

অম। আজ্ঞে হ্যাঁ। আছে বৈ কি!

অব। তবে? বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে চলে যাবে বলে যে বড্ড কাবুদানী করেছ, তোমার স্ত্রীর অবস্থা কি হবে?

দৃঢ়স্বরে অমরকুমার বলিলেন, "যা অদৃষ্টে আছে, হবে। প্রবঞ্চনা করে পরের বিষয় ভোগ করার চেয়ে নির্ম্মল দারিদ্র্য সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।"

অব। পরের কি করে হ'ল শুনি?

অম। আমি যখন তাঁর পুত্রই নই, তখন সম্পত্তি আমার কেমন করে হবে?

অব। তুমি তাঁর পুত্র বলেই পরিচিত, বিষয়ে তোমার পূর্ণ অধিকার।

অম। তিনি যদি আমার কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে আমাকে তাঁর সম্পত্তি দান ক'রে যেতেন, তা হলে আমি এ বিষয় ভোগ কর্‌তে পার্‌তুম। তা যখন তিনি করেন্ নি, ন্যায়তঃ এ সম্পত্তিতে আমার কোনও অধিকার নেই।

অব। তিনি যদি তোমাকে বলেন নি যে তুমি তাঁর পুত্র নও, তবে হঠাৎ তোমার মাথায় এ খেয়াল চাপ্‌ল কেন? কথাটা কি বড্ড পৌরুষের মনে কর তুমি?

অম। পৌরুষ হোক্ বা নাই হোক্, যা ন্যায্য তাই কর্‌ব।

অব। তাঁর কাছে যদি কিছু শোন নি, তবে তুমি জান্‌লে কেমন করে, তুমি তাঁর পালিত পুত্র?

অম। আমি তাঁর হস্তলিখিত ডায়েরি দেখে এ গুপ্ত রহস্য জান্‌তে পেরেছি।

অব। ডায়েরিতে লিখে রেখে গেছেন, তুমি তাঁর ছেলে নও?

অম। হ্যাঁ।

অব। তুমি তবে কা'র্ ছেলে ?

অম। তা' বল্‌তে পারি না।

অব। কই সে ডায়েরি, আমি দেখ্‌তে পারি ?

অমরকুমার তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে সেই খাতাখানি আনিয়া অবনীবাবুর হাতে দিলেন।

অবনীবাবু তাহা খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঃ এত বড় জোচ্চোর ছিল উপেন্ বোস !"

অমরকুমার আজ জানিতে পারিয়াছেন, উপেন্দ্রবাবু তাঁহার জন্মদাতা নহেন, তথাপি তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা তিলমাত্র হ্রাস হয় নাই। বরং তিনি যে অপরের পুত্রকে পালন করিয়া নিদারুণ পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন, অমর যে তাঁহার পুত্র নয় একথা ঘুণাক্ষরে কাহাকেও জানিতে দেন নাই, তাঁহার এরূপ অদ্ভুত সহিষ্ণুতা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি অমরকুমারের ভক্তি-শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই স্বর্গগত মহাত্মার প্রতি কুবাক্য-প্রয়োগ করাতে তিনি শ্বশুরের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু মুখে সে-ভাব প্রকাশ না করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অবনীবাবু খাতাখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অবজ্ঞা-ভরে গৃহতলে তাহা ফেলিয়া দিলেন। অমরকুমার তাহা কুড়াইয়া লইলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন। তাহার পরে অবনীবাবু শ্লেষ-ভরে বলিলেন, "এ কেলেঙ্কারি প্রকাশ করে তোমার কতদূর বোকামি হয়েছে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ ? বাপ্-মায়ের পরিচয় জান না, লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে ? লোকে বল্‌বে কি ?"

অমরকুমার এবার বিরক্তির সহিত বলিলেন, "সে পরামর্শ যখন আপনার কাছে চাইব, তখন দেবেন্। এখন আমি যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি।"

ক্রুদ্ধ হইয়া অবনীবাবু বলিলেন, "আমি যে তোমাকে মেয়ে দিয়েছি, নইলে কি দরকার ? তোমায় উপেন বোসের ছেলে জেনেই তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু যখন লোকে জান্‌তে পারবে সেটা জোচ্চোর, আর তুমি তার ছেলে নও, তোমার জন্মের স্থিরতা নেই, তখন লোক-সমাজে আমার যে আর মুখ দেখাবার উপায় থাক্‌বে না।"

ক্রোধে অমরকুমারের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু কি করিবেন্? তাঁহার উত্তর দিবার কিছুই নাই। যথার্থই তিনি মাতা-পিতার বিষয় কিছুই অবগত নন্। দূর অতীত জীবনের কোন ঘটনাই তাঁহার স্মরণ নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি শিশুকালের কোন কথা স্মৃতিপথে আনিতে পারেন নাই। কষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া ধীর প্রশান্ত ভাবে তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অবনীবাবু কিছুক্ষণ একাকী সেই কক্ষমধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর মনঃস্থ করিলেন, কন্যাকে লইয়া তিনি চলিয়া যাইবেন; জামাতার সহিত কোন সম্বন্ধই আর রাখিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি আশালতার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "অমরটার তো একেবারে মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। যে রকম বিজ্ঞাপন বার করেছে, এই কোন্

দিন কোন্ ব্যাটা জোচ্চোর এসে বলে,—'এই যে আমি উপেন্দ্রকিশোর বোসের ছেলে!—তখন সে ব্যাটা তো গালে চড় মেরে সর্ব্বস্ব কেড়ে নেবে, অমরকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। তুই মা ও হতভাগার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় কোথায় বেড়াবি? তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে নিয়ে যাই। ও যাই হোক্, তুই ত আমার সেই মেয়ে। আহা! কি কর্‌ব বল? বড়লোকের ছেলে মনে করে বিয়ে দিলুম, হয়ে গেল পথের ভিকিরি। সব তোর অদৃষ্ট! আমি তো টাকা খরচ কর্‌তে কশুর করি নি মা! হাক্ যা হবার হয়ে গেছে, তার তো আর কোনও উপায় নেই! তুই আমার সঙ্গে চ'। তোর কোন কষ্টই আমি রাখ্‌ব না।"

আশালতা নীরব। পিতার এত কথার সে কোনই উত্তর দিল না; নতমুখে দাঁড়াইয়া একপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া অপর পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি খুঁটিতে লাগিল। কন্যাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া একটু ব্যস্তভাবে অবনীবাবু বলিলেন, "নে মা শীগ্‌গির করে তোর জিনিষপত্র, গহনা টহনাগুলো গোছগাছ করে নে। আমি আর বেশীক্ষণ থাক্‌তে পার্‌ব না; ও দিকে ট্রেনের সময় হয়ে এল।"

ধীরে ধীরে আশালতা বলিল, "আপনি যান্ বাবা, আমি যাব না।"

বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া অবনীবাবু বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাবি না? সে কি? থাক্‌বি কোথায়?

আশালতা পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে বলিল, "এই খানে।"

বিদ্রূপের সহিত অবনীবাবু বলিলেন, "এই খানে? এখানকার লীলা-খেলা ত ফুরিয়ে এসেছে! তার পর?"

সহজভাবে আশালতা উত্তর করিল "তার পর যা অদৃষ্টে আছে, হবে।"

অবনীবাবু স্বর কিছু নরম করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী মা, আমার! তুই আমায় মেয়ে হয়ে এমন লোক-হাসান কাজ করিস্ নি। আমি তোর বাপ, তোর যাতে ভালো হয় আমি তাই কর্‌ব। আমার কথা শোন্, আমার সঙ্গে চল্। ও ছোঁড়ার কপালে অনেক দুর্গতি আছে, নইলে ওর এমন মতিগতি হবে কেন? লোকে দশটাকার সম্পত্তি পেলে ছাড়্‌তে চায় না, আর ও হতভাগা এই বিপুল সম্পত্তি যেচে বিলিয়ে দিচ্ছে। নিজের জন্মের কেলেঙ্কারি নিজে বার করে লোক সমাজে নিজের মাথা হেঁট করাচ্ছে। ছি! ছি! কি বল্‌ব! ছোঁড়া একেবারে অধঃপাতে গেছে।"

ধীর প্রশান্ত ভাবে আশালতা বলিল, "বাবা, যাঁর হাতে দিয়েছেন, তাঁর যখন যে অবস্থা হবে, আমাকেও সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে।"

ক্রুদ্ধ হইয়া অবনীবাবু বলিলেন, "দেখ, এখনও ভাল করে বুঝে দেখ। ভেবে দেখ, ভবিষ্যতে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা দাঁড়াবে। যদি নিজের ভাল চাও ত আমার সঙ্গে চল, নইলে এর পরে "বাবা বাবা" করে কেঁদে মরে গেলেও আর আমি ফিরে চাইব না, তা কেন।"

বেশ একটু দৃঢ়তার সহিত আশালতা বলিল, "তা হলে রাস্তায় পড়ে মরে থাক্‌ব, তবু দুঃসময়ে তোমার আশ্রয় চাইব না। এ

শিক্ষা আমি আমার মায়ের কাছে পেয়েছি। আপনি এখন ফিরে যান। যদি ভগবান্ কখনও দিন দেন্, তখন আবার আপনাকে প্রণাম কর্‌তে যাব!"

কন্যার মুখে এইরূপ গর্ব্বিত উত্তর পাইয়া ক্রোধে ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইয়া অবনীবাবু প্রস্থান করিলেন। আশালতা একাকী নীরবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। এতক্ষণ কক্ষান্তরে থাকিয়া অমরকুমার পিতাপুত্রীর সকল কথা শুনিতে পাইতেছিলেন। আশালতার কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব ও আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। অবনীবাবু চলিয়া যাইবার পর তিনি আশালতার নিকটে আসিয়া, সস্নেহে তাহার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "তোমার বাপ্ নিয়ে যেতে চাইলেন, কেন তুমি গেলে না? বেশ থাক্‌তে। সত্যই ত আমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত। সত্যই অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। আমার সঙ্গে থাক্‌লে সত্যই ত তুমি অনেক কষ্ট পাবে। তার চেয়ে বাপের বাড়ীতে থাক্‌লে বেশ সুখে থাক্‌তে!"

হাসিতে হাসিতে আশালতা উত্তর করিল, "তুমি নিজে যদি আমার বাপের কাছে আমাকে রেখে আস্‌তে পার, আমি যাব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

শ্যামা কি শ্যাম ?

বল্ রে তুই শ্যামা কি শ্যাম ?
জানি না আমি তোর কি নাম!
স্বরূপ ভুলিয়া তোর,
এ-হেন দুর্দ্দশা মোর,
রিপুর লাঞ্ছনে হৃদি হয়েছে শ্মশান,
আসুরিক বলে সদা ব্যথিত পরাণ।
তুই যদি হ'স্ শ্যামা,
মহাশক্তিময়ী বামা,
পাষাণি! পাষাণ হয়ে থাকিস্ নে আর,
দারুণ দুঃখের মা গো কর্ প্রতীকার।
দনুজ-দলনী সে মূরতি ধরে,
আবার মা তেমনি তেমনি করে,
নাচ্ রে হৃদয়-শ্মশান উপরে,
শাণিত কৃপাণ করেতে ধরি।
দনুজ-শকতি করিয়া দলিত,
কর মা! আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত,
হৃদি অশিবতা কর্ দূরীভূত,
আরোহি' শিবের হৃদয়োপরি।
বল্‌রে তুই শ্যমা কি শ্যাম ?
জানি না আমি তোর কি নাম ?
তুই যদি হ'স্ সে শ্যাম সুন্দর,
তবে চূড়া ধড়া বাঁশরী ফেলিয়া,—
শরীর রথের সাজিয়ে সারথি,
মুকতির পথ দে রে দেখাইয়া।
কুরুক্ষেত্রে যথা সারথির বেশে,
দিয়াছিলে পার্থে পথ সে বলিয়া,
তেমনি আমার মুকতির পথ,
দে শ্যাম! দেখায়ে সারথি সাজিয়া!

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বলদেব।

মহাবনের ছয় মাইল দূরে বলদেবের মন্দির অবস্থিত। বলদেব-সহরের লোক-সংখ্যা ২৮৩১। মন্দিরের সন্নিকটে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি সরোবর আছে। ইহাই ক্ষীর-সাগর নামে খ্যাত। কেহ ২ ইহাকে ক্ষীর-কুণ্ড বা বলভদ্রকুণ্ড কহিয়া থাকে। সরোবরটী ধ্বংস-দশা প্রাপ্ত এবং জলটী শৈবালের হরিদ্রাভ একটী স্তর-দ্বারা আবৃত। এই স্থানেই গোঁসাই গোকুলনাথ স্বপ্নে দেখেন যে, একটী দেবতা-বিগ্রহ প্রোথিত আছে। তৎক্ষণাৎ অন্বেষণ আরম্ভ হইল ও বলদেবের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গেল। বিগ্রহটীকে গোকুলে লইয়া যাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া হয়, কিন্তু যে যে শকটে বিগ্রহটী বহন করা হয়, তাহার সকলগুলিই ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপে অনেকগুলি গাড়ী ভাঙ্গিয়া যাইলে, বিগ্রহকে গোকুলে লইয়া যাইবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া,তথায় একটি মন্দির-নির্ম্মাণ করা হয়। ভরতীয়া-নামক স্থানের অধিবাসী কল্যাণ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণের উপর দেবতার পূজার ভার ন্যস্ত করা হয়। তাঁহার পুত্রপৌত্রগণই এখন দেবতার পাণ্ডা। দেব-সেবার জন্য কতকগুলি গ্রাম আছে। সেগুলির নাম—অরতোলী, নেরা, ছীবারেই, খরাইরা, নুরপুর, এবং সাহবপুর। ইহার আয় হইতে দেবসেবা চলিয়া থাকে। উক্ত গ্রামগুলির বাৎসরিক আয় ৩৮৫৩৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত যাত্রিগণ প্রতি-বৎসর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার পূজা দিয়া থাকে। ক্ষীরসাগরে স্নান করিতে হইলে তীর্থসেবী ব্যক্তিকে যাহা দিতে হয়, তাহা মন্দিরের পাণ্ডার প্রাপ্য নহে—ধনাঢ্য ব্রাহ্মণদিগের প্রাপ্য। এখানে ১১টী কুণ্ড আছে। প্রত্যেক কুণ্ড তাহার নির্ম্মিতার নামে নামান্বিত হইয়াছে। সরোবরের সন্নিকটে হরিদেবের মন্দির অবস্থিত। মুরসান-নিবাসী বেহারীলাল বোহরা ইহার নির্ম্মাতা।

বলদেবে দুইটী মেলা হইয়া থাকে; তন্মধ্যে একটি ভাদ্রমাসের ৬ই এবং অপরটী অগ্রহায়ণ-মাসের পূর্ণিমায়। মেলা উপলক্ষে প্রতিদিন অন্যূন একশত লোকের সমাগম হয়। পূজা দিতে যাত্রীদিগের খরচ অতিশয় অল্পই হইয়া থাকে; কিন্তু পূজার দ্রব্য একত্র করিলে তাহার মূল্য বড় কম হয় না। এখানে পূজাতে ৩।৪ দিনে যে চিনি চড়ে, তাহার মূল্য অল্পহারে ৮০৲ টাকা হইবে।

গোবর্দ্ধন বা গিরিরাজ।

গোবর্দ্ধন-সহরটী অত্যন্ত বড়। এখানকার লোক-সংখ্যা ৪৯৪৪। বরসানা ও গোবর্দ্ধন পরস্পর হইতে কেবলমাত্র সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী। পরন্তু গোবর্দ্ধন যাইতে হইলে মথুরা হইতে যাওয়াই সুবিধাজনক। কারণ, রাস্তাটী পাকা। মথুরার ১৪ মাইল দূরে গোবর্দ্ধন অবস্থিত। ইন্দ্র যখন পূজাভাবে ক্রোধান্বিত হইয়া বারি বর্ষণ করেন, তখন ব্রজের নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ এই পর্ব্বতটীকে ৭ দিন ও ৭ রাত্রি উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দু-

গণ ইহাকে গিরিরাজ বলিয়া থাকে। পুরাকালে ইহার নাম অন্নকূট ছিল। এখনকার লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, যমুনা যেমন প্রতিবৎসর ক্ষীণকায়া হইতেছেন, তেমনই গোবর্দ্ধনও উচ্চতায় প্রতিবৎসর হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে ইহাকে অরীং হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন কয়েক শত গজ যাইলেই, পর্ব্বতটী চক্ষুর অদৃশ্য হয়।

জাতিপুর ও অনিয়োর-নামক গ্রামের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে পর্ব্বতটীর উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার চূড়ায় ১৫১০ খৃঃ গোকুলের বল্লভাচার্য্য শ্রীনাথের নামে একটী মন্দির স্থাপিত করেন। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব মন্দিরটী আক্রমণ করিবেন্ ভাবিয়া বিগ্রহটীকে উদয়পুরের সীমানায় নাথদোয়ারা-নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। গিরিরাজের উপরিস্থ মন্দিরটী ক্রমে ধ্বংস-দশায় পতিত হয়।

পর্ব্বতের নিম্নে যতীপুরা নামে একটী গ্রাম আছে এবং তথায় অনেকগুলি মন্দিরও অবস্থিত। তন্মধ্যে গোকুলনাথের একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে বৎসরে দুইটী উৎসব হইয়া থাকে ;—একটী গিরিরাজ-পূজা, অপরটি অন্নকূট-পূজা।

কার্ত্তিক-মাসই গোবর্দ্ধনের পরিক্রমার সময়। পরিক্রমার সীমা ৭ ক্রোশ। লোকে দণ্ডবৎ হইয়া পরিক্রমা করে। এই দণ্ডবতী পরিক্রমা এক সপ্তাহ হইতে এক পক্ষ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পরিক্রমাটী ধনাঢ্য-ব্যক্তির জন্য। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা স্বয়ং পরিক্রমা করে না। তাহারা ব্রাহ্মণ রাখিয়া পরিক্রমা করায়। ব্রাহ্মণগণকে ৫০৲ হইতে ১০০৲টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে পরিক্রমার ফল ধনাঢ্য-ব্যক্তির, ব্রাহ্মণের নহে।

গোবর্দ্ধন-সহরটী মানসী গঙ্গার তটে অবস্থিত। মানসী-গঙ্গা একটী পুষ্করিণীমাত্র। পুষ্করিণীর সংস্কার ভরতপুরের রাজগণ করিয়া থাকেন। মানসী গঙ্গার খনন-কর্ত্তা জয়পুরের রাজা মানসিংহ। ছয়মাস পুষ্করণীটী শুষ্ক থাকে। দীপ-মালিকার সময় যখন দীপ-দান করা হয়, তখন পুষ্করিণীতে জল থাকে। সহস্র সহস্র দীপে পরিশোভিত হইয়া ঘাটটি অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। প্রবাদ এইরূপ যে, মানসী-গঙ্গা-তটে দীপমালিকায় দীপদান করিলে ফল অধিক পাওয়া যায়। এই সময় মানসী গঙ্গার পরিক্রমাও হইয়া থাকে।

মানসী-গঙ্গার সন্নিকটে হরিদেবের বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। অম্বরের রাজা ভগবান্ দাস আক্‌বরের সময় ঐ মন্দিরটী নির্ম্মাণ করান্। মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দুইটী গ্রাম আছে, যাহাদের বাৎসরিক আয় ২৩০০৲ টাকা।

মানসীগঙ্গার বিপরীত দিকে দুইটী বাটী আছে। ভরতপুরের রাজা রণধীর সিংহ ও রাজা বলদেব সিংহের স্মরণার্থ উক্ত বাটীদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে।

সহরের একমাইল দূরে রাধাকুণ্ড-তটে একটী জাঁকাল বাটী দেখা যায়। সেটী জওয়াহীর সিংহের পিতা সুরজ মলের স্মারক। এই বাটীর দুইদিকের দুই সীমানা রাজার দুই রাণী হংসীয়া ও কিশোরীর নামে রাখা হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে একটী সুবৃহৎ উদ্যান আছে এবং তাহার সম্মুখে কুসুম-সরোবর নামে একটি সরোবর দৃষ্ট হয়।

গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির

আছে। এখানে চারিটী কুণ্ড অবস্থিত; যথা (১) গো-মোচন, (২) ধর্ম্ম-রোচন (৩) পাপ-মোচন এবং (৪) ঋণ-মোচন। বর্ষাকালে কুণ্ডগুলিতে সমান্ত জল থাকে এবং বৎসরের অন্যান্য সময় ইহারা শুষ্ক হইয়া যায়। পাহাড়টী ভাঙ্গিয়া গিয়া যে-স্থানে সহরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দান-ঘাট নামে খ্যাত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট হইতে দুগ্ধের কর লইয়াছিলেন।

হরিবংশে লিখিত আছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশের হর্য্যশ্বনামে এক নরপতি মধুদৈত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহাকে বিতাড়িত করিলে তিনি পলায়ন করিয়া শ্বশুরের নিকট গমন করেন। তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে সমস্ত রাজত্ব দান করেন; কেবলমাত্র স্বীয় পুত্র লবণের জন্য মধুবন-নামক রাজধানীটি রাখিয়া দেন। হর্য্যশ্ব গিরিবরের উপর রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া অনর্ত্তের রাজ্যকে সুদৃঢ় ও তাহাতে অনুপ-নামক দেশ যোগ করেন। হর্য্যশ্বের পুত্র ভীম। ইঁহার রাজত্ব-সময়ে রাম অযোধ্যার রাজা। তিনি লবণের দুর্গ মধুবনকে ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে মথুরা-নগর নির্ম্মাণ করিতে শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করেন। মথুরা নির্ম্মিত হইলে শত্রুঘ্ন চলিয়া যান। তখন ভীম মথুরা অধিকার করেন। তাঁহার সময় হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারী বসুদেব পর্য্যন্ত সহরটি ভোগ করেন। হরিবংশে যে শ্লোক আছে, তাহাতে গিরিবর-শব্দ পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, হর্য্যশ্বের রাজধানী গিরিরাজের উপর ছিল এবং অনুপ-দেশটি বর্ত্তমান ব্রজ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

গোকুল।

যমুনার উপকূলে ও মহাবন-তহসিলের পশ্চিমে গোকুল অবস্থিত। মহাবন হইতে গোকুল এক মাইল এবং মথুরা হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী। যদিও সহরটীর নাম গোকুল তথাপি ইহা আধুনিক বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা পুরাণে পাওয়া যায়, যদিও তাহা গোকুলে হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথাপি সে-গুলি মহাবনের,—গোকুলের নহে। ইহাতেই বোধ হয় যে, বর্ত্তমান গোকুল পুরাণের গোকুল নহে। গোকুলে অনেকগুলি মন্দির থাকিলেও তন্মধ্যে একটীও মনোজ্ঞ নহে। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দিরের নাম গোকুলনাথ, মদন-মোহন এবং বিঠলনাথ। বাকী মন্দিরের মধ্যে দ্বারিকানাথ, বালকৃষ্ণ এবং যোধপুরের রাজা বিজয় সিংহ নির্ম্মিত মহাদেবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। নামী মেলার মধ্যে ভাদ্র-মাসের জন্মাষ্টমীর মেলা, কার্ত্তিকীয় প্রতি-পদের অন্নকুটের মেলা, কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতে তৃণাবর্ত্তের মেলা প্রসিদ্ধ। সহরের প্রধান ফটকের নাম গণ্ডিপুরা দরবাজা। ইহা প্রস্তর-নির্ম্মিত। গোকুলের লোকসংখ্যা ৩৮৮০, তন্মধ্যে ১৯১০ স্ত্রীলোক। ৭৭ জন মুসলমান ব্যতীত সমস্ত লোকই হিন্দু। গোকুলে বল্লভ-সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। বল্লভাচার্য্যের সময় হইতে গোকুলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

নন্দগাঁও—বর্ষাণা।

দুইটি গ্রামই পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থিত।

দূরত্ব কেবলমাত্র চারি ক্রোশের। জি, আই, পি রেলের একটা ষ্টেশনও এখানে আছে। নন্দগ্রামটী বস্তুতঃপক্ষে নন্দের ছিল। বর্ষাণা বৃষভানুর গ্রাম। এই বৃষভানুর কন্যা রাধা। নন্দগ্রামের মন্দিরে কৃষ্ণ, বলদেব এবং নন্দ-যশোদার মূর্ত্তি আছে। গ্রামটী একটি ক্ষুদ্র টীলার উপর অবস্থিত। 'টীলা'টি হিন্দি শব্দ, উচ্চ স্থানকে বুঝায়। এই টীলার নিম্নে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি কুণ্ড আছে; তাহা পামরী-কুণ্ড নামে খ্যাত। বর্ষাণা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম—পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে লেডিলীজীর মন্দির অবস্থিত। এই সুবৃহৎ মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। ইহার নীচের এক মন্দিরে নন্দের, তাহার নীচের মন্দিরে বৃষভানুর পিতা মহাভানু ও তাঁহার পত্নীর, এবং তাহার নীচের মন্দিরে রাধার পিতা বৃষভানু ও মাতা কীর্ত্তিদা এবং তাঁহার কয়েক ভ্রাতার মূর্ত্তি অবস্থিত। গ্রামের বহির্ভাগে বৃষভানু কুণ্ড নামে একটি পাকা সরোবর আছে। যদিও কৃষ্ণ রাধিকার সময় হইতে সহস্রেরও অধিক বর্ষ অতীত হইয়াছে, তথাপি নন্দগ্রাম এবং বর্ষাণার লোক-জন শালা-সম্বন্ধী ভাবে আচরণ করে। ব্রজের এই প্রান্ত অত্যন্ত রম্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ-রূপে উক্ত আছে। দেবীভাগবতেও উক্ত বিষয়ের চর্চ্চা দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও রাধিকার জন্মবৃত্তান্ত আছে। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবৎ, মহাভারত, হরিবংশ এবং বিষ্ণু-পুরাণে রাধিকার উল্লেখও নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শুচিবায়ু।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী মানবধাতুর প্রধান উপাদান। এই তিনটীর সমতা থাকিলেই মানবের দেহ এবং মন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে। কিন্তু উক্ত তিন উপাদানের তারতম্য ঘটিলেই নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাহারা পিত্তপ্রধানধাতু, তাহারা প্রায়ই ক্রোধী ও খিট্‌খিটে হয়; যাহারা কফপ্রধানধাতু, তাহারা প্রায়ই অলসপ্রকৃতি বা জড়তাযুক্ত হইয়া থাকে; এবং যাহারা বায়ুপ্রধানধাতু, তাহারা উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই বায়ুপ্রধানধাতু মানবের মন বায়ুদ্বারা যে-পথে চালিত হয়, সে ভূতাবিষ্টের মত সেই পথের চরমসীমায় উপনীত হইয়া থাকে। সে পথটা কতদূর গর্হিত, তাহাতে যাওয়া উচিত কি না, বা তাহাতে অল্প এইটুকুমাত্র যাওয়া উচিত—এইরূপ একটা বিধি, নিয়ম বা শৃঙ্খলার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া বায়ু অতি প্রবলভাবে মনকে যদৃচ্ছ চালিত করে; তাহাতে যে-দিকেই মন ধাবিত হয়, সে-দিকেই ব্যক্তির এমন একটা ঝোঁক উপস্থিত হয় যে, কিছুতেই সে ঝোঁক রোধপ্রাপ্ত হইতে চাহে না।

বায়ু যখন প্রবল হইয়া মানবকে অন্যায় ও অস্বাভাবিক শুচিতার দিকে পরিচালিত করে, তখন তাহার নাম শুচিবায়ু। এই শুচিবায়ু প্রায় কোমলস্বভাবা, স্বভাবতঃই শুচিতাপ্রিয়া নারীদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কারণ,

জীবিকার্জ্জনের জন্য নানা কার্য্যে ব্যস্ত, নানা স্থানে ভ্রমণরত, প্রয়োজনব্যপদেশে নানা সংসর্গে পতিত নরদিগের শুচিতার প্রতি ততটা পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না, তাই শুচিবায়ু তাহাদিগকে কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু অন্তঃপুরনিবদ্ধ কুলবালাগণকে স্বভাবতঃ দুর্ব্বলপ্রকৃতি ও শুচিতাগতপ্রাণ দেখিয়া এই বায়ু তাহাদিগের কতিপয়ের স্কন্ধে এমনই চাপিয়া বসে যে, তাহাদিগকে ত সংসারের অনুপযোগিনী করিয়া তুলেই, এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের অত্যাচারে সংসারের যাবতীয় লোককেই নানাপ্রকারে অশান্তি ভোগ করিতে হয়।

এই বায়ুটী কেবল ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া বলিলেই হয়। কারণ, অন্য দেশের মানব শুচিতা লইয়া এতটা আলোচনা করে বলিয়া জানা নাই। এইজন্য এই প্রবন্ধে শুচিবায়ুর সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইবে, তাহা ভারতীয় বা বস্তুতঃ বঙ্গবাসিনী নারীর বিষয়েই বুঝিতে হইবে। এই শুচিবায়ু নারীদিগকে কিরূপভাবে নির্য্যাতিত করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও সকলকে কিরূপ ক্লেশপ্রদান করিয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

এই শুচিবায়ুগ্রস্ত নারীগণ অতিপ্রবলভাবে শুচিতা রক্ষা করিতে গিয়া অতিকদর্য্য অশুচিতার মধ্যেই আসিয়া পড়ে। তাহারা অশুচিতাস্পর্শভয়ে শিশুগণের পরিত্যক্ত মলমূত্রাদি অথবা গৃহের অশুচি আবর্জ্জনারাশি বা পরিত্যক্ত পরিধেয়বস্ত্রাদি যথাসময়ে পরিষ্কৃত বা প্রক্ষালিত না করিয়া একেবারে তাহারা যখন স্নানার্থ বা বস্ত্রপ্রক্ষালনার্থ জলাশয়ে যাইবে, সেই সময়পর্য্যন্ত গৃহে যেখানে যাহা অবস্থিত, ঠিক সেইরূপ ভাবেই রক্ষা করিয়া থাকে। সেই সমস্ত মলমূত্র ও আবর্জ্জনা হইতে একটা পূতিগন্ধ বাহির হইয়া গৃহকে একদণ্ড-বাসেরও অনুপযোগী করিলেও এই শুচিতাপক্ষপাতিনী রমণীরা সেগুলি স্থানান্তরিত না করিয়া সেই অপবিত্র বস্তুসকলের মধ্যে প্রেতিনীবৃন্দের মত শোভা পাইয়া থাকে। ইহা কতদূর আক্ষেপের বিষয়! ইহাতে গৃহস্থ অপরাপর ব্যক্তিসকলের যে অবিরত নাসিকায় বস্ত্রনিঃক্ষেপপূর্ব্বক বমন হইতে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া উৎকট কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহা নহে, সর্ব্বদা দুর্গন্ধ আবর্জ্জনার মধ্যে থাকিয়া বিবিধ পীড়াভোগ করাও তাহাদের দৈনন্দিন পদ্ধতি হইয়া পড়ে। শুচিতাগ্রস্ত নারীগণ যে সে-সকল পীড়া হইতে রক্ষা পায়, তাহাও নহে।

আরও একটা কথা। পাছে স্নান করিয়া আসিবার পর আবার গৃহে মলমূত্রাদি নূতন করিয়া সঞ্চিত হয়, এইজন্য শিশুগণের মলমূত্রত্যাগের অথবা অন্যান্য আবর্জ্জনা নিঃক্ষেপের শেষ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহারা একেবারে বেলা কাটাইয়া স্নানে গমন করিয়া থাকে। তাহাতে প্রত্যহ অতিরিক্ত বেলায় স্নান ও আহার করায় তাহাদিগের পিত্তপ্রকোপজনিত স্বাস্থ্যহানি ত ঘটেই, অধিকন্তু তাহাদের 'পিত্তপড়া' দুগ্ধ-পান করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুগণও যকৃৎ প্রভৃতির দুরারোগ্য রোগের কবলে পতিত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইয়া থাকে। কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশুই বা বলি কেন? ইহাদের

স্নানাদিতে বিলম্ব-নিবন্ধন গৃহের অপর সকলেরও অতিরিক্ত বেলায় আহার জুটিয়া থাকে। কারণ, অধিকাংশস্থলেই এই সমস্ত গৃহকর্ত্রীরাই ত রন্ধন-বিধাত্রী! সুতরাং তাহারা রন্ধন করিলে তবে অন্য সকলে খাইতে পাইবে! যদি স্নান করিতেই বেলা কাটিয়া গেল—তাহার পর 'রান্না',—তাহার পর 'খাওয়া'। সে ত অপরাহ্ণই হইয়া গেল! এই অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত 'দাঁতে দড়ি' দিয়া থাকা গৃহস্থ-সকলেরই একটা নিত্যকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ফলে সকলকেই পিত্ত-প্রকোপজনিত বিবিধ পীড়া ভোগ করিতে হয়।

এই আহারের বেলাতিবর্ত্তন ব্যতীত আর একটি কারণে শুচিবায়ুগ্রস্তা নারী এবং তাহার সংসার পীড়া ভোগ করিয়া থাকে। সেটি—অতিরিক্ত জলের সংস্পর্শ। ঈদৃশী রমণী স্থানান্তরে যাইতে যাইতে একটা অপবিত্র বস্তু মাড়াইল, অথবা পদদলিত বস্তু অপবিত্র না হইলেও অনবরত শুচিতা-নাশাশঙ্কায় তাহা অপবিত্র বলিয়া অনুমান করিল; হয়ত, স্নান করিয়াই ফিরিতেছিল,এই ঘটনায় আবার জলাশয় অভিমুখে গমনপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার স্নান করিল; অবোধ মার্জ্জারের মল হয়ত গৃহ-প্রাঙ্গণে গুপ্তভাবে ছিল, স্নানের পর কাপড় মেলাইয়া দিবার সময়, তাহা পদতল স্পর্শ করিল, অমনি সেই সিক্তবস্ত্র লইয়া পুনর্ব্বার স্নানার্থ তীর্থাভিমুখে সে গমন করিল; আহারাদির পর নিশ্চিন্ত মনে একটু বসিয়া আছে, এমন সময় রৌদ্রে প্রদত্ত বস্ত্রের উপর একটি পক্ষী পুরীষবর্জ্জন করিল, অমনি হতভাগ্য পক্ষীর উপর সমস্ত ক্রোধ ক্ষেপণ করিয়া শকুনির চতুর্দ্দশপুরুষের নাম করিতে করিতে সরোবরের দিকে ধাবিত হইল; দাসী-কর্ত্তৃক মার্জ্জিত ধাতব পাত্রগুলি ধুইয়া লইবার সময় স্বকীয় শুচিবাতোচিত অতিসূক্ষ্মদৃষ্টিতে উচ্ছিষ্টের ক্ষুদ্রকণা হয় ত কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইয়া বিষমক্রোধসহকারে 'দাসীর চক্ষুঃ দাসীকে খাওয়াইয়া' উচ্চৈঃস্বরে পল্লীদেশ বিদীর্ণ করিতে করিতে জলাশয়ে গিয়া সেই অপবিত্র ধাতব পাত্রগুলি পুনরায় স্বহস্তে মার্জ্জন করিল ও তদনন্তর তৎস্পর্শজনিত 'পাপের ক্ষালনজন্য অবগাহন-স্নান করিল। কখনও বা সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ঈদৃশী নারীর কর্ম্মক্লিষ্ট স্বামী অতিরিক্ত ক্লান্তিনিবন্ধন পত্নীর নিত্য আদেশ মত 'গঙ্গাজলস্পর্শ' করিতে ভুলিয়া গিয়া বিশ্রামার্থ ধৌতশয্যাতল স্পর্শ-করিবা-মাত্রই ক্ষণকালের জন্য সে স্বামিভক্তি ভুলিয়া গিয়া স্বামিদেবতাকে অতিকর্কশ ভর্ৎসনা করিতে করিতে রণচণ্ডীর মত সেই সমস্ত শয্যাভার জলাশয়ে বহন করিয়া লইয়া গিয়া সেই শয্যাগুলি সমস্ত একে একে প্রক্ষালিত করিল ও স্বামীর প্রতি বিষম ক্রোধে জলে সাতবার ডুব দিয়া গৃহে ফিরিল! ক্রীড়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত শিশুসন্তানটী মায়ের আদর পাইবার জন্য উল্লাসাতিশয্যে বা অনবধানতা-বশতঃ 'গঙ্গাজল-স্পর্শ' না করিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিবামাত্রই সন্তানের গঙ্গাজলের অস্পর্শরূপ অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি কয়েকটি চপেটাঘাতে তাহার আদরাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া তাহার "মুখ পোড়াইতে পোড়া-

হইতে” ও তাহাকে “সাতবার যমের বাড়ী পাঠাইতে পাঠাইতে” তীর্থাভিমুখে গমন করিয়া, পূর্ব্বে স্নাতা হইলেও পুনরায় স্নান করিয়া আসিলেন্। এইরূপ শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীর বারংবার অবগাহন নিত্যকার্য্য হইয়া উঠে। এই বারংবার জলস্পর্শের ফলে তাহার ও তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানের অবিরত পীড়া ভোগ করিতে হয়, এ-কথা বলাই বাহুল্য। এমন কি শরীরের অসুস্থতা-কালেও সে অভীপ্সিত জলাভিষেক হইতে নিবৃত্তা হয় না। উদরাময়-রোগে, যখন স্নান একেবারে নিষিদ্ধ, তখনও প্রতিশৌচকালেই সে স্নান করিয়া থাকে। তাহাতে তাহার পীড়া আরও বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। শুচিবায়ুগ্রস্ত জননীগণের বিবিধ অনিয়মে সন্তান-পালনে বিলক্ষণ অনিয়ম হইয়া পড়ে। তাহাদের সন্তানগণ খাইবার সময় খাইতে পায় না, পরিবার সময় পরিতে পায় না। খাওয়া-পরার জন্য তাহাদের একটা সাধ অভিলাষ ঘুচিয়া যায়—তাহারা সর্ব্বদাই ত্রস্ত মনে কর্কশভাষিণী শুচিবায়ুগ্রস্তা জননীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে! সন্তানেরা যতই শিশু হউক্ না কেন, অথবা পীড়িত থাকুক্ না কেন, এই সমস্ত নির্দ্দয় শুচিবয়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোকগণ তাহাদের একটু অশুচিতা-গন্ধ পাইলেই অথবা স্বকীয় বুদ্ধিতে তাহাদের অবাস্তব অশুচিতাকে বাস্তব রূপে অনুমান করিলেই, আর রক্ষা নাই! অমনি এক কলস জল তাহাদের মস্তকের উপর নিঃক্ষিপ্ত হইবে! ফলে পীড়া তাহাদের নিত্য-সঙ্গিনী হইয়া পড়ে!

এইরূপ শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীর স্বামীকে যদি কর্ত্তব্যাপদেশে সকাল্ সকাল কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হয়, তাহা হইলে মাসের অর্দ্ধেক দিন ত তাহার আহার জুটে না; জুটিলেও, গৃহে বিবিধ ভক্ষদ্রব্য থাকিলেও, তাহাকে কোনরূপে দগ্ধোদরপূর্ত্তি করিয়া যাইতে হয়, অথবা আহার জুটাইবার জন্য নিজেরই রন্ধন-ক্লেশ-ভার গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, স্বামীর আহার জুটিবে কি না জুটিবে, এই চিন্তা অপেক্ষা কিসে গৃহ-ত্যক্ত মলমূত্র নিঃশেষে পরিষ্কার করিয়া বহুঘণ্টাব্যাপী জলসেকেরদ্বারা শুচিতা প্রাপ্ত হইবে, ইহাই শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীর প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়ায়, সে স্নানাদি-সমাপন করিয়া স্বামীর গৃহ হইতে বহির্গমনের পূর্ব্বে কোনদিন আসিয়া উঠিতে পারে না; কাজেই স্বামীর সে দিন আহার জুটে না। কোন দিন যদি বা পূর্ব্বেই আসিয়া পড়ে, স্বামীর বাটী হইতে বাহির হইবার এরূপ পূর্ব্বে আসে, যে তন্মধ্যে আবশ্যক দ্রব্যগুলি রন্ধন করা অসাধ্য। কাজেই স্বামীকে ‘আধপেটা’ খাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হয়। সেইজন্য অন্যন্য মুখপ্রত্যাশী পরিশ্রমশীল স্বামিগণ তাদৃশী স্ত্রীর উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ংই রন্ধনের কার্য্য করিতে বাধ্য হন্। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদিগের একটা অনাবশ্যক পরিশ্রম-ভার ঘাঁড় পাতিয়া লইতে হয় ও তজ্জন্য অনর্থক কষ্ট-স্বীকার করিতে হয়।

এই শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীর স্বামী ও সন্তানগণ কখনও ভাল শয্যায় শয়ন করিতে পায় না। কারণ, নানা অশুচিতা-ব্যপদেশে শয্যা কেবলই প্রক্ষালিত হওয়ায় উহা প্রায়ই সিক্ত অবস্থায় থাকে। কখনও বা গৃহিণীর অশুচিতাশঙ্কায় ঐ শয্যা শুষ্ক থাকিলেও তাহাদের

স্পর্শের অযোগ্য থাকে। শয্যার চাদর ও বস্ত্রাবরণগুলি সর্ব্বদাই কোনও না কোন অশুচিতা-ব্যপদেশে প্রক্ষালনীয় হওয়ায়, তাহা শয্যাতলে বিস্তৃস্ত হইলেও উন্মুক্ত থাকা হেতু মৃতের শয্যার মত পড়িয়া থাকে। সে শয্যায় বিশ্রামলাভ করিতে কাহার অভিলাষ হইতে পারে? তাহাতে আবার দুর্গন্ধ থাকিলে ত কথাই নাই!

এতদ্ভিন্ন শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীকে অশুচিতার ভান করিয়া সংসারের অবশ্যকর্ত্তব্য বহুকার্য্য হইতে অনেক সময় বিরত হইতে দেখা যায়। তখন বোধ হয়, শুচিবায়ু আলস্যেরই একটা ব্যপদেশমাত্র। শুচিবায়ুগ্রস্তাকে যদি বলা হইল, "ওগো, এই কাজ কর", সে অমনি উত্তর দিবে, "আমি কেমন করিয়া করিব! আমার বস্ত্র যে এখন অমুকরূপ অশুচি আছে।" এইরূপ সংসারের অনেক কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সে নিশ্চিন্তমনে কালযাপন করে। তাহার কার্য্য না করার দরুণ সংসার যে কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, তাহা তাহার বোধের মধ্যে আসে না, বা সে আনয়ন করে না। মনে করুন, একটি সংসারে দুইটিমাত্র স্ত্রীলোক আছেন—গৃহিণী ও পুত্রবধূ। পুত্রবধূটি শুচিবায়ুগ্রস্তা। গৃহিণী রন্ধনকর্য্যে ব্যাপৃতা; গৃহের ছাদে কতকগুলি বস্ত্র শুষ্ক করিতে দেওয়া আছে। সেগুলি রৌদ্রে শুকাইয়াও গিয়াছে। এ-অবস্থায় আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া গৃহিণী পুত্রবধূকে বস্ত্রগুলি তুলিতে বলিলেন। পুত্রবধূ বলিল, "আমি এখন অমুক প্রকারের অশুচি অবস্থায় ধুতি-কাপড় ছুঁইব কিরূপে?" এবং এই বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিল। রন্ধনরতা গৃহিণীও ব্যস্ততার দরুণ সে গুলি তুলিতে পারিলেন না। ফলে এক পাশলা বৃষ্টি আসিয়া শুষ্ক বস্ত্রগুলি সিক্ত করিয়া দিল! সে দিন হয় ত, সকলকে এই সিক্ত বস্ত্রই পরিধান করিতে হইল!

আরও দেখা যায়, শুচিবায়ুগ্রস্ত নারীগণ শৌচব্যপদেশে নিজের ও পরিবারবর্গের যে অবিরত বস্ত্র-প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে সংসারে অনাবশ্যক বস্ত্র-বাহুল্যের প্রয়োজনীয়তা আসিয়া পড়ে। এই বস্ত্রকষ্টের দিনে কেবল গৃহিণীর খেয়ালেই স্বামীকে সংসারে অতিরিক্ত বস্ত্র সরবরাহ করিতে গিয়া অনর্থক ব্যয়াধিক্যের মধ্যে পড়িতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাদের শুচিবায়ু-নিবন্ধন সাংসারিক পীড়ার বিচ্ছেদ না থাকায়, চিকিৎসা-ব্যপদেশেও অনেক অর্থব্যয় আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সমস্ত অকারণ ব্যয়-বাহুল্যে হতভাগ্য গৃহস্বামী যে জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন, তাহাতে আর সংশয় কি?

এইরূপ শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীর অপ্রিয় দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্ব্বক মার্জ্জিতরুচি পাঠক-পাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি-সম্পাদন করিতে চাহি না। যাহা হউক, শুচিবায়ুগ্রস্তা নারী নিজেও সুখী নয়, পরকেও সুখী করিতে পারে না। তাহারা সংসারে একটা অসম্ভব শুচিতার আদর্শ পালন করিতে যাইয়া সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়, এবং তন্নিবন্ধন মনে একটা বিষম অসন্তোষভাব পোষণ করে; এবং বারংবার বস্ত্র-শয্যাদি প্রাক্ষলন ও জলাবগাহনরূপ অকারণ পরিশ্রমসাধ্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গকর কর্ম্ম স্বীকার করিয়া শীঘ্রই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে, এবং সংসারকে স্বমতে চালিত করিতে গিয়া

পদে পদে তাহাতে পীড়াদি নানারূপ অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। সর্ব্বদাই একটা অসন্তোষভাব ও স্বাস্থ্যহানির জন্ত তাহার মতিগতি স্থির থাকে না; এই জন্ত সে প্রায়ই ক্রোধশীলা, খিট্‌খিটে ও কর্কশভাষিণী হইয়া সকলের অপ্রিয়ভাবেই জীবন অতি বাহিত করে। শুচিতা ভাল। দৈহিক ও মানসিক শুচিতার ফলে মানব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। কিন্তু যে শুচিতার মূলে ধর্ম্ম অবজ্ঞাত, সন্তানের অপালন, স্বামি-শুশ্রূষার অভাব, রক্ষণীয় শরীরের পাতন, সেই বাহ্য শুচিতার অতিরিক্ত পালন-চেষ্টায় অন্তঃশুচিতার বিস্মরণ প্রভৃতি অধর্ম্ম দ্বারা তাহার প্রকৃত ধর্ম্ম ভাব বিদূরিত হয়। কাজেই ধর্ম্মহীন শুচিতাজ্ঞান ও পাকে চক্রে মলমূত্রাদি অশুচিদ্রব্য লইয়া কূপমণ্ডূকের মত অবিরত সময়যাপন তাহার ঘৃণিত অশুচিতাকেই সূচিত করে, সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীকে সংসারের কণ্টকস্বরূপ বলিলে ক্ষতি কি?

পরিশেষে বক্তব্য, এই শুচিবায়ু নারীগণ প্রায় স্বকীয়া জননীর নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতিশৈশব হইতে শুচিবায়ুগ্রস্তা জননীদেবর কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া তাহারা উহাতে এতই অভ্যস্ত হয় যে, ক্রমশঃ সেগুলি তাহাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। তখন বিবিধ চেষ্টাতেও সে অভ্যাস অপসারিত করা যায় না। তাই স্ত্রীসমাজকে এই বায়ু হইতে রক্ষা করিতে হইলে জননীগণের ইহার অনুপযোগিতা সর্ব্ব প্রথমে উপলব্ধি করা প্রয়োজনীয়।

আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতি এই ভ্রান্তিময় এবং সংসারের সর্ব্বথা অশান্তিকর কুপথ লইয়া ব্যাপৃতা থাকিলে, জীবনের সন্মার্গ অবলম্বনের অবকাশ পাইবে কখন্? এবং স্বকীয় সন্তানদিগকে সুপথে চালাইবেন্ই বা কিরূপে? আর জননীদিগের এই শুচিবায়ুদোষে যদি শত শত সন্তান অপালনহেতু অকালমৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে সমাজের পুষ্টিসাধনও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। এবং মানবসমাজের উন্নতি শক্তিস্বরূপা স্ত্রীজাতির উন্নতির উপর সর্ব্বদা নির্ভর করে বলিয়া, নারীগণের মধ্যে এই দোষের বাহুল্যে জাতীয় উন্নতিও সম্ভাবপর নহে।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-নিয়োগ।—রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের স্থলে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় ভাল হইয়াছে। কারণ, ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আলোচনা হইবে। সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই বিষয়ে সুমন্ত্রণা দিতে পারিবেন, আমরা এইরূপ আশা করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের

রেজিষ্ট্রার মিঃ হারটগ ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বৃত্তি-প্রাপ্ত বালিকাগণ।—নিম্নলিখিত বালিকাগণ এ-বৎসর মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২০৲ টাকার বৃত্তি।

সাবিত্রী দত্ত, ইডেন বালিকা হাই স্কুল, ঢাকা। (ইনি অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।)

মহিলাবৃত্তি—২০৲

নিরঞ্জন কুমারী বৈরাগী-ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা।

১৫৲ টাকা বৃত্তি।

সুধীরা, বসু ডায়োসেসন কলেজ; কণিকা গুপ্ত, বিদ্যাময়ী হাইস্কুল মৈমনসিংহ; উষাবালা দত্ত, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা; শোভারাণী ঘোষ, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা; শান্তিময়ী দে; ডায়োসেসন কলেজ; অপর্ণা সান্যাল, ব্রহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

১০৲ দশ টাকা বৃত্তি।

আশালতা দাসগুপ্তা, ইডেন হাইস্কুল ,ঢাকা; শান্তিবালা সেন, ব্রাহ্মবালিকা; হেমলতা বসু-ঐ; বাণী ঠাকুর—ডায়োসেসন; বীণাপাণি সিংহ, ব্রহ্মবালিকা; প্রকৃতি গুপ্তা—ঐ; কনকলতা চাটার্জ্জি—ইউনাইটেড মিশনরী হাইস্কুল; সুরুচি কুমারী দাসগুপ্তা—ঐ; জুলিকা ভানু—ডাওসেসন কলেজ।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতেপ্রকাশিত।

Reg. No. C [illegible]

৫৭ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

শ্রাবণ, ১৩২৭—আগষ্ট, ১৯২০।

সূচী

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 684. August, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৮৪ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২৭। আগষ্ট, ১৯২০। | ১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

সফল দান।

কোমল তব প্রীতির ডোরে
বেঁধেছ এই কঠিন প্রাণ;
নিলাজ শঠ কপট মোরে
সাজে কি এত প্রণয়-মান!
বচনে তব অমিয়-ধারা,
সোহাগ-মাখা নয়ন-তারা,
অকূল প্রেমে করিতে হারা
কত না তব চাতুরী ভান।
নিলাজ শঠ কপট মোরে
সাজে কি এত প্রণয়-মান;
শোধিব কিসে তোমার ঋণ,
আমি যে সখা, অতীব দীন;
সকল হিয়া তোমারে দিয়া
সফল কবে হইবে দান?
তৃষিত মম অলস আঁখি,
হাসিবে কবে আবেশে থাকি,
চরণ-রাগে পরাগ মাখি
জীবন গাবে অমর গান!

দরবেশ।

লীনার শিক্ষা।

(উপন্যাস)

(২)

উভয়ে ষ্টেশনে আসিয়া 'প্লাটফরমের' এক প্রান্তে একটা বেঞ্চির উপর বসিলেন। লীনার হাত হইতে খবরের কাগজখানা লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে ভাঁজ করিয়া, লীনাকে বাতাস করিতে করিতে পার্সন এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনাকে অত্যন্ত নিস্তেজ বোধ হচ্ছে, একটু চায়ের চেষ্টা দেখ্‌ব না-কি?"

সবিনয়ে লীনা বলিল, "ধন্যবান, ট্রেণের আর আট দশ মিনিট মাত্র বিলম্ব, এইটুকু সময় শান্ত হয়ে বিশ্রাম করলেই সুস্থ হব। দেখুন দেখুন, ও-দিকের প্লাটফরমে ঐ যে মহিলাটি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উনি কে বল্‌তে পারেন? ওঁকে প্রায়ই ওখানে দেখি।"

পার্সন নির্দ্দিষ্ট মহিলাটির দিকে চোখ ফিরাইয়া ভ্রূ কুচ্‌কাইয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "উনি কোন একটা থিয়েটারের অভিনেত্রী ছিলেন। শুনেছি, এখন উনি 'ভবঘুরের' জীবন যাপন কর্‌ছেন।"

কথাটা বলিয়াই পার্সন বই খুলিয়া, চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। অগত্যা লীনা চুপ করিয়া গেল। পার্সন বই পড়িতে পড়িতেই লীনাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। লীনা শ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া, একান্ত মনোযোগে সেই মহিলাটিকে দেখিতে লাগিল।

মহিলাটির আকৃতি বেশ লম্বা চওড়া। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইতে পঁত্রিশ ছত্রিশ, যাহা হউক একটা কিছু হইতে পারে। প্রচুর স্বাস্থ্যপুষ্ট নিটোল সুগোল মুখের উজ্জ্বল গোলাপী রং দেখিলে হঠাৎ তাঁহাকে খাঁটি ইংরেজকন্যা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু পিঠের উপর দোলায়মান কুচকুচে কালো চুলের বিনুনী এবং চোখের কালো তারা হইতে তাঁহার বর্ণসঙ্করত্বের প্রমাণ ধরা পড়িতেছে। মেয়েটির পরণে গোলাপী রং-এর ঘাগ্‌রা ও জামা, তাহার উপর বক্ষ হইতে আপাদ-লম্বিত শাদা লেশের Apron বা বস্ত্ররক্ষিণী; পায়ে বাহারে সৌখীন চটি জুতা। মাথায় টুপি বা ভেল কিছুই ছিল না। মেয়েটি অত্যন্ত গর্ব্বিত ভঙ্গীতে প্লাটফরমের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। হাতে জ্বলন্ত সিগার। মাঝে মাঝে এ-দিক্ ও-দিক্ গর্ব্ব-দৃপ্ত কটাক্ষ হানিতে হানিতে তিনি সিগারে প্রচণ্ড টান মারিতেছিলেন। দুই প্লাটফরমে ট্রেণের প্রতীক্ষায় অনেকগুলা দেশীয় লোক বসিয়াছিল। তাহারা অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া মেয়েটিকে,—কেহবা মেয়েটির আচরণ দেখিতেছিল।

অজ্ঞাতেই লীনার চোখে বিস্ময় এবং অসহিষ্ণুতার চিহ্ন ঘনাইয়া উঠিল।—হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিরক্ত স্বরে সে বলিয়া ফেলিল, "কি অদ্ভুত!"

পার্সন চমকিয়া বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কি সে?"

লীনা ভিতরে অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল।—ওই প্লাটফরম ভরা লোকগুলা তীব্র কৌতূ-

হলে যাহার সগর্ব্ব বিচরণ-ভঙ্গী ও সিগারেট-ভস্মলীলা দেখিতেছে, সে যে তাহারই মত একজন ফিরিঙ্গী-যুবতী, সে-তথ্যটা হঠাৎ মনে উদয় হইয়া এক মুহূর্ত্তে লীনার আত্মাভিমানে কঠোর লজ্জার কশাঘাত করিল! লীনা দমিয়া গেল! পার্সন যতই উচ্চ-প্রকৃতির সহৃদয়া ভদ্রমহিলা হউন,—তবু তিনি খাঁটি ইংরাজকন্যা; সে-পার্থক্য-বোধটা লীনায় অত্যন্ত রূঢ় ভাবে স্মরণ হইল। এই পার্সনের কাছে নিজের স্বজাতি একটি ফিরিঙ্গী-কন্যার আচরণ-ত্রুটির ফল অকপটে প্রকাশ করিবার অপমান-দুঃখ লীনা কিছুতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়! কিন্তু অসতর্ক হইয়া কথার সূত্রপাত যখন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ একটা কিছু দেওয়া চাই!......মাথা চুলকাইবার ছলে টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া লীনা মৃদুস্বরে বলিল, "কি অভদ্র-বর্ব্বর, এ দেশের ঐ অসভ্য মূর্খগুলা! জানোয়ারের মত নির্লজ্জ বর্ব্বর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে!"

পার্সন চাহিয়া দেখিলেন; উদাসভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন, "নিতান্তই কৃপার পাত্র ওরা! নারীজাতি-সম্বন্ধে ওদের শিষ্টাচার-বোধটা খুব চমৎকার সুন্দর!"—

পার্সন নিজের টুপিটা টানিয়া কপাল পর্য্যন্ত নামাইয়া দিয়া বইটা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। পরক্ষণেই কি একটা কথা মনে পড়ায়,—হঠাৎ চোখের সামনে হইতে বইখানা সরাইয়া লীনার মুখ-পানে চাহিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে বলিলেন, "তবে একটা সুবিধা আছে। সভ্যসমাজের কেতা-দুরস্ত, আলাপোৎসুক বন্ধুদের বিরক্তিকর আলাপ-চেষ্টার চেয়ে ওদের নীরব-অশিষ্টতা ঢের বেশী নিরাপদ্! বিলাত থেকে ভারতবর্ষে আস্বার সময়, জাহাজে গোটাকতক—অসহ্য-শিষ্টাচারী সহযাত্রীর ব্যবহারে আমাদের এত বেশী উত্যক্ত হয়ে উঠ্‌তে হয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গিনী একটি ভদ্রমহিলা শেষে বেত্র-ব্যবহার করে তাহাদের বাঁদ্‌রামীর উপদ্রব থামাতে বাধ্য করেছিলেন!"—কথাটা শেষ করিয়াই পার্সন ম্লান হাস্যে বইয়ের দিকে চোখ ফিরাইলেন। তঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

লীনার মুখও গম্ভীর হইয়া গেল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "অকপট অসভ্যতাই বলুন, আর কপট-সভ্যতাই বলুন, দুই-ই মানুষের অন্তর্নিহিত একই বর্ব্বরতার দ্বিধা-বিস্ফুরিত পরিচয়!—এক-ই শ্রেণীর, একই সামগ্রী!

দৃঢ়স্বরে পার্সন বলিলেন, "নিশ্চয়ই!—পাশবিক বর্ব্বরতা, ইউরোপের পোষাক পরেই আসুক, আমেরিকার পোষাক পরেই আসুক, আর এসিয়ার পোষাক পরেই আসুক,—মানুষের অনিষ্ট কর্‌তে, সকল বর্ব্বরতার শক্তিই সমান! বাইরের হিসাব থেকে আমরা উনিশ বিশ গণনা করি, আর যাই করি,—পৃথিবী অত্যাচার-পীড়িতা হচ্ছেন কিন্তু একই সমান ওজনে!"—

লীনা গুম্ হইয়া গেল। অনেক দিনের জানা, অনেক জনের সম্বন্ধীয় অনেক চিন্তা তাহার মনের উপর ঢেউ খেলিয়া গেল। সে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

ষ্টেশনের যাত্রীর চঞ্চল-কোলাহল চারি

দিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল,—"ঐ গাড়ী আসিতেছে।"

দুইজনে চকিত-নয়নে দূর মাঠের দিকে তাকাইলেন, সত্যই ট্রেন ছুটিয়া আসিতেছে! স্বচ্ছ আনন্দোজ্জ্বল নীল চক্ষু-দুইটি লীনার মুখের উপর স্থাপন করিয়া পার্সন প্রসন্ন-হাস্যে বলিলেন, "এইবার বন্ধু-দম্পতীর শুভ-সম্মিলন ব্যাপারকে আনন্দ-সঙ্গীতে অভিনন্দিত করে দেওয়া আমার উচিত! কিন্তু অত্যন্ত ভুল হয়ে গেছে,—আমি অনুতপ্ত হচ্ছি—।"

পার্সনের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লীনা সকৌতুক উৎসাহোচ্ছল-কণ্ঠে বলিল, "যে-হেতু এ-সব ক্ষেত্রে গাইবার উপযুক্ত একটা গানও আপনার জানা নাই!—কেমন, ঠিক নয়? পার্সন, এ-সব অনাবশ্যক উপসর্গকে আপনি যতই নির্দ্দয় তাচ্ছীল্যে নির্ম্মমভাবে অবহেলা করে চলুন, কিন্তু—"

পার্সন ব্যস্তভাবে বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ ঐ পর্য্যন্তই থাক্! 'মম'—এই মমতাটার উপর মায়া ছাড়াই নির্ম্মমতা। সেটা সইতে আমি রাজী আছি, কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের হাসি-কান্নায় আমি স্বার্থপর ঔদাস্য অবলম্বন করে নির্দ্দয় হয়ে যাব, এতটা সহ্যশক্তি আমার নাই! মাপ করুন্, লীনা, আগামী বারে বন্ধু-দম্পতীর মিলন-উৎসবে আমি গান শিখে প্রস্তুত হয়ে থাকব, আপনাদের অবাক্ করে দেবার জন্যে দস্তুর মত চেষ্টা করব!—"

"আচ্ছা, খুব ভাল! আমি তা হলে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করি।—ঐ যে আমার স্বামী!" প্লাটফরমে আগমন-শীল ট্রেণের একটা জানালার ফাঁকে অস্পষ্টদৃশ্য একটি চুরুট-ধারী পরিচিত মুখ দেখিতে পাইয়া, লীনা কথা বলিতে বলিতেই ব্যগ্র ও উৎফুল্ল ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেণ প্ল্যাটফরমে থামিতেই, সৌখীন ছাঁটের উজ্জ্বল সবুজ-রঙের পোষাক-পরা, সুন্দর-কান্তিশালী, খাঁটি ইংরেজযুবা পিকক্ সাহেব দুয়ার খুলিয়া নামিলেন। চাকরদের গাড়ী হইতে তাঁহার ভৃত্য পোষাকের ব্যাগ ও শিকারের বন্দুক প্রভৃতি ছোট খাট কতকগুলা মালপত্র নামাইয়া একটা কুলীর মাথায় চাপাইয়া, দূর হইতেই প্রভু ও প্রভু-পত্নীর উদ্দেশে নীরবে অভিবাদন করিয়া, বাসার দিকে চলিল। পিকক্ একশ বিরানব্বুই মাইল-দূরবর্ত্তী......শহরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের যোগ্য বিরাট গাম্ভীর্য্যপূর্ণমুখে অগ্রসর হইয়া, পত্নী ও পত্নীবন্ধু পার্সনের সহিত কেতাদুরুস্ত শিষ্টাচার-বিনিময়পর্ব্ব সমাধা করিলেন।

উত্তেজনা-চাঞ্চল্যে লীনার দুর্ব্বল বুক দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। আবেগের উচ্ছ্বাসে ব্যগ্র কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "আমার মারসী কেমন আছে, বেচারা মারসী?"

পার্সনের চোখ আড়াল করিবার জন্য চট্ করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া, লীনার মুখের দিকে চাহিয়া পিকক্ তীব্র ভ্রূকুটি করিলেন! লীনার মাথা ঘুরিয়া গেল,—ভয়ার্ত্ত হৃৎপিণ্ড ভীষণ বেগে স্পন্দন জুড়িয়া দিল! লীনা কাতরভাবে চোখ নামাইল। পিকক্ সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, ভস্মাবশেষ চুরুটটা ঠোঁট হইতে নামাইয়া, একটানে প্ল্যাটফরমের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া, ঘাড় সোজা করিয়া, প্রবল উদাস-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "ভালই

আছে, তার জন্যে অতটা ব্যস্ত না হ'লেও চলে।"

লীনা মরমে মরিয়া গেল! এই প্রচণ্ড রাশভারী মহামান্ত স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যতা যে লীনার এতটুকুও নাই, সেটা লীনা খুব জানিত। নিজের ন্যায়-অন্যায় লইয়া তর্ক-প্রতিবাদে বিরোধ বাধাইতে লীনা ভয় পাইত। কাজেই অকাতর সহিষ্ণুতায় নিঃশব্দে স্বামীর যত কিছু উগ্র বিরক্তিকর আচরণ তাহা পরিপাক করা ভিন্ন তাহার গতি ছিল না। ঘনিষ্ঠ পরিচিত পুরুষ-বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ লীনার অগাধ ধৈর্য্যটা আদর্শ পাতিব্রত্যের লক্ষণ বলিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ড্রয়িং রুম মুখরিত করিতেন, কেহ বা শুদ্ধ গম্ভীর থাকিতেন। মহিলা-বন্ধুরা প্রকাশ্যে নীরব থাকিতেন, কিন্তু আড়ালে স্বামীর অন্যায়-সংশোধনে উদাসীনতার জন্য লীনাকে কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ পত্নী বলিয়া নিন্দা করিতেন। অখ্যাতিগুলা লীনার কাণে মোটেই পৌঁছাইবার পথ পাইত না, কিন্তু সুখ্যাতিগুলা পৌঁছাইত। খুব প্রবলরূপেই নিজের সহিষ্ণুতা-সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড আত্মপ্রসাদ-গর্ব্বও যে লীনার অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন না ছিল,—তাহা নয়! কিন্তু স্বামীর দম্ভ উদ্ধত ব্যবহারের ধাক্কায় লীনার সে গর্ব্বের দশা মাঝে মাঝে বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত।

আজিও তাহাই দাঁড়াইল। বিশেষ করিয়া কুমারী বন্ধু—অল্পপরিচিতা পার্সনের সামনে এই রুক্ষ বাক্যগুলা যে কিছুতেই আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের পরিচায়ক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারা যাইবে না, সেই ক্ষোভটাই তাহার অন্তরে বেশী বাজিল। কিন্তু কিল খাইয়া, কিল চুরি না করিলে, তাহা নিষ্ঠুররূপে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। কাযেই নিরুৎসাহ, ম্লান মুখের বিবর্ণতা যথাসাধ্য গোপন করিবার জন্য জোর করিয়া মুখের উপর খানিকটা শুষ্ক হাসি টানিয়া কম্পিতস্বরে লীনা বলিল, "না, না, অস্থির হই নি, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ— ।"

রুক্ষভাবে ভ্রুকুটি করিয়া পিকক্ বলিলেন, "আমি ভুল বুঝ্‌ছি!—"কথাটা বলিয়াই পিকক্ কি ভাবিয়া কে জানে কণ্ঠস্বর সংযত করিলেন; পার্সনের দিকে চাহিয়া বক্রহাস্যে বলিলেন, "জানেন মিস্ পার্সন, দুর্ব্বল অন্তঃকরণ মেয়েদের মত মিথ্যাবাদী জীব আর দুনিয়ায় নাই!—"

পার্সন ভালমন্দ কোন উত্তর দিলেন না। শুধু দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে লীনার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, সে মুখ গভীর লজ্জা-বেদনায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে! পার্সন প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণরূপে চাপা দিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, "এখানকার ভিড়ে লীনা অসুস্থতা বোধ কর্‌ছেন্, বাড়ী যাওয়া যাক্, চলুন।"

"চলুন"—বলিয়া পিকক্ ডান হাতটা পিছনে ঘুরাইয়া বাঁ-হাতে গোঁফে তা লাগাইতে লাগাইতে পা বাড়াইলেন। লীনার হাত ধরিয়া পার্সন অগ্রসর হইলেন।

তাঁহারা দশ পা চলিতে না চলিতে ঘণ্টা বাজিয়া, বাঁশী ফুকারাইয়া ট্রেণ প্লাটফরম ছাড়িয়া, দূর মাঠের দিকে উধাও হইল। প্লাটফরম-দ্বয়ের মাঝের ব্যবধান ঘুচিল। ও-দিকের প্লাটফরমের দিকে চোখ পড়িতেই পিকক্ হঠাৎ একটা ছোট ঠোকর খাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন!—ঠিক্ তাঁহাদের সোজাসুজি ও-প্লাটফরমে তখন সেই ফিরিঙ্গি

যুবতী দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিকক্ দারুণ বিস্ময়-পূর্ণ চোখে অবাক্ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। লীনা ও পার্সন যে তাঁহার সঙ্গেই রহিয়াছে, সে-কথা তিনি যেন মুহূর্ত্তের জন্য সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গেলেন।

লীনা অন্যমনস্ক ভাবে মাথা হেঁট করিয়া চলিতেছিল; পিককের আচরণ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু পার্সন সকলই লক্ষ্য করিলেন। চকিতে দৃষ্টি তুলিয়া তিনি ফিরিঙ্গী-যুবতীর দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অস্বাভাবিক বিদ্বেষজ্বালা-ভরা চোখে তাঁহাদের দিকেই চাহিয়া আছেন! পার্সন আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেলেন।

হঠাৎ পার্সনের দিকে চোখ পড়িতেই, পিকক্ চোরের মত সন্ত্রস্তভাবে চোখ নামাইয়া দ্রুত হাঁটিতে সুরু করিলেন। দুই মুহূর্ত্ত পরে, ঘাড় বাঁকাইয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মাদ্রাজীর খবরের জন্য তুমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছুটে না এলেই ভাল করতে, লীনা! বাংলো পনের মিনিটের পথ, আমি ত এখুনি সেখানে গিয়ে পৌঁছিতুম। কেন কষ্ট করে এলে?"

স্বামীর সদয় সম্ভাষণে লীনার মনের ভার অনেকটা লঘু হইয়া গেল। ক্লান্ত-মলিন মুখে একটু স্ফূর্ত্তির হাসি ফুটাইয়া মধুর স্বরে উত্তর দিল, "শুধু মাদ্রাজীর খবরের জন্য নয়, আমার বৈকালিক ভ্রমণটা শেষ করবার দরকারও ছিল।"

পার্সনের শঙ্কা হইল, এই বুঝি পুত্র-স্নেহব্যাকুলা লীনার আত্মগোপন-চেষ্টার দুর্ব্বলতা লইয়া মিঃ পিকক্ আবার রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া রুখিয়া উঠেন্। পার্সন ইতঃপূর্ব্বে পিকক্‌কে দুই একবারের বেশী দেখেন নাই, এবং সে সময় পত্নীর উপর পিককের ব্যবহার খুব সদয় অনুগ্রহপূর্ণ-ই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মাঝেই সন্তানের কথা লইয়া লীনা কখনও একটু কাতরতা প্রকাশ করিলেই পিকক্ যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, সেটুকুও পার্সন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজ পিককের মেজাজটা গোড়া হইতেই পার্সন নেহাৎ একটু অস্বাভাবিক 'গরম' টের পাইতেছিলেন। তার উপর আবার সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গসূত্র! পার্সন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পিককের মুখ-পানে চাহিলেন,—এই সুরু হয় বুঝি!

কিন্তু পিকক্ কোন সাড়া শব্দ দিলেন না। লীনার কৈফিয়ৎ তাঁহার কাণে ঢুকিল কি না, বলা শক্ত, কিন্তু তিনি আর লীনার দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, অত্যন্ত উন্মনা ভাবে, চারিদিক্ চাহিতে চাহিতে চলিলেন। পিককের আকস্মিক অনমনস্কতার ঔদাস্যে লীনা বেচারা বেকসুর খালাস পাইল দেখিয়া পার্সন একদিকে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন, অন্য দিকে তেমনি একটা অদ্ভুত বিস্ময়ও অনুভব করিলেন,—গুপ্ত অন্তরে, খুব সঙ্গোপনে!

(৩)

ষ্টেশনের বাহিরে, লাল সুর্কি ঢালা পথ ধরিয়া তিনজনে বাংলোর দিকে চলিলেন। তিনজনেই নীরব। কিছু দূর আসিয়া একটা চৌমাথার মোড়ে পৌঁছিয়া পার্সন ডাইনের রাস্তার দিকে চাহিয়া, হঠাৎ ব্যস্তভাবে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া, লীনার হাত ছাড়িয়া সেই রাস্তার দিকে চলিলেন। লীনা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথায়?" চলিতে চলিতেই, মুখ

ফিরাইয়া পার্সন স্নিগ্ধ হাস্তে উত্তর দিলেন, "মাপ করুন, কিছু মনে কর্বেন না, ঐ ছেলে-গুলির সঙ্গে একটু দস্যিবৃত্তি কর্তে চল্লুম, ওরা ভয়ানক মারামারি সুরু করেছে! আপনারা এগিয়ে যান। আমার যেতে দেরী হবে বোধ হয়।"

ডাইনের গলি-রাস্তার শেষ সীমায় দুইটি ভিখারী বালক কি একটা টুক্‌রা খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি জুড়িয়াছিল। বড়টি ছোটকে ভূমে ফেলিয়া দিয়া খাবার ছিনাইয়া লইয়া মুখে পূরিয়া দিল, ছোট ধূলার উপর গড়াগড়ি দিয়া আকুল কান্নায় অস্থির হইয়া উঠিল! পার্সন হাঁ হাঁ করিয়া, ছুটিয়া গিয়া দুইজনের মাঝে পড়িলেন,—বড়টির কাণ ধরিয়া বেশ একটা মোলায়েম পাক লাগাইয়া, ভর্ৎসনা-বচন ঝাড়িতে ঝাড়িতে ছোটটীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। নিকটেই একটা খাবারের দোকান ছিল; পার্সনের ইঙ্গিতে দোকানদার একটা ঠোঙায় করিয়া কিছু খাবার আনিয়া ছেলেটির হাতে দিল। পার্সন দোকানদারের প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া রুমালে করিয়া ছেলেটির হাত মুখের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতেই—ছেলেটি সমস্ত শোকের কান্না ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ ধূলার উপরই খাবারের ঠোঙা নামাইয়া, বসিয়া পড়িয়া, দুইহাতে খাবার তুলিয়া ব্যাকুল আগ্রহে মুখে পূরিতে সুরু করিয়া দিল। তাহার কান্না-ভরা মুখ আনন্দের হাসিতে ভরিয়া উঠিল!—পার্সন সস্নেহে তাহার কোঁক্‌ড়ানো চুল-ভরা রুক্ষ মাথাটার উপর হাত বুলাইয়া দিতে দিতে প্রসন্ন দৃষ্টিতে, খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। বড় ভাই নিশ্চিহ্নরূপে তখন গা ঢাকা দিয়াছে।

ও-দিকে পিকক্ একটা চুরুট ধরাইবার জন্ম পথের অন্য পাশে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া, দেশালাইয়ে কাঠি ঠুকিতেছিলেন। লীনা একটু দাঁড়াইবার সুযোগ পাইয়া, একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, পার্সনের 'দস্যিবৃত্তি' দেখিতে লাগিল। বুভুক্ষিতের আগ্রহে ছেলেটির খাওয়া দেখিতে দেখিতে লীনার মনে পড়িয়া গেল—নিজের ছেলের কথা! করুণ-ব্যথায় লীনার মন ভরিয়া গেল! আহা, মার-কোল-হারা কচি-শিশু মারুদী! ধাত্রীদের বুকে কত অপর্য্যাপ্ত স্নেহ-ক্ষমা থাকিতে পারে যে, সেই ছোট শিশুর অসংখ্য ছোট উপদ্রব, অজস্র সেবা-প্রয়োজনীয়তার ভার সযত্নে বহন করিতে পারে? ধাত্রীরা কত মনোযোগ তাহার উপর রাখিতে পারে? সেও হয় ত ঐ গরীব বাছার মত ধূলার উপর হইতে যা তা জিনিষ কুড়াইয়া মুখে পুরে! আহা—হা, কত অযত্নই না জানি, তার হইয়া থাকে, হায়!

লীনার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। নীরব কাতর দৃষ্টিতে ভিখারী বালকের দিকে সে চাহিয়াই রহিল।

চুরুট ধরাইয়া পিকক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"কই, তিনি কোথায় গেলেন?

চমকিয়া লীনা বলিল, "কে পার্সন?—তিনি—?" লীনা বলিতে গিয়া সভয়ে থামিল। সদাশয় স্বামীর হৃদয়ের মহান্ মহানুভবতার পরিচয় জানিতে কিছুই লীনার বেশী বাকী নাই। পৃথিবীর অনেক কিছু ভালকে শাদা-চোখে দেখিবার বা সরলভাবে ভালবাসিবার ক্ষমতা তাঁহার কিছুমাত্র না থাকিলেও, পরের অনুষ্ঠিত সকল কিছু ব্যাপারকে নিজের খাম-খেয়ালী ইচ্ছা, খুসী, জেদের উপর নিরঙ্কুশ

প্রতাপে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিতে এবং অন্ধ বিচারে অসঙ্কোচে ঘৃণা প্রকাশ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। ভিখারীর ছেলে লইয়া পার্সনের এই বাড়াবাড়ি, পিকক্ যে কিছুমাত্র সন্তোষের দৃষ্টিতে দেখিবেন না, তাহাতে একবিন্দুও সন্দেহ ছিল না। লীনা পার্সনের পাগ্‌লামো সাফ্ চাপিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি গলির মোড় ছাড়িয়া আগাইয়া চলিতে সুরু দিয়া ঢোক গিলিয়া, সংক্ষেপে বলিল, "তিনি এই দিক্ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে গেলেন।"

"এই দিকে!"—বলিয়া ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া পিক্‌ক কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া এ-দিক্ ও-দিক্ তাকাইয়া থামিয়া গেলেন। সম্মুখ ও পিছন হইতে অনেকগুলি ইতর-ভদ্র পথিক আসিতেছিল। তাহাদের খাতিরে সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া, কেতা-মাফিক সভ্যতার প্রমাণ দেখাইবার জন্য, বাঁধা-দস্তুর সাহায্যের বুলি আওড়াইয়া লীনার দিকে গম্ভীর চালে তিনি হাত বাড়াইলেন। দুইজনে নীরবে চলিলেন।

কিছু দূরে আসিয়া একটা পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে দুইটি ছোট ছোট সুদৃশ্য বাংলো দেখিতে পাওয়া গেল। বাংলো-দুইটির একটায় লীনার আড্ডা, অপরটায় মিশনারী মেম-দুইজন থাকিতেন।

পাঁচিলের ফটক পার হইয়া হাতায় ঢুকিয়া লীনা শ্রান্তি-বিবশকণ্ঠে বলিল, "এইবার ভারী ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। আধ ঘণ্টা-টাক্ চুপ-চাপ পড়ে জিরিয়ে না নিলে আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারব না, মাপ করো। তুমি চা খেয়ে ততক্ষণ চুরুট নিয়ে বোসো, আমি ওষুধ খেয়ে শোবার ঘরে চল্লুম।—ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই আস্‌ব।"

অনাবশ্যক বিরক্তি-ঝাঁজ-ভরা তাচ্ছীল্যের স্বরে পিকক্ বলিলেন, "বেশ তো, যাও না। কে তোমায় বারণ কর্‌ছে?"

লীনা নীরবে একবার শুধু স্বামীর মুখ-পানে চাহিল, কোন কথা বলিল না; মাথা হেঁট করিয়া শ্রান্ত স্খলিত চরণে বাংলোর বারেণ্ডায় উঠিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া কণ্ঠস্বরে খুব জোর ঢালিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "চল, চায়ের টেবিলেই বসা যাক্! রোজ একলা চা খাওয়ার কষ্ট সইতে হয়, আজ সুযোগ ছাড়্‌লে বোকামো হবে। কি বল ডার্লিং?" স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া লীনা সহজভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

পিকক্ অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে বলিলেন, "পাঁচ মিনিট অন্তর মত পরিবর্ত্তন তোমার চিরদিনের অভ্যাস, সেটা খুব জানি; সেই জন্যেই তোমায় প্রশ্রয় দিই না।"

লঘুহাস্যে লীনা বলিল, "বড় দার্শনিকের লক্ষণই তাই! 'ভদ্রলোকের এক কথা'-প্রবাদ তাঁদের কাছে খাটে না, জানো তো? ....আয়া, আমার ওষধের শিশি চায়ের টেবিলে দিয়ে যাও।"

প্রভু-দম্পতির আগমনে, কুঠির খানসামা, বাবুর্চ্চি ও আয়া-দুইজন তটস্থ হইয়া সেলাম দিয়া ছুটাছুটি করিয়া নিজ নিজ কাজে লাগিল।

দুইজনে আসিয়া ড্রয়িং রুমে ঢুকিলেন। লীনার ঔষধের গ্লাশ ও শিশি লইয়া আয়া পরমুহূর্ত্তে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিল। লীনা টেবিলের একটু দূরে একটা খোলা জানালার

সামনে চেয়ার লইয়া বসিয়াছিল,—বোধ হয় হাওয়া পাইবার অভিপ্রায়ে; পিকক্ টেবিলের উপর কুনুয়ে ভর দিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া ভ্রুকুটি-বদ্ধনয়নে টেবিলের উপরকার জলন্ত সেজের আলোটার দিকে চাহিয়াছিলেন। দুইজনেই নীরব নিঝুম।

আয়া লীনার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে অন্য দুয়ার দিয়া লীনার কুঠির চাকর 'বয়' চায়ের সরঞ্জমে সাজানো ট্রে লইয়া ঘরে ঢুকিল। টেবিলের উপর ট্রে নামাইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া প্রশ্ন পূর্ণ দৃষ্টিতে সে লীনার দিকে চাহিল,—চা কি সে-ই পরিবেশন করিবে?

গ্লাসের ঔষধ মুখে ঢালিতে উদ্যতা লীনা হাত নাড়িয়া নীরব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। পিকক্ চোখ ফিরাইয়া লীনার নিষেধ ইঙ্গিত দেখিয়া মুহূর্ত্তে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"ঢাল্ তুই চা।"

উগ্রগন্ধ-ভরা, কটুস্বাদ ঔষধ মুখে ঢালিয়া লীনা গিলিতে ভুলিয়া গেল; নিষ্পলক-নয়নে স্বামীর দিকে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে অন্যদিকে চোখ ফিরাইল। কষ্টে ঔষধটা গলাধঃকরণ করিয়া, আয়ার হাতে গ্লাস ফিরাইয়া দিয়া, সে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। আয়া চলিয়া গেল।

'বয়' থতমত খাইয়া চট্ পট্ ক্ষিপ্র হস্তে কাপ গুছাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত-পরেই পিকক্ আবার, কি ভাবিয়া কে জানে, চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"দূর্ হ তুই, পাজী! তোকে চা কর্‌তে হবে না।" সঙ্গে সঙ্গে ঘড়্ ঘড়্-শব্দে চেয়ার সরাইয়া নিজেও উঠিয়া পড়িলেন; দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া নিজের অনুচর ভৃত্যকে ডাকিলেন, "জুম্মন্ জুম্মন্।"

ষ্টেশন হইতে মোট ঘাড়ে বহিয়া কুঠিতে পৌছিয়া জুম্মন সেইমাত্র হাত-পা ধুইয়া বাবুর্চ্চিখানায় তামাক খাইতে ঢুকিয়াছে। প্রভুর চীৎকারে তটস্থ হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল। প্রভু তাহার কান ধরিয়া এক ঝাঁকুনী লাগাইয়া ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কাঁহা গেঁা রাস্কেল, জল্‌দি টী বানাও।"

আদর্শ ভাল মানুষীর সহিত নিঃশব্দে কর্ণের জ্বালা পরিপাক করিয়া, ভৃত্য নিরুত্তরে ঘরে ঢুকিল। বয় তখন অন্যদিকের দুয়ারের পর্দ্দার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া ভীতিম্লান মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে;—আর লীনা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া উদাস করুণ দৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকার-ভরা জগৎ দেখিতেছে! গৃহ নিঃশব্দ।

'টী-পট' হইতে পেয়ালা-দুইটায় চা ঢালিয়া জুম্মন প্রভুর দিকে এক পাত্র সরাইয়া দিয়া জ্যাম্ বিস্কুট কেক্ ভরা পাত্রটা সসংকোচে প্রভুর ডান দিক্ হইতে বাঁ দিকে ঠেলিয়া আনিতে আনিতে লীনার দিকে চাহিয়া সসম্মানে বলিল, "মেম সা'ব্!"

লীনা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। চায়ের তৃষ্ণা যে তখন তাহার কণ্ঠ হইতে একেবারেই চলিয়া গিয়াছে, সে-সত্যটা মুখ ফুটিয়া বলিবার প্রচণ্ড ইচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। ভৃত্য চা লইয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে উদ্যত দেখিয়া বলিল, "থাক্, আমি টেবিলেই যাচ্ছি, তুমি যেতে পারো।"

টেবিলের কাছে লীনার জন্য চেয়ার সরাইয়া দিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। লীনা উঠিয়া গিয়া চেয়ারে বসিল। কিন্তু চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া এক চুমুক গ্রহণ করিয়াই বুঝিল, উহা তাহার পক্ষে অসহ্য-কড়া! বিনা-বাক্যে পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া, একটা বিস্কুট মুখে লইয়া কম্পিত হস্তে চামচে জ্যাম্ তুলিতে লাগিল।

পিকক্ ঘাড় গুজিয়া খাইতে খাইতে, হঠাৎ সবেগে মুখ তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "আচ্ছা মিস্ পার্সন যে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন? মিষ্টার ডব্‌সনের কুঠিতে নিশ্চয়?"

প্রশ্নটা কিছু দূষ্য নয়, কিন্তু স্বামীর প্রশ্নের ভঙ্গীতে হঠাৎ লীনা ভয়ঙ্কর চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত-কাল তাহার কথা বাহির হইল না, তাহার পর পাংশু মুখে জড়িত স্বরে সে বলিল, "ডব্‌সনের কুঠি? না, না,—কৃষক-পল্লীতে বোধ হয়—।"

পি। কৃষক-পল্লী? ফের মিথ্যে কথা? কক্ষণো না;—ঐ দিকেই ডব্‌সনের কুঠির রাস্তা—

লী। হাঁ, তা ঠিক্, কিন্তু মিসেস্ ক্রাউডেন্ কি মিঃ ডব্‌সন কেউ তো আজ কুঠিতে নাই—।

লীনার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে ডুবাইয়া সশব্দে জুতা ঠুকিয়া কঠোর গর্জ্জনে পিকক্ বলিলেন, "নেই? আবার মিথ্যে দিয়ে পার্সনকে ঢাক্‌বার চেষ্টা? ঘোর মিথ্যাবাদী তুমি! আচ্ছা, চল্লুম আমি, দেখি তারা কেমন কুঠিতে নেই!—"

লাফাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, রুমালে হাত মুছিতে মুছিতে, টুপিটা বগলে চাপিয়া পিকক্ তীরবেগে বাহির হইলেন। লীনা হতবুদ্ধি বিহ্বলের মত বসিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

"পথিক।"

(১)

আমি ওগো চলি কেবল চলি—
কোন্ দেশেতে ঘরখানি মোর
পন্থা তাহার দেয় না ত কেউ বলি!
সকাল থেকে কেবল হেঁটে হেঁটে,
সারা দিনটা যায় গো আমার কেটে,
রাস্তা যে হায়, ফুরায় নাক' তবু—
শ্রান্ত দেহ পড়্‌তে থাকে টলি!
—তবু আমি চলি কেবল চলি!—

(২)

সকল চলা করি আমার শেষ,
না জানি কোন্ শুভক্ষণে মিলিবে মোর দেশ!
প্রিয়া আমার সোহাগ-ভরে
তুলে নিবে হাতটী ধরে,
পুত্র-কন্যা দিবে আমার
সারা অঙ্গ ছেয়ে—
—কেবল চুমো খেয়ে।

সকল দুঃখ-সুখের মাঝে
তাদের বাঁশী কানে বাজে,
আঁধার হিয়া' পরে আমার
বুলায় স্বপ্ন-তুলি,
—তাই ত আমি চলি!—

(৩)

বর্ষা আসে ঝঞ্ঝা মাথায় করি,
ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগে
নগ্ন-দেহ উঠে গো থরহরি!—
আকাশ ভেঙ্গে নাম্‌তে থাকে জল—
ভিজে ভিজে হিম হয়ে যাই,
নাইক আমার নাই কিছু সম্বল!
পথের কাঁদা পায়ে মাখি,
আঁধার ঠেলে চল্‌তে থাকি,
দরদী কেউ নাইক হেথা—
কারে এ-সব বলি!
বিজন-পথে চলি কেবল চলি!—

(৪)

এম্‌নি করে কাটিয়ে দে'ছি
কত গ্রীষ্ম কত শীতের দিন!
পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে
তবু আমি চলি বিরাম-হীন!
বসন্তের ওই পাখীর গানে
মনটী আমার কোথায় টানে!
না জানি কোন্ মায়া-হরিণ
নিচ্ছে আমায় ছলি'!
—আমি ওগো চলি কেবল চলি!—

(৫)

কবে আমার নাম্‌বে বোঝা
লাঘব হবে ভার—
ঠিকানা নাই তার!
কোন্ অজানা পুরের পানে
ছুটি কেবল উধাও প্রাণে!
হয় ত ওগো হবে আমার
চলাই কেবল সার!
পাখীরা সব ফিরে নীড়ে,
বাতাস আজি বহে ধীরে—
শ্রান্ত-দেহে অস্ত-পারে
সূর্য্য পড়ে ঢলি—
—তবু আমি চলি কেবল চলি!—

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

জপজী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

* বখত ন পাইউ কাদিয়া—কাজিরাও সে সময় নিরূপণ করিতে পারেন্ নাই। যি লিখন লেখ কোরাণ—যাঁহারা কোরাণের লেখা লিখিয়াছেন্।

তিথি বার ন যোগী জানৈ—যোগী ব্যক্তিরাও সে তিথি সে বার জানেন না। রুতী মাহ্ না কোই=কেহই সে ঋতু, সে মাস জানেন্ না।

প্রশ্ন। তবে কে জানে, কখন্ সেই নিরাকার ব্রহ্ম এই সাকার জগতের সৃষ্টি করিলেন্?

উত্তর। যা করতা সিরঠিকউ সাজে—যিনি এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া সাজাইয়াছেন্।

আপে জানৈ সেই=তিনিই আপনি জানেন্, কোন্ সময় তিনি আপনাকে এই জগদ্রূপে সাজাইয়াছেন্।

কিব করি আখা—এমন মহান্ পরমেশ্বরের কথা ক্ষুদ্র মানুষ কি বলিবে? কিব সালাহী—সেই মহান পুরুষের স্তুতি করিবার মানুষের কি শক্তি আছে? কিউ বরণী—কি শক্তি আছে যে তাঁহার বর্ণনা করিব? কিব জানা—কি জ্ঞান আছে যে তাঁহাকে জানিতে পারিব? যথা শ্রুতি—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—যাঁহাকে মন এবং বাক্য জানিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

নানক—নানক বলিতেছেন। আখনি সভ্ কো আখৈ=তাঁহার কথা এক জনের নিকট শুনিয়া আর একজন বলে, এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানই চলিয়া আসিতেছে। ইক্ দু ইক্ সিয়াণ [illegible] নিকট আর এক শাস্ত্রকার শুনিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ একজনের নিকট হইতে আর একজনের জ্ঞানের উৎপত্তি।

বড্ডা সাহিব—সেই প্রভু মহান্। বড্ডী নাউ—তাঁহার নাম মহান্। কীতা যাকা হোবৈ—যাঁহারই এই সৃষ্টি।

নানক—নানক বলিতেছেন্। যেকো—যাহার। আপৌ জানৈ—অহংজ্ঞান আছে। অগৈ গয়া ন সোহৈ—সে ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পারে না।

তাৎপর্য্য।—ভগবান্‌কে ভক্তি করিতে না পারিলে, তীর্থসেবা, তপস্যা, দয়া, দান,—এ সকল কিছুরই দ্বারা মানুষ তরিতে পারে না; আবার হৃদয়ে ভক্তি পোষণ করিয়া ইহাদের যে কোনও একটি অল্পমাত্র অবলম্বন করিলেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। সেই মহান্ পুরুষ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সগুণ।—সগুণ ভাবে না দেখিলে ভক্তি লাভ হয় না। শাস্ত্রকারেরা যদি নির্গুণ ব্রহ্মের বিচার করিতে চেষ্টা করেন্, সদ্রূপ ব্রহ্ম কি-প্রকারে আপনাকে জগদ্রূপে প্রকাশ করিলেন—তাহার বিচার করিতে যান্, তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; কারণ, নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় ক্ষুদ্র মানব কি বলিবে? সগুণ ব্রহ্মের ধারণা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই পথ ব্যতীত ভক্তিলাভ হয় না। অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়কে ভক্তিতে মাখাইয়া সেই সগুণ ব্রহ্মের ভাবে আপনাকে ডুবাইতে হইবে।

পাতাল পাতাল লখ, আগাশ আগাশ। উড়ক উড়ক ভালি থকে বেদ কহনি ইক বাত ॥ সহস আঠারহ কহনি কতেবা, অসলু ইক ধাত। লেখা হোই তো লিখিয়ৈ, লেখৈ হোই বিনাশ ॥ নানক, বড়া আসিয়ৈ, আপে জানৈ আপ ॥

[পাতাল পাতাল লখ=লক্ষ লক্ষ পাতাল তাঁহার সৃষ্ট। সৃষ্টির অনন্তত্ব দেখাইতেছেন্। আগাশ আগাশ=আকাশেও অনন্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছেন্।

উড়ক উড়ক ভালি=উড়ক অর্থে অন্ত। ভালি অর্থে খুঁজিয়া। ঋষিমুনিগণ তাঁহার সৃষ্টির অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে। থকে—ক্লান্ত হইয়া যায়। বেদ কহনি ইক বাত—বেদও সেই এক কথা বলে!—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম =ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ।

সহস আঠারহ কহনি কতেবা—অষ্টাদশ পুরাণ এবং সহস্র সহস্র পুস্তকও এই কথাই

বলিয়া থাকে। অসলু ইক ধাত=এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মই সার পদার্থ। লেখা হোই তো লিখিয়ৈ—অনন্ত সৃষ্টির বিষয় লেখা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে লেখা হইত। লেখৈ হোই বিনাশ—সৃষ্টি-সংখ্যা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সংখ্যা নাই, অর্থাৎ সৃষ্টি অনন্ত।

নানক বড়া আখিয়ৈ—নানক বলিতেছেন, তাঁহাকেই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আপে জানৈ আপু=আপনার সৃষ্টির বিষয় তিনিই আপনি জানেন।]

অর্থ।—লক্ষ লক্ষ পাতাল তাঁহার সৃষ্ট; আকাশেও অনন্ত লোক তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন্। ঋষিমুনিগণ তাঁহার অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে ক্লান্ত হইয়া যান্। অষ্টাদশ পুরাণ এবং সহস্র সহস্র ধর্ম্ম-পুস্তক এই কথাই বলে যে, অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে সেই ব্রহ্মই সার পদার্থ। অনন্ত সৃষ্টির বিষয় লেখা সম্ভব হইলে লেখা যাইত, কিন্তু সংখ্যা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সংখ্যা নাই। নানক বলিতেছেন, তাঁহকেই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আপনার সৃষ্টির বিষয় তিনি অপনিই জানেন্॥

২৩

সালাহী সালাহি এতী সুরতি ন পাইয়া।
নদীয়া অতৈ বাহ্ পবহি সমুন্দন জানিয়হি॥
সমুন্দ সাহ সুলতান গিরহা সেতী মালধন।
কীড়ি তুলি ন হোবনী, যে তিস মহে্ন বিসরহি॥

[সালাহী=স্তুতি পাইবার যোগ্য যে পরমেশ্বর। সালাহি=স্তুতি করিব। এতী—এত। সুরতি—প্রেম। ন পাইয়া=নাই; অর্থাৎ কোথায় পাই? যিনি স্তুতি পাইবার যোগ্য এমন পরমেশ্বরের স্তুতি করিব, সে প্রেম কোথায়? নদীয়া অতৈ বাহ্ পবহি সমুন্দ—নদী-সকল বহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে। ন জানিয়হি=কিন্তু সমুদ্র যে কত বৃহৎ, নদী-সকল তাহা জানে না। মনুষ্য সেই মহান্ আত্মার মধ্যে বাস করিতেছে, কিন্তু জানে না যে সেই ব্রহ্ম কিরূপ অপরিমেয়! যে তিস্ মহে ন বিসরহি—যে সাধক সেই পরমেশ্বরকে মন হইতে বিস্মৃত হয় না, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রেম করে। সমুন্দ সাহ সুলতান=যাহার নিকট সমুদায় রাজা মহারাজ। গিরহা সেতী—রাজপ্রাসাদাস্থিত। মালধন=ধন-সম্পত্তি। কীড়ি তুলি ন হোবনী=কীটের তুল্যও বোধ হয় না; অর্থাৎ কীট অপেক্ষাও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।]

তাৎপর্য্য:—স্তুতি পাইবার যোগ্য যে পরমেশ্বর, তাঁহার স্তুতি করিব, এমন প্রেম কোথায়? নদী-সকল সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, কিন্তু তাহারা কি জানে যে সমুদ্র কি মহৎ বস্তু! যদি কোনও সাধক ভাগ্যগুণে তাঁহার প্রতি প্রেম লাভ করে ও তাঁহাকে মন হইতে বিস্মৃত না হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট রাজা, মহারাজ এবং তাহাদিগের রাজপ্রাসাদ ও ধনসম্পত্তি কীট হইতে ক্ষুদ্রতর কীটের ন্যায় তুচ্ছ মনে হয়।

২৪

অন্ত ন সিফতী, কহনি ন অন্ত।
অন্ত ন করণৈ, দেনি ন অন্ত॥
অন্ত ন বেখনি, সুননি ন অন্ত।
অন্ত ন জাপৈ, কিয়া মনি মন্ত॥
অন্ত ন জাপৈ, কীতা আকার।
অন্ত ন জাপৈ পারাবার॥

অন্ত কারণি কেতে বিললাহি।
তাকে অন্ত ন পায়ে যাহি॥
এহ অন্ত ন জানৈ কোই।
বহুতা কহিয়ৈ বহুতা হোই॥
বড্ডা সাহিব উচা থাউ।
উচে উপরি উচা নাউ॥
এ বড় উচা হোবৈ কোই।
তিস উচে কউ জানৈ সোই॥
যে বড় আপি জানৈ আপি আপি।
নানক, নদরী করমী দাতি॥

[অন্ত ন সিফতী—পরমেশ্বরের গুণগানের অন্ত নাই।

কহনি ন অন্ত=তাঁহার কথা বলিয়া শেষ হয় না।

অন্ত ন করণৈ—তাঁহার কার্য্যের অন্ত নাই।

দেনি ন অন্ত=তাঁহার দানের অন্ত নাই। অন্ত ন বেখনি= তাঁহার দৃষ্টির অন্ত নাই। শুননি ন অন্ত=তাঁহার শ্রবণের অন্ত নাই যথা গীতায়—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" সর্বত্র তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার পদ, সর্বত্র তাঁহার নেত্র, সর্বত্র তাঁহার মস্তক, সর্বত্র তাঁহার মুখ, সর্বত্র তাঁহার শ্রবণ; অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া সেই বস্তু বিরাজমান আছেন।

অন্ত ন জাপৈ=অন্ত জানা যায় না।

কিয়া মনি অন্ত—সেই পরমেশ্বরের অভিপ্রায় কি? অন্ত ন জাপৈ=অন্ত জানা যায় না। কীতা আকার=কি প্রকারে তিনি মায়াশক্তি-দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন্। অন্ত ন জাপৈ=অন্ত জানা যায় না। পারাবার=সেই পরাবর অর্থাৎ আদ্যন্তহীন পুরুষের।

অন্ত কারণ কেতে বিললাহি—অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই বলিয়া কত কত মুনিঋষি ব্যাকুল হইয়া থাকেন্।

তাকে অন্ত ন পায়ে যাহি—তাঁহার অন্ত পাওয়া যায় না।

এহ অন্ত ন জানৈ কোই—এই অনন্ত পুরুষের অন্ত কেহ জানে না।

বহুতা কহিয়ৈ বহুতা হোই=যদি তাঁহার কথা অনেক বলা যায়, তাহা হইলেও অনেক বলিবার বাকি থাকে।

বড্ডা সাহিব উচা থাউ=তিনি মহান্ দেবতা, তাঁহার স্থান অতিশয় উচ্চে। উচে উপরি উচা নাউ—তাঁহার নাম (অর্থাৎ ওঙ্কার) উচ্চ হইতেও উচ্চ। এ বড় উচা হোবৈ কোই=যদি কেহ তাঁহার ন্যায় বড় হয়। তিস্ উচে কউ জানৈ সোই=তবে ত সে সেই মহান্ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে।

যে বড় আপি জানৈ আপি আপি= তিনি যে মহান্ পরমেশ্বর, তিনি আপনাকে আপনিই জানেন্। নানক, নদরী করমী দাতি—নানক বলিতেছেন্, সেই পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে এবং সাধকের শুভকর্ম্ম-অনুযায়ী তিনি আপনাকে জানিবার শক্তি সাধককে দেন্।]

তাৎপর্য্য :—সেই পরমেশ্বরের গুণগানের অন্ত নাই, তাঁহার কথা বলিয়া শেষ হয় না। অনন্ত তাঁহার কার্য্য, অনন্ত তাঁহার দান, অনন্ত তাঁহার দৃষ্টি, অনন্ত তাঁহার শ্রবণ। তাঁহার ইচ্ছার অন্ত কেহ জানে না।

তাঁহার সৃষ্টির অন্ত কেহ জানে না; তিনি আদ্যন্তহীন পুরুষ। কত ঋষি-মুনি "অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর" বলিয়া ব্যাকুল। তাঁহার কথা যত বলিবে, তত আরও বলিতে বাকি থাকিবে। তিনি মহান্ দেবতা। তাঁহার নাম উচ্চ হইতেও উচ্চ। তাঁহার সমান কেহ হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে? নানক বলিতেছেন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হইলে এবং সাধকের পুণ্যফলে, ভগবান্ আপনাকে জানিবার শক্তি সাধককে দেন; তাহা হইলেই সাধক তাঁহাকে জানিতে পারে।

২৫

বহুতা করম লিখিয়া ন যাই।
বড়া দাতা তিল ন তমাই॥
কেতে মংগহি যোধ অপার।
কেতি অগণত নাহি বিচার॥
কেতে খপি তুটহি বেকার॥
কেতে লৈ লৈ মুকর পাহি।
কেতে মুরখ খাহি খাহি॥
কেতিয়া দুখ ভুখ সদমার।
এহিভি দাত তেরি দাতার॥
বন্দি খালাসী ভাণৈ হোই।
হোর আখি ন সকৈ কোই॥
যে কো খাইকু আখনি পাই।
উহ জাণৈ যেতিয়া মুহি খাই॥
আপে জাণৈ আপে দেই।
আখহি সেভি কেই কেই॥
যিস্‌নো বখসে সিফতি সালাহ্।
নানক পাতসাহী পাত সাহ॥

[বহুতা করম=ভগবানের অনন্ত কৃপা। লিখিয়া ন যাই=লিখিয়া শেষ হয় না। বড়া দাতা=মহান্ দাতা। তিল ন তমাই=তাঁহাতে তিলমাত্র তমঃ বা অহঙ্কার নাই যে "এত দিতেছি।"

কেতিয়া মাংগহি যোধ অপার=কত যোদ্ধা কতই বাসনা করিয়া তোমার নিকট চাহিতেছে। কেতি অগণত নাহি বিচার=সংসারে ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, প্রভৃতি কত কত ব্যক্তি চাহিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই এবং ইয়ত্তাও করা যায় না।

কেতে খপি তুটহি বেকার=কত ব্যক্তি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া বৃথা জীবন হারাইতেছে। কেতে লৈ লৈ মুকর পাহি=কত ব্যক্তি লইতেছে, আবার অস্বীকার করিতেছে।

কেতে মুরখ খাহি খাহি=কত কত মূর্খ কেবল খাইয়াই যাইতেছে। কেতিয়া দুখ ভুখ সদমার=কত কত দুঃখী ব্যক্তি আবার ক্ষুধাতে মৃতপ্রায় হইতেছে।

এহিভি দাত তেরি দাতার=হে প্রভো! মানুষের যে এই সকল দুঃখ, ইহাও তোমার দান; কারণ, কর্ম্মফল-প্রদাতা তুমিই।

বন্দী খালাসী ভাণৈ হোই=বন্ধন এবং মোক্ষ তোমারই ইচ্ছায় হইয়া থাকে। হোর আখি ন সকৈ কোই=আরও যে কত তোমার দান, তাহা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না।

যে কো খাইকু আখনি পাই=যে তাঁহার দান পাইয়া অস্বীকার করে। উহ জাণৈ যেতিয়া মুহি খাই=সে জানিবে, তাহার মুখে কিরূপ আঘাত লাগে। আপে জাণৈ আপে দেই=তিনি আপনিই জানেন্ যাহা তিনি দিতেছেন। আখহি সেভি কেই কেই=কেহ কেহ তাহাও বলিয়া থাকেন্।

বিসনো বখসে সিকতি সালাহ্—যাঁহার প্রতি তিনি কৃপা করিয়া প্রশংসা এবং স্তুতি প্রদান করেন্।

নানক,পাতসাহী পাত সাহ্=নানক বলিতেছেন্, তিনিই রাজরাজেশ্বর হন্।]

অর্থ:—ভগবানের অনন্ত কৃপা লিখিয়া শেষ হয় না। মহান্ দাতা, তিলমাত্র তাঁহাতে অহঙ্কার নাই যে, 'এত দিতেছি।' কত কত যোদ্ধা কতই বাসনা করিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। সংসারের ধন-রত্ন-স্ত্রী-পুত্রাদি কত কত ব্যক্তি চাহিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত ব্যক্তি ভগবানের নিকট পাইতেছে আবার তাহা অস্বীকার করিতেছে। কত কত মূর্খ কেবল খাইয়াই যাইতেছে। আবার কত কত ব্যক্তি ক্ষুধাতে মৃতপ্রায় হইতেছে। হে প্রভো! মানুষের যে এই সকল দুঃখ, ইহাও তোমার দান; কারণ, কর্ম্মফল-প্রদাতা তুমিই। বন্ধন এবং মোক্ষ তোমারই ইচ্ছায় হইয়া থাকে। আরও যে কত তোমার দান, তাহা বলিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। যে তাঁহার দান পাইয়া অস্বীকার করে, সে জানিতে পারিবে তাহার মুখে কিরূপ আঘাত লাগে। তিনি আপনিই জানেন্. যাহা তিনি দিতেছেন্। কেহ কেহ তাঁহার দানের কথা কিছু কিছু বলিয়া থাকেন্। যাঁহার প্রতি তিনি কৃপা করিয়া প্রশংসা ও স্তুতি প্রদান করেন্, নানক বলিতেছেন্, তিনিই রাজরাজেশ্বর হ'ন্।

২৬

অমূল গুণ অমূল ব্যাপার।
অমূল বাপারিয়ে অমূল ভণ্ডার।
অমূল আবহি অমূল লৈ যাহি।
অমূল ভাই অমূল সমাহি॥
অমূল ধর্ম্ম অমূল দিবাণ্।
অমূল তুল্ অমূল পরবাণ্॥
অমূল বখ্ শিস্ অমূল নিশামু।
অমূল কর্ম্ম অমূল ফুরমাণ্॥
অমূলো অমূল আসিয়া ন যাই।
আসি আসি রহে লিবালায়॥
আথহি বেদ পাঠ পুরাণ।
আথহি পঢ়হি করহি বখ্যান॥
আথহি বরমে আথহি ইন্দ।
আথহি গোপী তে গোবিন্দ॥
আথহি ঈশ্বর আথহি সিদ্ধ।
আথহি কেতে কেতে বুদ্ধ॥
আসহি দানব আথহি দেব।
আথহি সুরি নর মুনিজন সেব।
কেতে আথহি আখন পাহি।
কেতে কহি কহি উঠি উঠি যাহি॥
এতে কেতে হোর করেহি।
তা আখি ন সকহি কেই কেই॥
যে বড় ভাবৈ তে বড় হোই।
নানক জানৈ সাচা সোই॥
যে কো আখৈ বোলু বিগাড়ু।
তা লিসিউ সির গাবার গাবারু॥

অর্থ। সেই পরমেশ্বরের দয়া প্রভৃতি গুণ অলৌকিক এবং সৃষ্টি-প্রলয়াদি ব্যাপারও অলৌকিক। তাঁহার নামের ব্যাপারি অর্থাৎ ভক্তজন অলৌকিক, এবং ভক্তজনের হরিনামের ভাণ্ডারও অলৌকিক। জীব-উদ্ধারের জন্য তাঁহার ভক্তজনের সংসারে আসা অলৌকিক। তাঁহার ভক্তগণ এই সংসার হইতে ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম-রূপ অমূল্য পদার্থ লইয়া

যান। ভগবানের প্রতি প্রেম অমূল্য বস্তু; এই প্রেম-দ্বারা অমূল্য সমাধি লাভ হয়। বেদ প্রভৃতিতে তিনি অমূল্য ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আবার আমাদের উদ্ধারের জন্য অমূল্য আচার্য্য ও ঋষিগণের সহিত মিলাইয়াছেন। সেই আচার্য্যগণের অমূল্য বুদ্ধিরূপ তুলাযন্ত্রে অধিকারী নির্ণয় করিয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহাও অমূল্য। আচার্য্যগণ শিষ্যকে অমূল্য বস্তু লাভ করাইয়াছেন্। তাঁহাদের চিহ্ন অলৌকিক। তাঁহাদের কার্য্য অলৌকিক। তাঁহাদের আদেশও অলৌকিক। মহাত্মাদের ব্যাপার সকলই অলৌকিক; তাহা বিবৃত করা যায় না। তাঁহারা ভগবানের গুণ গাহিতে গাহিতে প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যান্। বেদ আপনার মন্ত্র-দ্বারা এবং পুরাণ ইতিহাস-দ্বারা ভগবানের স্তুতি করিতেছে। সাধকগণ বেদ-পুরাণ পাঠ করিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া ভগবানের স্তুতি করিতেছেন্। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র সেই পরমেশ্বরের স্তুতি করিতেছেন্। গোবিন্দের গোপ-গোপিনীগণ তাঁহারই স্তুতি করিতেছেন্। শিব তাঁহার স্তুতি করেন্; সিদ্ধ মুনিগণ তাঁহারই স্তুতি গান করেন। কত কত বুদ্ধ তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন্। দেবতা এবং দানবগণ তাঁহারই স্তুতি করেন্। দেবতা, মনুষ্য, মুনি এবং উপাসকগণ তাঁহারই স্তুতি করেন্। কত কত ব্যক্তি এখন তাঁহার স্তুতি করিতেছে এবং কত কত ব্যক্তি ভবিষ্যতে তাঁহার স্তুতি করিবেন্। কত কত সাধক তাঁহার স্তুতি করিয়া উত্তম লোকে চলিয়া গিয়াছেন্। কত লোক তাঁহার স্তুতি করিয়াছে এবং কত অসংখ্য লোক তাঁহার স্তুতি করিবে। কিন্তু তাঁহার স্তুতির অন্ত কেহ করিতে পারিবে না। যত অধিক তাঁহার স্তুতি করা হইবে, তিনি তাহা হইতেও মহত্তর হন্। নানক বলিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপ নিজেই নিজের স্তুতির অর্থ জানেন্। যদি কেহ বলে যে, তাঁহার স্তুতির অন্ত সে জানে, এমন কথা তাহার অনিষ্টেরই মূল। যে তাঁহার মহিমার অন্ত নির্ণয় করিতে যায়, তাহার বুদ্ধি মূর্খ হইতেও মূর্খতরের ন্যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

ধ্বনি।

যে সুর বঁধু, বাজিয়েছিলে
　　সান্ধ্য ক্ষণে
সে সুর আজি এই নিখিলে
　　সঙ্গোপনে—
ফুটায় চারু চাঁদের হাসি,
ফুটায় ওগো কদম-রাশি,
জাগায় কথা—'ভালবাসি'
　　হৃদয়-মনে!

হাওয়ায় তব নিশ্বাস মিশে
　　হরষ-মাখা,
অম্বরে শ্যাম-হৃদয় দিশে
　　চির আঁকা!
বিচিত্র হে, গোপন থাকি'
বাঁধবে প্রাণে সুরের রাখী?
পাগ্‌লা হয়ে ছুটব না-কি
　　গহন বনে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝুলন-গীতি।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—দাদ্‌রা।

আভীর-বধু, আভীর-বালা,
ঝুল্‌বি আয়!
আপ্‌নি কালা নাগরদোলা
আজ দোলায়!

শাঙণ-ঘন গগন ঘিরে
থাকেই যদি, ভাবিস্‌ কি রে—
নাচ্‌ছে শিখী পেখম ধরে
তমাল-ছায়!

মদির বায় অধীর করে,
কদম কেয়া সুবাস হরে—
কাণুর বেণু মোহন সুরে
মন মাতায়॥

রচয়িতা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

II { রা মাঃ -রঃ | মা পা -া I না নাঃ -র্সঃ | র্সা র্সা -া I
আ ভী র ব ধু ০ আ ভী র বা লা ০

I নাঃ -র্রঃ র্সা | পা -া -া } I
ঝু ল্ বি আ য় ০

I { মাঃ -পঃ মা | রা সা -া I রা মা -পা | না র্সা -া I
আ প্ নি কা লা ০ না গ র দো লা ০

I নাঃ -র্রঃ না | র্সা -া -া } II
আ জ দো লা য় ০

অন্তরা।

১´ ০ ১´ ০
II { মা পা -া | না না -া I র্সা র্সাঃ -র্রঃ | না র্সা -া I
শা ঙ ণ ঘ ন ০ গ গ ন ঘি রে ০

১´ ০ ১´ ০
I না র্সাঃ -র্রঃ | র্মা র্রা -া I র্সা র্রাঃ -র্সাঃ | না পা -া} I
থা কে ই য দি ০ ভা বি ন্ কি রে ০

১´ ০ ১´ ০
I { মাঃ -ঃ পা | না পা -া I মা পা -মা | রা রা -া I
না চ্ ছে শি খী ০ পে খ ম্ ধ রে ০

১´ ০
I সা রা -ন্া | সা -া -া} II
ত মা ল ছা য় ০

সঞ্চারী।

১´ ০ ১´ ০
II { সা রাঃ -ঃ | ন্া সা -া I প্া ন্াঃ -ঃ | সা রা -া I
ম দি র বা য় ০ অ ধী র ক রে ০

১´ ০ ১´ ০
I মা রাঃ -ঃ | মা পা -া I মা রাঃ -মঃ | রা সা -া} I
ক দ ম কে য়া ০ সু বা স হ রে ০

১´ ০ ১´ ০
I { মা পাঃ -ঃ | না র্সা -া I র্রা র্মাঃ -র্রঃ | র্সা র্সা -া I
কা নু র বে ণু ০ মো হ ন সু রে ০

১´ ০
I নাঃ -র্সঃ না | পা -া -া} II II
ম ন মা তা য় ০

জাহাজ-ডুবি।

(৪)

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। রৌদ্রতপ্তা ধরণী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। দূর বৃক্ষরাজি হইতে ঘুঘুর করুণ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা কাক "কা কা"-রবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে শ্রান্তক্লান্ত ভাবে হাঁ করিয়া গৃহপ্রাচীরে বা বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইতেছিল। উচ্চ বৃক্ষশাখায় বসিয়া চাতক 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' বলিয়া করুণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু নির্দ্দয় জলধর তাহার পিপাসা-নিবৃত্তির কোন ব্যবস্থাই করিল না! জগতের নিয়মই এই। ভিক্ষুর কাতর প্রার্থনায় ধনী বধির হইয়া থাকে। ধনীর দ্বারে কেবল 'দাও' 'দাও' করা বাতুলতামাত্র। এ সময়ে পল্লী-পথে লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ। দৈবাৎ দুই একটা দুরন্ত বালক আম-তলায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল, এবং ঢিল ছুড়িয়া কাঁচা আম পাড়িয়া ভক্ষণ করিতেছিল; আবার পরস্পর বিবাদ বাঁধাইয়া শেষে হাতা-হাতি পর্য্যন্ত করিতেছিল। যে হারিয়া গেল সে কাঁদিতে কাঁদিতে "বাড়ী গিয়ে মাকে বলে দিইগে" বলিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিতেছিল। এই সময়ে আমাদের অমরকুমার একখানা 'শোফা'র উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন্। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আশালতা একখানা রঘুবংশ পাঠ করিতেছিল। অমরকুমার নিবিষ্টচিত্তে তাহা শুনিতেছিলেন, এবং যেখানে যেখানে বাধিয়া যাইতেছিল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া আশালতাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। গ্রীষ্মাতিশয্য-হেতু কক্ষের বাতায়নগুলি সমস্তই রুদ্ধ কিন্তু সিক্ত খস্‌খসের আবরণে কক্ষটি বেশ স্নিগ্ধ ছিল। বারান্দায় বসিয়া জনৈক ভৃত্য টানাপাখার দড়ী ধরিয়া পাখা টানিতেছিল। মাঝে মাঝে অমরকুমার অন্যমনে কি চিন্তাও করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়ভৃত্য কানাই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আনত হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল। অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, খবর কি?"

কা। আজ্ঞে বাইরে একজন লোক এসে আপনাকে খুঁজ্‌চে।

অ। আমাকে?

কা। আজ্ঞে হ্যাঁ!

অ। কি রকম লোক? ভদ্রলোক?

কানাই একবার উপর দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, 'আজ্ঞে তা আমি বল্‌তে পারব না!"

অমরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "বল্‌তে পার্‌বি না কি রে?"

কানাই বলিল, "তা আমি কেমন করে বলবো?"

আশালতা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুই দেখে এলি, তুই বল্‌তে পার্‌বি না, ত' কি আমি বলব? ভদ্দর লোক কি, ছোট লোক এটা আর চিনিস্ না?"

কানাই বলিল, "মাগো, তাকে দেখে চেনা আমার বাবারও সাধ্যি নেই!"

কানাইয়ের হাত মুখ নাড়া দেখিয়া আশালতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

অমরকুমার সহাস্যে বলিলেন, "কেন বল দেখি?"

কানাই পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "কি দেখে চিনব, বলুন? চেহারা?—পোষাক? না কথায়? গায়ের রংটা তো তার আমার চেয়েও একপোঁচ কাল বার্ণিশ করা, চোখ দুটো রাঙ্গা জবার মতন টক্ টক্ কচ্ছে, মাথার চুলগুলো আংড়ুল সহিসের মতন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় মূলোর মতন দাঁত। চিম্‌ড়ে হাড়গুলো জির্ জির্ করছে। মুখময় বসন্তের দাগ। এই তো গেল চেহারা। তারপর পোষাক।—গায়ে একটা আধময়লা জামা, কাপড়-খানা কালো চিরকুট; উড়ুনি-খানা কিন্তু ধপ্ ধপে ফর্সা; পায়ে একজোড়া ছেঁড়া শতেক তালি দেওয়া জুতোও আছে। বাবু বুক ফুলিয়ে মস্ মস করে বৈটকখানায় বসে পড়্‌ল! আমি তো প্রথমে মনে করেছিলুম, বুঝি, পাগল ফাগল হবে! তারপর তার কথা শুনেই তো আক্কেল গুড়ুম! ব্যাটা যেন লাটসাহেব! চেয়ারে বসে মুরুব্বি-আনা চালে আপনার নাম করে বল্লে-'বাড়ীতে আছে?' আমি বল্লুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন!" উত্তর হল, তাকে একবার ডেকে দে! সেই হুকুম নিয়েই ত ছুটে আস্‌ছি, এখন আপনিই বিবেচনা করুন, সে কি রকম লোক?"

অমরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "ব্যাটা আমার গোপাল ভাঁড়! হাসিয়ে হাসিয়ে মারলে! দেখি, লোকটা কে এল, কি বলে।" বলিয়া তিনি বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন; গিয়া দেখিলেন কানায়ের বর্ণিত লোকটী ভদ্র লোক কি না অমরকুমারই চিনিতে সমর্থ নহেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কি বলিয়া তিনি লোকটিকে সম্বোধন করিবেন, তাহা হঠাৎ খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কক্ষমধ্যে নির্ব্বাগ্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আগন্তুকই আগে কথা কহিল। সে তাহার কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য নম্র করিয়া বলিল, "আপনিই কি জমীদার উপেন্দ্র-কিশোরবাবুর পালক পুত্র অমর কুমার?" এই শিষ্টাচার-রহিত নীতিবিরুদ্ধ প্রথম আলাপে অমরকুমার কিছু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি সে—ভাব প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র বলিলেন, "হ্যাঁ"। আগন্তুক এক-খানা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, "বসুন্, আপনার সঙ্গে কথা আছে।" অমরকুমার কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া তাহার নির্দ্দেশ মত চেয়ারে বসিয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহি-লেন। আগন্তুক পকেট হইতে একখানা সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া একটা বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ দেখাইয়া বলিল, "আপনিই কি এই বিজ্ঞপন দিয়েছিলেন?" অমরকুমার বলি-লেন, 'হ্যাঁ।" আগন্তুক কাগজখানা পাট করিয়া পূর্ব্ববত পকেটে রাখিয়া বলিল, "আমিই সেই উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে অমরকুমার।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অমরকুমার বলিয়া উঠিলেন, "বলেন্ কি!"

আগন্তুক দৃঢ়স্বরে বলিল, "হ্যাঁ। আশ্চর্য্য হচ্ছেন্ যে?"

অমরকুমার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "আপনা সঙ্গে আমার তো কোন

দিন চাক্ষুষ পরিচয় নেই, কাজেই আমি আপনাকে চিনি না। আপনি যে তাঁর ছেলে, তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারলেই আমরা সন্তুষ্ট হব।"

আগন্তুক দক্ষিণ পদের পাদুকা খুলিয়া পাদাঙ্গুলী গণিয়া অমরকুমারকে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন প্রথম নিদর্শন—আমার পায়ে ছ'টা আঙ্গুল—।"

অমরকুমার বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন, জেঠা-ম'শাইকে ডেকে পাঠাই আগে।"

বিরক্ত হইয়া আগন্তুক বলিল, "আঃ—বিষয় তো তুমি দখল কোচ্ছ! বোঝাপড়া তো তোমার সঙ্গে হবে। তা জেঠামশাইকে আবার কেন? জেঠামশাইটে আবার কে?

অমরকুমার বলিলেন, "জেঠামশাই হচ্ছেন দেওয়ান। সকল বিষয়ে তিনিই হচ্ছেন কর্ত্তা, আমি তাঁর আজ্ঞাবহমাত্র।" এই বলিয়া অমরকুমার কানাইকে ডাকিয়া রাধাগোবিন্দবাবুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কিছু পরে রাধাগোবিন্দবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধাগোবিন্দবাবুকে দেখিয়া অমরকুমার বলিলেন, "জেঠামশাই, ইনিই হচ্ছেন আজিমগঞ্জের জমিদারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।"

রাধাগোবিন্দবাবু তাঁহার কোটের পকেট হইতে চশমা-জোড়াটা বাহির করিয়া বসনাগ্রভাগ দ্বারা তাহা মুছিয়া চক্ষে পরিয়া ভাল করিয়া আগন্তুকের মুখখানা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এর চৌদ্দ পুরুষেও কেউ উপেন্দ্রকিশোর বোসের বংশে জন্মায় নি।"

ক্রুদ্ধ হইয়া আগন্তুক বলিল, "তুমি চাকর, চাকরের মতন থাক। বোঝাপড়া তোমার সঙ্গে নয়।" আগন্তুকের কথা শুনিয়া অমরকুমার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহাকে তিনি পিতার ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্ররূপী আগন্তুক যে আগমনমাত্রে তাঁহাকে এরূপ অবমাননা করিতেছেন, তাহাতে অমরকুমার দুঃখিত হইলেন। রাধাগোবিন্দবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি চাকর বটে, তবে তোমার বাপের নয়।" অমরকুমারকে দেখাইয়া বলিলেন, "এঁর বাপের।"

অমরকুমার মস্তক নত করিয়া কক্ষতলে দৃষ্টি-স্থাপন করিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। আগন্তুক ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাবে কা'র বাপের! আমার বাপের খেয়ে বুড়িয়ে গেছ, আজ আমার শত্রুতা করতে এলে! যে বিষয় খাচ্ছে তার কাছে বুঝে নেব। তুমি মধ্যস্থতা করবার কে?"

অমরকুমার বাধা দিয়া বলিলেন, "অনর্থক মানী লোককে অপমানিত করবেন না। বিষয় বুঝে নিতে হলে, ওঁর কাছ থেকেই নিতে হবে। আমি ত বল্লুম, আমি কিছুই জানি না।"

আগন্তুক পূর্ব্ববৎ ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিল, "আচ্ছা বেশ! বিষয় ছেড়ে না দাও, আদালত খোলা আছে।"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "বেশ, সেই পথই দেখ।"

তেমনি ভাবেই গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আগন্তুক বলিল, "এতদিন ফাঁকি দিয়ে বিষয় ভোগ করে বুক বেড়ে গেছে কি-না! তাই ছাড়তে মন কেমন কর্চ্ছে, এখন! নয়?"

অমরকুমার তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "আপনি অন্যায় বল্‌ছেন। বিষয়ে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নেই! তা যদি থাক্‌ত, তা হ'লে আর আমি ইচ্ছা করে ডেকে বিষয় দিতে চাইতুম না। আমি যে তাঁর পুত্র নই তা তিনি ঘৃণাক্ষরেও কোনও দিন কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। আমি কোনও বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই যে, আমি তাঁর ঔরসজাত পুত্র নই; তাঁর পুত্র শৈশবে অপহৃত হয়েছেন। তিনি পুত্রশোক বিস্মৃত হ'বার জন্যে আমাকে প্রতিপালন ক'রে আমাকেই সর্ব্বস্ব দিয়ে যান্‌। আমিই মনঃস্থ করেছি, যদি তাঁর ঔরসজাত পুত্রকে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁকে সর্ব্বস্ব দিয়ে যাব। আপনি যে প্রকৃতই তাঁর পুত্র, তা'র সন্তোষজনক প্রমাণ দিন্‌, নইলে অমনি মুখের কথা বল্লেই ত হবে না।"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "অমর, তুমি ক্ষেপেছ? এই চোয়াড় অন্ত্যজ বেঁটে, কালো ভূতটা উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে!! সত্যই যদি তুমি উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে না হও, তা হলে তাঁর যে ছেলে ছিল, সে ছেলে ঠিক তোমারই অনুরূপ। তোমারই মতন অমনি ঢলঢলে মুখের উপর তার উজ্জ্বল দু'টী চোখ ছিল। সে তো আর দু'মাসের ছেলে হারায় নি? তাকে সাত বছরের দেখেছি। তোমারই মত আকৃতির সৌসাদৃশ্য বলে আমরা কোন দিন বুঝতে পারি নি, এবং এখন পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা যে, তুমি সত্যিই সে অমর নও। এ তোমার একটা খেয়াল। এ একটা প্রহেলিকা বলে আমার মনে হচ্ছে। আমার এতখানি বয়েস হ'ল, মাথার চুল পাক্‌ল, এমন রহস্য আমি জীবনে কখনও শুনি নি। যাই হোক, তা বলে এই চোয়াড় লোকটাকে তুমি উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে মনে করো না।"

অমরকুমার জনান্তিকে রাধাগোবিন্দবাবুকে বলিলেন, "জ্যেঠাম'শাই, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে পড়লে মানুষের আকৃতি ত খারাপ হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া বসন্তরোগ মানুষের সৌন্দর্য্যকে একেবারে নষ্ট করে দেয়। আর লেখা-পড়া না শিখে নীচ সংসর্গে বাস করলেও ত ভদ্রলোকের প্রকৃতি নীচভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব।"

রাধাগোবিন্দবাবু অমরকুমারের কথার কোনও উত্তর না দিয়া আগন্তুককে বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তুমি যে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে, তার প্রমাণ দেখাও।"

আগ। কি প্রমাণ দিতে হবে, বল। জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দিচ্ছি।

রাধা। উপেন্দ্রবাবুর ছেলে চুরি গেছে—সে তো আজ পঁচিশ বছরের কথা, এতদিন তুমি আস নি কেন?

আগ। বাড়ীর ঠিকানা ভুলে গেছলুম।

রাধা। তার পর বিজ্ঞাপনটা দেখে বুঝি মনে পড়ে গেল?

রাধাগোবিন্দবাবুর শ্লেষবাক্যে আগন্তুক ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল, "ঠাট্টা কচ্ছ কি? আমি যখন এখান থেকে গেছলুম, তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ, সে-সব কথা কি আর মনে থাকে!

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "তবে হঠাৎ আজ কি করে মনে পড়্‌ল?"

আগন্তুক অপেক্ষাকৃত নম্রভাবে বলিল, "কাগজে আমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা রয়েছে, দেখেই সব মনে পড়ে গেল।"

রাধা। এতদিন কোথায় ছিলে?

আগ। তার কি আর ঠিক্ আছে? আমি পনেরো ষোল বছর পর্য্যন্ত চোরেদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিচি। তারা আমাকে এক দণ্ডের জন্যেও ছেড়ে দিত না। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখ্‌ত। চাকরদের মতন খাটিয়ে নিত। তার পর অনেক ক'রে একদিন সুযোগ পেয়ে আমি পালিয়ে আসি।

রাধা। পালিয়ে যখন এলে, তখন কোথায় থাক্‌তে?

আগ। তার কি ঠিক আছে? পথে ঘাটে গাছতলায় যেখানে হোক্ পড়ে থাক্‌তুম, ভিক্ষে করে খেতুম। তারপর কুলিগিরি মুটেগিরি পর্য্যন্ত করেছি।

অমরনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি সমবেদনার সুরে বলিয়া ফেলিলেন, "আহা!"

রাধা। তুমি হঠাৎ নিরুদ্দেশই বা হলে কেন?

আগ। আঃ আমার কপাল! আমাকে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছল, আমি কি আর সাধ করে গেছ্‌লুম?

রাধা। কেন তোমাকে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছ্‌ল?

আগ। আমার গলায় খুব দামী একছড়া হীরের হার ছিল কি-না, সেই লোভে। আমি যখন বাবার সঙ্গে নোয়াখালিতে যাই, সে-কথা আমার বেশ মনে আছে, তখন তো আর আমি নিতান্ত কচি খোকা নই! আমার বয়েস তখন সাত বছরের। আমাদের একটা বুড়ো চাকর ছিল, সেটার নাম শঙ্কর। তার সঙ্গে আমি রোজ বেড়াতে যেতুম। তার পর হ'ল কি না, একদিন হয়ে যে—

অমরকুমার জনান্তিকে রাধাগোবিন্দবাবুকে বলিলেন, 'তবে জ্যেঠামশাই, এ সত্যিই তাঁর ছেলে। এই যে শঙ্করের কথা বল্‌ছে। আমি তো শঙ্করের কোন কথা বিজ্ঞাপনে লিখি নি।"

রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "চুপ কর না, শোন না কি বলে!"

আগন্তুক বক্র দৃষ্টিতে একবার উভয়ের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শেষ করিল—"আমার গলায় সেই হার দেখে দুটো চোরের খুব লোভ হয়। হার চুরি করবার জন্যে তারা তর্কে তর্কে ফির্‌তো। আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরত। কিন্তু বুড়ো শঙ্কর আমাকে এমন ভাবে আগ্‌লে নিয়ে বেড়াতো যে তারা কিছুতেই আমার গলা থেকে হার নিতে পারত না। তারপর হল কি, একদিন হয়ে যে,—আমরা বেড়াতে বেড়াতে সহর ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে পড়লুম্। মাঠে একটা মস্ত পদ্মপুকুর ছিল। আমি ছেলেবেলায় পদ্মপুকুর বড় ভাল বাস্‌তুম। বুড়োকে বল্‌তেই বুড়ো আমাকে পুকুরের পাড়ে দাঁড় করিয়ে জলের ধারে গিয়ে একটা বাঁস দিয়ে পদ্মফুলের একটা দল টেনে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। আর সেই অবসরে কোথা থেকে চোর-দুটো এসে আমাকে কোলে করে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগ্‌ল। আমি বুড়োকে ডেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম। তারা আমার মুখে একটা রুমাল চাপা দিয়ে ধরলে, ব্যস্! আমি অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লুম। আর আমার কিছুই মনে নেই। এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সে-রুমালে 'ক্লোরোফরম' মাখানো ছিল।"

করিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "তার পর কি হল ?"

আগ। তারা আমাকে নিয়ে কত জায়গায় বেড়াতে লাগল ; কখন খুব বনের ভিতর থাক্‌তো, কখনও ভাঙ্গা পড়ো বাড়ীতে আমাকে লুকিয়ে রাখ্‌ত ; আমি খুব কাঁদতুম বাবার কাছে পৌঁছে দিতে বল্‌তুম। কাঁদলে পরে তারা আমাকে কেটে ফেল্‌বে বলে ভয় দেখাতো। আমি যখন যোল সতের বছরের হলুম্ তখন তারা একটা সন্ন্যাসীর কাছে বেচে ফেল্লে। সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে যেন হাপ্ ছেড়ে বাচ্‌লুম্। একদিন সন্ন্যাসী আমাকে এক জায়গায় বসিয়ে ভিক্ষে করতে গেল, আর আমি সেই অবসরে চম্পট দিলুম।

রাধা। তোমার গলার সে হার কি হল !

আগ। তা' বলতে পারি না। বোধ হয়, যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলুম, তারা খুলে নিয়েছিল।

রাধা। যখন পালিয়ে এলে, তখন পুলিসের আশ্রয় নিলে না কেন ? তখন উপেন্দ্রকিশোরবাবুও বেঁচে ছিলেন। পুলিশের কাছে সব খুলে বল্লেই পুলিশের লোক তোমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যেত, চোরও এত দিন ধরা পড়্‌ত।"

পুলিশের নাম শুনিয়া আগন্তুক চমকাইয়া উঠল ; বলিল, "ও,—বাপ রে ! আমি তখন ছেলেমানুষ, তত সাহস কি আমার তখন ছিল ? তা ছাড়া পুলিশের লোকের কাছে গেলে পয়সার দরকার ! আমি ন্যাকড়া-পরা ভিকিরি, পয়সা কোথায় পাবো ?

রাধা। আজিমগঞ্জের জমিদারের ছেলের পয়সা অভাব হোত না। উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর ছেলে বলে পরিচয় দিলে পুলিশের লোক তোমাকে যত্ন করে এখানে নিয়ে আস্‌ত।

আগন্তুক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ঐ যে বল্লুম, তত বুদ্ধি কি আমার তখন হয়েছিল ?"

অমরকুমার এত ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। এখন বলিলেন, "সে কথা ঠিক ! মানুষের অল্প বয়সে বুদ্ধিরও অল্পতা থাকে।"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার সে বুড়ো চাকরটার কি হ'ল, জান ?"

আগ। না, আমাকে তারা চুরি করে নিয়ে এল। বুড়োটা কি হ'ল তা আমি কেমন ক'রে জানব ?

রাধা। আচ্ছা, যারা তোমাকে চুরি করে নিয়ে গেছ্‌ল, তাদের দেখলে চিন্‌তে পারবে ?

আগন্তুক আবার যেন চমকিয়া উঠিল ; আমতা আম্‌তা করিয়া বলিল, "এখন ? এখন তাদের কোথায় দেখ্‌তে পা'ব ?"

রাধা। যদির কথা বল্‌ছি। যদি দেখ্‌তে পাও, তা হলে চিন্‌তে পার কি ?

জড়িতস্বরে আগন্তুক বলিল, "তা বোধ হয়, পারি ; বোধ হয় পারি না।"

রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "বোধ হয় পারি, বোধ হয় পারি না—কি-রকম কথা ? তুমি ত অনেক দিন তাদের সঙ্গে ছিলে ; তারা অবশ্যই তোমার বেশ চেনা হয়ে গেছ্‌ল্।

আগ। তা হলেও আমি অনেক দিন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, এখন আর কেমন করে—কেমন করে চিন্‌তে পারব ?

রাধাগোবিন্দবাবু ও অমরকুমার কক্ষান্তরে গিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আগন্তুক যে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র সে-বিষয়ে অমর কুমারের মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। রাধাগোবিন্দবাবু কিছু স্থির করিতে না পারিয়া "আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু পরে তিনি উকিল চন্দ্রশেখরবাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে ডিটেকটিভ বিজনকুমারবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখরবাবু অতিবিচক্ষণ ব্যক্তি, বহুদর্শী উকিল। তিনি আসিয়া আগন্তুককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক জেরা করিলেন, আগন্তুক সকল কথারই ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিল। কিন্তু বিজনকুমারবাবু একটী কথাও বলিলেন না। তিনি কেবল কথাগুলি শুনিতে ছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবু অমরকুমারকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "লোকটীর প্রতি কি তোমার কোনও সন্দেহ হয় ?"

অমরকুমার বলিলেন, "না, আমার তো কোনও সন্দেহ হয় না। লোকটী ত সকল কথারই ঠিক ঠিক উত্তর দিয়াছে। তবে চেহারার কথা যদি বলেন, সেটা সঙ্গদোষে আকৃতি ও প্রকৃতি সবই বিকৃত হ'তে পারে।

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "আমার কিন্তু মনে হয়, লোকটা পাকা জুয়োচোর। কোন রকম করে এ-কথা গুলো সংগ্রহ করেছে— বিজনবাবু কি বলেন ?"

বিজনকুমার অতিবিনীত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনারা বিজ্ঞ বহুদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনাদের চেয়ে আমার কি বিবেচনা শক্তি বেশী !

চন্দ্রশেখরবাবু অমরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাই বল বাপু, রাবণের রাজত্ব বানরে লুঠ করবে ! এ যদিও সেই উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে হয় আগাগোড়া অসৎসঙ্গে বাস করে এর গুণ যা হয়েছে, তা এর কথাবার্ত্তা আর চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি যা করে ফেলেছ তার তো আর কোনোও উপায় নাই ! যে রকম চোখা চোখা কথা বল্‌ছে, এ যদি এখন আদালতের আশ্রয় নেয়, তা হলে ওরই জিত হবে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি তোমার বিজ্ঞাপনটা দেওয়া ভাল হয় নি।"

যাহা হউক সকলে মিলিয়া বাদানুবাদের পর আগান্তুককে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র বলিয়াই বিবেচিত করিলেন। অমরকুমার তখন তাহাকে সাদরে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। চন্দ্রশেখরবাবু এবং বিজনবাবু চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে আহারাদির পর অমরকুমার আগন্তুকের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া বৈষয়িক কথাবার্ত্তা এবং গল্প গুজব করিতে লাগিলেন ; শেষে বলিলেন, "এত দিন পরে আপনাকে দেখে বড় সুখী হলুম। আপনার সম্পত্তি আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম্। কাল আমি এখান থেকে চলে যাব।"

আগন্তুক কহিল, "না না, যাবে কেন ! যাই হোক্, আমার বাপ তো তোমাকে এতদিন খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছেন তোমায় একটা বিলি আমি করে দোব থাক না তুমি। যাই হোক্ তুমি সম্পর্কে আমার

এক রকম তাই হচ্ছ। তাঁরি ছেলে ত আমি, এতটা অধর্ম্ম আমি কর্ব্বো না।”

মৃদু হাসিয়া অমরকুমার বলিলেন, আপনার অনুগ্রহে ধন্য হলুম। কিন্তু তার কোনও দরকার নেই আমার মহানুভব প্রতিপালক আমাকে যা দু’ কলম লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তার দ্বারা আমার যা হোক্ করে চলে যাবে।

মাথা নাড়িয়া আগন্তুক বলিল “হাঁ, হাঁ, তা বটে! তা বটে! তুমি অনেক লেখাপড়া শিখেছ, তবে আর তোমার ভাবনা কি?”

অমরকুমার নিজ শয়ন-কক্ষে শয়ন করিতে আসিলেন। মনটা কিছু চিন্তাযুক্ত, কিন্তু প্রফুল্ল! তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহার মস্তক হইতে যেন একটা গুরু কর্ত্তব্যের বোঝা অপসৃত হইয়া গেল। চিন্তিত এই জন্য যে, কাল এখান হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবেন, কেমন করিয়া একটা চাকরি বাকরি যুটাইয়া লইবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

গান।

যখন যাহা পাস্ রে দান,
নিস্ রে ও মন! অবিচারে;
যা’ আছে তোর ভাগ্যে লেখা,
খণ্ডাতে তা’ কেউ না পারে!

তুই রে ছিলি রাজার ছেলে,
সিংহাসনের অধিকারী,
ধন্য হ’ত বিশ্বভুবন
পেলে রে তোর কৃপাবারি!

আজ রে সব হেলায় ছেড়ে
দাঁড়ালি তুই সবার দ্বারে,
সাজে কি তোর মানাভিমান,
নাই-ক জোর আর ত কারে’!

আপন ভাবে আপনি চল্,
ওরে পাগল! সৃষ্টিছাড়া!
বাঁধন যদি টুটেই থাকে,
ফেলিস্ নে রে অশ্রুধারা!

সুখের স্বাদ অনেক পেলি,
দুঃখে এবার পরখ কর্;
ফুলের মালা আস্লি ফেলে,
বজ্র নয় মাথায় ধর্।

সকল কিছু দু’ দণ্ডেরি,
মিলাবে সব অন্ধকারে,—
ভাবনা তবে কিসের তরে?—
ডুব্ দে মন! কাল-পাথারে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

একখানি পত্র।

কলিকাতা
৩১।৩।২০

কল্যাণীয়ে !

* * *

তুমি আমাকে মাতৃস্থানীয়া মনে করে মন খুলে প্রাণের কথাগুলি লিখেছ, তা'তে আমার কত আনন্দ হইয়াছে! তোমার তাতে প্রগল্‌ভতা হয়েছে মনে করিতেছ কেন? তোমরা যদি সত্যই মনে কর, আমার বিশ্বাস-ভক্তি-লাভ হইতেছে, তবে তো আমাকে আরও বেশী করে মন খুলে তোমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী করে নেওয়া উচিত।

ভেবে দেখ, ব্রাহ্মসমাজ আমাদের কত বড় একটা উচ্চ জিনিষ দিয়াছেন! পরব্রহ্মের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া আমরা শিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি অনেক সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি; আবার আত্মার অমরত্ব ও পরলোকে উজ্জ্বল বিশ্বাস লাভ করিলাম। বাল্যকাল হইতে 'মৃত্যু' একটা ভয়ানক ব্যাপার—এ-কথা শুনে শুনে মৃত্যুর করাল মুখই মনের সম্মুখে জাগিত; কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে শ্মশানের ভিতর দিয়া গমন করিয়া মৃত্যু যে প্রকৃতই অমৃতের সোপান, সেই বিশ্বাস লাভ করিলাম। আমার প্রিয়—জীবন্ত, চিরনূতন, অক্ষয় ও অবিনাশী। শ্মশান তাঁহাকে বিনাশ বা ধ্বংস করিতে পারে না, এবং তিনি আমার অতি-নিকটে নিত্যকাল থাকিবেন ও রয়েছেন।

প্রিয়তম পুত্রকে শ্মশানে বিসর্জন দিয়া আমার যখন ভগবৎ-করুণায় তাঁকে সত্য চিরনূতন, জীবন্ত, চিন্ময় সত্তারূপে বুকের অতিনিকটে পেলাম, তখন সেই পাওয়ায় পরলোক আমার নিকট জাগ্রৎ হইল। এই জাগরণে সন্তানের সঙ্গে নিত্যযোগ আরম্ভ হইল। যোগে যোগ ক্রমশই বিস্তৃত হইতেছে। আজ স্বামীর সঙ্গেও সেই শুদ্ধযোগে যুক্ত থাকিয়া বীতশোক ও বিগতক্লেশ হইতেছি; এবং আপনি আপনার সুখে তৃপ্ত না থাকিয়া কিরূপে দীন ভগিনীদিগের নিকট এই শুভসমাচার ব্যক্ত করিতে পারি, তজ্জন্য ভগবৎ করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

কল্যাণীয়ে! তোমরাও যোগের পথ ধরিয়াছ। তোমাদের সম্বন্ধে আমি খুব আশান্বিত আছি। তোমাদের ব্যাকুল ক্রন্দন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে না। আরো শ্রদ্ধা দেও, আরো পবিত্র ও সুন্দর হও। আরো অকপট শুদ্ধ হৃদয়ে তিনি পুত্র হইতেও প্রিয় হইয়া সময়ে প্রকাশ পাইবেন। তাঁহাকে ডাক, দেখিবে, দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে যথাসময়ে যথাবিধানে প্রিয়ের দ্বারা সুরক্ষিত সন্তান কত সুন্দর হইয়া স্বর্গের বার্ত্তা লইয়া তোমাদের হৃদয় আলোকিত করিয়া দিয়া যাইবেন। এখন যে একাকিত্বের ক্লেশ অসহনীয় হইতেছে, তাহা চলিয়া যাইবে, হারাণর ক্লেশ ঘুচিয়া গিয়া এমন নিশ্চিন্ত ভাব, এমন জীবন্ত সত্তার আবির্ভাব—এমন পুণ্য-প্রেমের শুদ্ধ পরশ লাভ হইবে, যাহা "বলিতে বচন হারে, কে বাখানে তায় রে।"

আহা, শোকতাপিত জনকে আর কে এমন করে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে? ঈশ্বর করুন্ তোমাদের এই নিশ্চিত শান্তি লাভ হউক্।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
তোমার মাসীমা।

বিশ্ব-জাগরণ।

আজ একি অনুভূতি! যে ধারে নয়ন মেলি, দেখি বিশ্ব জাগ্রৎ,—সর্ব্বত্রই জাগরণের পালা। তবে আমি কি কেবল সুপ্ত এ জাগরণের মাঝে? হে চিরসুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্য নয়ন মেলে দেখি, কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না কেন? ওই তো জাগরণের সাড়া—ঐ যে প্রভাতে নবোদিত রবির অংশুর বিকাশ—তাহা তোমার জাগরণে জাগ্রৎ; ঐ যে বিহগের কাকলীধ্বনির বন্দনাগীতি প্রভাতী-রাগে, তাহাও তোমার জাগরণের সঙ্গীত; ঐ যে পুষ্পনিচয় শাখা-'পরে সকল অঞ্জলি তোমাকে প্রদান করে, সেও জাগ্রৎ; ঐ যে পবন গতিশীল হইয়া কোন্ অজ্ঞাতপুরে বহে যায়, সেও জাগ্রৎ; ঐ যে উর্ম্মিমালা বারিধি-বক্ষে নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়া করে, সেও জাগ্রৎ; আর ঐ যে সান্ধ্য তিমিরে ধূসরিতা ধরণী, সেও জাগ্রৎ: নিশীথে তারকার দামে সজ্জিত গগন-থালায় চন্দ্রমার দীপ্তি, তাহাও জাগরণের পরিচায়ক। আমার নয়ন মুদিত নাই, ভাষা মুখর, শ্রুতি উন্মুক্ত, তবে কেন আমি জাগ্রৎ নই? কোথায় জাগ্রৎ আমি! তোমার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখি মাত্র! ভিতরের সত্তার বোধ নাই কেন? নবোদিত রবির অংশুতে যে তোমার রূপের বিকাশ, বিহগের গীতিতে তোমার উদ্দেশ্যের স্তুতি, কই সে ভাষা তো বুঝি না! কুসুমে তোমারই কোমলতার প্রকাশ, তাহাও দেখি না; পবন নিরত যে তোমার বার্ত্তাবহ—অজানা পুরের দূত, তাহাও জানি না; তরঙ্গভঙ্গের ধ্বনিতে তোমার গৌরব প্রতিশব্দে উচ্চারিত হইতেছে, তাহাও ত শুনিতে পাই না! তারকার দাম যে তোমারই মন্দিরের দীপাবলি, চন্দ্রিকার আভা যে তোমারই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কান্তির ভাতি—তাহাও জানি না! তবে কেমন করিয়া জাগ্রৎ আমি? তোমার যোগ কোথায়, তাই জানি না। হে মোর দেবতা, তবে মুখর ভাষাকে নীরব কর, শ্রবণশক্তিহীন করে বধির কর, নয়ন নিমীলিত কর, স্পন্দন-চেতনা-রহিত কর, তবে যদি আমি জাগরিত হই! আমার সকল অঙ্গ জাগ্রৎ থাকিতেও যখন আমি সুপ্ত, তখন তাহাদিগকে সুপ্ত করে আমাকে জাগ্রৎ কর।

* * * *

আজ আমি জাগ্রৎ! হে রম্য, আজ বেশ আমি জাগ্রৎ, তাহা আমি জানি না। আজ যে আমি সকল-বন্ধন-হীন, শোকাঘাতে হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন, সে পুলকবীণা আর বাজে না, নয়নের অশ্রুজল সারমাত্র, মায়ার কোন আকর্ষণ নাই, তাই এ জাগরণ। কি মোহের সুপ্তি!—আজ মরণে জীবন! জীবনে মরণ পেয়েও তো কিছুই হয় নাই, আজ রুদ্রমূর্ত্তিতে শোকের মধ্যেও তোমার ভিতরের সৌম্য কান্তির বিকাশ দেখে আমি জাগরিত! হে বরেণ্য, আজ তোমায় বরণ করিতে সমর্থ। সকল আসর-সজ্জিত হৃদয়-মন্দিরে, ভক্তি-পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ করে অশ্রু চন্দন-রসে অভিষিক্ত হও। ওগো এমনি করে কি জাগরিত কর—সকল হৃদয়-তন্ত্রীকে অবশ করে তোমার জীবন-বীণা এমনি করে বাজাও

না-কি? সংসারের প্রচণ্ড মিথ্যার মধ্যে হারানো নিজেকে সুপ্তি থেকে এমনি করে কি তোমার সত্যেতে জাগাও? তোমার ছবি সারা বিশ্বে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তোমার মিলনের ছায়া!—এই তো জাগরণ! আমার জীবনবীণা তোমার দান। আমি জাগ্রৎ হয়ে তোমার গীত গাই।—প্রকৃতি শ্রোতা হয়ে ছন্দে তাল দিক্।

শ্রীমণিকা রায় চৌধুরী।

উদ্যানলতা।*

শিবেশ্বর একজন ধনী গৃহস্থ। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জ্জন করা এবং সম্পূর্ণ নব্য ঢঙে সমস্ত চাল-চলন দোরস্ত করে তোলা, এইটিই হচ্ছে তাঁর প্রধান বায়ু। তাঁর মা কিন্তু একেবারে সেকেলে ধরনের। ছেলের চাল-চলন ধরন-ধারন নিয়ে প্রায়ই মায়ে ছেলেতে একটু খিটি মিটি চল্‌ত। অনেক চেষ্টায়ও মা ছেলের চাল-চলন শোধ্‌রাতে পারেন নাই। কারণ, শিবেশ্বর ছিলেন একজন ভারি গোঁড়া ধরণের সংস্কারক। কোনও কুসংস্কারকে তিনি কোনও মতেই আমল দিতেন না এবং যেমনটি বুঝ্‌তেন ঠিক তেমনিটিই করে যেতেন; মায়ের বাধায় বড় কিছু ফল হত না। শিবেশ্বরের স্ত্রী অল্পবয়সেই মুক্তি নামে একটী মেয়ে রেখে মারা যান। এই মেয়ের শিক্ষা নিয়ে মা মোক্ষদাদেবী ও শিবেশ্বরের সঙ্গে প্রায়ই মতের অমিল হত। শিবেশ্বর যতই মেয়েকে 'বোর্ডিং'এ দিয়ে সম্পূর্ণ নব্য ধরণে তৈয়ের কর্‌তে লাগলেন, এবং মেয়ের বয়স বাড়া সত্ত্বেও তার বিবাহ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে লাগলেন, তাঁর মাও ততই মেয়ের বিবাহের সুনিষ্পত্তির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে শিবেশ্বরের একটী ছেলে পোষবার সখ হল। তিনি তাঁর চাকরকে দিয়ে একটি ছেলে সংগ্রহ করিয়ে এনে তাকে রীতিমত স্কুল কলেজে পড়িয়ে মানুষ করে তুল্‌তে লাগ্‌লেন। মুক্তি প্রায়ই 'বোর্ডিং'এ থাক্‌ত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে প্রায়ই বাড়ীতে আস্‌ত এবং সেই উপলক্ষে ক্রমশঃ ঐ 'জ্যোতি'-ছেলেটির সঙ্গে তার বেশ পরিচয় জমে উঠ্‌ল। জ্যোতি প্রায়ই মুক্তিকে নানা আমোদ প্রমোদে সঙ্গ দিত। দুজনের মধ্যে তুচ্ছ মান অভিমানের ঝগড়া-ঝাটিও যে না হত, তা নয়। দু'জনেরই মন এত স্বচ্ছ, সরল, উচ্ছল ও আনন্দ প্রবণ ছিল যে, এই মেশামেশির মধ্যে একটি নির্দ্দোষ সৌহার্দ ছাড়া আর যে কোনও যৌবনসুলভ ভাবের কোনও যায়গা ছিল, এমনটি মনে কর্‌বার কোনও কারণ ছিল না। জ্যোতির সঙ্গী ছিল ধীরেন; এই ধীরেন পিত্রালয়ের দিক্ দিয়া মোক্ষদাদেবীর সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। মোক্ষদাদেবীর ইচ্ছা ছিল যে এই ছেলেটির সঙ্গে মুক্তির বিবাহ দেন। ধীরেন যখন মুক্তির সহিত পরিচিত হল, তখন তাহারও মনে মুক্তিকে পাওয়ার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, এবং সে শিবেশ্বরেদের সঙ্গে নানা বাহানায়

---

* একখানি উপন্যাস, শ্রীশান্তাদেবী ও শ্রীসীতাদেবী প্রণীত। ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা কর্‌তে লাগল। ইতিমধ্যে জ্যোতিকে শিবেশ্বর বিলাত পাঠালেন। জ্যোতিকে জাহাজে বিদায় দেওয়ার প্রবল উত্তেজনায় মুক্তির চিরদিনের সৌহার্দ্দটুকু তার আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলে দিয়ে মুক্তির যুবতী-হৃদয়ের কাছে তাকে তার আপন রূপে প্রকাশ করল। তারপর থেকে ধীরেন অনেকবার মুক্তির মন বোঝ্‌বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাধা পেয়ে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে মোক্ষদা-দেবী একবার একাকী তাঁর পিত্রালয়ে গগু-গ্রামে যান। মুক্তির তখনও বিয়ে হয় নি,—এ সংবাদটা সেই পাঁড়াগাঁয়ে একেবারে যেন দাবানল জ্বালিয়ে দিল। মোক্ষদাদেবীর ভাই, মোক্ষদাদেবীর অসুখের ভান করে মুক্তিকে কলিকাতা বোর্ডিংএ থেকে একেবারে পাঁড়াগায়ে নিয়ে হাজির কর্‌ল। শিবেশ্বরের তখন স্বাস্থ্যসঙ্কটে সিম্‌লা শৈলে। মোক্ষদা দেবী ও তাঁর ভাই, যার সঙ্গে মুক্তির সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন, সে হচ্ছে সেই ধীরেন। গায়ে হলুদের কাপড় পরাবার সময় মুক্তিকে জান্‌তে দেওয়া হল কোন এক হাবলার (ধীরেনের নাম) সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

সে শুনেই দরজায় খিল দিল, এবং কোনও এক সুযোগে সকলের অজ্ঞাতে রেল ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। পথে ধীরেনের সঙ্গে দেখা। মুক্তির জানা ছিল না যে, ধীরেনই তার বিবাহপাত্র হাবলা। তাই সে ধীরেন-কেই আশ্রয় করিয়া কলিকাতা রওনা হইল। ধীরেনের মন নানা সন্দেহে দুলিতেছিল, তবে ষ্টেশনে এসে জ্যোতির জন্যই মুক্তি অপেক্ষা করে আছে, এ কথা মুক্তির মুখে শুনে, তার আপন কামনার ব্যর্থতা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারল। (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিলাতে নারীশিক্ষা-সঙ্ঘ।—লণ্ডন-নগরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাগণ একটী আন্তর্জাতিক মহিলাসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সঙ্ঘে ব্রিটন, মার্কিন যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং অপর নানা রাজ্যের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নারীদিগের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীকরণে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্য অতিমহৎ।

বিমানপোতে বেগমসাহেবা।—সম্প্রতি ঢাকার পরলোকগত নবাব সার আসান উল্লার পত্নী ও কন্যাগণ কতিপয় য়ুরোপীয় মহিলার সহিত বিমানপোতে আরোহণ করিয়া বিমান ভ্রমণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের কাষ্ঠপ্রদর্শনীতে ভারতের কাষ্ঠ।—ভারতবর্ষ হইতে একশত প্রকার কাষ্ঠ ইংলণ্ডের কাষ্ঠ-প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। তথাকার লোকে ভারতের কাষ্ঠ-সম্পদ্ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। সুজলা সুফলা ভারতের ঐশ্বর্য্য-সম্পদের তুলনা হয় না। কিন্তু তথাপি দুর্ভাগা ভারতবাসীর দুর্দ্দশা ঘোচে না, ইহাই দুঃখ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পপ্রদর্শনী।—আগামী

১৯২৩ সালে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহায়তায় লণ্ডন-নগরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পসম্পৎ প্রদর্শনের নিমিত্ত এক মেলা খোলা হইবে। সাম্রাজ্যের সকল দেশ হইতে শিল্প দ্রব্য প্রেরিত হইবে। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রদর্শনীর আয়োজনের নিমিত্ত ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করিবেন। নানা দেশ হইতে ও নানা লোকের নিকট হইতে ৭৪ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। যুবরাজ এই প্রদর্শনী কমিটির সভাপতি হইবেন।

✓ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তা বালিকা।—নিম্নলিখিত বালিকাগণ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—

✓ শান্তিপ্রভা দাসগুপ্তা, বেথুন কলেজ। অমিয় ঘোষ, বেথুন কলেজ। সুধা রায়চৌধুরী, ডাওসেসন কলেজ। দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, ডাওসেসন কলেজ। যোশেফাইন নরোনহা, লোরেটো হাউস। রেণুকা দাসগুপ্তা, বেথুন কলেজ। সকিনা মুয়িজ্জাদা, ডাওসেসন কলেজ। উষাময়ী সেন—বেথুন কলেজ। উষালতা বিশ্বাস, বেথুন কলেজ। রেণুকা মজুমদার, ডাওসেসন কলেজ কমলা। বসু, লোরেটো হাউস। স্বর্ণকুমারী গুহ, বেথুন কলেজ। রমা বুদি, ডাওসেসন কলেজ।

যুবরাজের ট্রেণপতন।—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিজটাউনের সমীপবর্ত্তী বানবেরী-নামক স্থানে ইংলণ্ডের যুবরাজের ট্রেণ লাইন-চ্যুত হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় যুবরাজের কোন আঘাত লাগে নাই। তিনি অক্ষতদেহে জানালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বি-এ পরীক্ষার ফল।—নিম্নলিখিত মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

ইংরাজী অনার্স।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। বেগম সুলতানা মজিদ্‌জাদা—ডাওসেসন কলেজ
২। নলিনীবালা রুদ্র—ডাওসেসন কলেজ
৩। লতিকা মুখার্জ্জি—বেথুন কলেজ
৪। গ্রাডিস মেরী স্লেটউই—প্রাইভেট
৫। জন আকাম্মা—ডাওসেসন কলেজ
৬। গ্যারেট কনষ্টন্‌স্— প্রাইভেট
৭। ডরোথি থাইরিণী হামিলটন
৮। কোহিন ফ্লোরা

বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণা।

১। সুষমা বন্দ্যোপাধ্যায়—বেথুন কলেজ
২। অরুণা বেজ বড়ুয়া—ডাওসেসন কলেজ
৩। ললিতা বসু—
৪। ডালোষ্টা গ্লাডিস—প্রাইভেট
৫। আশা দত্ত—বেথুন
৬। বেলা ঘোষ ,,
৭। বীণা রায় চৌধুরী—ডাওসেসন কলেজ
৮। রাইট জেসি ,,

পাশ লিষ্ট।

১। ডলি চারুলতা ব্যানার্জ্জি—ডাওসেসন
২। কেথেলিন বেরী—প্রাইভেট
৩। রাজবালা বড়ুয়া—ডাওসেসন
৪। লাবণ্যলতা দাস—প্রাইভেট
৫। হিরণবালা দে— ,,
৬। ডাএংডুলি ম্যারিয়ান—ডাওসেসন
৭। নলিনী ঘোষ—প্রাইভেট
৮। হিলদাশেলা বাজুদ্—ডাওসেসন
৯। সুমতি মজুমদার—বেথুন কলেজ
১০। লতিকা রায় ,,
১১। লীলা রায়—প্রাইভেট
১২। সুবালা রায়—বেথুন
১৩। বিনোদিনী সারঙ্গী—ডাওসেসন

২১১, নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৩ নং এণ্টালীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

Reg. No. C. 134

৫৮ বর্ষ

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

ভাদ্র, ১৩২৭—সেপ্টেম্বর, ১৯২০।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 685. September, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ
৬৮৫ সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩২৭। সেপ্টেম্বর, ১৯২০। ১২শ কল্প।
১ম ভাগ।

শৈশব-স্মৃতি—

(ভৈরবী—কাওয়ালি)

১। শৈশব খেলা কত
নদীকূলে অবিরত
আজি ধীর সমীরণে
পড়িছে মনে !
প্রথম প্রভাতে উঠে
শিশির-ছিটানো মাঠে
যাইতাম্ ছুটে ছুটে,
পড়িছে মনে !

২। ভৃঙ্গ ফুলে ফুলে
যাইত বুলে' বুলে',
বিহঙ্গ ডালে ডালে
গাহিত সে গান্ ;
তটিনী তান তুলে
বয়ে' যেত কল্লোলে,
রহিতাম্ বসি কূলে,
পড়িছে মনে !

৩। কুড়ায়ে বকুল
গাঁথিতাম্ মালা,
আনন্দে আকুল
সাজাতেম্ ডালা ;
রাখাল ছেলের দলে
বসিয়া তরুতলে
কত গান গাহিতাম্,
পড়িছে মনে

৪। কখনো বা রাখালের
শুনিতাম্ বাঁশরী—
খেলাধূলা প্রভাতের
সকলি পাসরি'
জড়া'য়ে গলে গলে
কত গানে—কত ছলে
গৃহ-পানে ফিরিতাম্,
পড়িছে মনে

৫। সে প্রভাত আর কভু
আসে না জীবনে,—
সে আনন্দ হারালাম্
কে জানে কোন্ ক্ষণে!
কোথা সে হাসি গান,
কোথা সে খোলা প্রাণ,
সুখ-দিন অবসান,
পড়িছে মনে!

৬। আজিকে আবার
গাহিতে চাই গান,
ভগ্ন এ বীণায়
তুলিতে চাই তান!
সে সুর উঠিবে কি?
সে ফুল ফুটিবে কি?
তবু সাধিব প্রাণপণে
করেছি মনে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

জপজী!

২৭

সো দর কেহা সো ঘর কেহা যিত বহ সর্ব্ব সমালে।
বাজে নাদ অনেক অসংখ্য কেতে বাবণ হারে।
কেতে রাগ পরিসিউ কহিয়ন, কেতে গাবণ হারে।
গাবহি তু-ধন পৌণ পাণী বৈসংতর গাবৈ রাজা ধরম-দুয়ারে॥
গাবহি চিত-গুপতি লিখ জানহি লিখ লিখ ধর্ম্ম-বিচারে।
গাবহি ঈশর বরমা দেবী সোহন সদা সবারে॥
গাবহি ইন্দ্র ইন্দাপন বৌ দেবতা আদয় নালে।
গাবহি সিদ্ধ সমাধি অন্দর গাবন সাধ বিচারে॥
গাবন যতী সতী সংতোষী গাবহি বির করারে।
গাবন পংড়িত পড়ন ঋখীশর যুগ যুগ বেদা নালে॥
গাবহি মোহনীয়া মনমোহন সুরগা মছ-পয়ালে।
গাবন রতন উপায়ে তেরে অঠসঠ তীরথ-নালে॥
গাবহি যোধ মহাবল সুরা গাবহি খানি চারে।
গাবহি খণ্ড মংডল বরভংজ কর কর রখে ধারে॥
সেই তুধনো গাবহি যো তুধ ভাবন রতে তেরে ভগত রসালে॥
হোর কেতে গাবন সে মৈ চিত ন আবন নানক ক্যা বিচ'রে॥
সোই সোই সদা সচ সাহিব সাচা সাচী নাই।
হৈ ভি হোসী যাইন যাসি রচনা যিন রচাই॥
রংগী রংগী ভাতি কর কর যিনসি মায়া যিন উপাই।
কর কর বেখে কিতা আপনা যিবতি সদা বড়য়াই॥
যো তিস ভাবৈ সোই করসি হুকুম ন করনা যাই।
সো পাতসাহ সাহা পাতি সাহিবু নানক রহনা রজাই।

অর্থঃ—হে প্রভো! তোমার সে দরবার কিরূপ, তোমার গৃহ কিরূপ, যেখানে বসিয়া

তুমি সকলকে রক্ষা করিতেছ! কত অসংখ্য মাঙ্গলিক বাদ্য তোমার দ্বারে বাজিতেছে, কত প্রেমিক ও ভক্ত তোমার বাদ্যকর হইয়াছেন! কত রাগ-রাগিণীরূপ পরীগণ তোমার স্তুতিগান করিতেছে, কত কত ভক্ত তোমার গান করিতেছেন! বায়ু, জল, অগ্নি তোমার গুণগান করিতেছে; ধর্ম্মরাজ তোমার দ্বারে স্তুতিগান করিতেছেন। চিত্রগুপ্ত তোমার গুণগান করিতেছেন, এবং তোমার গুণ পুনঃ পুনঃ লিখিয়া ধর্ম্মের বিচার করিতেছেন্। হে প্রভো! মহাদেব, ব্রহ্মা ও মহাশক্তি নিরন্তর তোমার গুণগান করিয়া শোভিত হইয়াছেন্। ইন্দ্র ইন্দ্রাসনে বসিয়া দেবতাগণের সঙ্গে তোমারই স্তুতিগান করিতেছেন্। সিদ্ধগণ সমাধি-অবস্থাতে তোমরই গুণগান করেন্, সাধকগণ তোমারই প্রসঙ্গ আলোচনা করেন্। যতী সন্ন্যাসিগণ এবং সত্যবাদী ও সন্তোষী সাধকগণ ও কঠিন বীরগণ তোমারই গুণগান করিয়া থাকেন্। পণ্ডিত ও ঋষিগণ যুগে যুগে বেদ-হস্তে তোমারই মহিমা গান করেন্। মোহিনী অপ্সরাগন স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালে তোমারই স্তুতিগান করেন্। তোমার সৃষ্ট রত্ন-সকল এবং আটষট্টী তীর্থ তোমারই মহিমা গান করে। সুরবীর মহাবল যোদ্ধৃগণ এবং অণ্ডজ, জেরজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার জীবগণ তোমারই গুণগান করেন্। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতি গন্ধর্বগণ তোমার গুণ গান করিয়া তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখে।

হে প্রভু! সেই তোমার গান করিতে পারে, যে তোমার ভাবনায় রত এবং তোমার ভক্তিতে পরিপ্লুত। নানক বলিতেছেন্, আরও যে কত কত গায়ক তোমার রহিয়াছেন্, তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? তিনিই চিরন্তন সত্য প্রভু, তাঁহার নাম সত্য; তিনি আছেন্, তিনি থাকিবেন্; তিনি কোথাও যান্ নাই বা যাইবেন না; তিনি এই সংসারের রচনা করিয়াছেন্। তিনি আপনার মায়া-দ্বারা কত প্রকার রঙ্গের কত কত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন্! তিনি আপনি সৃষ্টি করিয়া আপনিই দেখেন; আপনার মহিমা তিনি আপনিই জানেন্। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন্, তাহাই করেন্; তাঁহার প্রতি কেহ হুকুম চালাইতে পারে না। নানক বলিতেছেন্, তিনি রাজার রাজা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। হে সাধক! তাঁহাকে প্রীতি কর॥

২৮

মুংদা সংতোখু সরমু পতু ঝোলি ধ্যানকি
করহি বিভূতি।
খিংথা কালু কুয়ারী কাইয়া, যুগতি ডংডা
পরতীতি॥
আই পংথী সগল জমাতী, মনজীতে জগজীতু।
আদেশু তিসে আদেশু, আদি অনীল অনাদি
অনাহতি যুগু যুগু একো বেশু॥

অর্থ:—তিনিই যথার্থ যোগী, যিনি সন্তোষ এবং লজ্জার মুদ্রা কর্ণে পরিয়াছেন, যিনি প্রতিষ্ঠার ঝোলা ধারণ করিয়াছেন, এবং ধ্যানের বিভূতি মাখিয়াছেন; যিনি কালকে পরিয়াছেন, শরীরকে ব্রহ্মচারী করিয়াছেন, এবং যুক্তি ও বিশ্বাসের দণ্ড ধারণ করিয়াছেন। সেই যোগী ভক্তির পথ প্রাপ্ত হন, এবং দয়া প্রভৃতি গুণ-দ্বারা সকল জীবের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, এবং মনকে জয় করা হেতু সমস্ত জগৎকে তিনি জয়

করেন। আমি সেই আদিপুরুষ ভগবান্‌কে বার বার বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি, তিনি নির্ম্মল, তিনি অনাদি পুরুষ, তিনি নাশ-রহিত। যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ॥

২৯

ভুগতি জান্থ দয়া ভাংভারন ঘটি ঘটি বাজহি
নাদ।
আপি নাথ্‌; নাথী সভ থাকি, ঋধি সিধি
অবরাসদ।
সংযোগু বিয়োগু দুহকার চলাবৈ হি লেখে
আবহি ভাগ।
আদেশু তিসৈ আদেশু।
আদি অনীল অনাদি অনাহতি যুগ যুগ
একো বেশু।

অর্থ:—তিনিই যথার্থ যোগী, যিনি জ্ঞানকে খাদ্য করিয়াছেন, দয়াকে ভাণ্ডারী করিয়াছেন, এবং যাঁহার অন্তরে প্রতি পলে পলে ভগবানের নাম-গান হইতেছে। সেই ভগবান্‌ সকলের স্বামী। তিনি আপনার মায়ায় সকলকে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণ ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সকল অবস্থার স্বাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। তিনি মানুষের কর্ম্মানুসারে সংযোগ ও বিয়োগ করাইতেছেন এবং যাঁহার যেরূপ প্রাক্তনকর্ম্ম সেইরূপ ফলভোগ করাইতেছেন। আমি সেই আদি-পুরুষকে বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি; তিনি নির্ম্মল, তিনি অনাদি পুরুষ, তিনি নাশ-রহিত; যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ।

৩০

*একা মাই যুগতি বিয়াই তিন চেলে পরবাণু।
একু সংসারী একু ভাংভারী ইকু লায়ে দিবাণু॥
যিব তিসু ভাবৈ তিবৈ চলাবৈ, যিব হোবৈ
ফুরমাণু।
উহু বৈ খৈ ওনা নদরি ন আবৈ বহুতা এহু-
বিভাণু॥
আদেশু তিসে আদেশু।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি যুগ যুগ
একো বেশু॥

ব্রহ্ম-শক্তির সহিত মায়াশক্তি যুক্ত হইয়া তিনটী শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা সংসারী অর্থাৎ সৃষ্টি করিলেন; বিষ্ণু ভাণ্ডারী অর্থাৎ পালন করিতেছেন; এবং মহাদেব প্রলয় করিয়া দেন। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, জগৎকে সেইরূপ চালান; যেমন তাঁহার আদেশ, সেইরূপই হয়। তিনি দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখে না; ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমি সেই আদিপুরুষকে বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি, তিনি নির্ম্মল; তিনি অনাদি-পুরুষ; তিনি নাশ-রহিত; যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ॥

৩১

আসনু লোই লোই ভংডার।
যো কিছু পায়া একোবার॥
করি করি বৈ খৈ সিরজন হারু।
নানক সচ্চেকি সাচিকার॥
আদেশু তিসু আদেশু।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি যুগ
যুগ একো বেশু॥

অর্থ:—সমস্ত জগৎ তাঁহার আসন; সমস্ত জগৎ তাঁহার ভাণ্ডার। যাহার যাহা প্রারব্ধ একবার স্থির করিয়া দিয়াছেন। সেই সৃষ্টি-

* একামাই—যথা গীতা ১৪শ অ, ৩য় শ্লোক।

কর্ত্তা আপনার সৃষ্টি আপনিই দেখিতেছেন। নানক বলিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপের সত্য ব্যাপার। আমি সেই আদি-পুরুষকে বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি, তিনি নির্ম্মল, তিনি অনাদি-পুরুষ, তিনি নাশরহিত; যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ॥

৩২

ইকছু জিভো লখ হোহি লখ হোবহি লখ বিশ।
লখু লখু গেড়া আখিয়হি একু নামু জগদীশ॥
এতু রাহি পতি পবড়িয়া চড়িয়ৈ হোয় একীশ।
শুনি নালাঁ আকাশকী কীট আই রীস।
নানক নদরি পাইয়ে কুড়ী কুড়ৈ টীস॥

অর্থ:—মানুষের এক জিহ্বা যদি লক্ষ হয়, আবার লক্ষ জিহ্বা যদি বিশ লক্ষ হয়, এবং সেই বিশ লক্ষ জিহ্বার দ্বারা যদি লক্ষ লক্ষ বার ভগবানের নাম লওয়া যায়, তাহা হইলেই অর্থাৎ সেই পথ- ও সিঁড়ি-দ্বারা গমন করিলেই ভগবানের দর্শন-লাভ হইতে পারে। আকাশের পক্ষীকে উড়িতে দেখিয়া কীটেরও সেইরূপ উড়িতে ইচ্ছা হয়। নানক বলিতেছেন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইলেই সে অবস্থা-লাভ হইতে পারে; মিথ্যা বাক্য-বিন্যাসে কিছু হয় না।

৩৩

আখনি জোরু চুপৈ নহ জোরু।
জোর ন মংগনি দেনি নহ জোরু॥
জোরু ন জীবনু মরণি ন জোরু।
জোরু ন রাজি মালি মনি সোরু॥
জোরু ন সুরতি জ্ঞানি বিচারি।
জোরু ন যুগতি ছুটৈ সংসারু॥
জিসু হাথি জোরু করি বেখৈ সোয়।
নানক উত্তম নীচু ন কোয়॥

অর্থ:—কথা বলিবার শক্তি বা মৌন হইবার শক্তি মানুষের নাই। প্রার্থনা করিবার বা দান করিবার শক্তিও তাহার নাই। মানুষের জীবিত থাকিবার বা মরিবার শক্তি নাই। রাজভোগের শক্তি মানুষের নাই, এবং সঙ্কল্প করিবার শক্তিও তাহার নাই। বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিচারের শক্তি মানুষের নাই। সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার, কোন প্রকার যুক্তি করিবার সামর্থ্যও মানুষের নাই। যে তাঁহার নিকট হাত জোড় করিতে পারে, সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। নানক বলিতেছেন, উত্তম বা নীচ বলিয়া কিছু নাই, কর্ম্মানুসারেই উচ্চ বা নীচ বলা হয়।

৩৪

রাতী রুতী থিতি বার, পবন পানী
অগনী পাতাল।
তিস বিচি ধরতী আপি রখি ধর্ম্মশাল॥
তিসু বিচি জীয় যুগতি কে রংগ॥
তিনকে নাম অনেক অনংত।
কর্ম্মী কর্ম্মী হোয় বিচারু।
সচা আপি সচা দরবারু॥
তিথৈ সোহনি পংচ পরবাণু।
নদরী করমি পবৈ নিশাণু॥
কচ পকাই উথৈ পাই।
নানক গইয়া জাপৈ যায়॥

অর্থ:—রাত্রি, ঋতু, তিথি, বার, পবন, জল, অগ্নি এবং পাতাল ভগবান্ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যস্থলে পৃথিবীকে ধর্ম্মশালার ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পৃথিবীতে আবার ভগবান্ নিজশক্তিতে কত প্রকারের জীব-সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল জীবের নাম ও প্রকার অনন্ত। তিনি আপনিই জীবের

কর্ম্মের বিচার করিতেছেন। তিনি সত্য-স্বরূপ, তাঁহার সত্য দরবার। তাঁহার দরবারে পংচ অর্থাৎ সাধুগণ প্রতিষ্ঠিত ও শোভিত হয়েন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলে সাধক কৃতার্থ হইয়া যান। তাঁহার দরবারে কাঁচা সাধক পাকা হইয়া যান। নানক বলিতেছেন, তাঁহার নিকট যাইলে, কর্ম্ম কাটিয়া যায়।

৩৫

ধর্ম্ম-খণ্ডকা এহো ধর্ম্মু।
জ্ঞান-খণ্ডকা আখহু কর্ম্মু॥
কেতে পবন পানী বৈসংতর, কেতে
কান মহেশ।
কেতে বরমে ঘাড়তি ঘড়িঅহি রূপ
রংগকে বেশ॥
কেতিয়া কর্ম্ম ভূমি মের কেতে কেতে
ধ্ উপদেশ।
কেতে ইন্দ চন্দ সুর কেতে, কেতে
মংডল দেশ॥
কেতে সিদ্ধ বুদ্ধ নাথ কেতে কেতে
দেবী বেশ।
কেতে দেব দানব, মুনি কেতে, কেতে
রতন সমুংদ॥
কেতিয়া খানি কেতিয়া বাণী, কেতে
পাত নরিংদ।
কেতিয়া শুরতি সেবক কেতে নানক
অন্ত ন অন্ত॥

অর্থ :—ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ যে এই পৃথিবী, ইহাই ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্জ্জনের স্থান। জ্ঞান-কাণ্ডের কথা এখন বলিবেন। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে কত পবন, কত জল, কত অগ্নি, কত কানাই কত মহেশ, কত কত ব্রহ্মা কত কত রূপ রঙ্গ ও বেশের কত কত সৃষ্টি করিয়াছেন। কত কত কর্ম্মভূমি, কত কত মেরুপর্ব্বত, কত কত ধ্রুবতারা এবং কত কত আচার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কত ইন্দ্র, কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত মণ্ডল, এবং কত দেশের সৃষ্টি হইয়াছে। কত সিদ্ধ, কত বুদ্ধ, কত নাথ যোগী, কত দেবী রহিয়াছেন। কতই দেবতা ও দানব, কতই মুনি, কতই রত্নসমুদ্র। কত জাতি, কত ভাষা, কত প্রজাপালক নরেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কতই শ্রুতি, কতই সাধক! নানক বলিতেছেন, সেই অনন্তের কার্য্যের অন্ত নাই।

৩৬

জ্ঞান-খংড মহি জ্ঞানু প্রচংডু।
তিথে নাদ বিনোদ কোত অনংদু॥
সরম খংডকী বাণীরূপু।
তিথে ঘাড়তি ঘড়িঐ বহুতু অনুপু॥
তাকিয়া গলাঁ কথিয়া ন যাহিঁ।
যে কো কহৈ পিছু পছুতায়॥
তিথৈ ঘড়িঐ সুরতি মতি মনি বুধি।
তিথৈ ঘড়িঐ সুরা সিদ্ধাকি সুধি॥

অর্থ :—জ্ঞান-মার্গ-মধ্যে ভগবদ্‌জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এই পথে ওঁকার, নাদ, প্রেমভক্তি ও শ্রেষ্ঠ আনন্দ প্রদান করে। এই ব্রহ্মানন্দসুখ বাণীরূপে ভক্ত-হৃদয় হইতে বাহির হইয়া জগতের সুখদায়ক হয়। ভক্ত-হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের হিল্লোল বহিতে থাকে। ভক্তহৃদয়ে যে ব্যাপার হয়, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। যদি কেহ বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে পশ্চাৎ অনুতাপ করে। ভক্তহৃদয়ে শ্রুতিবাক্য নিয়ত বিরাজ করে এবং তাঁহার সমস্ত বুদ্ধি ভগবানে লীন হয়।

তিনি সুর ও সিদ্ধগণের ন্যায় ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করেন্।

কর্ম্ম-খংডকী বাণী জোরু।
তিথৈ হোরু ন কোই হোরু ॥
তিথৈ যোধ মহাবল সুর।
তিন মহ্নি রামু রাহিয়া ভরপুর ॥
তিথৈ সীতো সীতা মাহিমা মাহি।
তাকে রূপ ন কথনে যাহি ॥
না ওহ মরহি ন ঠাগে যাহি।
যিনকৈ রামুবসৈ মনমাহি ॥
তিথৈ ভক্ত বসৈহি লোয়।
করহি অনংদু সচা মনি সোই ॥
সচি খংড বসৈ নিরংকারু।
করি করি বেখৈ নদরি নিহাল ॥
তিথৈ খংড মংডল বরভংড।
যে কো কথৈ ত অংত ন অংত ॥
তিথৈ লোয় লোয় আকার।
যিব যিব হুকমু তিবৈ তিবকার ॥
বেখৈ বিগসৈ করি বিচারু।
নানক কথনা করড়া সারু ॥

অর্থঃ—এই কর্ম্মভূমিরূপ মনুষ্যলোকে যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার বাণী অতিপ্রবল। সেখানে ভগবৎ-নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাঁহাকে ভক্তি-বৈরাগ্যরূপ যোদ্ধা সর্বদা রক্ষা করেন্। তাঁহার মধ্যে রাম পূর্ণরূপে বিরাজ করেন্। তাঁহার হৃদয়ে শান্তিরূপ সীতা আপনার মহিমা প্রকাশ করেন্। তাঁহার বিবরণ কথায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি মরেন্ না, তিনি কাহারও দ্বারা প্রতারিত হ'ন্ না। যাঁহার হৃদয়ে রাম নিরন্তর বাস করেন্, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তগণের দর্শনলাভ হয়। সেই সদাত্মা ভক্ত আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন থাকেন্। ভক্তজনের শুদ্ধ হৃদয়ে নিরাকার পরমেশ্বর বাস করেন্। তিনি ভক্তের শুদ্ধ হৃদয় দেখিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন্। সেই ভক্ত-হৃদয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়। ভক্তের হৃদয়ের অবস্থা যদি কেহ প্রকাশ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার অন্ত পায় না। ভক্ত-হৃদয়ে কত কত লোক কত কত সৃষ্টির দর্শন হয়। যেমন প্রভুর আজ্ঞা হয়, ভক্ত সেই মত কার্য্য করেন্। ভক্তের কার্য্য দেখিয়া ভগবান্ হাসেন্, এবং বিচার করিয়া তাঁহাকে উত্তম ফল দেন্। নানক বলিতেছেন, কথায় ভক্তি হয় না, ভগবৎ কৃপায় যখন বাসনার মূল উৎপাটিত হয়, তখনই ভক্তি প্রকাশ পায়।

৩৮

যতু পাহারা ধীরযু সুনিয়ার।
অহরণি মতি বেদু হাথিয়ার ॥
ভউখলা অগ্নি তপতাউ।
ভংজ ভাউ অমৃত তিতু ঢালি ॥
ঘড়িউ সব দু সচি টকসাল।
যিনকো নদরি করমু তিনকার ॥
নানক নদরি নদরি নিহাল ॥

অর্থঃ—সংযমরূপ ভাটিতে ধৈর্য্য স্বর্ণকার, সুমতি-লৌহখণ্ড, বেদ হাতুড়ী দ্বারা ভয়-হাপরে, তপস্যারূপ অগ্নি জ্বালিয়া ভাবনা-রূপ পাত্রে, গুরুর উপদেশরূপ অমৃত ঢালিতেছে। হে সাধক, অহরহঃ ভগবানের নাম মুদ্রারূপ টাকশালে লইতে থাক। যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার কার্য্য এই প্রকার। নানক বলিতেছেন্, এমন সাধকের দৃষ্টিতেই মানুষ কৃতার্থ হয় ॥

শ্লোক।

পবন গুরু, পানী পিতা,মাতা ধরতি মহত।
দিবস রাত দুই দাই দায়া খেলৈ সগল জগত॥
চংগাইয়া বুরিয়াইয়া বাচৈ ধরম হদুর।
করমী আপো আপনি কে নেড়ে কে দুর॥
যিনি নাম ধ্যায়া গায়ে মসকত ঘাল।
নানক তে মুখ উজলে কোত ছুটি নাল॥

জপুজী-সাহিব সম্পূর্ণম॥

অর্থঃ—পবন গুরু, জল পিতা, এই মহৎ পৃথিবী মাতা। দিবস এবং রাত্রি পালক এবং পালিকা; ইহা লইয়া সমস্ত জগৎ খেলিতেছে। ধর্ম্ম সেই ভগবানের সম্মুখে মানুষের সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্ম দেখাইতেছেন্। কর্ম্মানুসারে কেহ ভগবানের নিকটে, কেহ বা দূরে। যে নাম মনে রাখে, কষ্ট দূর করিয়া ভগবানের গৃহে যায়। নানক বলিতেছেন্, সেই সাধকের মুখ উজ্জল হয় এবং সেই সঙ্গে কত ব্যক্তি তারিয়া যায়॥

জপুজী সম্পূর্ণ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

ক্ষণমান।

বইল আজি সুরের হাওয়া
মাধব-সাঁঝে,
নয়ন-চারু কুসুম-কলি
মেল্‌ল না যে?
নিবিড় চাপা অশ্রু-ভাবে
বাদল কি গো ঘনিয়ে আসে?
গাছের পাতা নোয়ায় মাথা
কানন-মাঝে!

চায়না কেন চন্দ্র-বঁধু
নিমের আড়ে?
কানন-দেবী বীণায় কেন
সুর না ছাড়ে?
হ'ল যে গান পাওয়ার বেলা
অভ্রে এল সুরের ভেলা!
আজকে কেন ভুবন হেন
নীরব লাজে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জাহাজ-ডুবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

"কাকীমা! তোমরা না-কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে গা?" পরদিন প্রভাতে রাধাগোবিন্দ-বাবুর দ্বাদশবর্ষীয়া পৌত্রী নীলিমা আসিয়া দুই হস্তে আশালতার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া অশ্রু-বিজুড়িত স্বরে কম্পিত ওষ্ঠে পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিল। সরলা বালিকার স্নেহভরা ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আশালতা স্বচ্ছ দর্পণের মত দেখিতে পাইতেছিলেন। বলিতে গেলে বালিকা একাধারে আশালতার শিষ্যা, সখী, সঙ্গিনী—সবই ছিল। বালিকার সহিত ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তা আশালতার অন্তরকেও

ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল। আশালতা অশ্রু-সংবরণ করিয়া সস্নেহে দুই হস্তে নীলিমার মুখখানি তুলিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছাইয়া অসুবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে বলিল, "কে বল্লে মা?" নীলিমা বলিল, "কেন! দাদাবাবু।" আশালতা নীরব। নীলিমা আবার দুই হস্তে আশালতার দক্ষিণ হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সত্যি যাবে কাকী মা? কেন যাবে বল না?"

আ। তোমার কাকাবাবুর ইচ্ছে হয়েছে মা!

নী। এমন ইচ্ছে কেন হল, কাকিমা! লোকে বুঝি, নিজের ঘরদোর ছেড়ে চলে যায়? কাকাবাবুর এ কেমন ইচ্ছে, কাকীমা? তুমি বারণ কর না, কাকীমা!

ঠিক্ এই সময় অমরকুমার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন প্রফুল্ল, মুখমণ্ডল সহাস্য, গতি ধীর-প্রশান্ত! তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় না যে, তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র চিন্তা আছে। নীলিমা আবার দুইহস্তে আশালতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "কেন যাবে কাকীমা! বল না? আবার কবে আস্‌বে?" ইত্যবসরে অমরকুমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লি বলে কি?" আশালতা বলিল, "বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছ কেন? আবার কবে আসবে?—সেই কথা নীলিমা জিজ্ঞাসা কচ্ছে। নীলিমার পৃষ্ঠদেশে স্নেহের হস্ত বুলাইয়া দিয়া অমর কুমার বলিলেন, "তোর বিয়ের সময় আসব রে পাগলি!" নীলিমা বলিল, "কাকাবাবু যেন আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছেন! আমার সঙ্গেও ঠাট্টা!

অমরকুমার আবার পূর্ব্ববৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ওরে বাস্ রে! কে বল্লে তোকে ছেলেমানুষ মনে কচ্ছি! তুই যে আমাদের মা, বুড়ী হয়ে গেছিস্; সে-কথা কি আমরা ভুল্‌তে পারি!" অভিমানে নীলিমার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া উঠিল; অভিমান-ভরে বলিল, "আমাদের জন্যে মন কেমন কচ্ছে না কাকীমা?"

উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর পুত্র উপস্থিত হইয়াছেন এবং অমরকুমার চলিয়া যাইতেছেন, এ-কথাটা মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঝড়ের মতন গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এ-সংবাদে সকলেই দুঃখিত এবং ব্যথিত হইয়া উঠিল। অমরকুমারের গুণে সকলেই মুগ্ধ ছিল। প্রতিবেশী, বন্ধু, প্রজা, পরিচিত, অপরিচিত, সকলে দলে দলে আসিয়া অমরকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে লাগিল। অমরকুমার যেন কিছু লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মনটাও যেন কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। আবাল্যের পরিচিত গ্রাম, বন্ধু, সব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। হয়তো আর এ জীবনে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিবে না! হয় তো কেন? নিশ্চয়ই না। জন্মের মত আজিম-গঞ্জের সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া গেল! আর তিনি কিসের জন্য আজিমগঞ্জে আসিবেন্? দরিদ্র প্রজাগণ অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে করজোড়ে বলিতে লাগিল, "আমাদের দেবতা, আমাদের মা-বাপ্ আজ আমাদের ছেড়ে চল্লেন! আমাদের দশা কি হবে? বিপদে পড়্‌লে কা'র কাছে যাব? কা'র কাছে দুঃখ জানাব? কে আমাদের দয়া

করবে? ইত্যাদি—" তাহাদের সেই মর্ম্ম-স্পর্শিনী কাতরতায় অমরকুমারের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। তাঁহার সুদৃঢ় হৃদয়-দ্বারে কে যে নমুহু করাঘাত করিতে লাগিল। অমরকুমারের ভক্ত দীন প্রজাগণ তাহাদের সাধ্য-মত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ 'নজর' লইয়া আসিয়া অমরকুমারের পায়ের কাছে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর, গরিবের মা-বাপ, হুজুর আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন, আর হুজুরকে দেখা আমাদের ভাগ্যে কখনও ঘট্‌বে না, তাই আজ আমরা হুজুরকে কিছু নজর দিতে এসেছি। দয়া করে নিতে হবে।"

অমরকুমার মিষ্ট বাক্যে তাহাদের সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ও 'নজরে' আর আমার কোনও অধিকার নেই। তোমাদের নতুন মনিব এসেছেন, তোমাদের 'এ নজর' এখন তাঁরই প্রাপ্য।"

তাহারা এক বাক্যে সকলে বলিয়া উঠিল, "তাঁর প্রাপ্য তিনি বুঝে নেবেন। এ আমরা হুজুরকে দিতে এসেছি, হুজুরকে নিতে হবে।"

কিন্তু অমরকুমার কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতপণে পরাজিত হইয়া দুর্য্যোধনকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া যখন বনে গমন করিয়াছিলেন, রাজ্যমধ্যে তখন যেমন একটা গভীর মর্ম্মভেদী হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, অমরকুমারের প্রস্থানেও দেশ-মধ্যে তেমনিই একটা গভীর হাহাকার, মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস সমুত্থিত হইল। সকলের মুখেই শোনা যাইতে লাগিল, "এমন জমিদার আর হবে না।"

অমরকুমারের জন্য দেশের লোক যে এরূপ উতলা হইয়া উঠিবে, অমরকুমার পূর্ব্বে এতটা বুঝিতে পারেন নাই। এখন অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অন্তরও অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল। যত শীঘ্র পারেন, এ-স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য তিনি সংকল্প করিলেন। এ-দৃশ্য যতই দেখিবেন ততই মন খারাপ হইয়া যাইবে। প্রজাবর্গ চলিয়া যাইবার পর অমরকুমার অন্দর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাড়া-তাড়ি চারিটি ভাত খাইয়া আশালতাকে বলিলেন, "শীগ্‌গির প্রস্তুত হয়ে নেও। এখনি বেরুতে হবে। দেড়টার ট্রেনে কলিকাতা রওনা হব।"

আশালতা বলিল, "আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। যখনই বল্‌বে তখনই বেরুব।" অমরকুমার আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া একান্ত নির্ব্বিকার ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, আশা?"

আশালতা সগর্ব্বে উত্তর করিল, "কষ্ট? কিসের কষ্ট? তুমি যেখানে থাক্‌বে সেই আমার অমরভুবন, কুঁড়েতে থাক্‌লেও অট্টালিকা! এ পরের ধনে পোদ্দারি-গিরিতে কাজ কি আমার! তবে কষ্ট যদি হয়, তোমার! আজন্ম সুখে প্রতিপালিত হয়েছ, এখন সাধারণ লোকের মতন খেটে খেতে হবে।"

অমরকুমার আশালতার চিবুক ধরিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আশা যার সঙ্গিনী, তা'র আবার কষ্ট কিসের?"

রাধাগোবিন্দ-বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী মহামায়া আসিয়া উভয়কে আত্মীয়ের উপযুক্ত

থেষ্ট উপদেশ দিলেন এবং যখন যেখানে থাকিবেন, সর্ব্বদা সংবাদ দিতে বলিলেন। অমরকুমারও সম্মতি জানাইলেন। আশালতা গায়ের মূল্যবান্ গহনা সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া দরিদ্রের মত যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। আশালতাকে তদবস্থায় দেখিয়া মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যা বৌ-মা, গয়না-টয়না সব কি হল?" আশালতা বলিল, "সব লোহার সিন্ধুকে তুলে রেখেছি মা! কোথায় থাক্‌ব তার ঠিক্ নেই, গয়না সঙ্গে রেখে কি কর্‌ব?"

"আ বোকা মেয়ে! এখানে থাক্‌লে কি আর পাবে কিছু, বাছা? গয়না তোমার! ও গায়ের গয়নাতে ত' কারও অধিকার নেই।" এই বলিয়া মহামায়া লোহার সিন্ধুকের চাবিটা আশালতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আশালতার গহনাগুলি বাক্স-সমেত আশালতার ট্র্যাঙ্কে পুরিয়া দিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া অমরকুমার বলিলেন, "ও কচ্ছেন কি জেঠাই-মা! ও সকলে কোন দরকার নেই!" রাধাগোবিন্দ-বাবু বলিলেন, "অমর, তুমি ছেলেমানুষ, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না বাবা! সংসারে অর্থ নইলে মানুষের এক দণ্ডও চলে না; গয়নাগুলো সঙ্গে রাখ্‌লে ঢের উপকারে লাগ্‌বে।"

অমরকুমার বলিলেন, "কিন্তু অত দামি গয়না সঙ্গে রাখ্‌লে পথে বিপদেরই সম্ভাবনা। তার চেয়ে ওগুলো আপনার কাছে রেখে দিন, দরকার হলে চেয়ে পাঠাব।"

রাধাগোবিন্দবাবু সম্মত হইলেন। আশালতা তাহার পিতৃদত্ত একটা ষ্টীল ট্র্যাঙ্কে তাহার নিজের ও অমরকুমারের কিছু কিছু বস্ত্রাদি লইল এবং আর একটা ট্র্যাঙ্কে অমরকুমারের প্রিয়পাঠ্য পুস্তকগুলি লইল। কোচম্যান্ গাড়ী জুতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। নীলিমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছিল। বালিকার সেই নীরব রোদনে আশালতার চক্ষুর্দ্বয়ও আর্দ্র হইল। তিনি নীলিমাকে প্রবোধ দিবেন কি, নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কথা কহিতে গেলেই যত্নে নিবারিত অশ্রুধারা সবেগে প্রবাহিত হইয়া কপোল বাহিয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতে লাগিল। অমর-বিদায়ের করুণ দৃশ্যটি উপস্থিত জনমণ্ডলীর সকলের হৃদয়কেই উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল। অমরকুমার ও আশালতা রাধাগোবিন্দবাবু ও মহামায়া প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহামায়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে অমরকুমার ও আশালতাকে অজস্র আশিস্-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "রাম বনে গেছলেন; চৌদ্দ বছর পরে ফিরে এসেছিলেন। তুমি কি আর কখনও ফিরে আস্‌বে না, বাবা? ভগবান্ কি আর কখনও আমাদের সে-দিন ফিরে দেবেন না?" কানাই তাহার মুজাইটা গায়ে আঁটিয়া উড়ানিখানা তাহার উপর ফেলিয়া একটা ছোট পুঁটুলির মধ্যে তাহার জিনিষপত্রগুলি পুরিয়া, পুঁটুলীটা হাতে করিয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাইকে তদবস্থায় দেখিয়া অমরকুমার কিছু চিন্তিত হইলেন; বলিলেন, "কিরে, তুই কোথায় যাবি?" কানাই অম্লান বদনে বলিল, "কেন, আপনি যেখানে যাবেন?"

অ। আমি যেখানে যাব ? আমি কোথায় যাব তার কিছু স্থিরতা আছে কি ?

কা। তা' যেখানেই হোক, একটা জায়গায় যেতে হবে ত আপনাকে! যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব।

অ। আমার সঙ্গে কোথায় যাবি রে পাগল! আমি ও সমুদ্রে গা ভাসান দিয়েছি।

কা। আমিও তাই। যেখানেই থাকুন্ না কেন, আপনার একটা চাকর চাই ত! একটা চাকর না হলে ত আপনার চলবে না। আমি আপনার সব কাজ করব, বাসন মাজব, হাটবাজার করব। আপনার কাজ কর্‌ব, সব করব।"

অমরকুমার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাতো করবি জানি, কিন্তু আমার যে অবস্থা, এ অবস্থায় চাকর সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ালে লোকে যে আমার গায়ে ধূলো দেবে!" কানাই উত্তেজিত স্বরে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "হা ধূলো দেবে! ধূলো দিলেই হল! আমি ও-সব শুন্‌ব না; আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। না নিয়ে গেলে কাজ করবে কে ? মা-ঠাকরুন্ নিজে বাসন মাজবে নাকি ? আর তা ছাড়া আমি ও খোট্টা-মুখোর কাছে চাকরী কর্‌তে পার্ব্ব না।"

অমরকুমার যখন বালক, উপেন্দ্র কিশোর-বাবু তখন কানাইকে অমরকুমারের ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কানাই ও তখন বালক; অমরের প্রায় সমবয়স্ক! বাল্যকালে কানাই অমরকুমারের সেবা করিত, যখন যাহা দরকার হইত, সেই কাজই করিত; সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত, আবার খেলাও করিত। ছুটো ছুটি লুকো-চুরি, ঘুড়ি ওড়ানো, আবার সময় সময় অমরকুমারের ঘোড়ার রাস ধরিয়া সহিসের কার্য্যও সে করিত। তাহার পর অমরকুমার একটু বড় হইলে যখন স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, কানাই তখন দুই বেলা তাঁহার বই শ্লেট বহিয়া সঙ্গে যাই। কখনও কখনও লুকাইয়া অমরের পরিত্যক্ত প্রথম ভাগখানা পড়িত, শ্লেটে আকা বাঁকা অক্ষরে 'অ' 'আ' লিখিতে চেষ্টা করিত। অমরকুমার এক একদিন তাহা দেখিয়া অতি আগ্রহসহকারে তাহার শিক্ষকতা করিতে নিযুক্ত হইতেন। অমরকুমারের গৃহ-শিক্ষক আসিলে অমর কানাইকে ডাকিয়া তাহাকে পড়া দিতে বলিতেন। অমরকুমারের যত্নে কানাই তৃতীয় ভাগ, শিশুবোধ প্রভৃতি শেষ করিয়া ফেলিয়া-ছিল। লেখা পড়া জানিত বলিয়া ভৃত্য-মহলে তাহার বেশ একটু পশার জমিয়াছিল। অমরকুমার তাহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আর কানাই আবাল্য অমরকুমারের সংস্রবে থাকিয়া তাঁহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, সেইরূপ আবার দুরন্ত ছেলের মত আবদার করিতেও ছাড়িত না, আবশ্যক মত চোট-পাট জবাব করিতেও ভয় করিত না। অমরকুমার কিন্তু ইহাতে রাগ না করিয়া একটা আমোদ অনুভব করিতেন। তিনিও মাঝে মাঝে কানাইকে লইয়া রহস্য করিতেন। সেই পূর্ব্ব অধিকার-বলেই কানাই আজ অমরকুমারের বিনা অনুমতিতে অমরকুমারের সঙ্গে যাইবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। কানাই, অমরের প্রিয়ভৃত্য কানাই 'নাছোড়বান্দা'। কানাইয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া অমরকুমার কিছু বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। কানাইকে ছাড়িয়া যাইতে

তাঁহার মন কেমন করিতে লাগিল। অথচ কানাই সঙ্গে থাকিলে বুক ফুলাইয়া লোকের কাছে অমরকুমারের সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। অমরকুমার কানায়ের প্রকৃতি ভালরকমই জানেন। তিনি কিন্তু তাহা আদৌ চাহেন না। বিশেষতঃ এ অবস্থায় তাঁহাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে। কানাই কাছে থাকিলে, সে কাহার কাছে যে কি বলিয়া বসিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। সেইজন্য তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু এমন সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। সেই ডিটেক্‌টিভ বিজনকুমার-বাবু অমরকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে বা বিদায় দিতে সেই সময় সেই স্থানে আসিয়া দূর হইতে প্রভু-ভৃত্যের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি কানাইকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি বলিলেন। তাহাতে কানাই তাহার পুঁটুলিটা গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আভূমি আনত হইয়া অমর কুমার ও আশালতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনারা তবে আসুন্, আমি আর যাব না।"

হঠাৎ কানাইয়ের মত-পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশা ও অমরকুমার যারপর নাই বিস্মিত হইলেন; কিন্তু নিশ্চিন্তও হইলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বহু লোক পদব্রজে ষ্টেশণ পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অমরকুমারের অভাবে আজিমগঞ্জ সূর্য্যাস্তে গভীর তমসাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

(৬)

ঊষার অরুণ আলোকে ধরণী উদ্ভাসিতা। রজনীর তিমিররাশি বিনাশ করিয়া পূর্ব্বদিকে নবীন অরুণ সমুদিত। সুপ্তোত্থিতা ধরিত্রী যেন নবজীবন লাভ করিল। গাছে গাছে পাখী কুলায় পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চমে গান ধরিল। রাখাল বালকগণ পান্তা খাইয়া গাভী-বৎস লইয়া মাঠের অভিমুখে চলিল। বাষ্পীয় শকট বেলা দেড়টা হইতে সমস্ত রজনী ছুটিয়া ছুটিয়া, প্রভাতে হাবড়া ষ্টেষনে উপস্থিত হইয়া ক্লান্ত ভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিল। অমরকুমার ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং আশালতাকে লইয়া উপস্থিত তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর আশ্রয়ে যাইবেন, মনঃস্থ করিলেন; ভাবিলেন, দুই একদিন বন্ধুর গৃহে থাকিয়া একটা বাসা ঠিক করিয়া লইবেন। যথাসময়ে অমরকুমার বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুবর সস্ত্রীক অমরকুমারকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি সংক্ষেপে তাঁহার কাহিনী বিবৃত করিলেন। সুহৃদ তাহাতে ব্যথিত হইলেন না, বরং বিরক্ত হইলেন। যাহার অর্থ আছে সে অসৎ হইলেও সৎ, মূর্খ হইলেও পণ্ডিত, নীচ হইলেও উচ্চ; তাহার যতই দোষ থাকুক্ না কেন, অর্থ তাহার সকল দোষ ক্ষালন করিয়া দেয়। আর সে অভাগা লক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত, জগতে সে সকল প্রকার দোষের আকর। সে বিদ্বান্ হইলেও মূর্খ, সৎ হইলেও অসৎ, তাহার কুল, শীল, বংশ, মর্য্যাদা কিছুই তাহাকে সংসারে মান-সম্ভ্রম আদর-যত্ন দিতে পারে না। অর্থ-হীন ব্যক্তি আত্মীয়-বন্ধু, এমন কি মাতা-পিতা এবং নিজের সন্তান-সন্ততির নিকটেও অবজ্ঞের

হইয়া থাকে। অমরকুমারের বন্ধুটী তাঁহার কোনও বিশেষ আবশ্যক আছে বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। অমরকুমার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি দুঃখিত হইলেন না। সংসারের হালচাল তাঁহার নিকটে অজ্ঞাত ছিল না। বন্ধুটির ব্যবহার দর্শনে তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন। আশালতাকে একটা আশ্রয়ে কিছুক্ষণ না রাখিয়া তিনি একটা বাসা-টাসার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। কাজেই, তিনি আশালতাকে বন্ধুর বাটীতে বসাইয়া নিজে বাসার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। ভূতপূর্ব্ব আজিমগঞ্জাধিপতির অঙ্ক-শায়িনী আজ পরের বাটীতে অনাদৃত ভাবে বসিয়া আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভদ্রপল্লীতে দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের সহিত একত্র বাস করিবেন, মনঃস্থ করিয়া অমর-কুমার সেইরূপ বাটী খুঁজিতে লাগিলেন। কেন না, এ অবস্থায় কলিকাতায় একা একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করা সহজসাধ্য নয়। সমস্ত দিন সহরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ-গলি সে-গলি করিয়া, অনেক কষ্টে তিনি এইরূপ একটা বাড়ীর অনুসন্ধান পাইলেন। দেখিয়া শুনিয়া বাড়ীর যে দুইটি ঘর খালি ছিল, অমরকুমার মাসিক দশ টাকা হিসাবে সেই দুইটি কক্ষ ভাড়া করিলেন। একটী দ্বিতলে শয়ন-ঘর, অপরটি নীচে রন্ধনের কক্ষ।

বাড়ী ঠিক করিয়া অমরকুমার আশা-লতাকে বন্ধুগৃহ হইতে লইয়া আসিলেন। অমরকুমারের বিদায়কালে বন্ধুটী সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত করিবার অবসর পাইলেন না। অমর-কুমার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বন্ধু গৃহে নাই। অমরকুমার ভৃত্যকে বলিলেন, "তোমার বাবু এলে তাঁকে আমার ধন্তবাদ জানিয়ে বোল, তাঁর দ্বারায় আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে। সমস্ত দিন তাঁর একটা ঘর জোড়া করে রেখে তাঁর বড়ই অসুবিধা করেছি, তার জন্তে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি!"

'থার্ড ক্লাস' গাড়ীর লাল-রংয়ের শীর্ণকায় অস্থিপঞ্জরসার অশ্বিনী-নন্দনদ্বয় ঝন্ ঝন্ শব্দে যথাশক্তি ছুটিতে ছুটিতে সন্ধ্যার পর অমর-কুমার ও আশালতাকে তাঁহাদের নব-নির্ব্বাচিত বাসায় পৌঁছাইয়া দিল। অমর-কুমার আশালতা ও ট্র্যাঙ্ক দুইটাকে নামাইয়া লইয়া গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। দুইটী তরুণ যুবক আসিয়া অমরকুমারের ট্র্যাঙ্ক-দুইটি বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। অমর-কুমার লজ্জিত হইয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ওকি ম'শায়! থাক্ থাক্, আপনারা আবার কষ্ট ক'রে ও-গুলো বইছেন কেন? আমি নিয়ে যাচ্ছি।" একজন হাসিয়া বলিল, "বাঃ! আপনি একলা এই ভারি ভারি ট্র্যাঙ্কগুলো নিয়ে যাবেন কি করে?"

বাড়ীটিতে অনেকগুলি ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া বাস করেন। আশালতার আগমন-সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র মহিলাগণ অগ্রসর হইয়া চিরপরিচিতের ন্যায় আশালতাকে আদর-যত্নের সহিত অন্দর-মধ্যে লইয়া গেল। গৃহে প্রবেশমাত্র বাটীস্থ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সকলে আশালতাকে ঘেরিয়া ফেলিল, এবং অল্পক্ষণ-মধ্যেই তাহাদের আশালতার সহিত বেশ সম্প্রীতি হইয়া গেল। কোন বালক 'কাকীমা', কেহ 'মাসীমা', কেহ বা

'বউ দিদি', বলিয়া আশালতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ফেলিয়া বেশ আপনার জন করিয়া লইল। একজন রমণী আশালতাকে কলের ঘর দেখাইয়া দিয়া কাপড় কাচিতে বলিল। আর একজন তাঁহাদের স্বামি-স্ত্রীকে সেই রাত্রির মত তাঁহাদের নিকটে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল; বলিল, "দিদি, আজকে এই নতুন আসছ, আজকের রাতটায় আমাদের কাছেই যা' হোক্ খুদ্ কুঁড়ো খেতে হবে, নইলে ছাড়্‌ব না। কাল তখন সকাল বেলায় দেখে শুনে হাট-বাজার করে নিয়ে হাঁড়ী কেড়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে নিও।"

সেই সকল দরিদ্র ভদ্রগৃহস্থ-পরিবারের অকপট প্রীতি আশালতার নিকটে বড়ই মধুর বোধ হইল। অমরকুমার একটী যুবকের সাহায্যে ট্র্যাঙ্ক-দুইটা ও বিছানা-পত্র, যৎ-সামান্য সঙ্গে যাহা ছিল, সমস্ত উপরে তুলিয়া আনিলেন। যুবকটি ঝিকে ডাকিয়া অমর-কুমারের ঘরটি মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইতে আদেশ করিল। বাড়ীতে একটী মাত্র ঝি আছে, সেই সকলের বাসন মাজিয়া রান্নাঘর ধুইয়া দিয়া থাকে। সকলে মিলিয়া যাহার যেমন কাজ তদনু-রূপ মাহিনা দিয়া থাকেন। ঝি জল আনিয়া আদেশ-মত অমরকুমারের ঘরখানি বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, জল-খাবার এনে দোব কি?" অমরকুমারের তখন মনে পড়িয়া গেল, আজ তাঁহাদের সমস্ত দিন আহার হয় নাই! এতক্ষণ চিন্তায় পরিশ্রমে উৎকণ্ঠায় তিনি আহারের বিষয় একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। ঝিয়ের হাতে একটী টাকা দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, নিয়ে এস কিছু। আজ সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি।" ঝি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ? সমস্তদিন কিছু খাওয়া হয় নি? বাড়ী থেকে খাওয়া দাওয়া করে বেরোন্ নি বুঝি?"

অমরকুমার বলিলেন, "না, কাল দুপুর-বেলায় খেয়ে বেরিয়েছিলুম। আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। তারপর এই সমস্ত দিন বাড়ী খুঁজতেই কেটে গেল!"

"আহা! আপনাদের বাড়ী বুঝি অনেক দূরে? এখানে বুঝি কেউ আপনার জন নেই? আহা, সমস্ত দিন ভাত পেটে পড়েনি গা! কি ঘেন্না!" বলিয়া ঝি তাড়াতাড়ি প্রস্থানোদ্যত হইল। তাহার পর আবার ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতকের জলখাবার আন্‌ব? কি আন্‌ব?" অমর বলিলেন "যা হোক দেখে শুনে কিছু নিয়ে এস গে।"

ঝি চলিয়া গেল। অমরকুমারের সঙ্গী যুবকটী অমরকুমারের ঘরটী গুছাইয়া বিছানা পাতিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিল। অমরকুমার হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত কাজই হইয়া গিয়াছে। অমরকুমার সলজ্জে বলিলেন, "এ কচ্ছেন কি? বিছানা-টিছান এখন করে নেওয়া যেত, আপনি কেন এত কষ্ট কচ্ছেন?" যুবক সহাস্যে উত্তর করিলেন "আপনি আজ আমাদের গৃহের অতিথি আপনি একটু বিশ্রাম করুন্। আমি যাই চারটি ভাতের যোগাড় দেখি গে।"

অমরকুমার বলিলেন, "আবার তা' কেন? আজকের রাতটা জল টল খেয়ে কাটানো যেত এখন?"

"বাড়ীতে মানুষ থাক্‌তে কি তা' হয়!

বলিয়া যুবক সত্বর তাহার মাতার নিকটে আসিয়া বলিল, 'মা আজ যে ভদ্রলোকটি এসেছেন, ওঁদের আজ সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, ওঁদের জন্মে চারটি চাল নাও। আমি বলে এসেছি, ওঁরা আজ এইখানে খাবেন।"

জননী উত্তর করিলেন, "ওঁদের জন্মে যে শিবুর মা রান্না কচ্ছে।"

ঝি জল খাবার আনিয়া দিল। অমরকুমার কিছু জলযোগ করিলেন। যুবক তাঁহাদের খাওয়াইতে না পারিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। ক্রমশঃ রাত্রি হইল। বাবুরা সকলে ক্রমে ক্রমে একে একে আফিস হইতে প্রত্যাগত হইতে লাগিলেন। বাড়ীর সকল ভাড়াটিয়া-গুলিই আফিসের কর্ম্মচারী। কেহ বৃদ্ধ, কেহ প্রৌঢ়, কেহ যুবক। সকলেই সপরিবারে বাস করেন। আবার বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের উপযুক্ত পুত্রও আছেন; কেহ স্কুলে, কেহ কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাহিরে বসিবার জন্ত একটী বড় বৈঠকখানা ঘর আছে। একে একে বাবুরা সকলে সেইখানে সমবেত হইতে লাগিলেন। দিবসের শ্রমাপনোদনের জন্ত কেহ তাস, কেহ পাশা, কেহ বা দাবা বড়ে লইয়া বসিলেন। আবার কেহ কেহ বা বাটীর বহির্দেশে রকের উপর বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, অথবা গল্প জুড়িয়া দিলেন। লোকগুলি সকলেই বেশ অমায়িক, গর্ব্ববিরহিত, সদালাপী। আজ তাঁহাদের একজন নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া সকলেই বেশ আলাপ-পরিচয় করিয়া লইলেন। অমরকুমার বলিলেন, তিনি বিদেশী, চাকরি-বাকরির আশাতেই কলিকাতায় আসিয়াছেন, এবং বাড়ীতে আর কেহ আত্মীয় না থাকাতে বাধ্য হইয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিতে হইয়াছে। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়া-শুনো কতদূর পর্য্যন্ত হয়েছে আপনার? পাশ-টাস কিছু করেছেন কি?"

বিনীত ভাবে অমরকুমার উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, তা যা হোক্ ক'রে এম-এ টা পর্য্যন্ত উঠেছি।" একজন বিছানার উপরে সজোরে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সহাস্তে বলিয়া উঠিলেন, "তবে ত কেল্লা মেরেই দিয়েছেন। আপনার আবার চাকরীর ভাবনা কি! যেখানে যাবেন, সেইখানেই আপনাকে লুফে নেবে।"

রাত্রি দশটা বাজিল। ক্রমে বাবুরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইলেন। যাঁহার পত্নী আশালতা ও অমরকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তিনি অতিসমাদরের সহিত অমরকুমারকে সঙ্গে করিয়া গৃহ-মধ্যে আনিয়া আহার করাইলেন। অমরকুমার ও আশালতার সহিত সকলেরই বেশ সদ্ভাব হইয়া গেল।

অমরকুমারকে বিদ্বান্ জানিয়া ছেলেদের দল প্রায়ই তাঁহার নিকটে নিজেদের পাঠ্য-বিষয় বুঝিয়া লইতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে বলে, "অমর দা, এটা কি বলে দিন না।" কেহ বলে, অমর কাকা, এর অর্থ কি? ইত্যাদি।" এইরূপে সকলে তাঁহাকে কেহ দাদা, কেহ কাকা বলিয়া সম্বন্ধ পাতাইয়া আপনার জন করিয়া তুলিয়াছিল। অমরকুমার এবং আশালতা এই গৃহস্থ ভদ্রপরিবারদিগের সহিত বাস করিয়া এক অপূর্ব্ব স্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। নিজেদের অবস্থা স্মরণ করিয়া

দাশালতার মনে পড়িয়া যাইত কাশীরাম-দাসের সেই শ্রীবৎস-রাজের উপাখ্যান। রাজ্য-ধন পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ শ্রীবৎস যেমন কাঠুরিয়া-ভবনে আত্মগোপন করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন, অমরকুমারও সেইরূপ স্বেচ্ছায় বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ভাবে সাধারণের সঙ্গে বাস করিতেছেন।

চাকরীর জন্য অমরকুমার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এম এ, পাশ বলিয়া কেহ তাঁহাকে লুফিয়া ত লইলই না, বরং অনেক-স্থলে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইল। অনেক চেষ্টার পরে বহুকষ্টে অমরকুমার একটা 'মার্চেণ্ট আফিষে' পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে কেরাণীগিরির পদ প্রাপ্ত হইলেন। আপাততঃ অমরকুমার সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিলেন্। সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বেলা নয়টার সময় ভাত খাইয়া তিনি আফিসে যাইতেন; পাঁচটার গৃহে ফিরিতেন। দিনগুলা বেশ এক-রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাধাগোবিন্দবাবুর আদেশ-মত অমরকুমার তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন:—

শ্রীচরণকমলেষু।

জ্যেঠা-মহাশয়! শুনিয়া সুখী হইবেন, আমি এখানে একটা মার্চেণ্ট আফিষে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে চাকরি করিতেছি। আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে আমরা বেশ আছি কোন অভাবই জানিতে পারি নি। আমি দেখিতেছি, মানুষ নিজের দুঃখ-কষ্ট, নিজের দৈন্য সে নিজেই টানিয়া আনে। 'এটা না হলে আমার চল্‌বে না', 'ওটা না থাক্‌লে বড় কষ্ট হবে,' এইরূপ কল্পনাই মানুষকে যন্ত্রণা দেয়। 'এটা চাই', 'ওটা চাই' এই বাসনাই মানুষের অভাবের সৃষ্টি করে থাকে। তখন অনর্থক মাসে মাসে কত টাকাই না নষ্ট করেছি! বৃথা কতকগুলা দাস-দাসী খাটাইয়াছি। কল্পনায় অভাবের সৃষ্টি করিয়া রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াছি। আর আজ এই পঁচিশটী টাকা-তেই আমার বেশ চলিয়া যাইতেছে। এই পঁচিশ টাকাতেই আমাদের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া যাইতেছে। অথচ কোন কষ্টই আমাদের নাই। আপনি আমার ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম জানিবেন। পূজনীয়া মাতৃ-সমা জ্যেঠাইমাকে আমার ভক্তিপূর্ণ অজস্র প্রণাম জানাইবেন। নীলিমাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন। ইতি—

প্রণত

আপনার অমর।

যথাসময়ে পত্র রাধাগোবিন্দ-বাবুর হস্ত-গত হইল। বলা বাহুল্য, পত্র পাঠ করিয়া রাধা গোবিন্দবাবু মোটেই সুখী হইলেন না; তৎপরিবর্ত্তে অশ্রুমোচন করিলেন। "যে অমরের সামান্য একজন ভৃত্য মাসে পঁচিশ টাকা বা ততোধিক টাকা বেতন পাইত, আজ সেই অমর কিনা নিজে একটা সওদা-গরি আফিসে পঁচিশ টাকা মাহিনায় চাকরি করিতেছেন। হা ভগবান্, শেষে কি অমরের অদৃষ্টে এই লিখে ছিলে! ধন্য নিয়তি! কিন্তু অমরের সহিষ্ণুতাকে শত ধন্যবাদ। আফিষে সাধারণের ন্যায় হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া পঁচিশটি টাকা পাইয়াই তিনি সন্তুষ্ট! ঋষি আর কাহাকে বলে! ইহারই নাম ঋষি! এ ত অমরের স্বেচ্ছাকৃত দৈন্য। বিপুল সম্পত্তি

স্বেচ্ছায় পরকে বিতরণ করিয়া দিয়া নিজে দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় বহন করিতেছেন। ইত্যাদি।”—তিনি বলিতে লাগিলেন।

(৭)

একদিন অমরকুমার আফিস হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া একখানা সংবাদপত্র ক্রয় করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে ভিটেকটিভ বিজনকুমার! তেমন সময়ে বিজনকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বিজনকুমার অমরকে দেখিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, “কি অমরবাবু যে? এমন সময় এখানে দাঁড়িয়ে কেন?”

অমরকুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমি যে এই আফিসে কাজ কচ্ছি।” বিজনবাবু বলিলেন “হাঁ্যা হাঁ্যা শুনেছিলুম বটে, দেওয়ানজীর মুখে। তিনি এর জন্যে একদিন দুঃখ কর্‌ছিলেন। আমার অতটা স্মরণ ছিল না। মাপ কর্‌বেন! যাই হোক, আপনার সঙ্গে আর যে কখনও দেখা হবে, সে ভরসা ছিল না। আপনাকে দেখে বড় আহ্লাদ হোল।

অ। কবে এলেন এখানে? কোন দরকারে এসেছেন কি?

বি। হাঁ্যা, কএকটা জিনিষপত্র কেন্‌বার একটু দরকার ছিল।

অমরকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “অমরবাবুকে ত যাই হোক পাওয়া গেল; কিন্তু শঙ্করের হত্যাকারীদের ত কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না!”

বিজনকুমার একবার অমরকুমারের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, “কৈ, কই আর পাওয়া গেল!” কথায় কথায় উভয়েই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে বহুবাজারের মোড়ের মাথায় উপস্থিত হইলে অমরকুমার যথারীতি অভিবাদন করিয়া বাসার অভিমুখে চলিলেন। বিজনকুমার অমরকুমারের নিকট কাগজখানা চাহিয়া লইয়া ট্রামে উঠিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছু পরেই শিয়ালদহের মোড়ে নামিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে একটা সরু গলির ভিতর তিনি ঢুকিয়া পড়িলেন; দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, দুইজন লোক পরস্পর সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে। গলির ভিতরটায় গ্যাসালোক নিতান্ত বিরল ছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে বিজনবাবু লোক-দুইটীকে ভাল দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিবার জন্য তাঁহার মনে কেমন একটা কৌতূহল হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সে গলির ভিতর লোক-চলাচল খুব কম। বিজনকুমার অল্পক্ষণ সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাহারা নিজেদের কথায় মত্ত ছিল। বিজনবাবুকে কেহ বড় একটা লক্ষ্য করিল না। এক ব্যক্তি বলিল, “ভবিষ্যতে যে এমন ধারা ঘট্‌বে তা কি আর তখন জান্‌তুম্! তাহলে কি আর সে ছেলেটাকে হাতছাড়া করি! সে থাক্‌লে এখন আমাদের মুঠোয় ভিতর থাকৃত।” অপর ব্যক্তি বলিল, “মুঠোর থাকত কি, মুঠোর ভিতর আমাদেরই পুর্‌তো, তা ঠিক্ আছে কি! সে না থাকাতেই বরং মঙ্গল হয়েছে। বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না। তুইও যেমন! সে থাক্‌লে আমাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখাতো।”

প্রথম ব্যক্তি। তা যাই হোক্, এখন ত' অনেক কষ্টে এক ব্যাটাকে জোটানা গেছে। দেখা যাক্ নদীবে কি আছে! ছোঁড়া কোন রকমে না ঘেবড়ে যায়!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "তার জন্তে ভাবিস নি। সে ঘাবড়াবার লোক নয়। এই দেখ্ না কোন দিন আমাদের মে-মন্তর-পত্তর আসে এই! শ্যামচাঁদকে তুই সাধারণ লোক মনে করিস নি। সে তোকে আমাকেও এক হাটে বেচে আর একহাটে কিনে নিয়ে আস্‌তে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্। এতদিন গিয়ে সে গদীতে গিয়ে বসেছে, তা দেখিস।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "কিন্তু আমাদের তা হলে কোন খপর দিলে না কেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "কোথায় আমাদের খপর দেবে? আমরা তো আর এক যায়গায় স্থির নেই! কথা তো ছেল, আমরাই গিয়ে খপর নোব!"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তবে চ, কাল পরশু নাগাদ এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক্। দেখা যাক্ কি হল!

লোক-দুইটি ফিরিল। বিজনকুমার ও তাড়াতাড়ি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া একটা চুরুটে অগ্নি-সংযোগপূর্ব্বক টানিতে টানিতে বেশ সপ্রতিভভাবে বলিলেন, "ও মশয়! শিয়াল-দা, যাব কনে কইতে পারেন্? আমি আজ কলকাত্তার নূতন্ আস্‌সি, পথ-ঘাট চিন্‌বার পারি না। অনুগ্রহ কইর‍্যা দ্যাহায়ে দ্যান্!"

ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা বলিল, "আরে মর! শালার কথা শোন! আমরা কি তোর বাবার চাকর নাকি, যে তোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব? শালা কচিখোকা! পথ হারিয়ে ফেলচেন্!" বলিয়া তাহারা হন্‌হন করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা যখন একটা গ্যাস-স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী হইল, সেই অবসরে বিজনকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের পথ দেখিয়া লইলেন, এবং "ও মোশয় চটেন ক্যান? চটেন ক্যান্? দয়া কইর‍্যা ক'য়ে দ্যান না, কোন্ পথে যাব? আপনারা বারো মইস্ কলকাতায় আছেন্, পথঘাট ত চিন্‌বার পারেন্।" ইত্যাদি বলিতেই তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। লোক-দুইজন কিছুক্ষণ সোজা পথে চলিয়া তাহার তাহার পর আঁকা-বাঁকা পথ ধরিল। এ-গলি সে-গলি করিয়া হঠাৎ কোন্ গলির মধ্যে তাহারা ঢুকিয়া পড়িল, বিজনকুমার আর তাহাদের দেখিতে পাইলেন না। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর চিন্তিতান্তঃকরণে নিজের কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

গানের স্বরলিপি।

ভীমপলশ্রী—ভর্তুঙ্গা।

কখন হাসি, কখন কাঁদি,
কখন গাই গান,
ঠিকানা তার নাইকো কিছু,
দয়াল ভগবান্!
আপন মনে খেয়াল মত
আপন ধ্যানে আপনি রত,—
কোথায় আলো, আঁধার কোথা,
চায় না ফিরে প্রাণ!
দয়াল ভগবান!
একলা আমি বিশাল ভবে
'দরদী' কেহ নাই,—
জুড়াতে মোর হৃদয়খানি
পাই নি কণা ঠাঁই!
ভাবনা তায় নাইকো তবু
খেয়ালি! তুমি আমার প্রভু,
খেয়ালে তব জনম মম,
খেয়ালে অবসান!
দয়াল ভগবান!

রচনা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

১´ • ১´ •
II {জ্ঞা মা মা | পা পা । I মা জ্ঞা জ্ঞা | রা সা । I
. ক থ ন হা সি • ক থ ন কাঁ দি •

১´ • ১´ •
I ণ্া সা জ্ঞা | মা মা । I পা -া -া | -মা -জ্ঞা -া I
ক থ ন গা ই • . গা • ন • • •

১´ ০ ১´

I -। -। পা | পা পা মমা I পা -ণা ণা | । ধা পা I
০ ০ ঠি কা না তার না ই কো ০ কি ছু

১´ ০ ১´

I পধা -পা মা | -জ্ঞা জ্ঞা মা I পা -। -। | । । । } II
দ০ ০ য়া ল ভ গ বা ০ ন্ ০ ০ ০

১ম অন্তরা।

১´ ০ ১´ ০

II { । । পা | জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা মা I পা না -। | না র্সা । I
০ ০ আ পন ম নে খে য়া ল ম ত ০

১´ ০ ১´ ০

I । । র্সা | ননা র্সা র্জ্ঞর্রা I র্সা -না না | র্সা র্সা । } I
০ ০ আ পন ধ্যা নে০ আ প নি র ত ০

১´ ০ ১´ ০

I । । পা | র্সর্সা র্রা র্রা I । র্সা ণণা | । ধা পা I
০ ০ কো থায় আ লো ০ আঁ ধার ০ কো থা

১´ ০ ১´ ০

I মা -পা না | । না না I র্সা -। -। | । । । I
চা য় না ০ ফি রে প্রা ০ ণে ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০

I পধা -পা মা | -জ্ঞা জ্ঞা মা I পা -। -। | । । । II
দ০ ০ য়া ল ভ গ বা ০ ন্ ০ ০ ০

২য় অন্তরা।

১´ ০ ১´ ০

II { । । পপা | পা জ্ঞা মা I পা না -। | না র্সা । I
০ ০ এক লা আ মি বি শা ল ভ বে ০

১´ ০ ১´ ০

I । । র্সর্সা | র্জ্ঞা -র্রা -। I । র্সা না | র্সা -। -। I
০ ০ 'দর দী' ০ ০ ০ কে হ না ০ ই

১´ ১´ ০
I । র্সা র্সা | র্সা র্রা -া I র্সা ণা -া | ধা পা -া I
০ জু ড়া তে মো র হৃ দ য় খা নি ০

১´ ০ ১´ ০
I মা পা মা | -জ্ঞা জ্ঞা মা I পা -া -া | । । । } II
পা ই নি ০ ক ণা ঠাঁ ০ ই ০ ০ ০

৩য় অন্তরা।

১´ ০ ১´ ০
II । । মমা | পা জ্ঞা -মা I পা না না | র্সা র্সা -া I
০ ০ ভাব না তা য় না ই কো ত বু ০

১´ ০ ১´ ০
I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | -র্রা র্সা র্সা I না নাঃ -র্সঃ | র্সা র্সা -া I
খে য়া লি ০ তু মি আ মা র প্র ভু ০

১´ ০ ০ ১´ ০
I { । পর্সা র্সা | র্সা র্সা । I ণা র্সা ণা | ধা পা । I
০ খেয়া লে ত ব ০ জ ন ম ম ম ০

১´ ০ ১´ ০
I মা পা জ্ঞা | । জ্ঞা মা I পা -া -া | । । । } I
খে য়া লে ০ অ ব সা ০ ন ০ ০ ০

১ ০ ১´ ০
I পধা -পা মা | -জ্ঞা জ্ঞা মা I পা -া -া | । । । II II
দু০ ০ য়া ল ভ প বা ০ ন্ ০ ০ ০

লীনার শিক্ষা।

(৪)

আট দশ মিনিট সময় যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিল, লীনার কিছুই বুঝিবার শক্তি রহিল না। হঠাৎ এক সময় দুই কাণের পাশে দুই বিভিন্ন কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনি এক সঙ্গে শুনিতে পাইয়া, আত্ম-বিস্মৃতা লীনার ভিতর অজ্ঞাতেই আত্ম-সংবরণ-চেষ্টার একটা মূক ব্যাকুলতা ঘনাইয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গেই অপরিসীম বিস্ময়ের সহিত সে অনুভব করিল, তাহার চোখের সামনে হইতে পৃথিবীর সমস্ত আলো অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, এবং মাথাটাও ঠিক চিরাভ্যস্ত নিয়ম-মত ঘাড়ের উপর সোজা হইয়া নাই; সে যেন দেহের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কোন এক অনির্বাচ্য ব্যবধানের অঙ্কে ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া, একটা প্রচণ্ড কঠোর অবলম্বনের অঙ্কে আত্ম-নির্ভর করিয়া ক্লান্তিভরে ধুঁকিতেছে!

লীনা সজোরে মাথাটা টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মাথা আবার সেই কঠিন অবলম্বনের অঙ্কেই সশব্দে ঠক্ করিয়া আছড়াইয়া পড়িল। নিজের মাথাটার পর্য্যন্ত এই অভাবনীয় অবাধ্যতা দেখিয়া ভয়ে লীনার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইল!—হায়, হায়,—পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই,—এমন কি নিজের দেহেন্দ্রিয়গুলা পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! তবে আর সে কাহাকে কি বলিবে? লীনা হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল!

"মেম সা'ব মেম সা'ব!"—বলিতে বলিতে আয়া পিছন হইতে পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সযত্নে লীনাকে টানিয়া টেবিলের উপর হইতে তাহার মাথাটা তুলিয়া চেয়ারে সোজা করিয়া তাহাকে বসাইতে গেলে, সামনে টেবিলের উপরকার উজ্জল আলোর তীব্রচ্ছটা চোখে পড়িতেই লীনা যন্ত্রণাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "কমাও, 'কমাও, চোখ গেল!"

'বয়' পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, চট্ করিয়া আলোটা তুলিয়া, অন্যদিকে একটা টেবিলের উপর রাখিতে গিয়া, অসাবধানে একটা ছোট 'টিপয়' সশব্দে উল্টাইয়া ফেলিল! আকস্মিক শব্দ-অভিঘাত দুর্ব্বল শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর বড় বেশী জোরে বাজিল।—আহত-স্বরে লীনা বলিল, "কাণ গেল রে বয়, উঃ তোরাই আমায় হত্যা কর্‌লি!"

প্রৌঢ়া মাদ্রাজী খৃষ্টান আয়াটি বহুদিন হইতে লীনার সঙ্গে ঘুরিতেছে, সেবা-শুশ্রূষা ও সময়োচিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বুদ্ধি খাটাইতে, তাহার হাড় পাকিয়া গিয়াছে। বালক ভৃত্যটিকে নীরব ইঙ্গিতে স্থির থাকিতে উপদেশ দিয়া, সাবধানে সুকৌশলে লীনার হাল্কা দেহটি চেয়ার হইতে সযত্নে নিজের বুকে তুলিয়া পাশের ঘরে বহিয়া লইয়া গিয়া সে লীনাকে শয্যায় ফেলিল। অন্য আয়াটি তখন রান্না-ভাঁড়ারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। লীনার আকস্মিক অসুস্থতার খবর পাইয়া সেও ছুটিয়া আসিল। দুইজনে 'স্মেলিং সল্ট্', বরফ, 'আইস্-ব্যাগ', দুধ, ব্র্যাণ্ডি লইয়া সাময়িক শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। চাকরেরা বাহিরে জমা হইয়া চুপি চুপি

জটলা পাকাইয়া সশঙ্কচিত্তে সময় কাটাইতে লাগিল।

ঘন্টা-দুই পরে দ্রুতচরণে পিকক্ কুঠিতে ঢুকিয়া, সটান 'ড্রয়িং রুমে' আসিয়া একটা কৌচের উপর সশব্দে ধড়াস্ করিয়া শুইলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসে তখনও উত্তেজনার ঝড় বহিতেছে, মুখ লাল, কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতেছে। চাকরেরা ছুটিয়া আসিয়া, দুয়ারের পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইল, কিন্তু মিনিট-দশেক প্রভুর কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না। অগত্যা অভাগা জুম্মনকে "মরিয়া' হইয়া সামনে আসিতে হইল, এবং সভয়ে জানাইতে হইল, 'বাথরুমে' তাঁহার স্নানের বন্দোবস্ত সমস্তই ঠিক করা আছে, এবং পোষাক বদলাইয়া রাত্রের আহারে বসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়টা উপস্থিত হইতে আর বেশী দেরী নাই।

পিকক্ সবেগে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন, মেঝের ম্যাটিংএর উপর সজোরে জুতা ঠুকিয়া, রক্ত চক্ষে কঠোর গর্জ্জনে বলিলেন, "কে তোকে অনাবশ্যক মধ্যস্থতা করতে পাঠালে ?"

সভয়ে পিছু হাটিয়া ভৃত্য জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "কেউ না হুজুর, আপনার ঘড়ি ধরে—বাঁধা সময় আমি জানি।—"

উত্তরটা হুজুরের মোটেই মনঃপূত হইল না;—তিনি এই ব্যাপারে যাহার নাম চাহিতেছিলেন, তাহার নামটা সম্পূর্ণ উহ্য থাকিয়া যায় দেখিয়া, নিজেই রুষ্টস্বরে স্পষ্ট-বাক্যে সুধাইলেন,—"মেম সা'ব ?"

প্রভুপত্নীর সম্বন্ধে প্রভুর মনের ভাবটা মাঝে মাঝে যে বিষম বক্র হইয়া উঠে,—সে তথ্যটা ভৃত্যদের বিশেষরূপে জানা ছিল। কারণ, পত্নীর উপর যথেচ্ছ প্রতিহিংসা তুলিবার প্রকৃষ্ট উপায় যে ভৃত্যদের সামনে পত্নীর প্রতি অসম্মানসূচক ব্যবহার করা, এবং তাহাতেই যে তাঁহার স্বামিত্বের পৌরুষ ও ভদ্রত্বের মহিমা খুব চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠে—এ সম্বন্ধে পিককের কোন দ্বিধা, কোন দ্বন্দ্বই অন্তরে ছিল না; অন্ততঃ বাহিরের ব্যবহারে তাহা নিরঙ্কুশ সত্যরূপে প্রকাশ পাইত। কাজেই পুরাতন ভৃত্যরা প্রভুকে চটিতে দেখিলেই প্রভুপত্নীর সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া কথা বলিত।

জুম্মান ভিতরে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং ভীত হইয়া উঠিলেও, বাহিরে ধৈর্য্য বজায় রাখিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিল, "না হুজুর, চায়ের টেবিলেই তাঁর মূর্চ্ছার উপক্রম—।" জুম্মান ঢোক গিলিয়া কথাটা সামলাইয়া লইল; বিনা প্রশ্নে কোন সংবাদ জ্ঞাপন প্রভু যে সময় সময় মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, এবং অযাচিত ভাবে এ সব তাহাকে জানাইতে যাওয়া, তাহার মত ক্ষুদ্রপ্রাণ ভৃত্যের পক্ষে যে যথেষ্ট বিপজ্জনক,—দুই ভয়ই তাহার মনে পড়িল! কথাটা উল্টাইয়া লইয়া দ্রুতে বলিল, 'তিনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।"

সন্দিগ্ধ ক্রূর কটাক্ষে ভৃত্যের মুখ-পানে চাহিয়া পিকক্ দাঁতে দাঁত পিষিয়া অকথ্য গালি উচ্চারণ করিয়া জানাইলেন, কালই তাহাকে পুলিশের হাতে দিবেন, অথবা জেলে পুরিবেন্! কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠিয়া গেলেন।

দৈনিক অভ্যাস-মত রাত্রের স্নান সারিয়া পোষাক বদলাইয়া পিকক যখন আহারের

টেবিলে উপস্থিত হইলেন, তখন নীনা উঠিয়াছে। অডি-কলোনে ভিজানে রুমাল কপালে বাঁধিয়া, টেবিলের পাশে একটা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পিকক্ তাঁহার কড়া-গাম্ভীর্য্য অবিকৃত বজায় রাখিয়া, নীরবে চেয়ার লইলেন। আহার আরম্ভ হইল, দুইজনেই নীরব।

খানিকটা সময় গভীর নিশ্চিন্ততার মধ্যে ঘুমাইয়া নীনার অবসাদ-গ্লানি যদিও তখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসময়ে ঘুম ও অতৃপ্ত নিদ্রার আলস্যে, শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ বোধ হইতেছিল। একান্ত অনিচ্ছা ও ক্ষুধাহীনতা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র নিছক ভয়ের খাতিরে সে উঠিয়া আসিয়া আহারের টেবিলে বসিয়াছিল। গুরুপাক খাদ্যের ডিশ্‌গুলা সে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইতেই পিকক্ বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়া পরিবেশনকারী ভৃত্যকে বলিলেন, "খবরদার নিয়ে যেতে পাবি না, সব রেখে যা।"

নীনা বিনা প্রতিবাদে নতশিরে ডিশ্ টানিয়া লইল, কিন্তু মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিতেছিল।—যে খাদ্য তাহার পাকস্থলীতে সহিবে না, সে খাদ্যও স্বামীর ক্রুদ্ধ হুঙ্কারের ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করিতে হইবে! নিজের আহারের উপর পর্য্যন্ত তাহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই! এমনই প্রচণ্ড কঠোর মমতার অত্যাচার তাহাকে নির্ব্বিবাদে সহিয়া চলিতে হইবে!

কিন্তু ভিতরে যত রাগই নিঃশব্দ উত্তাপে ফুটিতে থাকুক, দাস-দাসীদের সামনে কেলে-ঙ্কারী ধরা পড়িবার ভয়ে নীনা নিঃশব্দেই আত্মদমন করিয়া রহিল। সমস্ত খাবারই মুখে বিষের মত তিক্ত বিস্বাদ বোধ হইতেছিল, তবুও গায়ের জোরে সমস্ত গলাধঃকরণ করিতে হইল; কিন্তু কোন ডিশ্‌ই নিঃশেষে উজাড় করিয়া রাগের প্রাধান্য বজায় রাখিবার ক্ষমতা তাহার কুলাইল না। যতটা খাইল, তার ঢের বেশী ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইল।

পরিবেশনকারী টেবিলের পাশ দিয়া দ্বিতীয় বার ঘুরিয়া যাইবার সময়, নীনা মৃদু-স্বরে তাহাকে বলিল, "মালদহের সেই আমটা নিয়ে এস।"

দুইটা পোর্সিলেনের প্লেটে আম সাজাইয়া আনিয়া ভৃত্য টেবিলে দিল। কিন্তু সে পিছন ফিরিতে না ফিরিতে চক্ষের নিমিষে আমের পাত্র তুলিয়া পিকক্ সশব্দে মেঝের উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। পাত্র-দুইটা শতকুচি হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল! ভৃত্য হতবুদ্ধি নির্ব্বাক্! নীনা চুপ!

যেন কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবে পিকক্ বেশ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন। নীনা বেশ জানিল, ইহার পর, সে একটু মাত্র অধৈর্য্য বা অস্থিরতা প্রকাশ করিলেই, আহার্য্যসামগ্রী-সমেত টেবিলটারও মেঝের উপর উল্টা হইয়া পড়িবার একান্ত সম্ভাবনা! বিনাবাক্যে মাথা নীচু করিয়া সে টেবিলের উপর আহার্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

পিককের খাওয়া শেষ হইলে এক সঙ্গেই দুইজনে টেবিল ছাড়িয়া উঠিলেন। দুইজনেই নীরব। (ক্রমশঃ)

লোকমান্য তিলক-মহারাজ।

(১)

একি শুনি আজ কুসংবাদ,
তিলক নাই, ভারতময়!
কে মুছিল তিলক ভারত-ভালে,
কে বা সে পামর নিঠুর হায়!

(২)

ভারতের রত্ন বহুদিন হ'তে
জলেছিল কি সুন্দর ভারত-শিরে!
আহা কে হরিল সে অমূল্য নিধি?—
নাহি তার দয়া হৃদয়ে কি রে?

(৩)

কে নিবালে সে দীপ? দুর্জ্জন কেমন!
বারেক ভাবিলে না ভারত তরে?
আঁধার ভারত,—বিষাদ-কালিমা
ছাইল আজিকে ভারত-নরে!

(৪)

ভারত-তিলক গৌরব-নিশান
শোভেছিল এতদিন উজলি দিক্;
কে তুলিল তারে শোভাহীন করি
ভারতেরে হায়! তাহারে ধিক্!

(৫)

ভারতের কণ্ঠ-হার তিলক সুন্দর,
কোন্ দস্যু তায় হরিল হায়!
শোভাহীন ভারত হইল এখন,
পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য নাহি-ক তায়!

(৬)

ভারত-হৃদয়-পদ্ম মকরন্দ ভরা
কে ছিঁড়িল আজ নিঠুর করে;
কে রে সে পামর নাহিক বিচার,
বারেক ভাবিল না ভারত তরে?

(৭)

ভারতের প্রিয় ভারতের প্রাণ
কে বধিল হায় তিলকে আজ?
ওরে রে দারুণ নিঠুর শমন
তোর শিরে আজ পড়ুক বাজ!

(৮)

এই ছিল মনে রে দারুণ বিধি,
হরিলি তিলকে পাষাণ হয়ে,
ভাবিলি না মনে তুই একবার,
কি হল রে তোর তাহারে লয়ে!

(৯)

ছিল যে তিলক গুণের আধার
দেশমান্য সেই আদর্শ নর;
তাহারে লইয়া কাঁদালি ভারতে!
ভাবিত না সেই আপন পর।

(১০)

সে যে দেশতরে ভাবিত সতত,
দেশদুখে প্রাণ দেছিল ঢেলে,
কত নর নারী পূজিত তাহারে,
তাহারে কোথায় দিলি রে ফেলে?

(১১)

তাহারে দেখিত দেবতা সমান;
পরশিতে পেলে চরণ তার,
সার্থক ভাবিত জীবন সকল!
এমন পুরুষ কোথায় আর!

(১২)

অন্তরে বাহিরে ছিল না দু'ভাব,
ধার্ম্মিক পবিত্র সরল প্রাণ,
সে যে কর্ম্মবীর, কর্ম্মের পর্ব্বত,
কর্ম্মে বেড়েছিল তাহার মান।

(১৩)

ব্রহ্মচারী ঋষি মহাত্মা তিলক,
সত্যের সম্মান রাখিত মনে ;
তাহার মতন হবে কি রে আর
ভারতে বাঁধিতে আপন প্রাণে !

(১৪)

ছিল রে সাধনা কর্ত্তব্য-পালন,
সুখ্যাতি অখ্যাতি ছিল না ভয় ;
মেঘের গর্জ্জন, অশনি-পতন
জানিত না কভু কাহারে কয় !

(১৫)

অটল অচল প্রতিজ্ঞা তাহার
বীরের বিক্রমে পালন হ'ত ;
জীবনের ভয় ছিল না তাহার,
কারাগার-বাস কুসুম মত !

(১৬)

হেন সুসন্তান ভারত-মাতার
হবে কিরে আর কখন হবে ?
ভুলি ক্ষুধা তৃষ্ণা দেশের কারণ
দেশের চিন্তায় মাতিয়া রবে ?

(১৭)

খোল খোল দ্বার স্বর্গের এবার
যাবেন তিলক সুবর্ণ-রথে ;
গাও রে অপ্সরী, যতেক কিন্নরী
চামর ঢুলাও তাঁহার পথে।

(১৮)

পুষ্পমাল্য তাঁরে পরাও আদরে
চন্দন-তিলক তিলকে দাও ;
করিয়া বরণ তাঁহারে যতনে
স্বর্গের ভিতরে তুলিয়া লও !

(১৯)

জ্বাল ধূপ-ধুনা, মাঙ্গলিক বীণা
কাঁসর প্রভৃতি বাজাও আজ;!
ওই দেখ দেখ ভারত-সুহৃদ্
যাইছেন স্বর্গে তিলক-রাজ।

(২০)

গাও সিন্ধুনীরে, মহীধর-চূড়ে,
পবন-হিল্লোলে, কুসুম-বনে ;
কল্লোলিনি গাও তিলকের নাম,
গাও রে প্রকৃতি অমূল্য ধনে !

(২১)

গাও যুবা বৃদ্ধ নর নারী যত,
ভারতমাতার তিলক-নাম ;
যে নামে তরঙ্গ ছুটিবে হৃদয়ে,
পাইবে সবাই অমর ধাম।

(২২)

মরে নি তিলক, আছে রে বাঁচিয়া ;
স্থূল দেহ তার গিয়াছে চলে !
কীর্ত্তি তার হেথা রহিবে বাঁচিয়া,
কর্ত্তব্যের পথ দিবেক বলে।

(২৩)

তিলকের মূর্ত্তি প্রতি ঘরে ঘরে
গড়িয়া ভারত পূজ রে তায় ;
হেন বীর-পূজা বল না আমায়
কার ভাগ্যে কেবা কোথায় পায় ?

(২৪)

মারাট্টা-ব্রাহ্মণ ত্যাগের মূরতি,
কা'র না ভকতি তাঁহার প্রতি ?
কর প্রণিপাত ভারত-সন্তান
রাখিয়া হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

উদ্যানলতা।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কলিকাতায় একা ধীরেনের সঙ্গে আসাতে, মুক্তি ও ধীরেনকে নিয়ে নানা কথার পাক্ জড়িয়ে উঠতে লাগ্‌ল। শৈল-প্রত্যাগত শিবেশ্বর যখন সকল গোলমাল মিটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় ধীরেনের সঙ্গে মুক্তির বিয়ের কথা পাড়বার চেষ্টা করেন, তখন ধীরেনের মুখে শোনেন যে মুক্তি জ্যোতির বাগদত্তা। সেই রাত্রেই জ্যোতির রওনা হওয়ার টেলীগ্রাম এসে পৌঁছিল। কিন্তু এর উপাখ্যানের দিক্ দিয়ে এ বইয়ের তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। একে ঠিক্ উপন্যাস বলা চলে না। উপন্যাসে সাধারণতঃ একটা বাঁধা কেন্দ্র থাকে, সেটিকে উদ্দেশ্য করে সমস্ত ঘটনাগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হয়ে গড়ে উঠ্‌তে থাকে। এই কেন্দ্রীভূত ঘটনাটিকে সার্থক করে তোলাই অন্য সমস্ত ঘটনার উদ্দেশ্য; এই কেন্দ্রীভূত ঘটনার অগ্নিপরীক্ষাতে প্রত্যেক নাটকীয় চরিত্রকে যাচাই করান হয়। প্রত্যেক নাটকীয় চরিত্র এমন করিয়া আঁকা চাই যাতে তাদের ঘাতপ্রতিঘাতে, কিম্বা তাদের ঘাতপ্রতিঘাতের অনুকূলতায় মূল আধিকারিক ঘটনাটি সম্ভব হয়ে ওঠে। এ বইখানিতে সে-রকম কোনও মূল ঘটনা নেই, সে জন্য ইহাকে উপন্যাস বল্‌তে ইচ্ছা করি না। আবার ইহাকে ঠিক ছোট গল্পও বলা চলে না, কারণ ছোট গল্পের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তাতে কোনও ঘটনা সংঘটন করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সেখানে প্রধান কথাই হচ্ছে কোন গূঢ় মর্ম্ম-বেদনাকে, কি কবির বিশেষ কোন মর্ম্ম-কথা বা অনুভূতিকে কোনও ঘটনার দ্বার দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। নানা চরিত্রের বাহুল্য সেখানে তেমন জায়গা পায় না, কিন্তু একটা গভীর মর্ম্মকথা কবি-হৃদয়ের কুসুম-কোরকটিকে শুধু অগ্রভাগে ঈষৎ দ্বিধা করিয়া দেয় মাত্র। সমস্ত গল্পটির আত্ম বেদনা এক জায়গায় সংহত হয়ে একটি বিশেষ সৌরভকে বাহির করিয়া আনে। যেখানে যেখানে তার যে কোনও বিশেষত্ব আছে, সে সমস্তগুলিই সেই একটি বিশেষ বেদনাকে অভিব্যক্ত করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, এবং সেইটিকে ফোটাতে পারলেই সে গল্পের কাজ শেষ হয়ে যায়। আমাদের এ বই-খানির মধ্যে কিন্তু ঠিক্ তেমন কোনও মূল বেদনা বা স্থায়ী ভাব খুঁজে পাই না। এমন কি সাধারণতঃ অনেক গল্পেই যেমন একটা Crux বা সন্ধি থাকে যেখানে এসে সমস্ত কাব্যের ঘটনাটা তোলপাড় খেয়ে উঠে একটা বিশেষ আশঙ্কা বা উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এখানে তেমন কিছু দেখতে পাই না। হাবলার সঙ্গে সুশিক্ষিতা ও নব্য-সংস্কারসম্পন্না মুক্তির বিবাহের আয়োজনটা খানিকটা কৌতুকই জমাইয়া তোলে। কিন্তু কোনও উত্তেজনার সৃষ্টি করে না, কারণ, হাবলা ক আর পাড়াগেঁয়ে হাবলা বা গ্যাবলা

---

* একখানি উপন্যাস, শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত।—মূল্য ২৲ টাকা।
প্রবাসী-কার্য্যালয়,
২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নয়। সে হচ্ছে মুক্তির প্রণয়লুব্ধ ধীরেন। শাব-লার সঙ্গে বিয়েটা যদি হয়ে যেত, তাতে আমাদের মনে একটুও আঘাত পেত না। বরং কৌতুকটা আরও জমে উঠ্‌ত। আর তা ছাড়া ধীরেন বেচারার জন্য আমার একটু দুঃখও যে না হয়, তা নয়। ঐ রকম একটা ফাঁকে ধীরেন বেচারার সঙ্গে যদি মুক্তির বিয়েটা হয়ে যেত, সে মন্দ কি হোত।

(ক্রমশঃ)

বরষায়।

আকাশ ভরিয়া যায়
ঘন-বিষাদের ছায়,
নহে দীপ্ত আলোকের হাসি,
বায়ুর ব্যাকুল স্বরে
কি বেদনা ব্যক্ত করে!
নীরধারে ঝরে অশ্রুরাশি!
কম্পমান তরু লতা
জানায় মরম-ব্যথা,
নীরব সে হরষ কূজন,
ক্ষুদ্র জীব সংগোপনে
লইয়া আশ্রয় কোণে
জানায় কি অন্তর-পীড়ন!
এ বিষাদ বক্ষে ধরে
তটিনী আবেগ-ভরে
মন প্রাণ সব অরপিয়া,
ধাইছে সাগর-পানে
প্রেম-গদগদ তানে,
নিরালম্ব জীবন হেরিয়া।
গৈরিক বসন পরি'
যোগিনীর রূপ ধরি,'
হে তটিনি! আত্মহারা হ'য়ে
কারো পানে না চাহিয়া,
কারো বাধা না মানিয়া,
মিশিতে সাগরে যাও ব'য়ে;

এই ঘন ছায়া যবে
আর না পীড়িতে রবে,
সুখহাসি উদিবে আবার,
সাগরে কি যাবে ভুলি?
না না, কুলুধ্বনি তুলি,
তুমি ত ছুটিবে অনিবার!
কিন্তু আমি অভাজন
বিষয়-বিমূঢ়-মন,
ক্লান্ত যবে দুর্দ্দিনের ভরে,—
সুখহাসি নিবে যায়,
পঙ্গু বায়ু ব্যথা পায়,
আশালতা কেঁপে উঠে ডরে!
উঠে না আনন্দ-তান,
কেবলি করুণ গান,
অশ্রুনীরে ভরে যায় দিঠি,
জীবন-শকতি ধায়
লুকাইতে নিরালায়,
অন্ধকার উঠে সেথা ফুটি'!—
ব্যাকুল হৃদয়ে হেরি—
কোথা নাথ,—কোথা হরি!
আলম্বন না পাইয়া আর,
হে তটিনি! তোমা' প্রায়
আবেগে ছুটিয়া যায়
তাঁরি পানে হৃদয় আমার!

কিন্তু যবে দুখ টুটে
আলকের হাসি ফুটে,
কল্লোলিনি! কহিব কি কথা?

কোহমত্ত পুনঃ মন
সুখে হয় নিমগন,
ভুলে যায় নাথের বারতা!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

নিবেদন।

১

দেব! একি এ যাতনা!
এই অন্ধ কারাবাসে, দিন রাত রুদ্ধ-শ্বাসে
একাকী হৃদয়-ভরা বহি যে বেদনা!
দিনান্তেও একটুক্‌ জুড়াতে এ শ্রান্ত বুক
অভাগার নাহি কোথা একটু সীমানা!

২

এই তো জগৎ-ভরা সকলে রয়েছে যারা,
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে—করে খেলা ধূলা;
মোর শুধু অহরহঃ একি জ্বালা দুর্ব্বিষহ!—
ধূমাকীর্ণ গুপ্ত বহ্নি বক্ষ-মাঝে ঢালা!

৩

দুঃখে যবে ফাটে বুক্‌, বলি কারে একটুক্‌
নামাব দুঃখের বোঝা ভাবি মনে মনে,
বুক হ'তে শিখা উঠি, কণ্ঠ-পথে বসে রুধি;
দারুণ যাতনা-জ্বালা বেজে ওঠে প্রাণে!

৪

একি শাস্তি, হে ভবেশ! তোমার এ পুণ্যদেশ
অভাগার ভাগ্যে কেন শুধু কারাবাস?
নাহি সঙ্গী নাহি সখা, একটু আশার রেখা!—
শুধু ব্যথা, শুধু জ্বালা, শুধু মর্ম্মোচ্ছ্বাস!

৫

নয়নে নাহি-ক জল, চরণে নাহি-ক বল,
মস্তকে পর্ব্বত-সম গুরু বোঝা চাপা,
পরাণে দারুণ জ্বালা, রাত-দিন পথ-চলা—
শ্রান্তি নাই ক্লান্ত প্রাণে কিবা নিশা-দিবা!

৬

কবে এ পথের শেষ, ফুরাবে এ মরু-দেশ,
নিভিবে প্রাণের বহ্নি—রাবণের চিতা,
লোকেরে দেখাতে মুখ, ফাটিবে না পোড়া বুক,
ঘুচে যাবে এ দুর্নাম—'অভাগা' 'অনাথা'!

৭

আমার যে রবি শশী, তাও যেন ভরা মসী,
আমার এ বায়ু যেন শুধু নিরাকার,
আমার এ দেহ যেন গড়িয়াছে ভিন্ন কোন,
আমার এ গৃহ যেন আঁধার গহ্বর!

৮

আমি কি তোমার রাজ্যে, বঞ্চিত সকল কার্য্যে?
যে অগাধ দয়ারাশি বর্ষে উচ্চ নীচে,
তাতেও বঞ্চিত আমি? কেন করুণার স্বামী!
কেন বহি এত শাস্তি কোন্‌ গুরু কাজে?

৯

তুমি তো অনাথ-বন্ধু, অগাধ-করুণা-সিন্ধু,
পাপী তাপী সবে ডাকে তোমারে দয়াল!
তোমার মধুর নাম, স্মরিলেও অবিরাম
হে প্রভু হবে না ছিন্ন দৃঢ় কর্ম্মজাল?

১০

তোমার সুখের ধরা, মমতা-অমিয়-ভরা;
আমি শুধু ফিরে যাব শূন্য রিক্ত হাতে?
আমারি এ মর্ম্মোচ্ছ্বাস, বক্ষোভেদী দীর্ঘশ্বাস
রবে ব্যাপ্ত নিশি দিন ধরার ধূলাতে?

১১

(আজ)
শ্রান্ত দেহ ক্লান্ত আঁখি, হে প্রভু,
কোথায় রাখি
এ গুরু মর্ম্মের বোঝা বেদনার ভার?
ব্যথিত তাপিত প্রাণ, কে চরণে
দিবে স্থান,
কে ঘুচাবে নয়নের চির অন্ধকার?

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

নদী-সৈকতে

(শ্রীআনন্দ আচার্য্য অবলম্বনে)

১। প্রভাত-বেলা পুষ্পবনে
পুষ্প চয়ি' সযতনে,
দিনের বেলা গাঁথি মালা
সাঁঝে তোমায় দেব বলে'!

২। সন্ধ্যা-ছায়া নেমে আসে,
গগন-কোলে তারা ভাসে,
শিশুরা সব কোলাহলে
গৃহে ফেরে দলে দলে!

৩। স্বর্ণ-রেণু তুলি' পথে
ধেনু ফেরে গোষ্ঠ হ'তে,
আনন্দেরি কলকলে
কুলায়-পানে পাখী চলে!

৪। তরুণ কবি কুঞ্জবনে
বাঁশী বাজায় আপন মনে,
দিনের খেয়া শেষ করি'
ঘাটে লাগে খেয়া-তরী!

৫। সেই সে পরম মধুর ক্ষণে
খুসী হয়ে জাগি মনে,
পরিয়ে দেব মালাখানি
চরণ-দু'টি বক্ষে টানি'!

৬। আকাশ ডোবে জ্যোৎস্নালোকে,
বন্যা জাগে ধরার বুকে!
চেয়ে থাকি কখন আস,
মালা নিয়ে মধুর হাস॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সাময়িক সংবাদ।

১। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা-কারিণী মহিলা চিকিৎসক।—বঙ্গদেশের সেনিটারী কমিশনর ডাক্তার বেণ্টলি এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের বালিকাবিদ্যালয়-সমূহের ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত একজন মেডিকেল ইন্স্পেক্টেস্ নিযুক্ত হইবেন। এই পদের প্রারম্ভ-বেতন মাসিক ২৫০৲ টাকা। ৩০৲ টাকা করিয়া বাড়িয়া এই মাসিক বেতন ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। এই পদে মেডিকেল কলেজের উপাধি-প্রাপ্তা মহিলারা নিযুক্তা হইবেন। পদপ্রার্থিনীদিগকে কলি-

কাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বঙ্গের স্বাস্থ্য-কমিশনার-মহোদয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যপরীক্ষাকারিণী পরিদর্শিকা-নিয়োগের ফলে এদেশের বালিকাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে দেশের যে কল্যাণ সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বেহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন; এই সংবাদ গত ১১ই আগষ্ট এখানে আসিয়াছে।

৩। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবাসীদিগকে জানাইয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ করিয়া যুবরাজ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং তিনি এবৎসর ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন না। যুবরাজের পরিবর্ত্তে তাঁহার খুল্লতাত ডিউক অব কনট ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

৪। গত ৩১শে জুলাই শনিবার রাত্রি ১২টা ৪০ মিনিটের সময় ভারতের অকৃত্রিম ও অকপট সেবক স্বদেশানুরাগী মহামান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় সমগ্র দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন্।

৫। কাশীর আয়ুর্ব্বেদ-সম্মিলনী কলেজ হইতে এবার তিনটী বাঙ্গালী মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী' উপাধি পাইয়াছেন।

৬। ক্যাণ্টনের চীনা স্ত্রীলোকেরা ২০ লক্ষ টাকা মূলধনের এক দেয়াশালাইয়ের কারখানা স্থাপন করিবে মনঃস্থ করিয়াছেন এই কারখানায় স্ত্রীলোকেরাই দিয়াশালাই প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা স্ত্রীলোকেরাই বিক্রয় করিবেন।

৭। বিলাতে পাশ করা ধাত্রীর সংখ্যা নব্বই হাজার।

৮। ১৮৬৯ অব্দে পেশোয়ারে ১০৪ নং "রয়ালমনষ্টার ফিউজিনিয়ার্স"-নামক সৈন্যদলের মধ্যে ভয়ানক ওলাউঠার প্রকোপ হয় কাপ্তেনের পত্নী মিসেস্ ওয়েবার হারিশ সেই রোগীদিগের অক্লান্ত সেবায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মিসেস্ হারিশ্ পথ্য প্রস্তুত করিয়া গীত গাহিয়া ও নানা উপায়ে সৈন্যদের মন প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেন। রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সেই সকল সৈনিকেরা মিসেস্ হারিশকে ভিক্টোরিয়া ক্রসের অবিকল একটী নকল, নকল করিয়া উপহার প্রদান করেন্। স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম "ভিক্টোরিয়া ক্রস্" প্রাপ্ত হন। এক্ষণে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, আকাশ-পোত-সম্বন্ধীয় সাহসিক কার্য্যের জন্য "ভিক্টোরিয়া ক্রস্"-নামক মহাসম্মানিত পদক স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই প্রদান করা যাইতে পারিবে।

৯। গত ৬ই আগষ্ট ময়ূরভঞ্জ মহারাজের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভ্রমসংশোধন।

আষাঢ়-সংখ্যার 'শুচিবায়ু'-প্রবন্ধে ৯৪ পৃঃ ১ম কলম ১ পংক্তিতে

"শয্যার চাদর...মত পড়িয়া থাকে।"—এইস্থলে

"শয্যার চাদর ও বস্ত্রাবরণগুলি সর্ব্বদাই কোনও না কোন অশুচিতা-ব্যপদেশে প্রক্ষালনীয় হও য়ায়, সেগুলিকে প্রায়ই শয্যা হইতে উন্মোচন করিয়া রাখা হয়। ফলে আবরণহীন শয্যাতল যেন মৃতের শয্যার মত পড়িয়া থাকে।" হইবে।

এতদ্ভিন্ন ঐ প্রবন্ধে কতকগুলি মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে। যথা "কর্ত্তব্যপদেশে" (৯৩পৃঃ১ম কলম শেষ লাইন) "কর্ত্তব্যব্যপদেশে" হইবে, "অস্তসুখ-প্রত্যাশী" (৯৩ পৃঃ ২য় কলম, ২১ পংক্তি) স্থলে "অনন্তসুখ-প্রত্যাশী", "প্রাক্ষসন" (৯৪ পৃঃ ২য় কলম, ২৯ পংক্তি) স্থানে "প্রক্ষালন", "জননীদেবর" (৯৫ পৃঃ, ২য় কলম, ২য় পংক্তি) স্থানে "জননীদেবীর" ও "সম্ভাবপর" (শেষ লাইন) স্থানে "সম্ভবপর" হইবে।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫৮ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আশ্বিন, ১৩২৭—অক্টোবর, ১৯২০।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৵০ ;

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 686 October, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৮৬ সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩২৭। অক্টোবর, ১৯২০। ১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

গান।

(রাগ—পঞ্চম একতালা।)

আকাশে বাতাসে আলোকে পুলকে
উৎসব এ কি ভূলোকময়!
মুঞ্জরে কলি—গুঞ্জরে অলি,
ঝঙ্কারে শ্যামা, পিক কুহরয়!
প্রভাতে অরুণ ঢালিল কিরণ
মেলিয়া তাহার আঁচল হিরণ;
শশী তারা রাতে, দীপ লয়ে হাতে
আরতি জ্বালিল গগন-ময়!
এ-ভবের নাটে, কত দিনে রাতে
কত খেলা হ'ল জীবনময়—
কত সুখে দুখে—কত শোকে তাপে
ফুরা'ল এ সুখ-লীলাভিনয়!
সকলি তাঁহার করুণা-আশিস,
তিনি চির-রাজা করুণাময়!
তাঁরে লয়ে বুকে, এস হাসি-মুখে,
গাই সুখে দুখে তাঁরি জয় জয়॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন হিন্দুদিগের—বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের—অতিপবিত্র তীর্থ। এখানে বাঙ্গালীগণের সংখ্যা অধিক। বাঙ্গালীরা কৃষ্ণভক্ত; সুতরাং এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বৃন্দাবন যমুনার তীরে অবস্থিত। বৃন্দা হইতে বৃন্দাবন-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃন্দা ও তুলসীতে পার্থক্য নাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে বৃন্দা হইতে তুলসীর জন্ম হয়। জন্ম-বৃত্তান্ত এইরূপ:—জলন্ধর-নামে এক রাক্ষস ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তির বাসনায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া শিবের শরণাগত হন। শরণাগত ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য শিব স্বয়ং জলন্ধরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। ঐ রাক্ষসের বিন্দা-নাম্নী পতিব্রতা এক পত্নী ছিল। শিবের সহিত জলন্ধরের যুদ্ধ হইলে, বিন্দা পতির প্রাণরক্ষার্থ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যার ফলে কোন রকমে জলন্ধরের বধ হয় না দেখিয়া দেবতারাও ভয়ে বিষ্ণুর শরণাগত হন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া, বৃন্দার তপোভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহার কর গ্রহণ করিলেন। বিন্দার তপোভঙ্গ হইবামাত্রই জলন্ধর শিবের হস্তে নিহত হইল। পতির নিধন-বার্ত্তা-শ্রবণে শোকার্ত্ত-হৃদয়ে বিন্দা বিষ্ণুর প্রতি শাপ-প্রদানে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু সভয়ে বিন্দাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—"তুমি জলন্ধরের সহিত সহমৃতা হও; তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে;—ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে, আমার তুষ্টি জন্মিবে। তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ এই চারি প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।" পতিব্রতা বিন্দার পবিত্র দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইলে, সেই চিতা-ভস্মেই, বিষ্ণুর আশীর্ব্বাদে, উক্ত চারিটী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। বিন্দার দেহভস্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, তুলসীকে বিন্দাজি-নামেও অভিহিত করা হয়।

বৃন্দাবন, মথুরার সহিত পাকা রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। রেল-পথেও বৃন্দাবন যাওয়া চলে। পাকা রাস্তায় যাইতে হইলে মধ্যে জয়সিংপুর এবং অহল্যিয়াগঞ্জ পড়িয়া থাকে। অর্দ্ধেক রাস্তায় একটা বৃহৎ খাত আছে; সেতুর দ্বারা তাহা পার হইতে হয়। ১৮৯০ সংবতে সেতুটী মাধোজি সিন্ধিয়ার কন্যা বালা বাই-দ্বারা নির্ম্মিত হয়। সন্নিকটে একটী সান-বাঁধান পুষ্করিণী অবস্থিত। ১৮৭২ খৃঃ দিল্লী-নিবাসী লালা কিশনলাল নামে জনৈক মহাজন এই পুষ্করিণীটী খনন করান। রাস্তাটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পুরাতন রাস্তাটী যমুনার নিকট দিয়াই গিয়াছিল। বৃন্দাবনের বাহিরে প্রথম দুই মাইল পর্য্যন্ত এই রাস্তার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই পার্শ্বে পাদপশ্রেণী এবং অনেকগুলি সুবৃহৎ হর্ম্ম্যাবলী রাস্তাটীর সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাদিগের প্রথমটী একটী বৃহৎ উদ্যান। বাগানটী ইষ্টক-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। গুজরাট-দেশবাসী কুশাল নামে জনৈক ধনাঢ্য শেঠ ইহার

নির্মাতা। ইঁহারই নির্ম্মিত একটী সুন্দর মন্দির মথুরাতে দেখা যায়। রাস্তার বিপরীত দিকে একটু দূরেই একটী সুন্দর বোয়ালী অবস্থিত। বাঙ্গালায় বোয়ালীকে বৃহৎ কূপ বলে। উক্ত কূপের সোপানাবলীর সংখ্যা ৫৭টী। সিঁড়িগুলি লাল প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইন্দোরের সুপ্রসিদ্ধা রাণী অহল্যা-বাই উক্ত বোয়ালীর খননকর্ত্রী। কিছু দূরে অক্রূর-নামক গ্রামে ভাতরন্ধ নামে একটী মন্দির আছে। ইহাতে "বিহারী জী"র বিগ্রহ বিরাজিত। ইহার বিপরীত দিকে শেঠদিগের উদ্যান। মধ্যস্থলে যে স্থান অবস্থিত, তাহাতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ভাত-মেলা হইয়া থাকে। এই সময়ে কটকের উপরে যে-সকল উচ্চপদস্থ দর্শক থাকেন, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এক দিবস কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে বাটী হইতে বহির্গত হইবার সময় সঙ্গে আহার্য্যদ্রব্য কিছুই লয়েন নাই বলিয়া এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভাত যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই মেলাটী সেই ঘটনার স্মারক।

বর্ত্তমান সময়ে বৃন্দাবনের মিউনিসিপালিটির সীমানায় অন্যূন এক সহস্র মন্দির আছে। ভিন্ন ভিন্ন বদান্য ব্যক্তির দ্বারা ৩২টী ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে দুইটী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। একটীর নাম ব্রহ্মকুণ্ড এবং অপরটীর নাম গোবিন্দকুণ্ড। প্রথমটী শেঠের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত; পরন্তু তাহা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। শেষোক্তটী মথুরার রাস্তার সন্নিকটে। পূর্ব্বে ইহা একটী সামান্য পুষ্করিণী ছিল; কিন্তু ১৮৭৫খৃঃ বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী রাজসাহী-প্রদেশের নিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী কালীসুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়ার অনুকম্পায় ত্রিশ সহস্র মুদ্রার ব্যয়ে কুণ্ডটীর চতুস্পার্শ্ব এবং সোপানাবলী পাকা গাঁথুনির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। তৃতীয় পুষ্করিণীটী কেওয়াড়-বনে অবস্থিত। কুণ্ডটী অশ্বত্থ, ডুমুর এবং কদম্ব-বৃক্ষদ্বারা নিষেবিত। মদনমোহনের মন্দিরে যাইতে হইলে যে স্থান হইতে বাঁকিতে হয়, সেই স্থানে কুণ্ডটী অবস্থিত। বনযাত্রাকালে এই স্থানটীতে আসিয়া থাকিতে হয়। দাবানল-বিষয়ে এই স্থানটী সম্বন্ধীভূত, যদিও কিংবদন্তীটা নদীর পরপারে ভদ্রবনেই শুনা যায়। এখানে দাবানল-বিহারীর মন্দির অবস্থিত। এখানকার গোঁসাই নিম্বারক বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত। বনের সংলগ্নীকৃত একটি উদ্যান আছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। উদ্যানটী টিহরী রাজার সম্পত্তি, কিন্তু তথাকার জল অত্যন্ত খারাপ বলিয়া উদ্যানটী বহুদিন হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানে ময়ূর ও বানর দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের সেবার জন্য কোটা ও ভরতপুরের রাজা টাকা জমা দিয়াছেন। এখানে প্রায় ৫০টা সত্র আছে। গরীব লোকে এখানে ভিক্ষা পাইয়া থাকে। সহরের লোক-সমষ্টির সংখ্যা ২১০০০, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈরাগী এবং বৈষ্ণবদিগের সংখ্যা প্রায় দেড় ভাগ। মুসলমান-রাজত্বকালে মুসলমানগণ বৃন্দাবনের নাম মিটাইয়া মুমিনাবাদ নাম দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে-চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বৃন্দাবনে মুসলমানের সংখ্যা অতীব কম। প্রায় ৫০ ঘর মুসলমানের বসতি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও সহরের বহির্ভাগে—ভিতরে নহে।

মন্দির-রাজী।

বৃন্দাবনে সর্ব্বপ্রথমে যে মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহা বৃন্দাদেবীর। কিন্তু এখন তাহার কোন নিদর্শন নাই। জনশ্রুতি এইরূপ যে, তাহা সেবাকুঞ্জে গঠিত হয়। সেবাকুঞ্জটী এখন প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। এই উদ্যানের মধ্যে রাসমণ্ডল অবস্থিত এবং তাহার সন্নিকটে একটি সরোবর আছে। বৃন্দাদেবীর মন্দিরের প্রখ্যাতি যখন দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়িল, তখন ১৫৭৩খৃঃ সম্রাট্ আকবর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গোঁসাই-গণকে দেখা দিতে রাজি হন। সম্রাটের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া নিধুবনে লইয়া যাওয়া হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে, উক্ত স্থানে সম্রাট্ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া স্থানটীর পবিত্রতা উপলব্ধি করেন। সমবেত রাজন্য-মণ্ডলী যখন উক্ত স্থানে মন্দিররাজী নির্ম্মাণের বাসনা প্রকটিত করেন, সম্রাট্ তখন তাহাতেই সায় দেন। সম্রাটের আগমনকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চারিটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেগুলির নাম—(১) গোবিন্দ দেব, (২) গোপীনাথ, (৩) যুগলকিশোর এবং (৪) মদনমোহন। এতন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমটীই সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। যুক্ত প্রদেশে, বোধ হয়, এমন সুন্দর মন্দির আর নির্ম্মিত হয় নাই। উক্ত প্রদেশ-মধ্যে হিন্দু শিল্পের ইহাই জাজ্বল্যমান প্রমাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্ট জন্মিবার ১৬৪৭ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির রূপ ও সনাতনের মতানুসারে জয়পুরের রাজা মানসিংহ-দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ঔরঙ্গজিবের ভয়ে মন্দিরের বিগ্রহটীকে জয়পুরে লইয়া যাওয়া হয়। তদবধি মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য আর হয় নাই। সুতরাং তাহা ক্রমশঃ ভগ্নদশাগ্রস্ত হয়। গ্রাউস-সাহেব যখন মথুরার কলেক্টর ছিলেন, তখন তিনি মন্দিরের ভগ্নাবস্থা গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করান। এই সময়ে জয়পুরের মহারাজ মন্দির-সংস্কারের জন্য পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে, মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রদত্ত মুদ্রা যথেষ্ট না হওয়াতে অচিরে তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। ১৮৭৫খৃঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট Sir John Strachey সাহেব ৩৮,৩৬৫৲ টাকা প্রদান করেন এবং তদ্দ্বারা মন্দিরের রীতিমত সংস্কারকার্য্য সমাধা হয়। মন্দিরের সরবরাহের জন্য গ্রাম অর্পিত আছে বটে, কিন্তু তাহা অতিসামান্য। জয়পুরে এবং আলোয়ারে মোটে একটী মাত্র গ্রাম আছে। বৃন্দাবনের সম্পত্তি ক্রমশঃ অল্প হইয়া আসিয়াছে; তবে সুখের বিষয় এই যে, প্রতিবৎসর প্রায় ২০ সহস্র মুদ্রা যাত্রীদিগের নিকট হইতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সংস্কারের ভার এখন সরকারী পাবলিক ওয়ার্কসের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

মদনমোহনের মন্দিরটী কালীয়মর্দ্দনের উচ্চ টীলায় অবস্থিত। সাধারণতঃ লোকে কালীয়মর্দ্দনকে কালীদয়-ঘাট বলে। জনশ্রুতি এইরূপ যে,পঞ্জাবের অন্তঃপাতী মুলতান-নামক সহরের অধিবাসী রামদাস নামে জনৈক ক্ষত্রিয় সওদাগর, বাণিজ্য বস্তুতে পূর্ণ একখানি তরী আরোহণ করিয়া আগ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ কালীয়মর্দ্দনের চড়ায় নৌকা লাগিয়া যাওয়াতে তরী আর হটিল না। তিন দিবস বৃথা চেষ্টার পর তিনি দৈব-সাহায্যের প্রয়াসী হইয়া দুঃশাসনপর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক

সনাতনের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। সনাতনের নিকট মদনমোহনের বিগ্রহ ছিল। তিনি তাঁহাকে উক্ত দেবতার আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। রামদাসের স্তবও সমাপ্ত হইল; অমনি নৌকাও জলে ভাসিতে লাগিল। আগ্রায় যাইয়া তিনি সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্যাদি-বিক্রয় করিয়া ধন আনয়নপূর্ব্বক সনাতনের হস্তে দেন এবং তদ্দ্বারা একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রার্থনা করেন। মন্দির নির্ম্মিত হইল। ১৮৭৫খৃঃ গ্রাউস সাহেব মন্দিরটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করেন। সনাতনের নিকট মদনমোহনের যে বিগ্রহ ছিল, তাহা এখন করোউলিতে আছে।

মদনমোহনের মন্দিরে প্রথমে বঙ্গভাষায় ও পরে নাগরী অক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোক ক্ষোদিত দেখা যায়ঃ—

হর ইব গুরুবংশো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুণিমণিরিব পুত্রো যস্য রাধাবসন্তঃ।
স্বকৃতসুকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
ব্যথিতবিধবদেন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ॥

মন্দিরের আয় ১০, ১০০৲ টাকা; তন্মধ্যে ৮ হাজার টাকা দর্শকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাকী সমর্পিত সম্পত্তি হইতে উঠিয়া থাকে। রাধাকুণ্ডে ইহার একটী শাখা আছে।

রাজা গোপাল সিংহ স্বীয় শ্যালকের নিকট হইতে মদনমোহনের বিগ্রহ লইয়া করৌলিতে স্থাপন করেন এবং রামকিশোর গোঁসাইকে সেবাইত নিযুক্ত করেন। গোঁসাই ঠাকুরের বাটী মুর্শিদাবাদ এবং তিনি বাঙ্গালি। বিগ্রহ-সেবার জন্য ২৭ হাজার টাকার বার্ষিক আয়ের ইহার জমিদারী আছে। দিনে সাতবার করিয়া দেবতার ভোগ হয়; তন্মধ্যে দুইবার রাজভোগ। মধ্যাহ্ন এবং শয়নকালই রাজ-ভোগের সময়। মধ্যে যে পাঁচবার ভোগ দেওয়া হয়, তাহাতে সামান্য মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়া থাকে। এই পাঁচবারের নাম—(১) মঙ্গল আরতি [প্রভাতে]; (২) ধূপ [বেলা ৯ টার সময়]; (৩) শৃঙ্গার [বেলা ১১ টার সময়]; (৪) পুনরায় ধূপ [৩ টার সময়] এবং (৫) সন্ধ্যা আরতী [গোধূলির সময়ে]।

সুরদাস-নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধু প্রণীত ভক্তমালা-নামক গ্রন্থে মদনমোহনের মন্দির-সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বিবরণ আছে। আকবরের রাজত্বকালে ইনি সাণ্ডিলার আমীন (শাসন-কর্ত্তা) ছিলেন এবং উক্ত মন্দিরে তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রাজ-কোষ নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। তখন তহবীলের ভিতর তিনি প্রস্তর ভরিয়া দিল্লিতে প্রেরণ করেন। রাজকর্ম্মচারীরা যখন তহবীল উদ্ঘাটন করেন, তখন প্রস্তর দেখিইয়াই অবাক্ হন। এরূপ অদ্ভুত কাহিনী আকবরের কোষাধ্যক্ষ টোডারমলও বিশ্বাস করেন নাই। বলা বাহুল্য, সাধু কারাগারে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে ভুলিলেন না। সাধুর মুক্তির জন্য আকবর স্বপ্নে দেবাদেশ পান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আগমনী।

ললিত মিশ্র—একতালা।

ওগো আনন্দময়ী জননী,—
চরণে তোমার প্রণমি!
তব প্রেম মুখে চাহিয়া,
যাব সুখে গান গাহিয়া;
বিপদ্ আপদ্ দুঃখ ক্লেশ—
কোন বাধা নাহি গণি!

বহু দিন পরে জননী
এসেছ দীনের দ্বারে,—
লও হৃদয়ের পূজা-উপহার
ভক্তি-কুসুম-হারে?

থাক গেহ আলো করিয়া—
যেয়ো না যেয়ো না সরিয়া,—
প্রেমে গানে প্রাণ ভরিয়া—
বিতর প্রসাদ জননী!!

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী

২´ ৩ ০ ১ -মপা -ক্ষ
II { র্সা র্সা সা। ঋসা -সমা মা। মপা গা পা। মা গা সা I
ও গো আ ন• •ন্ দ ময়ী জ ন নী • • •

২´ ৩ ০ ১
I না না না। র্সা র্সা র্সা। -া র্সা র্রা। র্সনা -দপা -মগা } I
চ র ণে তো মা র ০ প্র ণ মি০ • • ০ •

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II { দা দা দা। দা দা দা। -া না না। র্সা -া -া I
ত ব প্রে ম মু খে • চা হি য়া ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ঋা ঋা -া। ঋা ঋা র্সর্সা। -া না না। র্সা -া -া } I
যা ব • সু খে গান • গা হি য়া • •

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা। নাঃ -ঃ দা। -া পা া I
বি প দ্ আ প দ্ দুঃ খ ক্লে • শ •

২´ ৩ ০ ১
I মা মা মা। মা -া মা। পা গা -পা। মগা -ঋা -গা II
কো ন বা ধা ০ না হি গ ০ নি০ ০ ০

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১
II { সা সা সঋা। মা মা মা। গা পা মা। -া -া -া I
ব হু দি০ ন প রে জ ন নী ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I মা মা মা। মা মা পা। গপা মা -া। -া -া -া I
এ সে ছ দী নে র ঘা০ রে

২´ ৩ ০ ১
I গগা া ঋা। ঋা গা গা। ঋা ঋা ঋা। ঋা সা -া I
লও ০ হৃ দ য়ে র পূ জা উ প হা র

২´ ৩ ০ ১
I সা -মা মা। মা মা পা। গপা -া মা। -মগমা গঋসা -া } I
ভ ক্ তি কু সু ম হা০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

আভোগ।

২´ ৩ ০ ১
I { দা দা দা। দা দা দা। -া না না। র্সা -া -া I
থা ক গো হ আ লো ০ ক রি য়া ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ঋা ঋা ঋা। ঋা ঋা র্সা। -া না না। র্সা -া -া } I
যে য়ো না যে য়ো না ০ স রি য়া ০ ০

I র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সার্ঋ। না না দা। -া -পা } I
প্রে মে গা নে প্রা ণ ভ রি যা ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I মা মা মা। মা মা -া। পা গা পা। মগা -ঋা -সা II II
বি ত র প্র সা ০ দ জ ন নী ০ ০ ০

লীনার শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

শয়নকক্ষে লীনাকে পোষাক বদলাইয়া শোয়াইতে আসিয়া প্রৌঢ়া আয়া বিষন্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে বারংবার লীনার মুখপানে চাহিতে লাগিল; কিন্তু সেই রক্তহীন শুষ্ক শুভ্র মুখের উপর নীল পেন্সিলের পরিষ্কার দাগ-টানার মত গোটাকতক শিরার অস্বা-ভাবিক স্ফীতি ছাড়া আর কিছুই সে দেখিতে পাইল না। বিদায় লইবার সময় আয়া কুণ্ঠিতমুখে বলিল, "আজ আপনার শরীর ভাল নাই, যদি রাত্রে হঠাৎ দরকার হয়, আমরা পাশের কামরায় থাক্‌ব কি?"

লীনা অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল—"না, দরকার নাই। তোমরা ছাদের কামরায় যেমন থাক, তেম্নি থাকো গে।—"

আয়া প্রতিবাদের ইচ্ছায় ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, লীনা বিরক্তস্বরে বলিল, —"ঐ ঘুপ্‌সী ছোট্ট ঘরের মধ্যে হাওয়ার সম্পর্কমাত্র নাই। ওর ভেতর তোমরা আজ থেকে, কাল অসুখ বাধিয়ে বোসো, তারপর আমায় দেখ্‌বে কে? তোমাদের অসুখ মানেই,—আমার বিপদ্‌ বাড়ানো। যাও,—আমায় ত্যক্ত কোর না।"

আয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। লীনা আলো কমাইয়া, বিছানায় শুইল; আড়ষ্ট-কাঠ হইয়া, পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, অতঃপর তাহার কর্ত্তব্য কি।

লীনার শয়নকক্ষের অন্য পাশে লাইব্রেরী-ঘর। পিকক্‌ যখন আসিতেন, সেই ঘরেই শুইতেন। আজও আহারের পর তিনি সটান সেই ঘরে ঢুকিয়া চুরুট ও বই লইয়া বসিয়াছেন। আহারের পরই ঘুমান তাঁহার অভ্যাস ছিল না; ঘণ্টাখানেক এই সব লইয়া জাগিয়া থাকিতেন। লীনার অভ্যাস অনভ্যাস বলিয়া কোন কিছুর বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না;—যতক্ষণ শরীরের সহিত, ততক্ষণ সে বেড়াইয়া, বসিয়া, গল্প-গুজব করিয়া পড়িয়া শুনিয়া সময় কাটাইত; শরীর ক্লান্তিভারে অবসন্ন হইলেই সে আসিয়া শয্যা লইত।

আজ লীনার শরীর ভাল ছিল না, মনও যথেষ্ট অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মনে পড়িতে লাগিল, স্বামীর সহিত গোপনে মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য অনেকগুলা প্রয়োজনীয় কথা তাহার আছে। সেগুলা শেষ না করিলে রাত্রে যে লীনার ঘুম হইবে না, এমন নয়,—কিন্তু সে অপ্রিয় প্রসঙ্গ লইয়া দিনের আলোয়, চাকর-বাকরদের চোখের সামনে আলোচনা করিবার সাহস তাহার নাই। অধৈর্য্য উগ্রপ্রকৃতি স্বামী চটিয়া উঠিয়া সকলের সামনেই তাহাকে ইতরভাবে অপমান করিবেন।—ইচ্ছা করিয়া সে লাঞ্ছনা ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? এই গোপনতার সুযোগে সে অপমান গোপনে সহিয়া লইবার সুন্দর অবসর।—কারণ, কথাগুলা বলিতেই হইবে, এবং অপমান সহিতেও সে বাধ্য।

লীনার মাথা ঘামিতে লাগিল। জোর করিয়া বিছানা হইতে অবসন্ন শরীরটা টানিয়া তুলিয়া, চটি-টা পায়ে দিয়া একটা হাল্কা শাল গায়ে জড়াইয়া ধীরে ধীরে লাইব্রেরী-ঘরে যাইবার দুয়ারটার কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল। 'ডোর-স্প্রীং'-আঁটা দুয়ারটা সজোরে টানিয়া খুলিবার জন্য পিতলের হ্যাণ্ডেলটা চাপিয়া ধরিয়া সহসা লীনার হাত-পা হইতে শেষে মাথা পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ এমন একটা অভাবনীয় আতঙ্ক-ব্যথা উন্মাদবেগে আসিয়া সজোরে তাহার হৃৎপিণ্ডটা মুচড়াইয়া ধরিল যে মুহূর্ত্তের জন্য লীনার যেন শ্বাসবন্ধ হইয়া গেল! প্রাণহীন মৃতের মত মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লীনার অজ্ঞাতেই তাহার শিথিল মুষ্টি হ্যাণ্ডেলটা ছাড়িয়া দিল। মূঢ়ের মত আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লীনা ধীরে ধীরে ফিরিল। চটি খুলিয়া খালি পায়ে সেই ম্যাটিং করা মেঝের উপর ধীরে ধীরে পা-চারি করিতে করিতে, সে এই আকস্মিক উত্তেজনটা নিঃশব্দে সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাটিল। ক্লেশবহ চিন্তার দ্বন্দ্বে আপন-হারা লীনা হঠাৎ এক সময় শব্দ শুনিয়া চমকিয়া বুঝিল, পাশের ঘরে স্বামী এবার চেয়ার ছাড়িয়া, পোষাক বদলাইয়া শয্যায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। মৃদু শব্দগুলা একটার পর একটা কাণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। লীনা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়ভাবে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। আর বেশী দেরী করা তো চলিবে না! দুয়ারের কাছে সরিয়া আসিয়া, হ্যাণ্ডেলটা টানিয়া দুয়ার একটু ফাঁক করিয়া নিম্নস্বরে লীনা বলিল, "আমি আস্‌তে পারি?"

পিকক্ তখন আলো নিবাইয়া শয্যায় শুইয়াছেন। মশারীর ভিতর হইতেই তিক্ত-স্বরে বলিলেন, "প্রয়োজন?"

গলা ঝাড়িয়া লীনা স্পষ্টস্বরে বলিল, "কতকগুলা দরকারী কথা আছে।"

বিরক্তির সহিত ঝাঁঝিয়া উত্তর হইল—"এসো।"

মূঢ়ের মত ক্ষণিকের জন্য চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বেদনাক্রান্ত মৃদু নিঃশ্বাস ছাড়িয়া লীনা ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সাবধানে চেয়ার টেবিলের ধাক্কা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া মশারী-ফেলা খাটের শিয়রে পাতা 'আর্ম চেয়ার'টা দখল করিয়া পা গুটাইয়া সে বসিল। খালি পায়ে চলা-ফেরা করার জন্য অনেকক্ষণ হইতেই পা-দুইটায় শীত বোধ হইতেছিল; অন্যমনা থাকায় লীনা এতক্ষণ তাহা টের পায় নাই। এবার গরম শালে মুড়িয়া পা-দুইটাকে একটু আরাম দিতে গিয়া সে দেখিল, দুই চরণই বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে!—সমস্ত রক্ত মাথায় চড়িয়া, দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে পীড়ন সুরু করিয়াছে! কিন্তু নিজের শারীরিক যন্ত্রণার দিকে মনোযোগ দিবার মত লীনার মনের অবস্থা তখন মোটেই ছিল না। পা-দুইটা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া, গরম করিতে করিতে, মৃদুস্বরে সে বলিল, "আমি যা বল্‌তে চাই, দয়া করে সেগুলো মন দিয়ে শুনে সঠিক জবাব দেবে?"

কড়া গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে পিকক্ উত্তর দিলেন—"অত ভূমিকা আড়ম্বরের দরকার থাকে তো, উঠে যাও, মিছে ত্যক্ত কোর না।"

দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া ঈষৎ তীব্রস্বরে লীনা বলিল,"আমি আহোরাত্রই তো তোমায় মিছে ত্যক্ত করছি; তবু এই ঘুমের সময় অতিরিক্ত জ্বালাতন করতে বাধ্য হচ্ছি, উপায় নাই বলে।—মাপ করো।"

পি। কি বল্‌বার আছে ছাই, বল শীগ্রী।—

লী। সংক্ষেপেই বল্‌ছি। প্রথম কথা, পার্সন কোথায় গেছেন, কি বৃত্তান্ত, সে খোঁজ নেবার জন্ম অমন ভাবে ছুটে যাওয়ার আবশ্যকতা তোমার কি?"

রুষ্ট গর্জ্জনে উত্তর হইল—"খুসী আমার।

লী। সুসংবাদ! তোমার যথেচ্ছ খুসীর চরণে আত্ম বলি দিয়ে চলবার জন্ম আমি আজীবন বাধ্য, কিন্তু পার্সন কুমারী সন্ন্যাসিনী,—আমাদের অল্প দিনের পরিচিত প্রবাসের বন্ধু মাত্র। তাঁর আচরণ-সম্বন্ধে কোন ঘৃণিত সন্দেহ প্রকাশ করবার কি অধিকার তোমার আছে, জান্‌তে চাই।—

অধৈর্য্যস্বরে উত্তর হইল—"তুমি অতিশয় সঙ্কীর্ণহৃদয়া নারী, অত্যন্ত নীচমনা—"

বাধা দিয়া লীনা বলিল, "তথাস্তু, কিন্তু পরম উদারহৃদয়, উচ্চ-মনা ভদ্রলোক তুমি, তুমি শপথ করে সত্য বল দেখি,—পার্সনের সম্বন্ধে তুমি মনে মনে যে নীচ ধারণা পোষণ করেছ, সেটা কোন্ উচ্চতর, কোন্ ভদ্রতার দোহাই দিয়ে?"

পিকক্ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তারপর সহসা কণ্ঠস্বর নরম করিয়া উত্তর দিলেন—"তুমি কি স্বেচ্ছায় নিজের অপমানকে ডেকে আন্‌তে চাও?"

শান্ত স্থির কণ্ঠে লীনা উত্তর দিল—"তোমার কাছে আমার সম্মানের মূল্য কতটুকু, সেটা তোমার স্ত্রী হ'বার পর থেকে হাড়ে হাড়ে জেনে নিয়েছি। আজ এখানে তুমি নূতন করে কি অপমানের ভয় আমায় দেখাতে চাও? নিজের মান-মর্য্যাদা নিয়ে তোমার কাছে মানের কান্না আমি কাঁদতে আসি নি; আমি এসেছি পার্সন-সম্বন্ধে প্রশ্ন নিয়ে।—"

খুব ঠাণ্ডাস্বরে পিকক্ উত্তর দিলেন—"কাল সকালে চায়ের টেবিলে সে-কথার আলোচনা হবে, আমি সমস্ত তোমায় বুঝিয়ে দেব। আজ যাও, ট্রেনের ঝাঁকুনীতে আজ আমার শরীর ক্লান্ত হয়ে রয়েছে, ঘুমুতে দাও।"

লীনা দুই মুহূর্ত্তের জন্ম চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে বলিল, "এর পর আমার উঠে যাওয়াই উচিত, কিন্তু তা আমি যেতে পারছি নে, মাপ করো। পার্সনের প্রতি তোমার এ-ব্যবহারের কারণ কি, সেটা আজ রাত্রেই আমি জান্‌তে চাই।—"

পিকক্ খানিকটা ভাবিয়া উত্তর দিলেন—"আমার ব্যবহারের কারণ আমি পার্সনের কাছেই খুলে বল্‌ব, সেটা তোমার জান্‌বার কোন দরকার নাই।"

লীনার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে সক্রোধে বলিল, "কোন দরকার নাই? বাঃ! আমার সাম্‌নে তুমি একজন নিরপরাধা ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে অযথা অপমানসূচক বাক্য উচ্চারণ

কর্‌বে, আর আমি নির্জ্জীবের মত তাই দেখ্‌ব? তোমার অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌বার্ দরকার আমার নাই,—কিন্তু যিনি এর বিন্দু-বিসর্গও জানেন না, সেই পার্সনের কাছে তুমি ছুটবে তোমার হীন ধারণার কৈফিয়ৎ দিতে?—কথাটা মুখে আন্‌তে তোমার লজ্জা হোল না?"

তাচ্ছীল্যের স্বরে পিকক্ বলিলেন, "মিছে বক্‌বক্ কোর না! পার্সন এর বিন্দু-বিসর্গ জানেন না! তুমি আদ্যোপান্ত সব খবরই তো রাখো! ডবসনের কুঠিতে পার্সনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সেটা জানো?"

আতঙ্কিত হইয়া লীনা বলিল, "কি? সত্যি তুমি ডবসনের কুঠি পর্য্যন্ত গেছ্‌লে তা হলে?—"

পরম ঔদাস্যের সহিত উত্তর হইল—"হাঁ, তাতে হয়েছে কি?—"

থামিয়া, নিজেকে সামলাইবার জন্য একটু দম লইয়া, লীনা বলিল, "হয় নি কিছু, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তুমি সে-সময় হঠাৎ ডব্‌সনের কুঠিতে পার্সনকে খুঁজতে গেছ্‌লে, সে রহস্যটাও গোপন রাখো নি, আশা করি?"

নিরঙ্কুশ দার্ঢ্য-সহকারে উত্তর হইল,—"না তা তো রাখিই নি! আমি তোমাদের মত কৃত্রিম ভদ্রতার চরণে দাসখৎ লিখে 'পেটে এক মুখে এক' ব্যবহার মোটেই ভালবাসি নে। আমার মনে যে সংশয় জেগেছিল, আমি হাতে হাতে পরিষ্কার প্রমাণ নিয়ে সেটার স্পষ্ট মীমাংসা শেষ করে নেওয়াই পছন্দ করি।"

লী। পার্সনকে কি জানিয়ে দিয়েছ যে, তুমি তাঁর সম্বন্ধে একটা ঘৃণিত সন্দেহ-কল্পনায় অধীর হয়েই হঠাৎ ডব্‌সনের বাড়ীতে তাঁকে খুঁজ্‌তে গেছ্‌লে?"

"হ্যাঁ তা বলেছি বৈ কি, তা'তে তোমার কি?—"

লীনা হতবুদ্ধির মত খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, "সেখানে গিয়ে তোমার সন্দেহের অনুকূল প্রমাণ কি দেখ্‌লে? পার্সন কি ডবসন-সাহেব বা অন্য কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আপত্তিকর নিভৃত-আলাপে নিযুক্ত ছিলেন?

কোন উত্তর না দিয়া পিকক্ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। লীনা উত্তর-প্রত্যাশায় মিনিট-পাঁচেক ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ বলিল, "উত্তর দাও, পার্সনকে সেখানে কি অবস্থায় দেখ্‌লে? ডবসন্ কুঠিতে ছিলেন?"—

কোন উত্তর নাই। লীনা আবার খানিকটা অপেক্ষা করিয়া বলিল, "কথাগুলা শুন্‌তে পাচ্ছ?"

পিকক্ নীরব। লীনা খানিকটা নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, "আমার প্রশ্নগুলার উত্তর পাব না?"—

পিকক্ নিরুত্তর। যথেষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া লীনা উঠিয়া দাঁড়াইল; তীব্রস্বরে বলিল, "সম্ভ্রান্ততার মর্য্যাদা-দম্ভের আড়ালে যে ইতরামি লুকানো থাকে, সেই ইতরামিকেই আমি জগতের চরম ঘৃণার্হ বস্তু বলে মনে করি। তোমার স্বভাব-সংশোধনের জন্য আমি প্রাণ-পণে যতটুকু চেষ্টা কর্‌তে চেয়েছি, সে চেষ্টা আমার প্রাণান্তিক লাঞ্ছনার কারণ হয়েই

দাঁড়াচ্ছে, দেখ্‌ছি! তুমি অন্ধ জেদের বশে আমার মনের উপর যে বিষ ঢাল্‌তে সুরু করেছ, সে-বিষে আমার সমস্ত প্রকৃতি আগাগোড়া বিষাক্ত—বিকৃত হয়ে যেতে বসেছে! তুমি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে, ক্রমশঃ আমায় যেখানে নামিয়ে নিয়ে চলেছ, জেনে রেখো সেখান থেকে, তোমার ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রাখ্‌বার শক্তি আর আমার মোটেই থাকবে না।"

দুয়ারের কাছে গিয়া লীনা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। অধিকতর কঠিন কণ্ঠে বলিল, "তোমার নির্লজ্জ অভদ্রতার অত্যাচার আমি নিঃশব্দে সহ্য করে চলেছি, কিন্তু এই নীরব সহিষ্ণুতার সঙ্গে আমার বিবেক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে, বুকের ভিতর ঘৃণার ধিক্কার দিনের দিন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌ছে—"

লীনার কথা শেষ হইতে না হইতে, হঠাৎ পিকক্ মশারী খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া লীনার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও লীনার দুই হাত ধরিয়া সবেগে ঝাঁকানী দিয়া উগ্র-কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আমার স্ত্রী কি না আমি জান্‌তে চাই।"

লীনা স্তম্ভিত হইয়া গেল! সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়াই স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে আঁধারের গাঢ় আবরণ ভেদ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না;—অনুভব করিল, শুধু যেন, স্বামীর ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার সামনে এক দুর্দান্ত দানবের ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে! কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া শুষ্ককণ্ঠে লীনা বলিল, "এ প্রশ্নের অর্থ কি? আজ স্ত্রীর অনুচিত ভাবে অপ্রিয়-রূঢ় সত্য তোমার মুখের ওপর প্রকাশ করেছি বলে, সেই অপরাধের কৈফিয়ৎ চাও?"

উত্তেজিত স্বরে পিকক্ বলিলেন, "হাঁ তাই। মনে আছে কি,—গির্জ্জায় বিবাহের সময় তুমি শপথ করে স্বামীর সমস্ত আদেশ পালনের বাধ্যতা স্বীকার করেছ? মনে আছে সে অঙ্গীকার?"

লীনা উত্তর দিল—"হাঁ আছে, খুব আছে, কিন্তু স্বামীর ভুলকে সংশোধন কর্‌বার অধিকার,—স্বামীর অন্যায়-উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধ একগুয়েমির প্রতিবাদ কর্‌বার অধিকার, সকল-স্ত্রীরই আছে"—

লীনার কথা শেষ হইতে না হইতে পিকক্ অপরিসীম ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কখনই না! স্বামীর ওপর কোন কর্ত্তৃত্ব কর্‌বার কোন অধিকার কোন স্ত্রীর কিছুমাত্র নাই! স্বামীর ওপর সে-রকম কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনের চেষ্টা যে স্ত্রী করে, সে স্ত্রী-নামের অযোগ্যা!

লীনা খুব শান্তস্বরে উত্তর দিল-"সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার কর্‌ছি,—ন্যায়পরায়ণ সুযোগ্য স্বামীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রে যে স্ত্রী অন্যায়-ভাবে কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনের চেষ্টা করে, সে স্ত্রী একান্ত হতভাগিনী! কিন্তু ভাল ক'রে ভেবে দেখো দেখি, তোমার ওপর সে-রকম কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনের চেষ্টা আমি কখনো করেছি কি? তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘনের ভয়ে, এতদিন তোমার সমস্ত ন্যায়-অন্যায় আমি নিঃশব্দ-ধৈর্য্যে সহ্য করি নি কি? ভেবেছিলাম, তোমার সমস্ত ত্রুটি তুমি নিজেই একদিন সংশোধন কর্‌তে সচেষ্ট হবে; কিন্তু তোমার ভেতর সে চেষ্টা আপনা থেকে কিছুতেই

জাগ্‌ল না;—তোমার অত্যাচার-প্রবৃত্তি দিনে দিনে বেড়েই উঠছে, তুমি নিজের ভদ্রত্বের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত ভুলে যেতে বসেছ! তোমার—”

“চুপ করে থাক, চলে যাও,”—পিকক্‌ ক্রোধ ভরে দ্বারের দিকে আঙুল দেখাইলেন। লীনা কম্পিতচরণে অগ্রসর হইয়া, নিজের অজ্ঞাতেই শুষ্ককণ্ঠে চিরাভ্যস্ত বুলী উচ্চারণ করিল—“শুভ রাত্রি।” পর-মুহূর্ত্তেই সে দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।—

(৬)

পরদিন সকালে লীনার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা প্রায় ন’টা। বিছানা হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া, বিরক্তি-গ্লানি-জড়িত স্বরে লীনা আয়াকে ডাকিল। আয়া দুয়ারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল; ত্রস্তে ঘরে ঢুকিল। লীনা ঘড়ির দিকে ইসারা করিয়া বলিল, “এত বেলা পর্য্যন্ত আমার ঘুম ভাঙাও নি কেন?”

আয়া বলিল, “সাহেব বারণ করে গেছেন।”

লী। বারণ করে গেছেন? কোথায় তিনি?

আয়া। শীকারে বেরিয়েছেন।

লী। কখন?

আ। ঠিক সাড়ে ছ’টায়।

লী। প্রাতরাশ সেরে গেছেন?

আ। হাঁ।

লী। সঙ্গে বেয়ারা কেউ গেছে? কুন্দন?

আ। না, তিনি কাউকে সঙ্গে নেন নি।

লীনা উঠিয়া বসিল; গুম্‌ হইয়া খানিকটা কি ভাবিল, তারপর বিরক্তির সহিত বলিল, “তোমরা এত বেলা পর্য্যন্ত আমায় ঘুমুতে দিয়ে ভাল কর নি; আমার শরীর বড় অবসাদগ্রস্ত বোধ হচ্ছে।”

আয়া সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘন ঘন লীনার চোখের দিকে এবং মাথার বালিশটার দিকে চাহিতে লাগিল। লীনা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, “কি দেখছ?”

আয়া কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, “আপনার চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, মাথার বালিশ-টাও ভিজে দেখ্‌ছি, রাত্রে কোন দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদেছিলেন বোধ হয়।”

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নয়, জাগ্রৎ অবস্থাতেই যতক্ষণ না ঘুম আসিয়াছিল, ততক্ষণ অনর্গল অশ্রুস্রোত যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিঃশব্দে চোখ দিয়া ঝরিয়াছিল, সে কথা লীনার মনে পড়িল। আয়ার প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া, কার্য্যান্তরে মন দিল।

প্রাতরাশের জন্য লীনা টেবিলে বসিতেছে, এমন সময় বেহারা আসিয়া খবর দিল, “ছোট মিশনরী মেমসাহেব পার্সন আসিয়াছেন।” গত রাত্রির কথাগুলা তখন লীনা মনে মনে তোলা পাড়া করিতেছিল। পার্সনের আগমন-সংবাদে হঠাৎ তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হইয়া গেল। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, “সেলাম দাও।”

মুহূর্ত্ত-পরেই সদানন্দময়ী পার্সন প্রসন্ন

হাস্যোজ্জ্বল মুখে ঘরে ঢুকিয়া 'সুপ্রভাত'-সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আজ রবিবার আপনাকে গির্জ্জায় ধরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি, চলুন।"

লীনা চমৎকৃত হইয়া গেল! এ কি ব্যাপার! তবে কি পিকক্ কাল রাত্রে লীনাকে সব মিথ্যা বলিয়াছেন? পার্সনের প্রতি তাঁহার ভদ্রাচার-শূন্য ব্যবহারটা তবে সম্পূর্ণই মিথ্যা কথা! নিশ্চয়!......তাহাই তো হওয়া সম্ভব। সত্যই পিকক্ কিছু ক্ষেপিয়া উঠেন নাই, যে পার্সনের মত একজন সম্রান্ত পদস্থা ভদ্রমহিলাকে অকারণে অযথা অপমান করিবেন! যাক্, ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, বাঁচা গেল!

স্বগত চিন্তাকে সবলে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া, তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টানিয়া পার্সনকে বসিতে দিয়া লীনা স্মিতমুখে বলিল, "বসুন, বসুন,—আজ রবিবার? কিচ্ছু খেয়াল নাই! গাধার মত পড়ে পড়ে এমন ঘুমিয়েছি যে, বেলা দুপুরে ঘুম ভেঙে উঠলুম্ আজ। ঝি-চাকরগুলিও আমার তেমি সব তালেবর হুঁসিয়ার! কেউ ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয় নাই, কি অন্যায় বলুন দেখি?......যাক্, এক কাপ চা চলুক্ এখন, কি বলুন্?"

"খুব, খুব! বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা চা হলেই চল্‌বে,—বিলক্ষণ! আমি নিজে চা ঢেলে নিচ্ছি, দাঁড়ান, দাঁড়ান!—আপনি ততক্ষণ নিজের খাওয়াটা সুরু করে দিন্। মিস্ নীল গির্জ্জার চলে গেছেন,—আমাদের বেশী দেরী করা হবে না।"

দুইজনে চা-পান ও কিঞ্চিৎ ভোজন আরম্ভ করিলেন।—মাঝে-মাঝে দুই চারিটা কথা কহিতে কহিতে পার্সন অলক্ষ্যে লীনার মুখের দিকে বার-কয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া হঠাৎ এক-সময় হাসিমুখে বলিলেন, "আপনি আবার সেই মুর্‌গীটি হয়ে যেতে সুরু কর্‌লেন্ যে! মার্‌সীর জন্যে ভারী উতলা হয়ে উঠেছেন্ নয়? এ আপনার অত্যন্ত অন্যায়। আচ্ছা, কেন অত ভাবেন্, বলুন দেখি?"

পার্সনের স্নেহভরা অনুযোগের স্বর শুনিয়া লীনা চমকিয়া উঠিল! বিস্মিত নয়নে চাহিয়া বলিল, "না, না,—কে বল্লে সে কথা? বাস্তবিক মার্‌সীর জন্যে আমি কিছু মন খারাপ করি নি।—মনে বৃথা অশান্তি এনেকি কর্‌ব বলুন্? আমার কাছ ছাড়া হয়ে না থাক্‌লে, যখন তারও শরীরের মঙ্গল নাই, আমারও জীবনের কল্যাণ নাই, তখন দুর্ব্বল মনের অন্যায় দাবীকে সজোরে অগ্রাহ্য করাই উচিত। তবে কি জানেন পার্সন,—" হঠাৎ লীনার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল; অন্য দিকে চাহিয়া ঢোক গিলিয়া আত্মসংবরণ করিয়া ক্ষুব্ধ-করুণ কণ্ঠে বলিল,—"আর কিছু নয়, সময় সময় বড় মনটা খারাপ হয়ে যায় যে, নিজের অসুখের জন্য আমি আশা মিটিয়ে ছেলেটির উপর মায়ের কর্ত্তব্য-পালন কিছুই কর্‌তে পারি নি! সে হ'বার পর থেকেই নিজের শরীর নিয়ে এমন বিরক্ত-বিব্রত হয়ে থাক্‌তে হোল যে, বড় কষ্ট হয় পার্সন, বড় কষ্ট হয়,—তার আদর আব্‌দার হাসি খুসীতে আমি একদিনের জন্য প্রাণভরে আনন্দ কর্‌তে পারি নি। ইদানীং 'দামাল্' হয়ে উঠেছিল, কাছে এলেই হুটোপাটি করে উৎপাত জুড়ে দিত, আমার ভারী জ্বালাতন-বোধ হোত; অনেক সময় সামান্য দোষেই আমি অসহিষ্ণু

হয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে কড়া শাসন করে বসতুম্! এখন, সেগুলো মনে পড়্লে বড় অনুতাপ বোধ হয়, সময় সময় মন ভারী অস্থির হয়ে ওঠে।..."

পার্সন বাধা দিয়া সান্ত্বনা-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "যেতে দেন, যেতে দেন। নিজের শরীর ভাল না থাক্লে অনেক মানুষই ইচ্ছার বিরুদ্ধে খিটখিটে রাগী হয়ে ওঠে। ও তো একটা সাধারণ নিয়মই আছে। ওর জন্যে কেন দুঃখিত হন? আপনি ভাল হয়ে ফিরে যান, সন্তানের ওপর মার কর্ত্তব্য পালন কর্‌বার পরিপূর্ণ সুযোগ পাবেন। এখন এরকম নিষ্ফল অনুতাপে মনকে মিছামিছি ক্ষুব্ধ কর্‌লে, আপনার শরীরের উন্নতির ব্যাঘাত হবে।—ভুলে যান, ও-সব চিন্তা ছেড়ে দেন। সন্তোষই সকল সুখের মূল, এটা জানেন তো? কেন মিছে কতকগুলো অপ্রীতিকর চিন্তা নিয়ে নিজেকে কষ্ট-পীড়িত করেন? ওতে যে আপনার স্বামীকেও অসুখী করা হয়।—হয় না কি?"

পার্সন জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে লীনার মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাইলেন। লীনা বিষাদ-ভরে ম্লান হাসি হাসিল; কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ সনিঃশ্বাসে জোর গলায় বলিয়া উঠিল, "আপনি বিয়ে করেন্ নি, বেশ করেছেন্ পার্সন। বেশ আছেন আপনি! আপনার মত পবিত্র স্বভাব অবিবাহিত নর-নারীর মুখের দিকে তাকালে, আমার অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ হয়। বেশ আছেন আপনারা। আপনি খবরদার্ বিয়ে কর্‌বেন না!"

সহসা অপরিসীম কৌতুক-উচ্ছ্বাসে পার্সন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—"বাহবা, বাহবা, বাঃ! এই ত চাই! চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নি, আপনার মুখে কাল এক মত শুনেছি, আজ এখন ....! মিসেস্ ক্রাউডেনকে এই নিয়ে রাগিয়ে দিতে আমার বেশ মজা লাগে —ওর ছোট ভাইটি,—অর্থাৎ মিঃ ডবসন্, ভারে-বাড়া স্ফূর্ত্তিবাজ মানুষ!—ভদ্রলোকের কোন নেশা নেই, শুধু এক চিত্রবিদ্যা তাঁকে ষোল আনা দখল করে রেখেছে। ও মানুষের বিয়ে পা করবার আশা ইহজন্মের মত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের উৎকট-মমতা তা বলে তো তাঁকে রেহাই দেবে না। চট্‌পট্ তাঁর আইবুড়ো নাম খণ্ডে দেবার জন্যে বিবাহিত বন্ধুর দল 'মোরিয়া' হয়ে উঠেছেন মিসেস্ ক্রাউডেন ভয়ানক চটে যান! কিছুতে যখন পেরে ওঠেন না, তখন আমার কাছে অভিযোগ কর্‌তে ছুটে আসেন, ডবসন্ বেচারা হেসে আকুল হন!—

পার্সনের অনর্গল উচ্ছ্বসিত বক্তৃতায় বাধা দিয়া হঠাৎ ব্যস্তভাবে লীনা বলিল, "আচ্ছা মিসেস্ ক্রাউডেনরা পৌঁছে কোন 'তার' করেছেন কি? ওঁর স্বামী কেমন আছেন? আপনি কাল সন্ধ্যা বেলা ওঁদের কুঠিতে গেছলেন্, নয়?"

কথাটা শেষ করিয়াই লীনা উৎকণ্ঠাব্যগ্র দৃষ্টিতে চকিতের মত পার্সনের মুখপানে চাহিল। এতক্ষণ কোন ছুতায় ডবসনের কুঠির নামটা সে মুখে আনিতে পারিতেছিল না, এবার একটু সুযোগ পাইতেই, তিক্তস্বাদ কটু ঔষধ-গেলার মত করিয়া কথাটা বলিয়াই, পরক্ষণে বিকৃত বিবর্ণ মুখে, টেবিলের তলায় হেঁট হইয়া কি যেন একটা জিনিস খুঁজিতে লাগিল; পার্সনের মুখের দিকে চাহিয়া

প্রশ্নের উত্তর শুনিতে তাহার শক্তি রহিল না।

পার্স'ন স্বাভাবিক প্রসন্নতার সহিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "হঁ্যা, মা চলে গেছেন, মামা চলে গেছেন, বালিকা ক্লাউডেন-কন্যা একা গবর্ণেসের কাছে রয়েছে, তাই বেচারীর খোঁজ নিতে গেছলুম্। মিঃ পিকক্‌ও খানিক পরে সেখানে গিয়ে হাজির। উনি ভবসন্‌কে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলেন।"

লীনার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাক থাকিয়া, হেঁট হইয়া নিজের পায়ের মোজাটা অকারণ ব্যস্ততায় টানিয়া সোজা করিতে করিতে, দ্রুতনিঃশ্বাসে জড়িতকণ্ঠে বলিল, "তারপর? ভবসন কুঠিতে নাই শুনে কি বল্লেন?"

একান্ত মনোযোগে উপর্য্যুপরি চায়ে চুমুক দিতে দিতে, পার্স'ন খুব সংক্ষেপেই বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়।"

লীনা আত্মদমন করিতে পারিল না; রুদ্ধ উত্তেজনার আবেগে, সহসা অধীরকণ্ঠে বলিল, "কিছুই নয়? আপনার সঙ্গেও কোন কথা হোল না?"

চায়ের কাপ নামাইয়া, রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে পার্স'ন একটু কাসিয়া বলিলেন, "সামান্যই।"

পরক্ষণেই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুমাল্‌ ঘুরাইয়া, কপালে বাতাস দিতে দিতে বলিলেন, "উঃ বড় গরম, আর ঘরের ভিতর টিক্‌তে পারা যাচ্ছে না; চলুন্‌, রাস্তায় বেরিয়ে পড়া যাক, এবার! আপনি পোষাকটা বদ্‌লে নিন্‌, আমি ততক্ষণ বাইরের বারাণ্ডায় বসি।"

পার্স'ন প্রস্থানোদ্যত হইলেন। লীনা অস্থির ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল স্বরে বলিল, "দাঁড়ান দাঁড়ান, আর, একটু আমার অনধিকার চর্চ্চার অপরাধ মাপ করুন্‌! আপনার সঙ্গে কি কথাটা হোল, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?"

পার্সন চৌকাঠের কাছে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; তীক্ষ্ণ-অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে লীনার মুখপানে চাহিয়া প্রসন্নমুখে স্মিতহাস্যে বলিলেন, "আপনি যে এই প্রশ্নটা কর্‌বার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত আছেন, সে আমি আগেই টের পেয়েছি, সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি চম্পট লাগাচ্ছিলুম। যেতে দেন, যেতে দেন, ওসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামানো পণ্ডশ্রম! মিঃ পিককের মেজাজ কাল মোটে ভাল ছিল না, তার ওপর কুঠিতে ফিরে আপনার সঙ্গেও বোধ হয় কিছু চটাচটি হয়ে থাক্‌বে? রোখের মাথায় বন্ধু যদি আমায় কিছু অর্থহীন কথা শুনিয়ে থাকেন্‌, তার জন্যে আমার কোন আপশোষ নাই। আপনাকে আমি অনুরোধ কর্‌ছি, ওর জন্যে আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত হবেন না। যান্‌, পোষাক-কামরায় যান, দেরী কর্‌বেন না।"

পার্সন হাসিমুখে চলিয়া গেলেন। লীনা মুহ্যমান নির্ব্বাক্‌ ভাবে টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা কি কতদূর ঘটিয়াছে, তাহা সে কিছুই সুনিশ্চিত রূপে জানিতে পারিল না; কিন্তু একটা কিছু যে ঘটিয়াছে, তার কোন সংশয় নাই, এবং পার্সন সেটাকে যত জোরেই হাসিয়া উপেক্ষা করুন্‌, সেটা যে সেরূপ ভাবে উপেক্ষণীয় মোটেই নয়, সে-বিষয়ে লীনার লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। পার্স'ন উদার-হৃদয়া, শুভাকাঙ্ক্ষিণী বন্ধু, তিনি

বন্ধু-প্রীতির অনুরোধে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা নির্ব্বিবাদে চাপা দিতে চান, কিন্তু বন্ধুর অন্যায় অপমান নির্ব্বিকার-চিত্তে সহ্য করিবার সাধ্য তো লীনারও নাই, এবং যতক্ষণ পিককের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-বন্ধনটা স্বীকার করিতে হইতেছে, ততক্ষণ সেরূপ উদাসীন থাকাও উচিত নয়।

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া আঁধার-ভরা মুখে লীনা পোষাক-কামরার দিকে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রার্থনা।

পতিতপাবন তুমি শুনেছি, দয়াল !
কেঁদে কেঁদে কাটাইব আর কত কাল ?—
বুঝিতে পারি না কিছু ! হের পাপে তাপে
নিদারুণ নিয়তির ঘোর অভিশাপে
দুরবহ হইয়াছে জীবন আমার,
নিভিয়াছে জীবনের সকল আশার
সকল আলোক নাথ ! পারি না ত আর
ডুবিতে এমন করে—বহিতে অপার
মরম-বেদনা হায় ! পতিতপাবন !
তুমি দাও দয়া করে পতিতে শরণ
রাতুল চরণতলে ! মুছে দাও আঁখি
তোমারি কমলকরে ! অনাথ একাকী
নহি দেব, তুমি আছ চিরসাথী হয়ে—
বুঝাইয়া দাও আজি অধীর হৃদয়ে !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জাহাজ-ডুবি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

আজিমগঞ্জের বাটীতে আজ মহোৎসব। আজিমগঞ্জের নূতন জমীদার বহুদিন যাবৎ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, এতদুপলক্ষে তিনি একটা মহা-ভোজের আয়োজন করিয়াছেন।

পৈতৃক-সম্পত্তি লাভ করিয়া অবধি তিনি দুইহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন; নাচ, তামাসা, বাগান-পার্টিতে ইয়ারের দল লইয়া অজস্র অর্থ উড়াইতেছেন। মোসাহেবের দলও একটা ভাল-রকম জুটিয়া গিয়াছে! তাহারা সকলে একবাক্যে সমস্বরে বলিতেছে, "হ্যাঁ, একেই ত' বলি জমীদার! আগেকার সে ভূতটা কি আবার জমীদার ছিল না কি! না জান্‌তো আমোদ করতে, না জান্‌তো অর্থের সদ্ব্যয় করতে। কোথাকার কোন্ একটা দুঃখী কাঙ্গালের ছেলে এতবড় জমীদারিটা হাতে পেয়েছিল! সে কি আর বাবার জন্মে

আমোদ কা'কে বলে, তা জানতো? পৃথিবীতে জন্মে যদি একদিনের জন্যে একটু ফূর্ত্তিই না কর্‌বি, তবে ভগবান্ তোকে টাকা দিয়েছেন কেন? আর ঐ বুড়ো দেওয়ান-বেটাও জুটেছিল তেমনি! আমাদের কি এ-সীমানায় মাথা গলাতে দিত! আমরা যেন ওঁদের কাছে মানুষ বলেই গণ্য ছিলুম না।" পারিষদবর্গের এতাদৃশ চাটুবাক্যে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জমীদার-বাহাদুর তাঁহার বৃহৎ দন্তগুলি পরিস্ফুট করিয়া হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিতেন। বৃদ্ধ রাধা-গোবিন্দবাবু কার্য্য-পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে হারাধন- ও পরাণ-নামক কোথা হইতে দুইটি বন্ধু জুটিয়াছিল। নূতন জমীদারের সমস্ত বিষয়-কার্য্য তাঁহারাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একে একে পুরাতন কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং দাসদাসী সকলেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের স্থানে হারাধন ও পরাণ নিজ নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে নিযোজিত করিতেছিলেন। তাহা-দিগের নিষ্ঠুর অত্যাচারে দেশবাসী প্রমাদ গণিল। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর সমস্ত মহলের প্রজাগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। নির্য্যাতনের সীমা রহিল না। অনেকে ঘর-ভিটা পরিত্যাগ করিয়া উপেন্দ্রবাবুর এলাকা ছাড়াইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া পলায়ন করিল। কেবল অটল কানাই। অমরকুমারের প্রিয়ভৃত্য কানাই—যে কানাই একদিন "অমন খোট্টা-মুখোর কাছে কাজ কর্‌তে পার্‌ব না" বলিয়া বাঁকিয়া বসিয়াছিল—সেই কানাই এখন নূতন জমী-দারের দাসানুদাস। যে একদিন বুক ফুলাইয়া অমরকুমারের যশঃকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইত, সে এখন অম্লানবদনে অমরকুমারের নিন্দা-বাদ করিয়া নূতন মনিবের মনস্তুষ্টি-সাধনে প্রয়াস পাইতেছে, এবং নূতন মনিবের লাথিটা ঘুসিটা, চড়টা চাপড়টা, এবং টাকাটা সিকিটাও অম্লানবদনে পরিপাক করিতেছে। ক্রমশঃ সে নূতন মনিবেরও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদা প্রভুর ছায়ার ন্যায় সে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ক্রমশঃ এমন হইয়াছে যে, কানাই না হইলে জমীদারের এক দণ্ডও চলে না।

ভোজ দিবার মানস করিয়া আজ জমীদার-বাবু ঘটা করিয়া মঞ্চে বসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত নর্ত্তকী আসিয়াছে, নাচ হইবে। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ সুদৃশ্য-কারুকার্য্য-খচিত বৃহৎ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। তাহার স্থানে স্থানে বহুশাখাবিশিষ্ট ঝাড় ঝুলিতেছে। রাত্রি নয়টা। বৃহৎ প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ। গ্রামস্থ হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল ভদ্র লোককেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-দিগের জন্য চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর কেদারা স্থাপিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তারকামণ্ডলীর ন্যায় নব জমীদারের চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিয়া সেই চেয়ারগুলি অধিকৃত করিয়া নিবিষ্টচিত্তে গান শুনিতেছেন। আর সেই আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত আসরের লতা-পুষ্প-সমলঙ্কৃত কার্পেটের উপর সালঙ্কারা, সুবেশা, সুকণ্ঠী নর্ত্তকী সুন্দর সলমা-চুমকির কারুকার্য্যমণ্ডিত ওড়নাতে শোভিত, লাবণ্য-বিকসিত নিজ সুকোমল ললিত দেহ-বল্লরী দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, উঠিয়া বসিয়া মধুর সুরতানে বীণা-নিক্কণবৎ মধুর কণ্ঠে গাহিতেছে। নূতন জমীদারের নূতন

ভৃত্যের দলও নূতন পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া তক্‌মা আঁটিয়া আসর-মধ্যে সুবাসিত তাম্বুল ও চুরুট বিতরণ করিতেছিল। হারাধন ও পরাণ মাঝে মাঝে স্বহস্তে রজতপাত্রে করিয়া আতর, গোলাপ-পুষ্প ও পুষ্পমাল্য লইয়া এ-ধার ও-ধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং তাহাদের ইচ্ছামত ব্যক্তিকে তাহা বিতরণ করিয়া সম্মানিত করিতেছিল। উৎসবের কিছু-মাত্র ত্রুটি হয় নাই। অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিও ব্যক্ত করিল যে, আজিমগঞ্জের জমীদার-বাটীতে এমন নাচগানের ধূম কস্মিনকালেও হয় নাই। শ্রোতৃগণের বিশেষ অনুরোধে নর্ত্তকী একটী চণ্ডীদাসের পদ গাহিল—

> জনম অবধি হাম রূপ নিরখিনু,
> নয়ন না তিরপিত ভেল!
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর রাখনু
> তবু হিয়ে জুড়ন গেল।

ইয়ারের দল ঘন ঘন মাথানাড়া, হাততালি এবং বাহবা দিতে লাগিল। ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইলে নর্ত্তকী গান বন্ধ করিল। তাহার পারিশ্রমিক এবং উপযুক্ত পারি-তোষিক লইয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে জাতিনির্ব্বিশেষে স্থানে স্থানে ভোজনে বসিয়া গেলেন। চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ খাদ্যেরই আয়োজন হইয়াছিল। সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন সমাধা করিলেন।

আহারান্তে সকলে একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আসর-মধ্যে কেবল স্বয়ং জমীদার এবং তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হারা-ধন ও পরাণ, এই ত্রিমূর্ত্তি বিরাজ করিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া কানাইলাল লাল জলের বোতল বগলে করিয়া লালজল সরবরাহ করিতে আসিলে, হারাধন সানন্দে লাফাইয়া উঠিয়া কানাইয়ের পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, "বেঁচে থাক বাপ-ধন! বেঁচে থাক! জন্ম জন্ম আমাদের লালজল খাইয়ে পিপাসা নিবৃত্ত করাও।" কানাই ক্ষিপ্রহস্তে বোতলের ছিপি খুলিয়া গ্লাসে বিলাতী সুরা ঢালিয়া ক্ষিপ্রগতিতে ত্রিমূর্ত্তিকে তাহা দান করিতে লাগিল। গ্লাসের পর গ্লাস, বোতলের পর বোতল শূন্য হইতে লাগিল। ত্রিমূর্ত্তিই নেশায় বিভোর! উল্লাসে পরাণচন্দ্র বলিয়া উঠিল, "কে জানে বাবা, বুড়ো ব্যাটাকে মেরে এমন রাজত্ব লাভ হবে! এমন রাজত্ব ভোগ করতে পেলে, একটা বুড়ো কেন, সাতটা বুড়োকে খুন করতে পারি।"

জমীদার স্বয়ং নেশায় মজগুল! কিন্তু হৃদয়ের গুপ্ত প্রদেশে জ্ঞান-নামক বস্তুটা তখনও তাঁহার একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তিনি হারাধনের কথা শুনিয়া জড়িত স্বরে তাহাকে নীচজনোচিত বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি শশুর, ভারি বেয়াদপ, ভারি বেয়াদপ! এ সব আমার বাবার রাজত্ব, আমার বাবার রাজত্ব। উপেন্দ্র-কিশোর আমার বাবা, আমার বাবা, বুঝলে কি না?—বুঝলে কিনা?" কানাই সুরা ঢালিতে ঢালিতে একবার কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল। আকণ্ঠ সুরা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ত্রিমূর্ত্তি ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিলেন। সুরাদেবী তাহাদের মস্তকে উঠিয়া মোহন নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন ক্রমশঃ সেই ত্রি-মূর্ত্তি পর-স্পর পরস্পরের অঙ্গে পতিত হইয়া ভূমিশয্যা

অধিকার করিলেন। কানাই তখন নিজ কার্য্যে প্রস্থান করিল। বাটীর অন্যান্য সকলে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া নিদ্রিত হইলে পর কানাই ধীরে ধীরে তাহার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অতিসন্তর্পণে বাটী হইতে বহির্গত হইল। কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। কেবল দেউড়িতে রামশরণ পাঁড়ে দ্বারবান্ বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল; মনুষ্য-পদশব্দে চমকিত হইয়া সিদ্ধির ঝোঁকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই অর্দ্ধজড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কোন্ হ্যায় রে?"

কানাই বেশ সপ্রতিভ ভাবে পরিষ্কারকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি কানাই।"

রামশরণ দ্বারবান্ পূর্ব্ববৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিল, "এত্না বড়ী রাত্মে কাঁহা যাতা হ্যায়?"

কানাই তেমনি সহজ ভাবে উত্তর দিল, "বাবুর ব্রাণ্ডি ফুরিয়াছে, তাই বাবুর জন্যে ব্রাণ্ডি আন্তে যাচ্ছি। এখুনি ফিরে আস্‌ব, তুমি ফটক বন্ধ কোরো না।" বলিয়াই কানাই চলিয়া গেল। রামশরণ পাঁড়ে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

কানাই বরাবর পুলিশের গোয়েন্দা বিজনকুমারবাবুর বাটীতে গমন করিল। রাত্রি তখন প্রায় দুইটা বাজিয়াছিল। বিজনবাবুর বাটীর সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল; কেবল বিজনবাবুর শয়নকক্ষ-মধ্যে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। কে যেন কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিতেছিল। বাতায়ন-পথে রাস্তায় দাঁড়াইয়া কানাই তাহার ছায়া দেখিতে পাইল। কানাই রাস্তায় দাঁড়াইয়া বহির্দ্বার ঠেলিতে লাগিল। বহুক্ষণ কপাট ঠেলাঠেলি করায় বিজনকুমারের ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সদ্যঃসুপ্তোত্থিত নিদ্রালস জড়িত কণ্ঠে বিরক্তভাবে গৃহমধ্য হইতে সে উত্তর করিল, "আঃ—মর! এত রাত্তিরে কেরে জ্বালাতন কর্‌তে এল?"

এই মধুর সম্ভাষণে কানাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না, কিন্তু মুখে সে তুষ্ট রুষ্ট কোন ভাবই প্রকাশ না করিয়া সহজভাবে বলিল, "শীগ্‌গির দোর খোল।—আমি কানাই, বাবুর কাছে আমার একটু দরকার আছে।"

ভৃত্য পূর্ব্ববৎ বিরক্তিভরে রুক্ষস্বরে বলিল, "কানাই হও আর বলাই হও, এত রাত্তিরে আমি দোর টোর খুলতে পারব না। কাল সকালে এসে তোমার যা বল্‌বার আছে, বলে যেও।"

কানাই বলিল, "সকালে আমি আস্‌তে পারব না। শীগ্‌গির একবার দোর খোল, আমার বিশেষ জরুরি কাজ আছে।"

ভৃত্য পাশ ফিরিয়া শুইল,—উঠিল না। কানাই তখন একটু উদ্ধতভাবে বলিল, "বেশ! দোর না খোল ত' আমি চল্লুম! কিন্তু এর পরে বাবুর কাছে জবাবদিহি কোর, আমি নিজের দরকারে আসি নি, বাবুর কাজের জন্যেই এসেছি।"

ভৃত্য তখন রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে, আপন মনে গজ্ গজ্ করিয়া বকিতে বকিতে, দুই হস্তে নিদ্রাবিজড়িত চক্ষুর্দ্বয় রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বিজনবাবুর বাটী কানাইয়ের অপরিচিত নহে। বিজনবাবুর বাটীতে তাহার যাতায়াত ছিল, ঘর দ্বার-পথ সমস্তই তাহার

পরিচিত। সুতরাং বহির্দ্বার খোলা পাইবামাত্র সে আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে বিজনকুমারবাবুর কক্ষের দিকে চলিল। বিজনবাবু তখন পর্য্যন্ত শয্যাস্পর্শও করেন নাই; একাকী কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন এবং আপন কর্ত্তব্য-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কানাই আসিয়া তাহার অভ্যাস মত আভূমি প্রণত হইয়া করযোড়ে বিজন-কুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া বিজনবাবু সাহস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, খবর কি? এত রাত্তিরে যে? ব্যাপারখানা কি রকম?"

কানাই চতুর্দ্দিকে চাহিয়া খুব বিচক্ষণ-তার সহিত অন্যের অশ্রাব্য ভাবে চুপি চুপি গোটাকতক কি কথা বলিল। বিজনকুমার-বাবু খুব মনোযোগ-সহকারে কানাইয়ের কথা-গুলি শুনিলেন, তাহার পর বেশ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখিস্, খবরদার যেন ঘুণাক্ষরেও এ-কথা প্রকাশ না হয়! সাবধান! তা হলে সব মাটী হয়ে যাবে।"

কানাই মাথা নাড়িয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল, "উহুঁ! এ গোলাম সে পাত্র নয় হুজুর! সে ভাবনা আপনার কিছু নেই; গলায় ছুরি দিলেও আমি এ-কথা কারো কাছে বল্‌ না।"

বিজনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, দেখিস্। এখন যা, কাল একবার আসিস্, যা করতে হয়, পরে বোল্‌বো।"

এই বলিয়া বিজনবাবু একখানা চেয়ারে বসিয়া কি একটা কাগজ পড়িতে লাগিলেন। রজনীর অধিকাংশ কালই তাঁহার বিনিদ্র অব-স্থায় কাটিয়া যাইত। "যে আজ্ঞে হুজুর!" বলিয়া পুনর্ব্বার আভূমি আনত হইয়া কুর্ণিস করিতে করিতে কানাই প্রস্থান করিল। যাইবার সময় রামধন শুঁড়ির নিকট হইতে সেই বোতল মদ কিনিয়া লইয়া গেল।

(৯)

প্রায় এক বৎসরকাল অমরকুমার কলি-কাতায় বাস করিলেন। কিন্তু আর তাঁহার এখানে বাস করা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। কারণ, পথে বাহির হইলেই পরি-চিত বন্ধু এবং সহপাঠিগণের সহিত সাক্ষাৎকার হইত; তাহাদের উপর্য্যুপরি প্রশ্নের উপর প্রশ্নের জ্বালায় অমরকুমারকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। অমরকুমার যতই প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে চাহিতেন, পাঁচজনে মিলিয়া ততই তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত। একদিন একটা শনিবারে তিনি সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন-সময়ে তাঁহার পূর্ব্বেকার ধোপার সহিত পথে দেখা হইল। অমরকুমারকে দেখিয়া রজক-নন্দন দ্রুতগতি নিকটে আসিয়া আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবু কবে কলকাতায় আসা হলো গো? কাপড় চোপড় অবিশ্যি ময়লা হয়ে গেচেন? আমি ত খপর পাই নি, হুজুর! ওবেলা গিয়ে নিয়ে আসব এখন!" অমরকুমার হঠাৎ তাহাকে পথিমধ্যে দেখিয়া কিছু ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন; কি বলিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অমরকুমার যখন উপেন্দ্রবাবুর কলি-কাতার বাটীতে বাস করিয়া কলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে এই রজক তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিত। তাহার পর কখনও কোন কার্য্য উপলক্ষে, অমরকুমার যদি কলিকাতায় আসিতেন, তখনও এই রজকই তাঁহার বস্ত্র

ধৌত করিত। অমরকুমারকে নীরব দেখিয়া রজক পুনর্ব্বার বলিল, "তা হলে হুজুরের এখন থাকা হবেন্ ত?" অমরকুমার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না।"

র। দু'চার দিনও তো থাক্‌বেন্? আমি দু'দিনেই কেচে ইস্তিরি ক'রে দিয়ে দোব এখন।

অ। না, আমার থাক্‌বার এখন কিছুই ঠিক নেই, এখন কাপড় কাচ্‌বার কিছু দর্‌কার নেই।"

র। সে কি বাবু, আপনার কাপড় যে বড্ড ময়লা হয়ে গেছে দেখ্‌চি,—কাচাবেন্ না? এমন কাপড় আপনি পর্‌বেন্ কেমন করে?

অ। থাকি যদি এর পর তোকে খপর দোব এখন। এখন আমার থাক্‌বার কোনও ঠিক নেই।

ক্ষুণ্ণ হইয়া সেদিন রজক প্রস্থান করিল। আর একদিন অমরকুমার সকাল বেলায় বাজার করিয়া আসিতেছিলেন। একখানা গামছায় বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া কিছু তরিকারি লইয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় রাস্তার মধ্যে তাঁহার একজন পরিচিত সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল। তাহাকে দেখিয়া অমরকুমার পাশ কাটাইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। কিন্তু উক্ত সহপাঠী বন্ধুটি দূর হইতে অমরকুমারকে বেশ ভাল রূপেই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। অমরকুমারের এই অবস্থা, অর্দ্ধ-মলিন জামা-কাপড়, হাতে গামছার পুঁটুলি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনিও দ্রুতগতিতে গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া, অমরকুমারের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "কি হে অমর! তোমার এমন অবস্থা কেন? এতদূর যে, শেষে গামছার পুঁটুলি হাতে করে বাজারে বেরুতে হ'ল! কেন বল দেখি হ্যাঁ?"

অমরকুমার কি উত্তর দিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না। চিন্তাযুক্ত মুখখানা একটু মলিন হইয়া উঠিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমিদার অমরকুমার বসুকে এতদূর দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া, এবং তদুপরি অমরকুমারকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ বন্ধুটীর মস্তিষ্কে চট্ করিয়া একটা কথা গজাইয়া উঠিল। ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বন্ধুবর বলিলেন, "কি হে, বাপ্ মর্‌বার পর বিষয়টা হাতে পেয়ে দু'দিনেই ফুঁকে দিয়েছ বুঝি? সরে সম্বুরে চলতে হয় হে! সরে সম্বুরে চল্‌তে হয়! একদিন জুড়ি হাঁকিয়ে বেড়িয়েছ, আর আজ গামছা হাতে ক'রে বাজার কর্‌তে বেরিয়েছ! ভেবে দেখ দেখি, বুদ্ধির দোষে কি রকম কাজটা করেছ! চানকা বয়স! অত বড় জমীদারিটা হাতে পেয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে না! তা' তোমার দোষ কি? তোমার মত বড়লোকের আদুরে গোপালদের মধ্যে অনেকেরই এই দশা ঘটে! তবে তুমি এত লেখা পড়া শিখ্‌লে, কলেজে একটা ভাল ছেলে বলে বরাবর নাম কিনে এলে, এসে, তোমার যে এমন বুদ্ধিশুদ্ধি হবে, তা আমরা কোন দিন মনে করি নি। যা হোক্ রূপচাঁদের মহিমা বটে! হাতে পড়্‌লেই মাথাটা বিগ্‌ড়ে যায়! আরে, ও মোসাহেবের দলই বল, আর বাইজীর দলই বল, সব ছায়াবাজী! যতক্ষণ

পয়সা ততক্ষণ, পয়সা ফুরুলেই সব ফোকা! দেখতে পাচ্ছ তো এখন, বদখেয়াল জুটলে নেশায় পড়লে কুবেরের ভাণ্ডারও উড়ে যায়!" এক নিঃশ্বাসে বন্ধুবর অনেকগুলি উপদেশ দান করিলেন, কিন্তু তাহার জন্য অমরকুমার তাঁহাকে একবারও ধন্যবাদ বা নিন্দাবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। অমরকুমারের নিকট ভালমন্দ কোন রকম উত্তর না পাইয়া অগত্যা বন্ধুবর তাঁহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন।

অমকুমার ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা-সহরে আর একদণ্ডও তিষ্ঠান তাঁহার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। সেইদিন হইতে অমরকুমারের একটা প্রধান কার্য্য হইল সংবাদপত্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠ করা, আর দরখাস্ত লেখা।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড মহকুমার এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ খালি ছিল। কিছুদিন পরে অমরকুমারের সৌভাগ্যক্রমে এই চাকরিটুকু জুটিল। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে, তিনি সীতাকুণ্ডের এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অমরকুমারও আশালতার অভাবে বাসায় পুরুষ এবং মহিলাগণ সকলেই বড় দুঃখিত হইলেন। তাহাদের বিদায়ের দৃশ্যও বড় করুণ হইয়াছিল। মহিলাগণ আশালতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন। কোন্ অজানা দেশ হইতে দুই দিনের জন্য তাঁহারা শাপভ্রষ্টা দেবীর প্রায় এক সঙ্গিনী পাইয়াছিলেন! সেই স্বর্গচ্যুতা দেবী যেন শাপমুক্ত হইয়া এখন চিরজন্মের মত তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন,—তাঁহাদের এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এমন নম্র এমন শিষ্টস্বভাবা, এত লক্ষ্মী শান্ত মেয়ে, তাঁহারা জীবনে কখনও দেখেন নাই। এই গৃহস্থ বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অমরকুমারের মনটাও যে একটুও বিচলিত হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু তিনি এখন বিরাট-গৃহে ধর্ম্মরাজের অজ্ঞাত-বাসের মত কোনও সুদূর প্রবাসে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিবার জন্য ব্যগ্র! পিতৃমাতৃহীন অজ্ঞাতকুলশীল নিজ জীবনকাহিনী আর তিনি কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন! বিষয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তিনি একটা গুরু কর্ত্তব্যের ভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন-মনে করিয়া এ রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে কার্য্য যখন সিদ্ধ হইয়াছে তখন আর তিনি নিজের অজ্ঞাত জীবনকাহিনী লোকের নিকট প্রচার করিয়া কাহারও নিকটে হাস্যাস্পদ হইতে ইচ্ছুক নহেন। তাই এই পার্ব্বত্য দেশে পর্ব্বতমালা-মণ্ডিত প্রকৃতিরাণীর বিরাম-কুঞ্জস্বরূপ সীতাকুণ্ডে আসিয়া তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। একটা প্রবল স্বস্তির বাতাসে তাঁহার অন্তরটা হাল্কা করিয়া দিল। এখানে কেহ অযাচিত উপদেশ দান করিতে আসে না, কেহ বিদ্রূপ-কটাক্ষ করে না, আবার "রাজপুত্র" বলিয়া আভূমি আনত হইয়াও কেহ প্রণাম করিতে আসে না এই চির অপরিচিত সুদূর পল্লী-মধ্যে তাঁহার দিনগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ পর্ব্বতের অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলি দেখিয়া অমরকুমার মুগ্ধ হইলেন। একদিন তিনি আশালতাকে লইয়া

বাড়বা কুণ্ডুতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই ফুটন্ত জলের মধ্যে অমরকুমার যখন আশালতাকে অবগাহন করিতে বলিলেন, আশালতা তো ভয়েই অস্থির! ভীত ভাবে বলিলেন, 'অমন টগ্ বগ্ করে জল ফুটচে, ও জলে কেমন করে নাইব?'

অমরকুমার কষ্টে হাসি চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তা নাইতে না পারলে ত পুণ্য হবে না! তীর্থ করার কোন ফলই তা হলে পাবে না।" এখানকার পাণ্ডারা বলেন, এই কুণ্ডের জলে স্নান করলে পর সমস্ত তীর্থের ফল পাওয়া যায়! বহু পুণ্য লাভের লালসা, অথবা নিষ্ফলতার আশঙ্কা কিছুতেই আশালতাকে বিচলিত করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিল—"এমন গরম জলে স্নান করে গায়ে ফোস্কা পড়ানোর চেয়ে, পুণ্যি না হয় সেও ভাল!"

অমরকুমার পুনর্ব্বার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "একান্তই যদি নাইতে না পার, তা হলে আমি এক আঁজলা জল তুলে তোমার মাথায় দিয়ে দিই, তুমি স্পর্শ করে নাও! আর কি করব বল?" এই বলিয়া অমরকুমার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল তুলিয়া লইয়া আশালতার গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। গায়ে ফোস্কা হইবার ভয়ে আশালতা প্রথমে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু জল-স্পর্শমাত্রে সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ও আমার কপাল! এমন পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল! কি আশ্চর্য্য! দেখলে পর ত' মনে হয় যেন চায়ের জল ফুটছে।"

আর একদিন অমরকুমার আশালতাকে লইয়া চন্দ্রনাথদেব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রথমে আশালতা চন্দ্রনাথদেব ও পর্ব্বতের শোভা দর্শন করিবার বাসনায় খুব আগ্রহের সহিত পর্ব্বতে উঠিয়াছিল, কিন্তু পর্ব্বতের শিখরদেশ ভ্রমণ করিয়া যখন নিম্নে অবতরণ করিবার সময় হইল, তখন আশালতা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল; কিছুতেই আর নামিতে সমর্থ হইল না। নীচের দিকে চাহিবামাত্র সেই সহস্র সহস্র হস্ত পরিমিত নিম্ন সমতল ভূমি ও এক গভীর জঙ্গল দর্শন করিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া আসিতে লাগিল; কোন রকমেই আর সে নামিবার সাহস-সঞ্চয় করিতে পারিল না; অমরকুমার অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। দেড় হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-সোপান পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ঠিক পাশাপাশি দুইজন লোক চলিতে পারাও দুঃসাধ্য! সোপানের দুই পার্শ্বই উন্মুক্ত! যদি একটা রেলিং দেওয়া থাকিত, তাহা হইলে আশালতা তাহা আঁকাড়িয়া কোন রকমে নামিতে পারিত; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ প্রকৃতিরাণী তাঁহার প্রজাদিগের সে সুখ-সুবিধার জন্য একটুও মনোযোগী হন নাই। নিম্নে কোথাও হিংস্র-শ্বাপদ কোথাও গভীর অরণ্য, কোথাও সমতল ভূমি, কোথাও পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পার্ব্বত্য জাতি বাস করিতেছে! কোন রকমে দৈবাৎ যদি সোপান হইতে পদস্খলন হইয়া যায়, তাহা হইলেই বিপদ্! নশ্বর মানবদেহের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া অণুরেণুতে পরিণত হইয়া যাইবে! অতিসন্তর্পণে, বহু কষ্টে অমরকুমার আশালতাকে নামাইয়া লইলেন। সেই দিন হইতে আর তিনি আশালতাকে কোথাও

লইয়া যাইতেন না। আশালতাও বড় লজ্জিত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সেও আর যাইতে চাহিত না। কিন্তু অমরকুমার প্রতিদিন দিবসের কার্য্যান্তে পাহাড়ের উপর বেড়াইতে যাইতেন। প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর অসীম সৌন্দর্য্যরাশি অমরকুমারের মনঃপ্রাণ শীতল করিয়া দিত।

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আসিয়া পরিচিত জনের সংস্রবশূন্য হইয়া, অমরকুমার বেশ শান্তিতে রহিলেন। কেহ তাঁহার সংবাদ জানে না, তিনিও কাহারও সংবাদ জানেন না। এ সংসারের সকল বস্তুতেই যেন তিনি নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, শান্ত! নির্ব্বিবাদে ঋষির ন্যায় তাহার দিন যাইতে লাগিল। কেবলমাত্র রাধাগোবিন্দবাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অবহেলা করিতে অসমর্থ হইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইত। অমরের পিতৃপ্রতিম সেই বৃদ্ধ রাধাগোবিন্দবাবু যে অমরকে অন্তরের সহিত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করেন, তাহা অমরকুমারের অজ্ঞাত ছিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

আশে।

নিভৃত বন্ধু, আসিও,
অন্তর-আঁখি-অঞ্জন ওগো,
বিজনতা ভরি' হাসিও!

এমনি মধুর রাতে
যবে গন্ধে পবন মাতে,
হিল্লোলে লতা নীরব হাস্যে
চন্দ্রমা-দিঠি-পাতে;
চুপিলে বীণাটী গাহি'
যবে অনিমিষ-আঁখি চাহি,
সুন্দর! মম মর্ম্ম-মুকুরে
নয়নের পথে ভাসিও!—
বিজনতা ভরি' হাসিও!

গভীর নিশীথ যামে
যবে অমৃত-পরশ নামে
মূর্চ্ছনা-রত চেতনা-তন্ত্রী
বিশ্ব হরণ গ্রামে,
সুন্দর ওগো আসি'
মোরে তেমনিই ভালবাসি'
চন্দন-ফুল-কুল পরশে
সকল চেতনা নাশিও!—
নিভৃত বন্ধু আসিও!

ঝরিলে নীহার-ধারা
যেন উদে না বিভাতি তারা,
কুঞ্জ-বিতানে পঞ্চম-স্বর
তুলে না-ক কোনো সাড়া!
রহিব আপনা বিনা
চির বিরাম-অঙ্কে লীনা,
(ভুজ) বন্ধন তব নন্দন মম
মন্দার ফুল-ফাঁসী ও!—
নিভৃত বন্ধু আসিও!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমাজে নারীর কাজ।

সংসারের ভিত্তিস্বরূপা নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গী হইয়া যে-কালে এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা, তখন অবশ্য তাঁহাদের সাহায্য-বিহীন হইয়া কোন কাজ করিলে সে কার্য্যটা সম্পূর্ণ ফলদায়ী হয় না। এ-জন্য ক্রমেই আমরা বুঝিতেছি যে, নারী কেবল সংসারে জননী, ভগিনী বা পত্নী হইয়া জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিলেই যে তাঁহার সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিল—আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না—তাহা নহে। পুরাকালে যেরূপ স্ত্রীগণ শক্তিসঞ্চারিণীরূপে পুরুষের সহকর্ম্মিণী হইয়া সকল স্থানেই সকল অভাবের পূরণ করিতেন, এখন তাহার ব্যতিক্রম হওয়াতে আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা জন্মিয়াছে। অবশ্য সে-ত্রুটি সাধারণের প্রত্যেকের চক্ষে নাও পড়িতে পারে।

আমাদের জাতীয় উন্নতির গোড়ায় সংসার ও সমাজ সমানভাবে সে অভাব বোধ করিতেছে। সংসারে নারী যে মঙ্গলময়ী ও লক্ষীস্বরূপা, শাস্ত্র তাহা স্বীকার করেন। তবে তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়াই ত কল্যাণপ্রদ। এ-জন্য নারীকে সে-স্থলে সমান অধিকার দেওয়া ও তদুপযোগী শক্তি- ও জ্ঞান-লাভ হইতে বঞ্চিত না রাখাই ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান কালে সকল দিকেই তরঙ্গায়িত অবস্থা। এই সময় যেমন পুরুষশক্তির মুখ্যভাবে প্রয়োজন, সেইরূপ নারীর যত্ন চেষ্টা-সাহায্যও অন্ততঃ গৌণভাবেও আবশ্যক। সামঞ্জস্য ও একতার বন্ধন এই উভ-শক্তি লাভের প্রধান উপায়। কিন্তু এখনকার সময় ঐ দুইটিই দুর্ল্লভ। এক ঘরের তিন জনেরই এক কার্য্যে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন সময়ে সমাজকে উন্নতির মুখে টানিয়া আনা কি একা পুরুষ-শক্তির কাজ! বহু শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা যেমন ঘরের অমঙ্গল দূর করিয়া সুমঙ্গল আনিতে পারি, সেইরূপ বাহিরেও সমাজকে তৈয়ারী করিয়া তুলিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন, পুরুষেরা যে কঠিন আয়াসসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে না স্ত্রীগণের সেখানে কি সাধ্য! অগাধ সমুদ্রে তৃণের মতন ভাসিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে বিচিত্র কি! সমাজে দলাদলি, জাতিপাত, বিদ্বেষ ইত্যাদি নানা-প্রকারের উন্নতির অন্তরায়, সুখের পথের যে কণ্টকগুলি আছে, তাহা নারীগণ যদি প্রশ্রয় না দিয়া, তাহার উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান্ হইয়া পুরুষের প্রাণে বল দিতে পারেন, তবে সে-কার্য্যের দ্রুত সফলতা অসম্ভব নহে। পুরুষের শক্তি বহির্মুখী আর নারী সেই সেই বিষয়ে অন্তর্মুখীশক্তির দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। পুরুষের কার্য্যে উৎসাহ-বর্দ্ধন নারীর দ্বারায় খুব সম্ভব এবং সে-স্থলে প্রতিবন্ধকও সহজে অপসারিত হয়।

সমাজের মঙ্গলসাধনের প্রধান উপায় শিক্ষাবিস্তার। নারী সে কার্য্য করিতে অক্ষম নহেন। নারী মহিলা-সমাজে প্রীতিবন্ধন করিতে তৎপর। যেখানে সমাজ শিক্ষিত, সে-স্থলে কুরুচি-পরিবর্ত্তন, ভাল-মন্দের জ্ঞান, পুণ্যের প্রতি আসক্তি, পাপে ঘৃণা, আশা করা

যায়। "সত্য ও অসত্য, ন্যায় এবং অন্যায়ের ভেদাভেদ এবং কুসংস্কারের প্রতি বিরাগ—এ সকলি নারী জন্মাইতে পারেন। শিক্ষিতা নারী সমাজের উপকারার্থ বদ্ধপরিকর হইলে তাঁহার আদর্শে অপরের আস্থা সমাজের প্রতি ধাবিত হইতে পারে।

সমাজে নারী-শক্তির দ্বারায় সঙ্কীর্ণতা দূর হইতে পারে শীঘ্র, যদি নারীদিগকে টানিয়া জ্ঞানের আলোকে উন্নতির পথ ধরান যায়। নারী যেমন গৃহ উজ্জ্বল করিতে পারেন, তেমনি বাহিরেও তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে, যদি ক্ষেত্র কর্ষিত থাকে। সমাজে নারীর কাজ প্রচার ও প্রচলনের উপায় প্রতিষ্ঠিত করিলে নারীগণ যে সুফল দেখাইতে পারেন্ না, এমন বলা যায় না।

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া এখনকার উল্লেখযোগ্যা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিতা রমণী সমাজে সাহিত্য-প্রচার করিয়া ভাষার উন্নতি করিতেছেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য স্ত্রীমহামণ্ডল ও তদীয় প্রতিষ্ঠাত্রী এবং জীবনদাত্রী স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসীর কাছে সকলেই ঋণী। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী বিধবাগণের বিদ্যাশিক্ষা, জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিল্প-বয়নাদি-শিক্ষার যে সদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

ইহা ছাড়া নারীসমাজের হিতার্থে ধাত্রী-বিদ্যা, শিশু-পালন প্রভৃতি ঘরে ঘরে গিয়া শুনাইলে ও বুঝাইলে কত কাজ হয়। ইহা পুরুষের সাধ্যাতীত; এবং ইহার অভাবে কত ক্ষুদ্র প্রাণ যে জগৎ হইতে অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নারী সমাজে আরও একটি অমঙ্গলমূল সহজে উৎপাটিত করিতে পারেন এবং তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনও নানাস্থানে ও অনেক পল্লীগ্রামে দিবা দুই-প্রহরের অবসরকালে যে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা গঠিত হইয়া পর-সমালোচনা ও কুৎসারটনা দ্বারা সভাস্থল মুখরিত এবং মানুষের জীবনের অধোগতি সাধিত করে, তাহারই নিবারণ করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অবশ্য উপদেশে তথায় কোন ফল হইবে না। তথায় মহিলাগণের হৃদয়-আকর্ষণকারী কলাবিদ্যার প্রচার হইলে সুফলের আশা করা যায়। সঙ্গীতবিদ্যাও মানব-জীবনে পরম শান্তিময়ী। উহাতে শোক-দুঃখ অপসারিত হইয়া মানবচিত্তকে সজীবতা প্রদান করে।

সঙ্গীত, শিল্প, চিত্রবিদ্যা—এ সকলই নারী স্বসমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ। আজ-কাল নব যুগের নূতন উৎসাহ—নূতন ধারা! বেশ-ভূষা, ধরণ-ধারণ সকলি নর-নারীকে সমভাবেই নিজের দিকে টানিতেছে। প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থা শিথিল হইয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে সমাজের স্রোত ফিরান কঠিন। কিন্তু যাহার যেমন উপযোগী, সেটিকে বজায় রাখিয়া নিজের গন্তব্য-পথ ধরার দৃষ্টি রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ভীরুতার ছায়ায় মিথ্যার আশ্রয়-গ্রহণ, একটা যেন ফ্যাসন বা সংক্রামক ব্যাধিরূপে সকলকেই আক্রমণ করিতেছে। সেগুলি হইতে সমাজকে রক্ষা করা নারীর কাজ।

'জাতিচ্যুত, দলাদলি ও এক-ঘরে প্রভৃতির ভয়ে যাহা পরিহার্য্য ও অন্যায়, কিন্তু যাহা বাস্তবিকই অপরিহর্ত্তব্য ও সঙ্গত সেই

সকল স্থায় ও সদাচারের অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজে ও সংসারে জয়ী হইব', এ-ভাব প্রত্যেক রমণী নিজের পরিবারে যদি রক্ষা করিতে পারেন, তবে সমাজের অনেক উপকার হইতে পারে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আকাঙ্ক্ষা।

ধনের আকাঙ্ক্ষা করি
আকাঙ্ক্ষা মিটে না, হায়,
কেঁদে কেঁদে মরি!
মানের আকাঙ্ক্ষা করি,
কেহ ত না ফিরে চায়!—
বুকে শেল ধরি!
যশের আকাঙ্ক্ষা করি,
শুধুই ফিরিতে হয়
অপযশ ল'য়ে!
প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করি,
অবহেলা এ হৃদয়
দেয় যে দলিয়ে!
শকতির আকাঙ্ক্ষায়
শুধু হেরি অপচয়
নিজত্বের মোর,
মুকতির আকাঙ্ক্ষায়
শুধু ধরে এ হৃদয়
বাঁধনের ডোর!
সফলতা-কামনায়
শুধু লভি ব্যর্থতার
কঠোর গঞ্জনা,
মাগি' তব করুণায়,
সহি নাথ! অনিবার
তোমারি ছলনা!
এই মৃগ-তৃষিকায়
বল নাথ! কত আর
বেড়াব ঘুরিয়া?
কত দিনে তব পায়
বলি দিব আকাঙ্ক্ষার,
আপনা ভুলিয়া?

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

পুস্তক-সমালোচনা।

সাতনদী।—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ, কর্ত্তৃক বালক-বালিকাদিগের জন্ম প্রণীত। হিন্দুদিগের পূজায় বসিয়া জলশুদ্ধি করি-

* মূল্য—দশ আনা। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স বিক্রেতা।

বার জন্ম যে মন্ত্রটী পাঠ করা হয়, পুস্তকখানিতে সেই মন্ত্রোক্ত গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, ও কাবেরী—এই সাতটী নদীর ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর, সহজ ও সুললিত কথোপকথনে প্রচলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত এই সকল নদী-সম্বন্ধে আধুনিক ভূগোলের কথাও ইহাতে

কিছু কিছু সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতিবৃত্তগুলি এত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক যে ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সিন্ধু, নর্ম্মদা, কাবেরী প্রভৃতি নামগুলি কেন হইল, কি-জন্য ইহারা পুণ্যতোয়া ও জন-সাধারণের নমস্যা হইয়াছে, তাহারও পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। নদী-সাতটীর ত্রিবর্ণ চিত্রগুলিও অতিমনোহর। এইরূপ পুস্তকের দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সহিত ভৌগোলিক বিবরণও বালকবালিকাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। নদীগুলির উৎপত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত একখানি ভারতের মানচিত্র পুস্তকে থাকিলে ভাল হইত। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, চিত্র অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। আশা করি, সকলের নিকট ইহার যোগ্য সমাদর হইবে। পুস্তক হইতে নর্ম্মদা-নদীর কাহিনীটী সংক্ষিপ্ত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য্যি, তারা, আর যেখানে যা কিছু আছে, সে সবই মহাদেব অনেকবার নষ্ট ক'রে ফেলেন্ ও তা'র পর নূতন ক'রে আবার সব সৃষ্টি করেন্। এই নষ্ট হয়ে যাওয়াকে মহাপ্রলয় বলে।

একবার মহাদেব আর দুর্গাতে ছুটোছুটি খেলা আরম্ভ কর্‌লেন্। তাঁদের পদভরে পৃথিবী নষ্ট হয়ে গিয়ে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র তৈরি হ'ল। খেলার পরিশ্রমে দু'জনে খুব ঘেমে উঠ্‌লেন্।...মহাদেবের ঘাম জমে...একটী পরম-সুন্দরী মেয়ে হ'ল।

নিজের সেই মেয়েটীকে দেখে' মহাদেব দুর্গাকে বল্লেন্, 'একটা মজা করা যাক্। এই ব'লে তিনি তাঁর সেই সুন্দরী মেয়েটিকে এনে স্বর্গের যত দেবতা, দৈত্য, দানব ছিল, তাঁদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন্। তাঁরা মেয়েটীকে দেখে সবাই বল্লেন্, 'আমি মেয়েটীকে বিয়ে কর্‌বো'। তাঁদের কথা শুনে মহাদেব বল্‌লেন, 'তোমরা সবাই একটী মেয়েকে কি ক'রে বিয়ে কর্‌বে!' তোমাদের মধ্যে যে ঐ মেয়েটীকে দৌড়ে ধর্‌তে পার্‌বে, আমি তা'রই সঙ্গে ওর বিয়ে দেবো।'

এই কথা শুনে সবাই মেয়েটীকে ধর্‌বার জন্যে ছুট্‌লেন্। মেয়েটী শিবের গা থেকে হয়েছে, তা'কে ধরে কার সাধ্যি? তাঁরা যেম্‌নি তা'কে ধর্‌তে গেলেন্ অমনি দেখ্‌লেন্, মেয়েটী এক যোজন দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁরাও ফেরে ছুট্‌লেন্। মেয়েটীও সরে যেতে লাগ্‌ল। এক যোজন, দু' যোজন, তিন যোজন, ক্রমে মেয়েটী শেষে এক শ' যোজন দূরে গিয়ে দাঁড়াল।...তখন দেবতা দানবেরা ভ্যাকা চ্যাকা খেয়ে গিয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগ্‌লেন। তাঁরা যে দিকে তাকান্, মেয়েটাকে সেই দিকেই দেখ্‌তে পান্। তখন তাঁরা মেয়েটিকে ধর্‌বার জন্যে পাগলের মত চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগ্‌লেন।...তাঁদের অবস্থা দেখে দুর্গা আর শিব হো হো ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লেন্। তখন মেয়েটী এক ছুটে আবার শিবের কাছে ফিরে এল।...

মহাদেব তখন মেয়েটীকে বল্লেন, "তুমি একাই এদের সব হারিয়ে দিয়েছ, এতে আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমায় বর দিচ্ছি যে...পৃথিবী যতবারই নষ্ট হোক না কেন, তুমি কখন মরবে না।

সাপুড়েরা যেমন সাপ খেলায় তুমিও তেম্‌নি এদের নিয়ে সাপ খেলান গোছের খেলালে; আর আমি যে কখন হাসি নে, তোমার ব্যাপার দেখে আমিও হেসে খুন হ'লাম; এই দুই কারণে তোমার নাম রাখ্‌লাম 'নর্ম্মদা'।" (সংস্কৃত 'নর্ম্ম' কথার মানে খেলা আর হাসা)।

তা'র পর আবার যখন পৃথিবী নষ্ট করে ফেলবার সময় হ'ল, তখন মহাদেব...পৃথিবীটাকে একটা মস্ত সমুদ্র করে ফেল্‌লেন্‌।... সেই সমুদ্রে মহাদেব খুব চমৎকার একটী ময়ূরের রূপ ধরে সাঁতার দিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন্‌। নর্ম্মদাও সেই সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছেন্‌, এমন সময়...মহাদেব নর্ম্মদাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্‌, "হাঁগা, তুমি কে? আর সব্‌বাই মরে গেল, তুমি বেঁচে রয়েছ কি ক'রে?" তখন নর্ম্মদা বল্‌লেন, "মহাদেব,...আপনার ঘাম থেকেই আমি হ'য়েছিলাম্‌। আমার নাম আপনি নর্ম্মদা রেখেছিলে।...আমাকে আপনি অমর করে দিয়েছিলেন্‌, সেইজন্তে আমি মরি নি। আপনি এখন আবার পৃথিবী সৃষ্টি করুন্‌।"

মহাদেব তখন...সব পৃথিবীর জিনিশ তৈরি কর্‌লেন্‌। যেখানে নর্ম্মদা সাঁতার দিচ্ছিলেন সেইখানে চিত্রকুট পাহাড় হ'ল। মহাদেব তখন নর্ম্মদাকে বল্‌লেন..."তুমি চিত্রকূট পাহাড় থেকে নদী হ'য়ে বেরিয়ে দক্ষিণ দেশ দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে মেশ। তোমার জলে নাইলে এত পুণ্য হ'বে যে লোকে তোমাকে দক্ষিণ-গঙ্গা বল্‌বে। সেই দিন থেকে নর্ম্মদা পৃথিবীতে এসে নদী হলেন।

নর্ম্মদা রেবা-রাজ্যের মধ্যে অমরকণ্টক ...পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। নর্ম্মদা ৮০০ মাইল লম্বা। নর্ম্মদা অনেক জায়গায় উঁচু পাহাড় থেকে হঠাৎ একেবারে নীচুতে পড়েছে...ব'লে ঐ নদীতে নৌকা চলাচল করতে পারে না।......

উদ্যান লতা।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঐ মগজিল পঞ্চানন মোটরবাজ জ্যোতির চেয়ে ধীরেন ছেলেটি কোনও অংশে মন্দ ছিল না। শিবেশ্বর যখন ঘটনাটা শুন্‌লেন, তখন তিনিও মনে করেছিলেন যে হাবলা যে ধীরেন এইটি প্রকাশ করে দিলে, সমস্ত গোল মিটে যাবে। ধীরেনের নিজের মনের মধ্যেও সেই বিশ্বাস ছিল। সেই জন্তই সে ষ্টেশনে অত করে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে গিয়েছিল। মুক্তির মনের ভাবও আমরা পূর্ব্বপর্য্যন্ত যতদূর জান্‌তে পেরেছি, তাতে ধীরেনের প্রতি যে বিমুখতাটুকু পেয়েছি, তাতে এমন কিছু আমাদের মনে লাগে না যে মুক্তির সঙ্গে কোনও পতিকে ধীরেনের বিয়ে হলে মুক্তির মনে চিরদিনের মত একটা দাগ থেকে যাবে। যদি মুক্তির সঙ্গে সত্য সত্যই কোনও পাড়াগাঁয়ের হাবলা কি গ্যাবলার সঙ্গে বিয়েটা

---

* একখানি উপন্যাস, শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত।—মূল্য ২৲ টাকা।
প্রবাসী কার্য্যালয়,
২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অমনি করে পেকে উঠ্ত, তা হলে আমাদের মনে একটা আশঙ্কা হত এবং একটা ভাবী ট্র্যাজিডির আশঙ্কায় আমাদের মন কণ্টকিত হয়ে উঠ্ত এবং তাতেই একটি নাটকীয়সন্ধির সৃষ্টি হোত। এমন একটা crux এর স্বাভাবিক প্রলোভন যে লেখিকারা বর্জন করেছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে বেচারা ধীরেনকে মুক্তিকে নিয়ে একটু নিষ্ঠুর কৌতুক করা ছাড়া তাঁদের আর কোনও বড়রকম ব্যাপার জমিয়ে তোলবার ইচ্ছা ছিল না। তবে জ্যোতির বিয়ের মিষ্টান্ন-ব্যাবস্থার সময় ধীরেনের ডাক পড়েছিল কি না এই কথাটি যদি তাঁরা আমাদের বলে দিতেন তা হলে আরও খুসি হতুম! আজকালকার দিনে চারিদিকের হিন্দুসমাজের পরম্পরাগত সংস্কার-জালের মধ্য থেকে দুই একটি ব্যক্তি জাল কেটে বেরিয়ে আস্তে চাচ্ছেন। তাঁদের চারিদিকেই আত্মীয়স্বজন; তাঁদের সঙ্গের স্নেহ-বন্ধন তাঁরা কিছুতেই ছিড়তে পারেন না। অথচ তাদের জীবনের ধারণা, সংস্কার সমস্তই তাদের প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতা বা দ্বন্দ্বের ছায়ায় শিবেশ্বরের প্রসন্নোদার অপত্য-স্নেহের নির্বাধ-আকাশে ও মোক্ষদাদেবীর স্নেহমূঢ় টানের মধ্যে একটি কুমারীজীবন কেমন করে গড়ে উঠেছিল, সেইটাই এখানে ফোটাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনও প্রেমের কাহিনী, কি উপন্যাস, এ কোনটিই এ কাব্যের কোনও বিশেষ কথা নয়। এর বিশেষ কথাই হচ্ছে একটি উদ্যানলতার নিখুঁত ছবি দেওয়া, একটি বর্ত্তমান সময়ের কুমারীজীবনের স্ফূর্ত্তিময় রহস্যময় আনন্দোজ্জ্বল চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আগামী সুখ-দুঃখের দুইএকটা রেখাপাত করা। কুমারীজীবনের একটা বিশেষত্ব এই যে তার মধ্যে একটা নির্ম্মল আনন্দ ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠ্তে থাকে। সে জিনিষটিকে তার যথার্থ ঠিক যায়গায় ধর্তে পারা পুরুষের পক্ষে বড় কঠিন। সেটুকু এত তরল ও কোমল যে শুধু কল্পনার সাহায্যে তাকে পাওয়া যায় না। যাঁদের যথার্থ সে-রকম জীবনের সঙ্গে যোগ আছে, এবং যারা সেই রকম জীবনের নিছক আনন্দরসটিকে যথার্থভাবে অনুভব কর্তে পেরেছেন, তাঁরাই তাকে ব্যক্ত কর্তে পারেন। এই বইখানির বিশেষত্ব এই যে বাড়ীতে বোর্ডিংএ পথে ঘাটে বেড়াবার সময়ে, চায়ের টেবিলের পাশে, পিতার রোগ-শয্যার পার্শ্বে, এবং আরো নানা রকম ছোট খাট বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে এমন সুন্দর ভাবে মুক্তির জীবনটি ফুটে উঠেছে যে, তা'কে আর কোনও মতেই বইয়ের মুক্তি বলে মনে হয় না। আমাদের চারিদিকের জানা-শোনার মধ্যে কত মুক্তিই আমাদের মনের সাম্‌নে আসছে। সমস্ত নবশিক্ষিতা কুমারীদের গূঢ় মর্ম্মকথাটি মুক্তিকে আশ্রয় করে এমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যে আমার মনে হয়, যে কোনও কুমারীকে আমরা ঐ রকম শিক্ষা ও সঙ্গের ব্যবস্থায় রাখ্‌তুম সেই মুক্তির মতন হয়ে গড়ে উঠ্ত। শুধু একটা স্বচ্ছতা, সরলতা বা আনন্দপ্রিয়তা ছাড়া, মুক্তির মধ্যে আর কোনও বিশেষ রকম নূতন স্বভাব বা বিশেষত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। চরিত্রগত কোনও বিশেষত্বের দিক্ দিয়ে মুক্তিকে দাঁড় করান হয় নাই। মুক্তি, মাধবী, কি মল্লিকা, কি যূথিকা, তার কোনও পরিচয় দেওয়া হয় নাই; শুধু দেখ্‌তে পাই যে, সে শিবেশ্বরের যত্নবর্দ্ধিত উদ্যানে আপন আনন্দে আপনি জড়িয়ে উঠেছে। মুক্তিকে দেখ্‌লে কোনও বনলতার সঙ্গে কোনও তুলনা তেমন মনে হয় না; শুধু এই মনে হয় যে, সে একটি যত্ন-সংস্কৃতা মনোহারিণী উদ্যানলতা। চরিত্রগত কোনও বিশেষত্বের আশ্রয় না নিয়ে কেবল-

মাত্র কুমারীজীবনের নিছক্ রসটুকুকে এমন মূর্ত্তিমতী করিয়া তোলা সত্যই বিস্ময়কর। যাঁদের এ জীবনের সঙ্গে সহানুভূতি কম, তাঁদের চোখে এই বইখানির এই অদ্ভুত কৃতিত্বটুকু হয় ত তেমন চোখে না পড়্তে পারে। কিন্তু যাঁরা আমাদের নবযুগের কুমারীজীবনের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যটুকুর প্রতি কোনও দিন আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা বুঝ্তে পার্বেন যে সেই দিক্ দিয়ে দেখ্তে গেলে এই বইখানি যে-কোনও সাহিত্য-সভায় শ্রেষ্ঠ স্থান নিতে পারবে। কি সুন্দর ভাষা বিলোল ভঙ্গীতে নানাছন্দে এই উদ্যানলতাকে নানা-ভাবে দুলিয়ে আমাদের সাম্নে এনে ধরে আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। বাঙ্লা ভাষার যে কত শক্তি, কত সম্পদ্, তা যেন এই বই-খানি পড়্বার সময় আমরা নূতন করে বুঝ্তে পারি। কোনও বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে নি, কোনও সামাজিক তত্ত্বকে ইঙ্গিত করে নি, কোনও বিশেষ মনোভাব বেদনা-তুর হয়ে প্রকাশ পায় নি, অথচ একটি আনন্দময়ী কুমারী মূর্ত্তি শিক্ষা ও সংস্কা-রের জল- বাতাসে এমন সুষমাময় হয়ে উঠেছে যে, যে দেখে আনন্দে তার মন শিহরিয়া ওঠে। জ্যোতির সঙ্গে মুক্তির মেশামেশি দেখে আমরা অনেক সময়ে একটি প্রণয়ের অঙ্কুর খুঁজেছি, কিন্তু কোনও জায়গাতেই সেটি ধর্তে পারি নাই। জ্যোতিও শেষ পর্য্যন্ত বুঝ্তে পেরেছিল বলে মনে হয় না। এমন কি মুক্তিও জ্যোতিকে জাহাজে বিদায় দেওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটুও স্পষ্ট করে বুঝেছিল কি না, তা বলা কঠিন। কুমারীজীবনের ভাব প্রবণতার মধ্যে এমন একটি মায়ার শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে খেলা করে যে কোন্ সময়ে সৌহার্দ্দ, কি বন্ধুত্বটা হঠাৎ প্রেম হয়ে দাঁড়ায়, তার ঠিকানা করা সহজ নয়। যে-মুহূর্ত্ত থেকে সৌহার্দ্দটা প্রেমে অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্ল, সেই সময় থেকেই উত্তোরত্তর সেই অঙ্কুরই বেড়ে চল্‌ত লাগল; ঐটুকু কুসুমকোমল হৃদয় যখন প্রচ্ছন্ন ভাবে একটা প্রেমতীর্থের অন্বেষণে যাত্রা করে, তখন পথের আর কোনও কুঞ্জের দিকে ফিরেও চায় না। এই যে শক্তি, এই যে দৃঢ়তা, এইটুকু মেয়েদের জীবনের বিশেষত্ব। সক-লের অলক্ষ্যে কখন্ যে উদ্যানলতা যৌবনবতী হয়ে সহকার-তরুকে দৃঢ়ালিঙ্গনে বেঁধে ফেলে, তা কেউ টেরও পায় না, কিন্তু একবার জড়ালে সে বাঁধন আর কারো পক্ষে টেনে ছাড়ানো সহজ নয়। এই মূল ছবিটি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে এ-দিকে ও-দিকে নানাস্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা আধটা করিয়া আঁচড় দিয়া উদ্যানলতার আশেপাশের চারিদিকে উদ্যা-নের একটি ছবি দেওয়া হয়েছে, হেড্ মিস্-ট্রেসের গম্ভীর মাষ্টারি চাল, বোর্ডিংএর মেয়ে-দের বিবাহ-সমুৎসুকতা, শিবেশ্বরের সংস্কার-প্রচণ্ডতা, মিসেস্ ঘোষের নীতি-সংরক্ষণপরতা, মোক্ষদা দেবীর সদাচারনিষ্ঠা, পাঁড়াগাঁয়ের বদ্ধ সংস্কারের আব-হাওয়া, ব্রাহ্মবন্ধুগণের সমাজ-সংরক্ষণে উৎকণ্ঠতা ও ব্রাহ্মগৃহিনী-গণের ছেলে পাক্‌ড়া করিবার উৎকণ্ঠাপরা-য়ণতা, যখন যে-দিকে কটাক্ষ করা হয়েছে, নিপুণ তুলিকা তাই অতি জীবন্তভাবে সুস্পষ্ট করে এঁকে দিয়েছে। এমন কি প্রসঙ্গ-ক্রমে উড়েমালী, কি হিন্দুস্থানী দারোয়ানের কথা যেখানে উঠেছে, দুই এক কথায় তাদের চিত্রও বেশ স্ফুট হয়েছে। গল্পের কথা একে-বারে ভুলে গিয়ে শুধু ক্লান্তচিত্তকে সরস কর্-বার জন্য কর্ম্মের অবসরে যখনই যে যায়গা খুলে পড়েছি, সেইখানেই আনন্দ পেয়েছি;—যেন কতগুলি জীবন্তলোকের সঙ্গ কর্‌চি। বই পড়্‌চি, সে-কথা ভুলেই গিয়েছি। এমন উজ্জ্বল, হাল্কা, উৎফুল্ল স্বভাব-কুশল বিলাস-বিলোল ভঙ্গী বাঙ্লা ভাষায় কমই পড়েছি। এই উদ্যানলতার মধ্যে নবযুগের কুমারীবর্গের জীবনলতা যিনি দর্শন লাভ কর্‌বেন, তিনি আর কখনও দুষ্যন্তের মত শোক কর্‌বেন্ না যে—'দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বন-লতাভিঃ।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

২১০, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

Reg. No. C. 134

৫৮ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

কার্ত্তিক, ১৩২৭—নভেম্বর, ১৯২০।

সূচী

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৵০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 687. November, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৮৭ সংখ্যা।	কার্ত্তিক, ১৩২৭। নবেম্বর, ১৯২০।	১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

গান।

(দরবারী কানেড়া—কাওয়ালি।)

একটি করে' ভুলের প্রদীপ
জ্বালিয়ে রেখো প্রিয়তম
ভুলে ভুলেই রইবে না আর
চির ভোলা হৃদয় মম!

বারে বারেই নয়নজলে
এলো তোমার দুয়ার-তলে,—
দিয়ো না গো রইতে ভুলে
সুখে,—সুপ্ত পাষাণ সম॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

গানের স্বরলিপি।

(রাগ ভৈরবী—একতালা।)

তোমারি পাখীর গান শুনি' নাথ,
তোমা পানে মন ধায়!
তোমারি আকাশ, তোমারি আলো
কি আকুল নয়ানে চায়!
তোমারি তরু—তোমারি কুসুম,
তোমারি তপন—তারকা-প্রসূন;
নদী পারাবার মহিমা তোমার—
তোমারি করুণা গায়!

জীবন আমার—করুণা তোমার,
তব প্রেমরসে সুন্দর;—
এত হাসি-গান উছসিত প্রাণ
আশা-ভালবাসা ভাঁড়ার।
তোমারে জীবনে লভিতে চাই,
তোমার মাঝারে ডুবিতে চাই—
মরমে মরমে তোমারি চরণে
প্রণমিবারে যেন পাই॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল।

অস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
[পা]
II মা মপা পা। দা দা দা। পা দা পা। পা পা পদপদপমা
তো মা রি পা খী র্ গা ন শু নি না ····· থ

২´ ৩ ০ ১
I গা পা ঋা। পা মা গা। ঋা -া -া। -া সা -া।
তো মা পা নে ম ন ধা · · · য় ·

I ঋা মা মা। মা মা -া। পা মা পা। ঋা ঋা সা
তো মা রি আ কা শ তো মা রি আ লো কি

I ঋা সা সা। গা পা পা। মা -া -া। পধপর্সা পা দা II
আ কু ল ন য়া নে চা · · ···· · য়

অন্তরা।

II দা দা দা। দা দা -া। না না র্সা। র্সা র্সা র্সা
তো মা রি ত রু · তো মা রি কু সু ম

লীনার শিক্ষা।

(উপন্যাস।)

(৭)

মুখের বিষাদ-গাম্ভীর্য্য যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিয়া উজ্জ্বল সুন্দর বেশ-ভূষায় তারুণ্য-শ্রী-মণ্ডিত ক্ষীণ-মূর্ত্তিটির মনোরম শোভা বাড়াইয়া লীনা মৃদুপদে বারেণ্ডায় আসিয়া যখন দাঁড়াইল, পার্স'ন তখন দ্রুতপদে বারেণ্ডার এ-ধারে ও ধারে চক্র দিয়া সজোরে হাঁটিতেছিলেন। লীনাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিনা প্রশ্নেই হাসিমুখে কৈফিয়ৎ দিলেন—"চায়ের দামটা আদায় করে নিচ্ছি, বুঝ্‌লেন? আপনার মত কাহিল মানুষদের সঙ্গে তো দৌড়-ঝাঁপ করে রাস্তা-হাঁটা চল্‌বে না, তাই এইখানেই ছুটোছুটি করে ঘাম বার করে নিলুম। চলুন, এবার ভদ্র-ধরণে পথ হাঁটা যাক্।"

পার্স'নের প্রসন্ন-সহাস মুখে কি সম্মোহন-মন্ত্রভরা আনন্দের আলো ছিল, কে জানে,—লীনার অন্তরের প্রচ্ছন্ন বিষাদ-ম্লানিমা যেন চকিতে ঢাকা পড়িয়া গেল! সহসা অত্যন্ত খুসীর সহিত হাসিয়া লীনা উৎসাহ-ভরে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনি বুঝি আমায় এতই অপদার্থ মনে করেন যে, একটু জোরে পথ হাঁটবার ক্ষমতাও আমার আছে,—এটুকুও বিশ্বাস করতে পারেন না? চলুন তো, কত জোরে হাঁট্‌তে হবে বলুন,—আমি হাঁট্‌ছি।"

"দুই হাত বাড়াইয়া লীনাকে নিবারণ করিয়া পার্স'ন হাস্যরুদ্ধ অধরে কপট-কোপে বলিলেন, "হাঁ, আসুন! আপনার বিদ্যার দৌড় জান্‌তে তো বাকী নাই।—" বলিয়াই কপট গাম্ভীর্য্যে মাথা নাড়িতে নাড়িতে, মিটিমিটি চক্ষে চক্ষে চাহিয়া কৌতুক-স্মিত-মুখে বলিলেন, "সত্যি বল্‌ছি, বাস্তবিক বল্‌ছি, আপনার মত চক্ষু-লজ্জার খাতিরে প্রাণের মায়া-ত্যাগকারী দুঃসাহসী রোগীদের চিকিৎসক হ'তে পার্‌তুম্ যদি আমি,—তা হলে আপনাকে জেলে পুরে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌তুম্!"

"বহু ধন্যবাদ,—ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে গেছি, তা হলে বলুন?"—কথাটা বলিতে বলিতে হঠাৎ লীনার পরিহাস-স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ব্যগ্র-কৌতূহলে ভরিয়া উঠিল; পার্স'নের মুখ পানে চাহিয়া সে বলিল, "আচ্ছা বলুন তো পার্স'ন, আপনি যদি সত্যি সত্যিই রীতিমত চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করে চিকিৎসক—অর্থাৎ ব্যবসাদার-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষ হতে পারতেন, তা হলে—তা হলে, আপনি, নিজের মনুষ্যত্বের খাতিরে রোগীর উপর বেশী দরদ করতেন, না ব্যবসার খাতিরে রোগীর পয়সার উপর বেশী দরদী হতেন?"

তরল-কৌতুক-চপল কণ্ঠে উচ্চহাসি হাসিয়া পার্স'ন বলিলেন, "মুস্কিলে ফেল্‌লেন্! ব্যবসাদার না হয়ে, ব্যবসাদারী সম্বন্ধে যা খুসী বলে দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, অবস্থা-দ্বন্দ্বের নিরীখে নিজেকে যাচাই করে না দেখ্‌লে আসল সত্য সম্বন্ধে কি—"

হঠাৎ বাধা দিয়া, পার্স'নের হাত চাপিয়া ধরিয়া ঈষৎ আবেগের সহিত লীনা সনিঃশ্বাসে বলিল, "ঠিক পার্স'ন, ঠিক,—ঐটেই আসল সত্যি কথা। কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অবস্থা-দ্বন্দ্বের

নিরীখে নিজেকে যাচাই করে না দেখ্‌লে,—নিজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝেও পাওয়া যায় না, খুঁজেও পাওয়া যায় না? মাপ করুন, মাপ করুন আমায়। আমার প্রশ্নটাই ভুল হয়েছে।”

পার্সন কিছু না বুঝিলেও, এটা বেশ বুঝিলেন, লীনা কি একটা নিগূঢ়-মর্ম্মপীড়া সন্তর্পণে আড়াল করিয়া রাখিল, এবং সে মর্ম্মপীড়ার আভাসমাত্রও পার্সনের কাছে প্রকাশ করিতে সে অনিচ্ছুক। নীরব-স্নেহ-সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চকিতের জন্য লীনার ব্যথিত-করুণ মুখের দিকে চাহিয়া পার্সন মুখ ফিরাইলেন। বাহিরের রাস্তার দিকে চাহিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “আসুন, আর দেরী করা নয়।”

দুইজনে বাহির হইলেন। দুইজনেই নীরব। লীনা অন্যমনস্ক, পার্সন গম্ভীর। কিছু দূর আসিয়া, মোড় ফিরিয়া দুইজনে একটা নির্জ্জন পথে পড়িলেন। পার্সন সুবিধা পাইয়া, লীনার অন্যমনস্কতা ভাঙাইবার জন্য কি একটা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়া, সহসা পথের অন্য সীমানার মোড়ের মাথায় আর একজন ইউরোপীয়ান যুবককে আসিতে দেখিয়া সহসা সংবরণ করিলেন। কথা আর বলা হইল না, উদাস দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে চাহিয়া, লোকটার বেজায় অন্যমনস্কতা, তন্ময়ভাব ও অসামঞ্জস্য-গতি দেখিতে দেখিতে নীরবে খানিকটা অগ্রসর হইয়া, কাছাকাছি পৌঁছিয়া, সহসা নিজের অজ্ঞাতেই সবিস্ময়-কৌতূহলে বলিয়া উঠিলেন, “বাঃ, মানুষ চেনাই দায়! মিসেস্ পিকক্ চেয়ে দেখুন, লোকটাকে চিন্‌তে পারেন?”

লীনা মুখ তুলিয়া চাহিল; নির্দ্দিষ্ট মানুষটির দিকে দুই মুহূর্ত্ত অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট-জড়িত স্বরে বলিল, “মিঃ ডব্‌সন নয়? ও কি, নিজের মনে অমন অদ্ভুত ভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছেন্ কেন? ঠিক যেন পাগল!—”

বাস্তবিকই আগমন-শীল মানুষটি নিজের মাথার টুপিটা কপালের উপর এত বেশী টানিয়া, এত বেশী মাত্রায় ঘাড় হেঁট করিয়া চলিতেছেন, যে টুপির ধারের আড়ালে তাঁহার চোখ হইতে নাকের ডগা পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং পায়ের নীচেকার পথটার দিকে একান্ত ভাবে চাহিয়া চলিলেও রাস্তার বড় ছোট ইট্-পাট্‌কেল্‌গুলা যে তাঁহার চোখে মোটেই ঠেকিতেছে না, সেটা তাঁহার প্রতিপদে হোঁচট্ ঠোক্কর খাওয়া হইতে বেশই বুঝিতে পারা যাইতেছে। চিবুক হইতে নীচেকার মুখ পর্য্যন্ত যতটুকু অংশ দেখা যাইতেছে, সমস্তটুকুই কি যেন একটা উচ্ছল কৌতুকের নিঃশব্দ-উল্লাস-হাস্যে, অপরিসীম মধুর সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল! ডান-হাতে ধরা ছড়িটি চিবুকের নীচে ঠেকাইয়া, বাঁ হাতটি পকেটে পুরিয়া তিনি নিজ মনে সটান্ চলিতেছেন তো চলিতেছেন-ই? মুহূর্ত্তের জন্যও কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই!

পার্সন সহাস্য-প্রসন্ন-দৃষ্টিতে লোকটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ও রকম খেয়ালী লোকেরা পাগলেরই দ্বিতীয় সংস্করণ বটে! কিন্তু দাঁড়ান; আচ্ছা, একটু পথ ছেড়ে দাঁড়া[illegible]মন হয়?”

একটু হাসিয়া লীনা বলিল, “বেশ নিরাপদ্ হওয়াই হব! দেখ্‌ছেন্ না, ভদ্রলোক যে

রকম অন্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে অন্য পথিকেরা সতর্ক না হলে, আকস্মিক-সংঘাতের সম্পূর্ণ আশঙ্কা।"

পার্সন স্বভাব-সিদ্ধ তরল কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন! আগন্তুক তখন দশ বারো গজ মাত্র ব্যবধানে আসিয়া পড়িয়াছেন; শব্দটা তাঁহার কাণ এড়াইল না। অপ্রস্তুত ভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরমুহূর্ত্তে পরিচিত মূর্ত্তি-দুইটিকে চিনিতে পারিয়া, হাস্যোজ্জ্বল মুখে টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিয়া, দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "বাগ্ বা! আপনারা! আমি ঠিক ঐটুকুই ভয় করছি! কিন্তু মাপ করুন ভদ্র-মহিলারা, আমি একটু অশিষ্টতা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি! ধূর্ত্ত কবিদের এক চোখো রসিকতা আমি কিছুতেই সহ্য করতে রাজী নই—"বলিতে বলিতে ক্ষিপ্রচরণে তিনি কৌতূহলবিস্মিতা তরুণী দুইটির ডান পাশ অতিক্রম করিয়া সাঁ করিয়া একচক্র ঘুরিয়া আসিয়া, বাঁ পাশ কাটাইয়া আবার সামনে পৌঁছিলেন; হাত বাড়াইয়া করমর্দ্দন করিতে করিতে, হাসিমুখে সসম্মানে বলিলেন, "কিছু মনে করবেন্ না আপনারা, আমি বেহাৎ ভাল মানুষের মতই আসছিলুম মিঃ প্রিন্‌কের সন্ধানে। হঠাৎ পথে মনে পড়ে গেল একটা পুরোণো কবিতা;—" বলিয়াই তিনি সকৌতুকে ব্যঙ্গ-স্বরে আবৃত্তি করিলেন:—

"A fair woman and a slashed gown
Will find some nail in the way."

কি অবমাননার অত্যাচার বলুন দেখি! কবিদের চৌকশ বুদ্ধির চিকণতায় ভয়ানক রাগ ধরছিল! একটা কড়া প্রতিবাদ করবার জন্য ভয়ঙ্কর ইচ্ছাও হচ্ছিল, অথচ হাসিও পাচ্ছিল,—এমন সময় দেখি—আমার ভাগ্যেও, some nail in the way, জুটে গেছেন! হাতে হাতে প্রমাণ দাখিল করে কবির উদ্দেশে দস্তুরমত প্রতিবাদ করে দিলুম! এবার আপনারা বিচার করুন, আমার কাজটা ভাল কি মন্দ?"

সেই বালকের মত অসঙ্কোচ-সারল্য-ভরা যুবার মুখের নির্ম্মল-সুন্দর-কৌতুক-দীপ্তি লীনার ম্লান বিষাদ-ভরা দৃষ্টির উপর একটা স্নেহ-করুণ তৃপ্তির কিরণ ছড়াইয়া দিল।—পৃথিবীর মানুষ, তোমাদের সরল হাসির সৌন্দর্য্য কি অপার্থিব, কি চমৎকার! সৃষ্টিকর্ত্তার শিল্পের সেরা শিল্পই বুঝি,—সরলপ্রাণ মানুষের মুখের এই প্রসন্ন কৌতুক-উচ্ছল আনন্দের হাসিটুকু! হে ভগবন্, হে ভগবন্, দুষ্ট গ্রহের কোপে পড়িয়া যে হতভাগ্য প্রাণগুলা এ সম্পদ্-ভোগের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের সন্তপ্ত প্রাণকে ক্ষণিকের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইবার শক্তি দাও,—এই সব পবিত্রপ্রাণ মানুষের স্বচ্ছন্দ-নির্ম্মল হাসিটুকুর দিকে চাহিয়া!

মনের গুপ্ত বেদনাকে মনের আড়ালেই গুপ্ত রাখিয়া লীনা প্রকাশ্যে বেশ প্রফুল্ল ভাব দেখাইয়া বলিল, "আচ্ছা পার্সন, আপনার হাতেই আমি এর সম্পূর্ণ বিচার-ভার ছেড়ে দিলুম,—আপনার সমালোচনা-শক্তি আমার চেয়ে ঢের ভাল হবে, আশা করি।"

পা। মিঃ ডব্‌সন্, আপনি মনে করবেন্ না, বন্ধুত্বের খাতিরে আমি নির্ব্বিচারেই, আপনার সাধু-উদ্দেশ্যটা সমর্থন করব। ততটা সং-

প্রকৃতির মানুষ আমি মোটেই নই। আমি প্রথমেই তর্ক তুলতে চাই, কবিকে আপনি যে প্রতিবাদ করলেন্ সে প্রতিবাদটা বাস্তবিক ঠিক নির্ভুল হয়েছে কি না? কারণ, কবি-বর্ণিত fair woman আমরা যে ঠিক হতে পারি, তার তো কোন প্রমাণ নাই।

সবিস্ময়ে ডবসন্ বলিলেন "বলেন কি! চিত্রবিদ্যার পিছনে ধাওয়া (?) করে, আমার চোখ দুটো কি এম্নিই উচ্ছন্নে গেছে যে আপনাদের নিগ্রো-বালিকা বলে মেনে নিতে হবে? আমি কি এম্নিই হতভাগা জীব!—"

লীনা স্মিতমুখে বলিল "নাঃ, বন্ধুত্বটা এবার বিপরীত মুখে পাক খেয়ে, বিষম মোচ-ড়ের মাথায় উপস্থিত হোল যে! মিঃ ডবসন্ ক্ষমা করুন, পার্সনের মত ফাঁসুড়ে লোকের হাতে সমালোচনার ভার দেওয়া যে কত বড় বিপজ্জনক কায, সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, তাই আপনাকে দুঃখ দিয়েছি। যাই হোক,—এবার আমি মধ্যস্থতা করছি শুনুন্, আপনার হিসাবের ভুল নিয়ে নির্দয়-ভাবে তর্ক বন্ধ না করে—"

লীনার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পার্সন সকৌতুকে বলিলেন, "সটান নারী-সমাজের তরফ থেকে, আপনাকে হিতৈষী বন্ধু বলে সাধু বাদ দেওয়াই উচিত! এবং তাই দেওয়াই হচ্ছে! হে বন্ধু, ক্ষোভ ত্যাগ করে প্রসন্ন হোন, আপনারই জয়! এখন মিঃ ক্লাউ-ডেনের কুশল-সংবাদটি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করুন দেখি, তাহলেই খুসী হয়ে আর এক দফা ধন্যবাদ দিয়ে, আপনার খবর শোনবার জন্য বসে পড়বে?"

লীনার দিকে চাহিয়া করুণ অভিমানের স্বরে ডবসন বলিলেন, "দেখছেন, আমার জয়গাঁথা কতখানি তীব্র পরাজয়ের লাঞ্ছনা বহন করে আনলে! নাঃ, এবার চট-পট্ চম্পট দেওয়াই নিরাপদ! মিঃ পিকক কাল আমায় খুঁজেছিলেন কেন জানতে হবে। বাড়ীতেই আছেন তিনি, আশা করি? আমি গেলে পরে তাঁর দেখা পাব এখন?"

লঘু-কৌতুকস্রোতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া, লীনা ক্ষণিকের জন্য নিজের দুর্ভাগ্য-গ্লানির দাহ ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আবার ডবসনের মুখে পিককের নাম শুনিয়া চকিতে গত কল্যকার কথা সমস্ত মনে পড়িয়া গেল,—নিমেষে মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল! ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতে গেল, কিন্তু তাহার আগেই কৌতুকময়ী পার্সন সবিদ্রূপে বলিয়া উঠিলেন, "সকল বিষয়ে স্বাস্থ্যজনক আশা করাটা যে পৃথিবীর মানুষদের পক্ষে পরম সহজ ব্যাপার, তা খুব জানি, মিঃ ডবসন্, কিন্তু বন্ধুপ্রীতির অনুরোধে, নিঃস্বার্থ হিতৈষী ভাবে উপদেশ দিচ্ছি, শুনুন—হতাশ হওয়াটা তার চেয়েও আশ্চর্য সহজ ব্যাপার!"

প্রশ্নোন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া ডবসন বলি-লেন, "অর্থাৎ? প্রিয়বন্ধু কুঠিতে নাই?—"

লীনা ম্লানমুখে ক্ষীণ হাসি টানিয়া কি একটা উত্তর দিতে গেল, কিন্তু তার আগেই পার্সন বাধা দিয়া বলিলেন, "তার আগেই আমাদের বন্ধুর মঙ্গল সংবাদটা আমাদের দাবী করবার অধিকার আছে, বোধ হয়।"

ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া ডবসন্ বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, ভুলে গেছি, ক্লাউডেন-দম্পতীর কথা বলছিলেন নয়? তাঁরা ভাল আছেন, চমৎকার

ভাল আছেন।" কথাটা বলিতে বলিতে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াইয়া ডবসন ব্যস্তভাবে কি একটা জিনিস খুঁজিতে লাগিলেন।

পার্শন সেটুকু লক্ষ্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে বলিলেন, "আমার চিঠিখানি হারিয়ে এসেছেন তো? মিসেস ক্লাউডেন যেটা লিখেছিলেন?"

অবাক হইয়া মুহূর্ত্ত কাল হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ডবসন্ বলিলেন, "সেটুকুও আন্দাজ অনুমানেই বুঝে ফেলেছেন? বাস্তবিক আমি একটি আস্ত গাধা! মাপ করুন, সত্যিই আমি চিঠিটা হারাই নি, বোধহয়; আমার টেবিলে পড়ে আছে বোধ হচ্ছে, আমি এখুনি গিয়ে খুঁজে দেখ্ছি।"

পার্শন সপ্রতিভভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া সবিনয়ে বলিলেন, "না মিঃ ডবসন, আপনাকে জব্দ কর্‌তে গিয়ে সত্যিই এবার নিজেরা জব্দ হয়ে বসেছি, মাপ করুন। আপনার হাসি-মুখ দেখেই মিঃ ক্লাউডেনের কুশল বুঝতে পেরেছি, আর চিঠির জন্য তাড়াতাড়ি নাই, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন। কিন্তু অমন সাংঘাতিক অসুখের খবর দিয়ে টেলিগ্রামটা করেছিল কে?"

হাসিয়া ডবসন বলিলেন, "বোকা বাঁদরদের ঘাড়ে যদি দুর্বৃত্ত বদমাইস কেউ বন্ধু হয়ে চড়ে বস্‌তে পায়, তবে সে আসল অভিভাবকের চেয়েও বড় দরের মুরুব্বি হয়ে পড়ে কি না! ক্লাউডেনের সেই পাজী বন্ধুটাই আড়াল থেকে এই খেলা খেলেছে, এখন সাফ পিট্‌টান লাগিয়ে সরে পড়েছে।"

পার্শন চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। লীনা ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এমন ভাবে মিথ্যা দুঃসংবাদ দিয়ে মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলে জব্দ করবার অর্থ কি?"

উদাস হাস্যে ডবসন বলিলেন, "মজা দেখা!—বিদায়।"

"বিদায়। মিসেস ক্লাউডেন এখন সেই খানেই থাক্‌বেন?"

"বোধ হয়। কিন্তু শীঘ্র আসাও অসম্ভব নয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মা।

শিশুব্রত শিশুচ্ছ নারী, ধন্য তুমি বলিহারি,
তোমার বর্ণিতে নারি তব গুণ সমুদায়!
অকম্পন অনির্ব্বাণ তব স্নেহ নহে মেয়!
কে তব তুলনা হবে দয়া-স্নেহ-করুণায়?—
সন্তানেরে বক্ষে করি, নিদ্রাহার পরিহরি,
স্ববিপদ্ তুচ্ছ করি' যাপ নিশা কতবার!
সন্তান-মঙ্গল তরে যত বাধা মাথি শিরে
সাজাবে চুম গো তারে হেরি মুখ সুধাধার।

নিজ রক্ত দুগ্ধরূপে, তনয়ের দাও মুখে,
উভ হয়ে মত তার সর্ব্বাঙ্গের কালিমা।
এত স্নেহ কোথা পেলে, কে তোমারে শিখাইলে,
কহ দেখি সন্তানেরে স্নেহময়ি ওগো মা !
স্বার্থময় এ জগত স্বার্থ তরে সবে রত,
স্বার্থ বিনা অন্য কাজ কেহ নাহি করে আর !
সেথা কহ, তবে কেন স্বার্থহীনা মূর্ত্তি হেন,
দয়াময়ি স্নেহময়ি সুখময়ি মা আমার !
এত কষ্ট সহ্য করি, এত জ্বালা বক্ষে ধরি,
পুত্রগণে রক্ষা করি কিবা ফল তব হয় !
তুমি দান কর এত !— প্রতিদান পাও কত ?
দেখ দেখি চিন্তা করি লাভ কিংবা ক্ষতি তায় !
লাভ নাহি ও জননি, সব দিকে হয় হানি,
বুঝিলেও কভু তুমি বুঝিতে ত চাহ না।
'হা পুত্র, হা পুত্র' করি পুত্রগণে কোলে ধরি
চিদানন্দে চুমা দাও, অন্য কিছু দেখ না।
এ ব্রত মা কে শিখা'ল, এ মন্ত্র মা কে জানা'ল,
স্বার্থহীন লোভহীন এ কর্ত্তব্য কে আনিল ?—
আনিল ত, তব প্রাণে কে গাহিল তানে মানে ?—
স্নেহের সুসার দিয়া কে হৃদয় নিরমিল ?
বুঝিয়াছি এতদিনে তিনি ভিন্ন অন্য জনে
স্বার্থভরা বিশ্বমাঝে করে নাহি এই কাজ !
তিনি যে দয়াল পিতা পুত্রের হরিতে ব্যথা
স্নেহরূপে অবতরি পশিয়াছে হৃদি-মাঝ।
সেই তুমি সেই তিনি, সেই তিনি সেই তুমি,
বিন্দু মাত্র নাহি ভেদ মধ্যে তব উভয়ের।
যে তোমা চিনিতে পারে, কায়মনে সেবা করে,
সে ত দুঃখ নাহি পায় তিলমাত্র জগতের !
তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণ তাই বাঁচি,
তুমি ভিন্ন তনয়ের কে বোঝা গো বহিবে ?—
সন্তানের দস্তু যত, সন্তান-প্রার্থনা শত
তুমি ভিন্ন আর কে গো সে-সমস্ত সহিবে ?

ধন্যা তুমি ধন্যা নারী, ধন্য তোমা বলিহারি,
ধন্য তব সহ্য গুণ, ধন্য তব মহিমা!
ধন্য তব পুত্র-স্নেহ, ধন্য তব মায়া-মোহ,
ধন্য তব পুত্র মোরা, কৃপাময়ি ওগো মা॥

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাহাজ ডুবি।

(১০)

শ্রাবণের শেষভাগ। প্রবল বর্ষা অবিরত বারিধারা বর্ষণ করিয়া ধরিত্রীদেবীকে স্নান করাইতেছে। নিবিড় জলদরাশিতে আকাশ আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ক্ষীণ সৌদামিনী আকাশের গায় মৃদু হাসিয়া দেখা দিতেছে। দীঘি-পুষ্করিণী কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তটিনী কূলে কূলে উচ্ছলিয়া পড়িতেছে। প্রবল তরঙ্গরাশি তটপ্রান্তে আঘাত করিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে। ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতেছে। বুদ্বুদগুলি একবার উঠিয়া একবার ডুবিয়া ঠিক্ যেন লুকোচুরি খেলা করিতেছে। পথঘাট সর্ব্বত্র কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। বর্ষা-প্লাবনে পথিককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বেলা অপরাহ্ণ। অবিরত ঝিপ্ ঝিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। সূর্য্যদেব কখন আসিয়াছেন, কখন যাইবেন, তাহা নির্ণয় করা মানুষের সাধ্যাতীত। অবিরত বৃষ্টির জন্য পথ ঘাটের অবস্থা, বিশেষতঃ পল্লিগ্রামের পথের অবস্থা এত শোচনীয় যে তাহার কথায় কাজ নাই। সকল পথেরই এতটা দুর্গতি না হইলেও সহজে কেহ এমন দিনে বাটীর বাহির হইতে চাহে না। দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া রাধাগোবিন্দবাবু নিবিষ্টচিত্তে একমনে গীতা পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি অনাবৃত দেহ দেখিলে সেই পুরাকালের রাজর্ষিদিগের কথা মনে পড়িয়া যায়। ভৃত্য অনেকক্ষণ পূর্ব্বে তামাকু দিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি গীতা-পাঠে এত মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তামাকটা পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়া গেল তবুও তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি পড়িল না। কক্ষতলে বিস্তীর্ণ ফরাস, তদুপরি ধোপদস্ত চাদর, পাশে ধোপদাস্ত ওয়াড় ঢাকা গোটাকতক তাকিয়া। রাধাগোবিন্দবাবু একটা তাকিয়ার উপর কনুইয়ের ভার দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গীতা পাঠ করিতেছিলেন এমন সময়ে এক ব্যক্তি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। লোকটী আমাদের নূতন জমীদারের পারিষদই বলুন, আর সুহৃদই বলুন—শ্রীযুক্ত হারাধন। হারাধনের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেহের গঠনে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শরীর এখনও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। মাংসপেশীগুলি সুদৃঢ়, মস্তকের কেশরাশির এক আনা অংশ মাত্র শুক্লবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যৌবনের সর্ব্ব

এখনও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। তাহার পরিধানে ঢাকাই জরিপাড় মিহি ধুতি, গায়ে ঢাকাই ফুলদার চুড়ীদার, কাঁধের উপর এক খানা তদুপযুক্ত সিল্কের চাদর দোভাঁজ করিয়া ফেলা; পায়ে সিল্কের মোজা এবং পম্পসু শোভা পাইতেছিল। মাথার উপর খাড়া খাড়া চোঁচ কাঁটার মত চুলগুলি তৈলাক্ত করিয়া পমেটম এবং 'কসমেটিকে'র সাহায্যে যথাসাধ্য মসৃণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গোলাকার চক্ষু-দুইটা সুরাদেবীর কৃপায় সর্ব্বদাই রক্তাক্ত, এবং তাহা যেন সর্ব্বদাই কিসের অনুসন্ধানে ব্যস্ত! হারাধন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া পায়ের জুতাটা খুলিতে খুলিতে মুরুব্বিয়ানা ধাঁজে বলিল, "কি হচ্চে মশাই?"

এই বাদলার দিনে নির্জ্জন কক্ষমধ্যে হঠাৎ মনুষ্য-কণ্ঠ শ্রুত হওয়ায় রাধাগোবিন্দবাবু চক্ষের চশমা-যোড়াটি খুলিয়া বাম হস্তে রাখিয়া পুস্তক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "কে?"

"এই যে আমি শ্রীহারাধন চন্দ্র, চিনতে পারছেন না নাকি?" বলিয়া হারাধন ফরাসের মধ্যস্থলে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। নূতন জমীদারের আচার-ব্যবহারে এবং কার্য্যকলাপ-দর্শনে রাধাগোবিন্দবাবু কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত রাধাগোবিন্দবাবুর আর কোন সংস্রব ছিল না। বৈষয়িক সকল কার্য্যভার সম্পন্ন করিত জমীদারের সুহৃদ হারাধন এবং পরাণ। নূতন জমীদার এতদুভয়ের বুদ্ধিমতেই পরিচালিত হইতেন। প্রজাসাধারণের নির্য্যাতনের সীমা ছিল না। তাহারা তাহাদের দুঃখের কাহিনী রাধাগোবিন্দবাবুর নিকটে জানাইতে আসিত, তিনি তাহাদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বলিতেন, "আমি কি করব বাপু, তোমাদের জমীদারকে জানাওগে।" কিন্তু জমীদারের সঙ্গে তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিত না। জমীদারের নিকটে যাইবার সামর্থ্য তাহাদের ছিল না। দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেই হারাধন ও পরাণের হুকুম মত, দ্বারবানের নিকটে প্রহৃত হইয়া তাহাদের ফিরিতে হইত। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবু ইহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ইহাদিগের ছায়া স্পর্শ করিতেও তাঁহার অন্তর অস্থির হইয়া উঠিত। আজ হারাধনকে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মনোভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া ভদ্রোচিত ভাবে বলিলেন, "আসুন!"

হারাধন রাধাগোবিন্দবাবুর কথায় কোনও উত্তর না দিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল,—"ওরে তামাক দিয়ে যা।"

রাধাগোবিন্দ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেলে হারাধন তাহা বেশ মনোযোগের সহিত টানিতে লাগিল। কোনও কথা বলে না। ঠিক যেন সে তামাকু সেবন করিবার জন্যই আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "ম'শায়ের কি অভিপ্রায়ে আমার কাছে আসা হয়েছে?"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হারাধন বলিল, "অভিপ্রায়? অভিপ্রায় আছে বই কি! বিনা অভিপ্রায়ে কি মানুষ কোন কাজ করে?"

হারাধনের এইরূপ নিরর্থক হাসি এবং

কথাবার্ত্তায় রাধাগোবিন্দবাবু আরও অত্যধিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন---"কি অভিপ্রায়টা তবু শুনি ?"

হারাধন বলিলেন, "বাঃ শুনবেন বই কি ! বিলক্ষণ ! আপনাকেই বলতে এসেছি, আর আপনি শুনবেন না ?" বলিয়া ভৃত্যকে পুনর্ব্বার এক ছিলিম তামাকু দিবার জন্য আদেশ করিল। তামাকু টানিতে টানিতে বেশ মুরুব্বিআনা চালে বলিল "আপনার একটী নাত্‌নী আছে না ?" বলিয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষায় রাধাগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে চাহিল। দুর্বৃত্তের মুখে নাত্‌নীর নাম শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। নাত্‌নীর সঙ্গে ইহাদের কি প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁা, তা কি হয়েছে ?"

হা। ওর নাম কি,—এটা আর বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না—আপনি এত বড় বুদ্ধিমান লোকটা হয়ে ?

রা। স্পষ্ট করে খুলে না বল্লে আপনার মনের কথা বুঝ্‌ব কেমন করে বলুন ?

হা। ইয়ে হয়েচে, যে, জানেনই ত আপনাদের জমীদার ছেলেবেলা থেকে চোর-ডাকাতের হাতে পড়ে কত কষ্টই না পেয়েছেন, বিয়ে থাও হয়নি। এখন যাই হোক ভগবানের কৃপায় যখন বাপের বিষয় পেয়েছেন, তখন বিয়ে থাও করা ত দরকার ! আপনিই বুঝুন না ?

অন্যমনস্ক ভাবে রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন "তা তো নিশ্চয় !"

তীব্র দৃষ্টিতে রাধাগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া হারাধন বলিল "এই কেবল নাম কি,—আপনার নাত্‌নীটির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে হবে।"

রাধাগোবিন্দবাবু বিস্ময়ে ক্রোধে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তবে তাঁহার বিচক্ষণতা ও বহু সহিষ্ণুতাগুণে মুহূর্ত্ত-মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন "তা আমার নাত্‌নীকে কেন ? তিনি যদি বিয়ে করবার ইচ্ছে করে থাকেন, তা হলে অনেক জমীদারের মেয়ে পাওয়া যাবে।"

দন্তবিস্তারপূর্ব্বক হাসিয়া হারাধন বলিল, "তা ত' পাওয়া যায় জানি ! তবে ওর নাম কি, আপনার নাত্‌নীর কপাল জোর বলতে হবে, তার ভাগ্য ফিরে গেছে। আপনার প্রভু-পুত্র কেমন করে আপনার নাত্‌নীটিকে দেখ্‌তে পেয়েছেন, দেখে তাঁর ভারি পছন্দ হয়েছে ! তিনি বলেছেন আপনার নাত্‌নীকে ভিন্ন আর কাকেও তিনি বিয়ে করবেন না।"

রা। আমার নাত্‌নী এখনও ছেলেমানুষ, এই সবে বার তের বছরের, এখনও সে বিয়ের যোগ্য হয় নি !

হা। বার তের বছরের মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয় নি ! এ কথা বাঙলা দেশে খাটে না। এ দেশে কত বার তের বছরের মেয়েকে ছেলের মা হতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে !

রা। তা' হতে পারে, কিন্তু সেটা জানেন কি, অভিভাবকের ইচ্ছানুরূপ হয়ে থাকে। আমি সে রকম বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী নই, তা ছাড়া আমার ছেলের অনভিমতে আমি তার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই কইতে পারব না।

রা। সেটা কি আর কাজের কথা হল। আপনি হলেন খোদ কর্ত্তা, আপনি যা বলবেন, আপনার কথার উপরে কি আর আপনার ছেলে কোন কথা কইতে পারবে?

রা। মোট কথা আমার নাত্‌নীর এখন বিয়ে দিতে আমাদের কারও ইচ্ছে নেই। আর তা হোবও না।

হারাধনচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "দেখুন আপনাদের জমীদার, আপনার প্রভু-পুত্র, একদিন যার চাকর বলে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন, আজ তাকে জামাই বলে পরিচয় দিতে পারবেন;—স্বয়ং যেচে তিনি আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে চাইছেন। এটা আপনার সৌভাগ্য বলে মনে করবেন। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করবেন না।

রাধাগোবিন্দ বাবু একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন ম'শায়! এতটা সৌভাগ্যের আমি প্রত্যাশী নই! আমরা গরিব মানুষ, চাকরের জাত, জমীদারের সঙ্গে কুটুম্বিতা আমাদের শোভা পায় না।"

হারাধন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, "কত টাকা চান বলুন, আমরা কিছুতেই পিছপাও হব না।"

ক্রোধে রাধাগোবিন্দবাবুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল তথাপি তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "এইবেলা মানে মানে চলে যান, নইলে আমি ভদ্রতা রাখতে পারব না; আপনাকে জোর ক'রে উঠিয়ে দিতে বাধ্য হব।"

রাধাগোবিন্দবাবুর কথা শুনিয়া হারাধন উত্তেজিত ভাবে বলিল "জানেন কার জমীতে বাস করছেন?"

হাসিয়া রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "সেটা আপনার চেয়ে আমি বেশী জানি।"

হারাধন পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল "তবে? কার অপমান করছেন, সেটা মনে করে দেখুন!"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "তাও দেখেছি। একটা জুয়াচোরের দু'দিন বাদে তাকে জেলখানায় ঢুকতে হবে।"

ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারাধন বলিল, "সাবধান! মুখ সামলে কথা বোল! বুড়ো বলে মাপ করব না বলে দিচ্ছি।"

ধীর প্রশান্তভাবে রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "কিছু দরকার নেই। কে আপনার কাছে মাপ চাইবে মশাই? আপনার যথাশক্তি, যা ইচ্ছে তয় করতে পারেন।"

হারাধন—"আচ্ছা বেশ! তাই হবে। দেখো কি হাল করি। আমার বাড়ী বরিশাল জেলায়, আমাকে সাধারণ লোক মনে কোর না। আমার যে কথা সেই কাজ!" বলিয়া ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে দ্রুত-পদক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেল। রাধাগোবিন্দবাবু চিন্তিতান্তঃকরণে অন্যমনস্কভাবে গীতাখানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে অন্দরাভিমুখে গমন করিলেন।

(১১)

নিশাদলের রাজবাটীতে একজন অপূর্ব্ব জ্যোতিষী আসিয়াছেন। তিনি লোকের

হাত দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সকল কথাই বলিয়া দিতে পারেন। যে তাঁহার নিকটে অদৃষ্ট গণনা করাইতে আসিত, তাহাকেই তিনি বলিয়া দিতেন; কাহাকেও নিরাশ করিতেন না; অথচ কাহারও নিকট হইতে একটা পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার এই অত্যদ্ভুত গণনা-শক্তি দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত! সন্তুষ্ট হইয়া লোকে তাঁহাকে প্রণামী দিতে আসিত, তিনি তাহাও গ্রহণ করিতেন না; বড় জোর যদি কেহ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া তাহা লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত, তাহারই কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন। তাহাও তিনি অধিক পরিমাণে লইতেন না; বলিতেন "আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, কোনও দ্রব্য সংস্থান ক'রে রাখা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ভগবান্ যেদিন যেমন জুটিয়ে দেবেন, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট; পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্য আমাদের গ্রহণ করতে নেই! কেবলমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির মত দ্রব্য আমরা গ্রহণ করতে পারি।"

তাঁহার কথায় তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আরও সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইত। শত সহস্র ব্যক্তি শত সহস্র মুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। ধনাঢ্য, দরিদ্র, গৃহস্থ যে আসিত সকলকেই তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া দিতেন। কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। তাঁহার সুন্দর সৌম্য প্রশান্ত প্রতিমূর্ত্তি এবং ধীর নম্র ব্যবহারে তিনি সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যে একবার দেখিত, সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি ইংরাজীতেও বেশ পত্রিকার কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। লোকে অনুমান করিত তিনি কোনও বড় ঘরের ছেলে, কোনও কারণবশতঃ সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় কাহাকেও বলিতেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মৃদু হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার ব্যবহারে লোকে তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় প্রাপ্ত হইত। তিনি রাজবাটীর একটী নির্জ্জন কক্ষে একাকী বাস করিতেন। রাজার আদেশে যদি কোনও সাধু সন্ন্যাসী সমাগত হন, তবে রাজবাটীতে তাঁহাকে স্থান দিতে হইবে এবং প্রত্যহ দুই বেলা তাঁহাদের সিধা দিতে হইবে। এ জ্যোতিষীটী রাজবাটীতে বাস করিতেন বটে, কিন্তু সিধা গ্রহণ করিতেন না। লোকে বলিত, তিনি সাধু মহাপুরুষ ভক্তের দান ভিন্ন অভক্তের দান স্পর্শও করেন না। রাজা স্বয়ং যদিও একজন নিষ্ঠাবান্ ভক্ত, কিন্তু তিনি তখন বাটীতে ছিলেন না। তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ, সাধু সন্ন্যাসী বা অতিথি ব্রাহ্মণ আদৌ দেখিতে পারিত না। নিতান্ত না করিলে নয় তাই রাজাদেশ পালন করিত মাত্র। এমন অশ্রদ্ধার দান তিনি গ্রহণ করেন না। আবার কেহ কেহ বলিত, তিনি যোগসিদ্ধ পুরুষ, বায়ু আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি রাজার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রাজা বৎসরের অধিক কাল প্রবাসে কাটাইতেন; মাঝে মাঝে বাটী আসিতেন। রাজার পাচক ভৃত্য-দ্বারবানের নিকটে বসিয়া জ্যোতিষী কত গল্প করিতেন, রাজার সংবাদটা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহারাও জ্যোতিষী ঠাকুরের এইরূ

অমায়িকতা ভাব দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ খুলিয়া কথা বলিত। তাহার কতক প্রকৃত, কতক অপ্রকৃত, কতক অতিরঞ্জিত। জ্যোতিষী ঠাকুর তাঁহাদের নিকটে জানিতে পারিলেন, রাজা পুত্রহীন; একটী মাত্র পুত্র হইয়াছিল, বহুদিন পূর্ব্বে শৈশবেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।* দুরন্ত কাল অকালে শিশুটীকে অপহরণ করাতে, রাজা রাণী উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই পর্য্যন্ত তাঁহারা তীর্থে তীর্থেই ভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। তবে কিছুদিন হইল, তিনি মনঃস্থ করিয়াছেন দেওয়ানের কনিষ্ঠ পুত্রটীকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন। তাহারই অনুষ্ঠান হইতেছে। দেওয়ানের পুত্র এখন রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত রাজপ্রাসাদেই বাস করিতেছেন। এবার রাজা তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। রাজপুত্রের কোথায়, কবে, এবং কি প্রকারে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহাও জ্যোতিষী জানিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি গণনা করিয়া বলিলেন—"রাজপুত্রের মৃত্যু ঘটে নাই।" "তিনি এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিষী বলিলেন, তাহা তিনি বলিতে অক্ষম এবং যতদিন না রাজা গৃহে প্রত্যাগমন করেন, ততদিন এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই তিনি প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু রাজার এখন আসিবার কোনও স্থিরতা নাই, এবং তিনি যে এখন কোন তীর্থে অবস্থান করিতেছেন, তাহাও কেহ অবগত নহে। কেবল টাকার দরকার হইলে মাঝে মাঝে দেওয়ানের নিকটে পত্র লিখেন। জ্যোতিষী রাজার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জ্যোতিষীর অদ্ভুত গণনায় লোকে আশ্চর্যান্বিত হইল বটে, কিন্তু অবিশ্বাস করিতে পারিল না। কারণ তাঁহার গণনার প্রতি লোকের একটা অগাধ বিশ্বাস এবং দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়া গিয়াছিল। এ-কান, ও-কান করিয়া ক্রমশঃ এই সংবাদ সকলে জানিতে পারিল। হাটে, ঘাটে, মাঠে, দোকানে, পসারে, বাজারে এই অদ্ভুত ঘটনা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সকলের মুখেই এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ জ্যোতিষীকে স্বয়ং ভগবান্ প্রেরিত বলিবার চেষ্টা করে, কেহ বলে "রাজার পুত্র জীবিত আছেন, অথচ রাজা পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিতেছেন, এই জন্য স্বয়ং ভগবান্ রাজাকে পুত্র দান করিবার জন্য মানুষরূপে রাজবাটীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। রাজা যে পরম ধার্ম্মিক! এমন লোকের উপর ভগবানের দয়া হবে না ত কা'র উপর হবে?"

কথাটা ক্রমশঃ দেওয়ানের কর্ণেও উপস্থিত হইল। তিনি শুনিয়া চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন—কোথাকার একটা ভিক্ষু গাঁজাখোর সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পুত্রের রাজা হইবার পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। একদিন তিনি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রুক্ষভাবে বলিলেন, "ওহে সন্ন্যাসী ঠাকুর! গাঁজার মাত্রাটা একটু কম কোরো!"

জ্যোতিষী অবিচলিত ভাবে উত্তর করিলেন—"মশাই, আমি গাঁজা খাই না, আপনি ভুল বুঝেছেন।" রুক্ষস্বরে দেওয়ান বলিলেন "গাঁজা খাওনা তো, এমন গাঁজাখুরির গল্প সৃষ্টি হয় কোথা থেকে!" পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত ভাবে জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "কি গাঁজাখুরির গল্প সৃষ্টি করেছি?" দেওয়ান

উত্তেজিত ভাবে বলিলেন "গাঁজাখুরি গল্প নয়? আজ পঁচিশ বৎসর হলো রাজার ছেলে মরেছে, আর আজ তুমি বলছ কিনা, সে ছেলে [illegible], বেঁচে আছে! কি আশ্চর্য্য! কেউ এতদিন একথা জানতে পারে নি, আর তুমি বুঝি স্বর্গ হতে দেবদূত আজ এই খবর নিয়ে এসেছ?"

মৃদু হাসিয়া জ্যোতিষী বলিলেন, "ম'শায়! কথাটা মিথ্যা নয়, সত্যই রাজার ছেলে জীবিত।"

দে। তুমি ঠাকুর মতলবপ্রবে যাও।

জ্যো। যখন তিনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন, তখন আমার কথার সত্য মিথ্যা উপলব্ধি করতে পারবেন।

এবার দেওয়ান কিঞ্চিৎ নম্রভাব অবলম্বন করিলেন। অপেক্ষাকৃত একটু শান্ত ভাবে বলিলেন, "ঠাকুর, তোমার মতলবখানা কি বল তো শুনি? আজ পঁচিশ বচ্ছর যে মরেছে সে কি আর যমের বাড়ী থেকে উঠে আসবে? রাজা এখন পোষ্যপুত্র নেবার ইচ্ছা করেছেন, আমার ছোট ছেলেটীকে পোষ্যপুত্র নেবেন বলে স্থির হয়েও গেছে, এখন যদি তুমি তাঁর মৃত পুত্রের কথা তুলে মন খারাপ করে দাও, তা হলে তাঁর মাথা ঘুরিয়ে যাবে। হয় তো পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবার বাসনা ত্যাগ করবেন, তার ফলে এত বড় একটা রাজবংশ লোপ হয়ে যাবে, জমীদারিটা কোম্পানীতে নেবে।"

শান্ত অবিচলিত ভাবে জ্যোতিষী বলিলেন "তাই বুঝি আপনার এতটা রাগের কারণ? কিন্তু মশাই, রাজার জন্য আপনার কোনও চিন্তার কারণ নেই। যথার্থই তাঁর পুত্র জীবিত।"

দেওয়ান মহা বিপদে পড়িলেন। একজন ভিক্ষু সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার আশাতরুর মূলে কুঠারাঘাত করিবার উপক্রম করিয়াছে। যেরূপে হউক তাহাকে বিদায় করিতেই হইবে। দেওয়ান বলিলেন, "বুঝতে পেরেচি ঠাকুর, তোমার কিছুর টাকার দরকার হয়েছে। তাই সন্ন্যাসী সেজে রাজবাড়ীতে এসে রাজাকে ঠকিয়ে কিছু গাঁড়া মারবার চেষ্টায় আছ। তা বাপু, আমার কাছেই বল না, কত তোমার দরকার? আমি যা দোব, রাজা তার চেয়ে বেশী কিছু দেবে না।"

সহাস্যে জ্যোতিষী বলিলেন "না ম'শায়, আমরা সন্ন্যাসী, টাকার প্রয়াসী নই! জগতের হিত-সাধনই আমাদের কার্য্য! রাজা পুত্র-হীন নহেন, গ্রহবৈগুণ্যে পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটেছে মাত্র। এ স্থলে পিতা-পুত্রের মিলনের সাহায্য করা, তাঁর মঙ্গল সাধন করাই আমার কার্য্য!" দেওয়ান যখন কোন প্রকারেই গর্ব্বিত জ্যোতিষীটাকে সহজে হইতে টলাইতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "একটা লাঠির চোটে তোমার সব বুজরুকি ভেঙে দেব! ব্যাটা ভণ্ড, তুমি রাজার ছেলে বার করে দেবে? যমের বাড়ী গিয়ে রাজার ছেলেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস গে" বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেলেন। আর এখানে বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া জ্যোতিষীও সেইদিন গৈরিক বসনখানি এবং লোটা কম্বল লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া চম্পট দিলেন।

(১২)

কানাইয়ের বড় অসুখ। কি অসুখ তাহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। প্রত্যহ যথানিয়মে নানাহারের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা

যায় না। কিন্তু সে বলে, তাহার "বড় ব্যামো।" তাহার বুকের ভিতর কি একটা গুপ্ত ব্যথা আছে, মাঝে মাঝে সেটা বুকে জাগিয়া উঠে, তখন সে মৃতকল্প হইয়া পড়ে। লোকে মনে করে সে নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু সেটা প্রকৃত ঘুম নহে। যন্ত্রণার চোটে সে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। বাড়ীতে গিয়া সুস্থ হইয়া আসিবে বলিয়া মনিবের নিকটে সে দুই মাসের ছুটী চাহিতেছিল, কিন্তু কানাইয়ের মত হিসাবী বুদ্ধিমান্ সভ্যভব্য চাকর দুষ্প্রাপ্য বলিয়া মনিব তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিতেছেন না। তিনি যথারীতি ডাক্তার দেখাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইতে চান। কানাইয়ের জন্য তিনি অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ন'ন, কিন্তু কানাই তাহাতে সম্মত নয়। সে বলে,—এ ব্যামো তাহার ডাক্তার-কবিরাজে আরাম করিতে পারিবে না। তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রভু এজন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কলিকাতায় লইয়া গিয়া খ্যাতনামা চিকিৎসকদের দেখাইয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এ রোগ ঝাড়-ফুঁক, মাদুলি-ধারণ, দৈব অনুষ্ঠান-ব্যতিরেকে আরাম হইবার নয়। কানাই আরও বলে—"এত অসুখে ভুগে কাজ করলে শেষ মারা পড়ব কি? দু'দিন দেশে গিয়ে 'তিকিচ্ছে' করে না জিরুলে কি হয়!" আর তাহার এ রোগ আরাম করিবার রোজা নাকি তাহার দেশেই আছে। মনিব যখন কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহেন না, তখন সে বলিল—"দু মাসের জন্যে আমার ভাই বলাইকে আপনার কাছে রেখে যাব। তার কাজ-কর্ম্ম, হিসেব-কিতেব দেখলে পরে তখন আবার তাকে ছাড়তে চাইবেন না। তার এত বুদ্ধি যে আপনি হাঁ করলে সে আপনার মনের কথা বুঝে নেবে। সে এমন চিনিবি যে আপনি গ্লাস চাইলে সেবি-সাম্পেন, হুইস্কি-ব্রাণ্ডি, সব এনে হাজির করবে। আপনি জল চাইলে খাবার, পান, তামাক সব তৈরি করে আনবে। আপনি ধুতি চাইলে আপনার জামা, জুতো, ছড়ী, ঘড়ি, এমন কি গাড়ীশুদ্ধ যুতিয়ে রাখবে। আমার ছোট ভাই বটে, কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি, হিসেব-কিতেব এমন যে, দেখলে পরে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন।"

সবিস্ময়ে জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি না-কিরে?"

কানাই বুক ফুলাইয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল, "হাঁ, হুজুর! দু'দিন রেখে পরখ করেই দেখুন না কেন? তবে তার একটা কিন্তু মস্ত দোষ আছে।"

ব্যস্তভাবে জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ রে?"

কা। আজ্ঞে সে হাবা, আর কালা। কথাও কইতে পারে না, কানেও শুনতে পায় না। নইলে ভগবান্ তা'কে সব গুণই দিয়েচেন্।

জমী। তবেই ত বলি ভাল! হাবা-কালা চাকর নিয়ে কাজ চালাবো কি করে?

কা। আজ্ঞে তা'হলেও আপনার কাজের কোনও ক্ষতি হবে না। ঐ ত বল্লুম হুজুর! যে আপনি হাঁ করলেই আপনার মনের কথা টেনে আনতে পারবে। এত চালাক সে একটু ইসারা পেলেই ব্যস্! অমনি সব বুঝে ফেলবে। দু'দিন দেখুন না কেন! তা'কে কাজ-কর্ম্ম সব বাতলে দিয়ে তবে যাব।

আপনার কোন কষ্টই হবে না। আপনার যাতে কষ্ট হয়, তেমন কাজ আমি কি করতে পারি হুজুর ? আপনার মত এমন মনিব আমি আর কোথায় পাব ? আহা, যেন সদাশিব ! কি করব ব্যামোটা দু'দিন বড্ড চেগে উঠেছে তাই ! নইলে কি আর আমি আপনাদের কাছ ছেড়ে যাই ! চাকরি যদি করতে হয় তাহলে আপনার কাছেই করব, নইলে এ শর্ম্মা আর কাহারও গোলামী করবে না।"

কানাইয়ের কথা শুনিয়া সপরিষদ্ জমীদার প্রভু মহাসন্তুষ্ট হইলেন। হারাধন জনান্তিকে বলিলেন—"ওকে ভাই রেখেই দেখ না ওর ভাইকে। ও যা বলছে তা সত্যিই হবে। আর দেখ, হাবা কালা চাকর আমাদের পক্ষে এক রকমে ভালই হবে! সত্যি কথা বলতে কি, আমার ও তোমার কানাইকে বড় ভাল বলে ঠেকে না। চাকর-বাকর অত চালাক-চতুর কিছু নয়। বিশেষতঃ বিজে ...... বড্ড পেছনে লেগেছে ; ...... কেবল ঘুরঘুরে পোকার মতন তকে তকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ...... সেদিন সন্ধান জানতে নোয়াখালিতে গেছল ; আসবার সময় নাকি আমাদের দেশে পর্য্যন্ত পায়ের ধুলো দিয়ে এসেছে।"

পরাণ হারাধনের মুখের কাছে হাত দুইটা নাড়িয়া বলিল, "তুই ...... যেমন আহাম্মক ! তুই ত বল্লি সেদিন, বুড়ো ব্যাটার কাছে দেশের পরিচয় দিয়ে এসেছিস ! নইলে কে জানত বল্ ? হারাধন রোষকষায়িত-লোচনে পরাণের দিকে চাহিল। কানাই কাজের ছুতা করিয়া চট্ করিয়া কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেল।

হারাধনের রক্তচক্ষু দর্শনে পরাণ হা হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল ; বলিল, "কি বাবা পাঁচ বছরের কচি খোকাটী পেয়েছ নাকি যে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ ?"

হারাধন অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে বলিল, "থাকা গেছে ভদ্রলোকের মতন সেটা বুঝি তোর ভাল লাগছে না ? আবার কি সেই বনে জঙ্গলে বেড়াবার সাধ হয়েছে নাকি ? বুড়ো হয়ে গেলি, এখনও কি তোর লুকোচুরি খেলার সাধ মিটল না ?"

অম্লানবদনে পরাণ বলিল, "না—সেই যে কথায় বলে 'জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ বলে ডান' ! সমস্ত জন্মটা কেটে গেল যে কাজ করে, সে কাজ কি কখনও ভুলতে পারা যায় ? তা বাবু সত্যি কথা বলতে কি, এ রকম নিরীহ গোবেচারা হয়ে চুপচাপ বসে থাকা আমার মোটেই ভাল লাগে না। গরীব প্রজার ঘর জ্বালিয়ে আর কত আমোদ পাওয়া যায় ? বলে, 'মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার।' মাঝে মাঝে হাতটা সুড় সুড় করে ওঠে। কেবল লাল জলের মহিমায় কোন রকম ক'রে নিজেকে সামলে রেখেছি মাত্র ! তবে যাই বল, তোমার ও বিজে ...কে আমি একরত্তিও ভয় করি না। ফুঃ ! বাছাধন ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি ত ! যেদিন পড়বেন আমার হাতে, সেইদিন টের পাইয়ে দোব ! বলে কত বড় বড় টিকটিকিকে ধরে ঘোল খাইয়ে দিলুম !—আর ও ত সেদিনকার ছোঁড়াটা ! উনি কিনা আমাদের পেছুতে লাগতে আসেন ! হায় রে কপাল !"

গলা ঝাড়িয়া কানাই কক্ষমধ্যে প্রবেশ

করিল; বিনীতভাবে প্রভুকে বলিল, "কি বলেন হুজুর! আমার ভাইকে আসতে কি তা হলে একখানা পত্তর লিখে দোব বাড়ীতে?"

হারাধন প্রভুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"হ্যাঁ—হ্যাঁ দিবি বাই কি! যতই কেন চাকর-বাকর থাক না, তোর বদলে তোর ভাইয়ের থাকা চাই! আজকেই তাকে চিঠি লিখে দে আসবার জন্যে! বুঝলি! এই নে একখানা পোষ্টকার্ড নিয়ে যা।" বলিয়া উঠিয়া সেল্‌ফের নিকটে গিয়া একখানা বইয়ের ভিতর হইতে একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া সে কানাইয়ের হাতে দিল। কানাই পোষ্টকার্ড লইয়া তাহার স্বভাবানুযায়ী যুক্ত করে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে কানাইয়ের ভাই বলাই আসিয়া উপস্থিত হইল। বলাই কানাইয়ের অপেক্ষা বয়েসে ছোট। রংটা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, তবে ধূলায় কাদায় অযত্নে কিছু রুক্ষ রুক্ষ হইয়া পড়িয়া ফ্যাকাসে গোছ দেখাইতেছে; মাথায় রুক্ষ রুক্ষ ঝাঁকড়া, ঝাঁকড়া কোঁকড়া কোঁকড়া, এক রাশি চুল, তাহা দেখিলে মনে হয় না যে জন্মে তাহা কোন দিন তৈল স্পর্শ করিয়াছে। হাত মুখ নাড়িয়া ইঙ্গিতে কথা বলে, কিন্তু খুব চটপটে! কানাই তাহার প্রতিশ্রুতিমত দুই দিন থাকিয়া ভাইকে তাহার কি কি কর্ত্তব্য সে-সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া মনিবের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

কানাই চলিয়া যাইবার দিন কতক পরে একদিন অপরাহ্নে রাধাগোবিন্দবাবুর পৌত্রী নীলিমা ঝিয়ের সহিত তাহাদের খিড়কীর পুষ্করিণীতে গা ধুইতে গিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। তপনদেব অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই পশ্চিম আকাশের কোলে গা ঢাকা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। সন্ধ্যা আগমনের প্রারম্ভেই গাছের তলায় তলায় অন্ধকাররাশি জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। বৃহৎ বাগান; বাগানে আম কাঁঠাল লিচু, গোলাপজাম এবং তাল বেল কুল পেয়ারা নারিকেল প্রভৃতি সমস্ত দেশীয় ফলের গাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে ছিল। আবার খোলা জায়গায় লাউ কুমড়া মূলা বেগুণ শাক সবজি প্রভৃতি যে সময়ের যা ফসল সমস্তই সে বাগানে হইত। রক্ষকস্বরূপ দুইটা মালী সর্ব্বদাই বাগানে অবস্থান করিত। তাহাদের বাসের জন্য বাগানে দুই খানি ঘর ছিল। বাগানের মধ্যস্থলে একটা দীর্ঘিকা, সে দীর্ঘিকার জল অতিস্বচ্ছ, নির্ম্মল! জলে অবতরণ করিলে পায়ের নখ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঘাটটি সুন্দররূপে বাঁধানো, বাগানের চতুষ্পার্শ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যে গেট; গেটের দ্বার লৌহ রেলিং-দ্বারা নির্ম্মিত। রাত্রিতে শয়নকালে মালীরা তাহা সুদৃঢ় তালা দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে। বাগানটী রাধাগোবিন্দবাবুর খিড়কীর বাগান। রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীর মহিলাগণ এই দীর্ঘিকা ব্যবহার করিতেন। উড়িয়া মালিদ্বয় ব্যতীত কোনও পুরুষের গতিবিধি তথায় ছিল না। নীলিমার সমভিব্যাহারিণী ঝিয়ের কক্ষে একটী পিত্তলের কলসী ছিল। সে এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া সোপানের উপর কলসীটাকে রাখিয়া মাজিতে লাগিল। কলসীটি মাজিয়া ধুইয়া সোপানের উপর রাখিয়া কাপড় কাচিবার জন্য সে জলে নামিয়া পড়িল। নীলিমা একটু পৈঁঠায়

গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আঁকশী দিয়া পেয়ারা পাড়িতে লাগিল। পুষ্করিণীর পাশেই পেয়ারা গাছ। নীলিমাকে পেয়ারা পাড়িতে নিযুক্ত দেখিয়া ঝি নিষেধ করিল—"ওগো, কাল সাঁঝিতে সোমত্ত মেয়ে গাছে হাত দিও না।" কিন্তু নীলিমা পেয়ারার লোভ সংবরণ করিয়া, ঝির নিষেধ গ্রাহ্য করিতে পারিল না। ঝি বারংবার চেঁচাইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল, কিন্তু নীলিমা শুনিল না। ঝি কাপড় কাচিতে লাগিল। নীলিমা গোটাকতক পেয়ারা পাড়িয়া স্কন্ধস্থিত গামছা খানাতে বাঁধিয়া লইল। একটা পেয়ারা হাতে করিয়া কামড়াইতে কামড়াইতে দীর্ঘিকার দিকে ফিরিতেছিল, ঠিক এই সময়ে নীলিমার পার্শ্বস্থ একটা কলমের আম গাছ হইতে, দুই ব্যক্তি ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া নামিয়া পড়িল। তাহাদের পরণে ঢিলা পাজামা, গায়ে ঢিলা কুর্ত্তা। কুর্ত্তার আস্তানাদ্বয় বেশ করিয়া গুটানো, পদদ্বয় উন্মুক্ত ও মুখে মুখোস পরা ছিল। তাহাদের সেই বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আতঙ্কে নীলিমা "মা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নিমেষ-মধ্যে তাহারা নীলিমার নিকটবর্ত্তী হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নীলিমাকে আর কোনও বাক্য-স্ফূর্ত্তির অবকাশ না দিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মুখটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং নিমেষ মধ্যে দুইজনে মিলিয়া মৃতদেহের ন্যায় বালিকার দেহলতাখানি স্কন্ধে করিয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। রুমালে ক্লোরফরম মাখানো ছিল, কেননা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বালিকা নির্জ্জীব ভাবে তাহাদের স্কন্ধের উপর লুটাইয়া পড়িল। যখন তাহারা নীলিমাকে লইয়া পলায়ন করিল। ঝি তখন তাহাদের দেখিতে পাইল, এবং 'চোর' 'চোর', 'ওগো কি হলো গো! ও মালী, রঘুয়া, ও চুনা, ওরে মুখ-পোড়ারা তোরা বেরোনারে, মরিচিস্ নাকি,' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিতে লাগিল। ঝিয়ের চীৎকার শুনিয়া রঘুয়া ও চুনা, উড়ে মালীদ্বয় দুই হস্তে গুড়ি রগড়াইতে রগড়াইতে, দৌড়িয়া আসিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কড় হউচি পারা?" ঝি কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমার মাথা হয়েছে! এতক্ষণ ছিলি কোন চুলোয়? দেখ দেখ খুকু-রাণীকে চুরি করে নিয়ে গেছে, শীগগির যা, ছুটে যা, অমন দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা না ছুটে", আমি বাড়ী গিয়ে বাবুদের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?" নীলিমাকে বাড়ীর সকলেই আদর করিয়া খুকুরাণী বলিত। ঝিয়ের কথা শুনিয়া উড়িয়া-পুঙ্গবদ্বয় অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া রহিল। ঝিয়ের কথার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইল না। ভাবিল, খুকুরাণীকে চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে কি? খুকুরাণী কি টাকার বস্তা, না সোণার ঢেলা, অথবা বাগানের ফসল যে, তাহাকে চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে! তাহারা সবিস্ময়ে উভয়েই এক-বাক্যে বলিয়া উঠিল, "কঁড় কউচি? খুকুরাণী গলা কঁউঠি?" অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ঝি উত্তর করিল "আরে মোল, উড়ে ম্যাড়া, বুঝতে পাচ্ছিস্ না? ছুটো কে যমদূতের মতন মিলে খুকুরাণীকে কাঁধে করে নিয়ে পালিয়ে গেল, দেখ্ না কোথায় গেল, ওমা কি হবে গো!"

তখন উভয়ের মস্তিষ্কেই বুদ্ধির গাছ গজাইয়া উঠিল। কথায় বলে—"চোর পালালে

ঘুচি যাবে।” উড়িয়া-বীরদ্বয়েরও ঠিক তাহাই হইল। এইবার তাহারা লম্ফঝম্পপূর্ব্বক “আরে মলারে শঙ্কা গলা কোয়াড়ে” বলিতে বলিতে উড়িয়া-বীরদ্বয় ছুটিল। ঝিও প্রথমে চোর দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহার সাহস ও শক্তির আবির্ভাব হইল। আর্দ্রবসনে গালাগালি দিতে দিতে মালীদের পশ্চাৎ সেও ছুটিল। গোলমাল শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবু এবং এবং নীলিমার পিতা অজয়নাথও বাহির হইয়া পড়িলেন। ঝিয়ের মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অজয়নাথ একটা পিস্তল হাতে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। চারিদিকে লোক ছুটিল, পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইল, কিন্তু চোর তখন সাধু হইয়া আড্ডায় গিয়া বসিয়াছিল, পুলিশের সাধ্য কি যে ধৃত করে? কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া সকলে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। রাধাগোবিন্দবাবু বিজনকুমারের নিকটে গেলেন। বিজনকুমার তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার অনেক কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতিনিধির কার্য্য করিতেছিলেন। তিনিই বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “বিজনবাবু আজ কদিন থেকে বাড়ীতে নেই, কোন একটা বিশেষ দরকারের জন্যে স্থানান্তরে গেছেন। কেউ এলে পর, কি কোনও সংবাদ থাকলে আমাকে লিখে রাখতে বলে গেছেন।”

বিজনবাবুর সহিৎ সাক্ষাৎকার না হওয়াতে রাধাগোবিন্দবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কি প্রকারে নীলিমাকে পাওয়া যাইবে, ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; বলিলেন, “তিনি কবে আসবেন? আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ ছিল।”

কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন, “তার কিছুই ঠিক নাই, আজ-কালের ভিতরে আসতে পারেন, আবার দুদিন দেরিও হতে পারে। আবার এখুনিও এসে পৌছিতে পারেন। তিনি কখন কি করেন, কখন কোথায় যান, সে কথা কারও কাছে প্রকাশ করেন না।”

“তাই ত! এখন-কি করা যায়?” বলিয়া রাধাগোবিন্দবাবু চিন্তিতমনে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

কর্ম্মচারী বলিলেন, “আপনার আবশ্যকতাটা কি বলতে যদি বাধা না থাকে, তাহলে আমাকে বলুন, আমি নোট করে নিচ্ছি, তিনি এলে দোব।”

বলিতে বলিতে বিজনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজনকুমারকে দেখিয়া রাধাগোবিন্দবাবু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, বলিয়া উঠিলেন “এই যে বিজনবাবু এসেচেন, বাঁচা গেল!”

বিজনবাবু সসম্ভ্রমে বলিলেন, “ও দাদা-মশাই সন্ধ্যে থেকেই বসে আছেন নাকি? বড় কষ্ট হয়েছে ত!”

রাধাগোবিন্দবাবু প্রবীণ ব্যক্তি বলিয়া বিজনকুমার কোনও দিন তাঁহার নাম ধরিতেন না। ‘দাদামহাশয়’ বলিয়া ডাকিতেন। এবং সম্বন্ধানুযায়ী সময়ে সময়ে রহস্যালাপ করিতেও ছাড়িতেন না। অমরকুমার চলিয়া যাইবার পর হইতে বিজনকুমারের রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীতে যাতায়াতটায় কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাঁহার পরিবারবর্গের

সহিত ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছিল। বিজনকুমারের কথা শুনিয়া রাধাগোবিন্দ-বাবু বলিলেন, 'আমি বড় বিপদে পড়েছি।'

প্রশান্তভাবে বিজনকুমার বলিলেন, "আপনি আসবেন বলেই আমি তাড়াতাড়ি করে আসছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "কি বলছেন, আমি আসব বলে আপনি জানতেন?"

সহাস্যে বিজনকুমার বলিলেন, "হাঁ জানতাম বৈকি! আরও জানতাম নীলিমার অনুসন্ধানের ভারটা আমার স্কন্ধেই পড়বে!"

রাধাগোবিন্দবাবু অবাক্! বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিজনকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নীলিমাকে চুরি করে নিয়ে গেছে তাও জানেন?"

বি। জানি বই কি! আপনারা চোরকে প্রশ্রয় দেবেন, আর চোরে চুরি করবে না? দোষ চোরের নয়, রাগ করবেন না দাদামশাই, দোষ আপনাদের।

রা। আপনার কথাটা বুঝতে পারলুম না বিজনবাবু! আমরা চোরকে প্রশ্রয় দিচ্ছি কি রকম?

বি। দিচ্ছেন না? চোর যখন আপনাকে শাসিয়ে গেছ'ল 'যেমন ক'রে হক নীলিমাকে নিয়ে যাবই, তখন ত কৈ আমাকে কিছু বলেন নি? তা হলে আর এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। আপনারা মেয়েকেও সাবধানে রাখলেন না, আমাকেও জানালেন না। কাজে কাজেই চোরের চুরি করবার সুযোগ হলো।

চট্ চট্ করিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া গেল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপনি সে কথা জানলেন কি করে বিজনবাবু? আপনি কি অন্তর্যামী?"

বি। না, আমরা অন্তর্যামী নয়, দাদা-মশায়! তবে দিন-রাত চোর-ডাকাতের পেছনে পেছনে ঘুরতে হয় বলে আমাদের চারিদিকে চোখ-কান রাখতে হয়। কাজে কাজেই সাধারণ লোকের চেয়ে আমরা সংসারের খপর ঢের বেশী পাই।

রা। আপনি কি সন্দেহ করেন, তাদেরই এই কাজ?

বি। নিশ্চয়! সন্দেহ কি?—নিশ্চয়! আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

রা। প্রত্যক্ষ করেছেন? বলেন কি? নীলিমাকে নিয়ে যেতে আপনি দেখেছেন নাকি?

বি। হাঁ আমি তখন তাদের কাছেই ছিলুম।

রা। কাছেই ছিলেন? আপনার সুমুখ দিয়ে আমার নীলিমাকে চোরে চুরি করে নিয়ে গেল, আর আপনি রক্ষা করলেন না?

বি। কি করব বলুন! তারা শক্তিশালী দস্যু, তাতে সশস্ত্র! আমি ক্ষীণ-জীবী ম্যালেরিয়াভুক্ত বাঙ্গালী! তাতে আবার একলা, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও কিছু ছিল না। কেমন করে কি করি বলুন? নিজের ডাহা কাঁচা গলাটা তো আর তাদের ছুরির আগায় বাড়িয়ে দিতে পারি না।

অত্যন্ত কাতর হইয়া রাধাগোবিন্দবাবু বিজনকুমারের ডানহাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি হবে উপায়! আমার নীলিমাকে

কি আর পাব না? আমাকে রক্ষা কর ভাই! আমার জাত, কুল, মান, সব তোমার হাতে। আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।"

এমন ভাবে রাধাগোবিন্দবাবু কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে বিজনকুমারের অন্তরও ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং বৃদ্ধের এই ভ্রাতৃ-সম্বোধনে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বৃদ্ধের মুখে 'আজ্ঞে' 'আপনি'র চেয়ে 'তুমি' কথাটা বিজনকুমারের বেশ মধুর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনার কোনও চিন্তা নাই দাদামশাই, আমি যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন নীলিমার কোনও অনিষ্ট হতে দোব না।

যত শীগ্‌গির পারি আপনার নীলিমাকে উদ্ধার করে আপনার কাছে এনে দোব।

শুনিয়া রাধাগোবিন্দ কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, "ভগবান্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন! তুমি চিরদিন এমনি নিঃস্বার্থ-ভাবে লোকের উপকার করতে থাক। অজয় তো একেবারে ঘাড় গুঁজড়ে বিছানায় এসে পড়েছে। একে মেয়ের ভাবনা, তাতে অপমানের ভয়।"

মৃদু হাসিয়া পরিহাসচ্ছলে বিজনকুমার বলিলেন, "এত ভাবনাই বা কেন দাদাম'শাই? জমীদার নাত-জামাই হবে মন্দটাই বা কি? তারা তো আর মন্দ অভিপ্রায়ে নিয়ে যায় নি! বিয়ের আয়োজন কচ্ছে!"

চমকিয়া উঠিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "তাই নাকি? বিয়ের আয়োজন কচ্ছে?"

বি। হাঁ, পুরুত ডাকিয়ে পাঁজী দেখিয়ে বেশ চলনসই বিয়ের বন্দোবস্ত করছে!

তাহার পর তিনি আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন দাদামশাই, জমীদার নাত-জামাই আপনার পছন্দসই নয়?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "না ভাই, আমার জমীদার নাত-জামাইয়ে কাজ নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমরা যেমন খেটে খেয়ে মানুষ হয়েছি, আমার নাত-জামাইও যেন তেমনি খেটে খেয়ে মানুষ হয়; মনুষ্যত্ব শেখে! এর বাড়া আমি আর কিছু চাই না!"

বিজনকুমারের মুখ-ভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। যেন একটা পুলকের তড়িৎপ্রবাহ তাঁহার অন্তরের ভিতর দিয়া দ্রুত বহিয়া গেল। বুঝি, কার একখানা কচি মুখ তাঁহার হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে একবার উঁকি দিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি ত্রস্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "তবে চল্লুম দাদামশাই, আমার হাতে অনেক কাজ, আমার এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াবার অবকাশ নেই।"

রাধাগোবিন্দবাবুও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাও ভাই! ভগবান্ তোমায় সহায় হোন, তোমার সকল কাজ সফল হোক। আমি অস্থির হয়ে পড়েছি! যতক্ষণ না আমার নীলিমাকে পাই, ততক্ষণ আমার মন স্থির হচ্ছে না! হা ভগবান্, এ কি করলে! বুড়ো বয়সে একি পরিতাপ!" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বিজনকুমার তাঁহার কর্ম্মচারীটিকে গোপনে দুই একটা কি পরামর্শ দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

নাড়ু-গোপাল।

(১)

এস—যশোদা-দুলাল! নাড়ুয়া-গোপাল!
হামা দে ছুটে ধন পালায়ো না।
আমি—রয়েছি বসিয়ে, বাহু প্রসারিয়ে,
দেখা দে যাদু, আর লুকায়ো না।

(২)

মোর—কোলে দুলে হেলে, এসে হেসে খেলে,
জুড়াও তৃষিত তাপিত হৃদি।
দেখি—তন্ময় হইয়ে, আপনা ভুলিয়ে,
নাচ গো হৃদয়ে হৃদয়-নিধি!

(৩)

তুমি—বুকেতে নাচিবে, করতালি দিবে
মুগধ নয়নে চাহিয়ে র'ব।
তব—কঙ্কণ-কিঙ্কিণী— রসাল-শিঞ্জিনী,
—রুণু ঝুণু বোলে বিভল হ'ব।

(৪)

মরি—আ মরি আ মরি! কি রূপ-লহরী!
লাবণ্যে ভুবন ভাসিয়া যায়!
আহা—সুঠাম সুন্দর, নিটোল নধর,
নবীন-নীরদ-বরণ কায়।

(৫)

শিরে—শিখি-চূড়া হেন— নভোধনু যেন,
কজ্জল-শৈবালে নয়ন-পদ্ম।
কিবা—ললাটে অলকা— খচিত তারকা,
অধর সায়াহ্ন-রক্তিম সদ্য।

(৬)

দোলে—নাসায় বেশর— ধবল সুন্দর,
—নীল-সায়রে মরাল যেন রে!
খেলে—কটিতে মেখলা, মেঘেতে চপলা,
কুণ্ডল ফণি-যুগ-মণ্ডল রে!

(৭)

কি যে—পরাণ মাতানো, ভুবন ভোলানো,
হাতে নাড়ু ধরা গোপাল ওই!
আমি—আমিত্ব যে ল'য়ে, মোহে মুগ্ধ হ'য়ে,
এমন মাণিক কোলে না লই!

(৮)

এবে—চিনেছি চিনেছি, বুঝেছি বুঝেছি,
কেন যে গোপাল নাড়ুটি ধরে।
তুমি—রেখেছ আহার, সুমিষ্ট সুধার,
বিশ্ব-প্রপঞ্চের প্রাণীর তরে।

(৯)

জীবে—শিখাতে সরল, অভেদ অমল,
বাল্যভাব আহা মধুর কি যে!
তাই—ভুবন-মোহন, নয়ন-রঞ্জন,
বাল্যরূপ তুমি ধরেছ নিজে।

(১০)

এস—যশোদা-দুলাল! নাড়ুয়া-গোপাল!
স্নেহ-স্তন্য দিই অধরে ওই।
ডাক—এসে মোর কোলে, আধ 'মা'মা' বোলে,
বাৎসল্য-ভাবেতে মগন হই।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

গোপীনাথের মন্দির।—কাছোয়ার ঠাকুর-বংশের রায়সেলজী-নামক জনৈক ব্যক্তি গোপীনাথের মন্দির স্থাপন করেন। ইনি আফগানগণকে দূরীকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া আকবর ইঁহাকে দরবারী খেতাব দেন এবং ১২৫০ অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক করেন। ইনি মানসিংহের সহযোগে মেওয়ারের রাণা প্রতাপ সিংহের সহিত যুদ্ধ করেন এবং কাবুল আক্রমণেও বিশেষ বীরত্ব দেখান। ইঁহার মৃত্যুকাল অজ্ঞাত। গোপীনাথের মন্দিরের মত অবিকল এক মন্দির ইনি নির্ম্মাণ করেন, পরন্তু তাহা এখন ভয়ানক ভগ্নদশাপন্ন।

যুগলকিশোরের মন্দির।—ইহা বহু পুরাতন মন্দির এবং কেশীঘাটের নিকটে অবস্থিত। ইহা জাহাঙ্গিরের সময় ১৬৮৪ সংবতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চৌহান রাজপুত-বংশোদ্ভূত ননকরণ নামে জনৈক ব্যক্তির দ্বারা এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়।

রাধাবল্লভের মন্দির।—১৬৮৩ সংবতে সুন্দর দাস নামক জনৈক কায়স্থ-দ্বারা এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। ইনি দিল্লীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ব্রজচাঁদ গোঁসাইয়ের শিষ্য এবং রাধাবল্লভী উপাসক সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা হরিবংশ-নামক জনৈক ব্যক্তির পুত্র।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। শৃঙ্গার বটনামে বাঙ্গালী মন্দিরটী মদনমোহনের নিকট অবস্থিত। এই মন্দিরের বার্ষিক আয় ১৩৫০০৲ টাকা এবং ইহার অংশীদার তিনজন চারিমাস ব্যাপিয়া প্রত্যেক অংশীদারের পালা পড়ে। নদীর পরপারের জহাঙ্গিরপুর নামে গ্রাম এবং বেলবন উক্ত মন্দিরের জমীদারী।

রাধা-দামোদরের মন্দিরে জীবগোসাই, তাহার খুল্লতাত ও রূপসনাতনের চিতাভস্ম রক্ষিত আছে। রাধা-দামোদরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জীব গোসাই এবং অপর দুইজন গোবিন্দ দেবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। জীবদ্দশায় ইঁহারা এই বাসনা প্রকটিত করেন যে, মরণান্তে যেন তাঁহারা একই স্থানে সমাহিত হন; সুতরাং তাঁহাদিগকে একই স্থানে গোর দেওয়া হয়। শ্রাবণ মাসে উক্ত তিন জনেরই বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে; এই সময়ে তথায় অনেক বাঙ্গালীর সমাগম হয়। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক জনে কিছু কিছু পূজা চড়ান। মন্দিরের লভ্যাংশ দুই মন্দিরের মোহান্ত বণ্টন করিয়া লয়েন, কিন্তু ১৮৭৫ খৃঃ রাধাদামোদরের মোহান্ত গোবিন্দদেবের লোকগুলিকে পৃথক করিয়া স্বয়ং সর্ব্বস্ব লইতে চেষ্টা করেন। রাধা-দামোদরের মোহান্ত বলেন যে, গোবিন্দদেবের ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন; কারণ, তাঁহারা জয়পুর-রাজের আদেশানুসারে কপালে ত্রিপুণ্ড্র তিলক কাটেন। এরূপ তিলক শৈবদিগের চিহ্ন। এই কথায় দুই দলে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হয়। পুলিশ হস্তক্ষেপ না করিলে নিশ্চয়ই একটা হাঙ্গামা হইত।

পুরাতন মন্দিরের কথা আমি বলিয়াছি। এক্ষণে আধুনিক মন্দিরের কথার উল্লেখ করিব।

আধুনিক মন্দিরের মধ্যে পাঁচটী উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের মধ্যে যেটী খুবই পুরাতন সেইটীর নাম কৃষ্ণচন্দ্রমা। ইহা ১৪১০ খৃঃ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ-নামক জনৈক প্রাতঃস্মরণীয় বাঙ্গালী কায়স্থের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইনিই বৃন্দাবনে লালাবাবু নামে খ্যাত। মন্দির-নির্ম্মাণ করিতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

লালাবাবুর পূর্ব্বজ হরকৃষ্ণ সিংহের পুত্র বাবু মুরলীমোহন সিংহ একজন ধনাঢ্য সওদাগর এবং জমিদার ছিলেন। মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী কান্দি-নামক স্থানে ইঁহার বাস। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিহারীলাল সিংহের তিন পুত্র,—রাধা-গোবিন্দ, গঙ্গা-গোবিন্দ এবং রাধাচরণ। শেষোক্তটী পিতার সম্পত্তি পাইবামাত্র অন্য দুই ভ্রাতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরুদ্দেশ হন। রাধা-গোবিন্দ মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ এবং সিরাজদৌল্লার চাকুরি গ্রহণ করেন ও অতি শীঘ্র উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অপুত্রক মরেন, সুতরাং তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতা গঙ্গা-গোবিন্দ পান। ইনি Warren Hastingsএর সময়ে Bengal Settlementএ অনেক সাহায্য করেন। ইঁহারই দ্বারা নদীয়ায় চারিটী মন্দির এবং কতকগুলি ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরগুলি নদীর জলে ভাঙ্গিয়া যায় এবং দেববিগ্রহ কাঁদিতে লইয়া আসা হয়। নদীয়াতে ইনি কতকগুলি সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করেন। ইনি ইঁহার পিতার শ্রাদ্ধে অনেক টাকা ব্যয় করেন এবং প্রতি বৎসরেও ১ লক্ষ টাকার কম খরচ করিতেন না। গঙ্গা-গোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ পিতৃধনের আরও বৃদ্ধি সাধন করেন। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালাবাবু নামে খ্যাত। ইনি প্রথমে বর্দ্ধমানে রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং পরে উড়িষ্যায় আসেন। ব্রজ-ধামে আসিয়া যখন ব্রজের সীমানা নির্দ্ধারিত করেন, তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। বৃন্দাবনে ইঁহার মন্দির ত আছেই; তদ্ব্যতীত পান্থনিবাসও আছে। এই পান্থনিবাসে যাত্রিগণকে প্রত্যহ আহার দেওয়া হইয়া থাকে। ইঁহার বাৎসরিক খরচ ২২ হাজার টাকা। রাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে ই ইনি সুন্দর ঘাট বাঁধাইয়া তদুপরি প্রস্তরের চত্বর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। লোকে এই চত্বরের উপর উপবেশন করিয়া রাধাকুণ্ডের শোভা দর্শন করে। এই অগাধসম্পত্তিশালী মানুষের মনে হঠাৎ ভগবৎপ্রেম স্পর্শ করিল। অমনি অতুল বিভব পরিত্যাগ করিয়া তিনি বৈরাগ্য-মার্গ অবলম্বন করিলেন। যখন ইনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, তখন ইঁহার বয়স চল্লিশ মাত্র। এই বয়সে তিনি ব্রজের বন, উপবন, প্রভৃতি সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে ভ্রমণ করেন। এই কালে ইনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও এইরূপ ভাবেই জীবন কাটাইয়াছিলেন। দৈববশে ঘোড়ার পদাঘাতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ শেঠ লক্ষ্মীচাঁদের পিতার সহিত থাকিতেন। ইনিও সন্ন্যাসি-ধর্ম্মাবলম্ব ছিলেন। মথুরাতে লালাবাবু যে দশবৎসর সংসারাশ্রমে ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি তথাকার তীর্থস্থানগুলিকে ক্রয় করেন। ইহাতেই তাঁহার আয় বৃদ্ধি করিবার উপর কিরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি

করিতে পারা যায়। তিনি তথাকার জমিদারদিগকে বলেন যে, স্থানগুলির মাহাত্ম্য-রক্ষার্থই তিনি লইতেছেন—স্বীয় ভবিষ্যৎ আয়ের জন্য নহে; এই সকল স্থানে বানর ময়ূর পূর্ব্বকালে যেরূপ নৃত্য করিত, পরেও সেইরূপ করিবে। অবশ্য এই সব অঙ্গীকার মৌখিক মাত্র ছিল, কোনরূপ কাগজে কলমে ছিল না। মহাত্মার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সে অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই। জমিদারগণও দেখিলেন যে, নালিশ করিলেও এবংবিধ ঘটনার কোনরূপ প্রতিবিধান হইতে পারে না; কারণ মৌখিক কড়ার আদালতে গৃহীত হয় না। মথুরা জিলায় লালাবাবু যে সকল গ্রাম ক্রয় করেন, তাহার সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী; যথা, (১) কোশী পরগণায় জাউ, (২) ছাত্রায় নন্দগাঁও, (৩) বর্সানা, (৪) সঙ্কেত, (৫) করহেলা, (৬) গড়্‌ষী এবং (৭) হাতীয়া এবং মথুরা-পরগণায় (৮) মথুরা, (৯) যাইত,(১০) মাহোলী এবং (১১) নারীপুর। শেষোক্ত স্থান ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানই ন্যূনাধিকপরিমাণে তীর্থস্থান। ইহাতে আরও চারিটী গুজরদিগের গ্রাম, যথা পীরপুর, গুলালপুর, চামারগাড়ী এবং ধীমড়ী যোগ করিলে একুনে ১৫টী গ্রাম হইয়া থাকে। নন্দগাঁওয়ের ক্রয়ের জন্য ৯০০৲ টাকা, বর্সানার জন্য ৬০০৲ টাকা, সঙ্কেতের জন্য ৮০০৲ টাকা এবং করহেলার জন্য ৫০০৲ টাকা দেন। উক্ত গ্রামের বার্ষিক আয় নন্দগাঁও হইতে ৬৭১২৲, বর্ষানা হইতে ৩১০৯৲, সঙ্কেত হইতে ১৬৪২৲ এবং করহেলা হইতে ১৯০০৲ টাকা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, লালাবাবু যখন সংসারাশ্রমে ছিলেন, তখন আয়বৃদ্ধিবিষয়ে তাঁহার মস্তিষ্ক কিরূপ ছিল। তিনি যেমন সন্ন্যাসাশ্রমে বৈরাগ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তেমনই তিনি সংসারাশ্রমে বিষয়ীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি আলিগড় ও বুলন্দসহরে চৌহানবংশীয় রাজা বাবাসিংহের নিকট হইতে ৭২টী গ্রাম ক্রয় করেন; কিন্তু তন্মধ্যে ১২টী গ্রাম লালাবাবুর বংশধর শ্রীনারায়ণ সিংহের সময়ে নিলাম লইয়া যায়। শ্রীনারায়ণ সিংহ পিতার মৃত্যুকালে নাবালক ছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে নারায়ণ সিংহ পরলোক প্রাপ্ত হন। রাণীমাতা তাঁহার পুত্রের দত্তক পুত্রদ্বয়কে প্রতিপালন করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি প্রতাপচন্দ্র নামে খ্যাত। ইনি কান্দিতে একটা ইংরাজি স্কুল এবং কলিকাতায় চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন এবং সরকার হইতে বাহাদুর খেতাব পান। ইনি ১৮৬৭ খ্রীঃ ভবধাম পরিত্যাগ করেন। ইঁহার চারিটী পুত্র যথা গিরীশ চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র, এবং শরৎ চন্দ্র। ইঁহার অনুজ ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৬৩ খ্রীঃ একমাত্র পুত্র ইন্দ্রচন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। লালাবাবুর জমীদারী ইন্দ্রচন্দ্র ও তাহার তিনটী খুল্লতাত-পুত্রদিগের মধ্যে বণ্টিত হয়। মথুরা জেলার জমীদারীর খাজনা ৭৬, ৭৩৮৲ টাকা। ইহা হইতে গভর্ণমেণ্ট ৪৯৪৯৬৲ টাকা রাজস্ব লয়েন। যখন জমীদারী ক্রয় করা হয়, তখন তাহার মূল্য ছিল ২৪০৭৯২৲ টাকা; এখন ৩৮০৪৯২৲ টাকা। ক্রমশঃ

শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ।

জীবন-রাগিণী।

জীবন-রাগিণী কি? কেনই বা বাজে, বাজায় কে, শ্রোতাই বা কে? কখনই বা এ রাগিণী বাজে? কত কথা, কত প্রশ্ন! এর সমাধান কোথায়, তা ত জানি না। জীবন জানি, সুখ দুঃখ আশা নিরাশা হাসি কান্নার ভিতর দিয়ে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন চলে; কি স্থাবর জঙ্গম, কি চেতন অচেতন, সকলে যে নিয়তির চক্রে বাঁধা—জীবনও সেই চক্রের আবর্ত্তে ঘুরিতেছে ও তার সমাপ্তি—সেই যতটুকু তার আয়ু, তাহার পর আরো আছে কিনা, তাহা জানা যায় না। 'সারা জীবন' কথাটী শুনতে যত বড়, জীবনকে তত বড় করে ব্যাপ্ত করে ক'জনে খাটাইতেছি। গোড়া থেকেই যখন যেটার যা অর্থ তাহার অনুসারে না চলি সে যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাহাতে ভুল নাই।

তবে এ অসত্যের মধ্যে সত্য, নিত্যের মধ্যে অনিত্য, জ্ঞেয়ের মাঝে দুর্জ্ঞেয় সেই অমর জীবন-রাগিণী কি করে বাজে? সাধারণতঃ হারমোনিয়মের সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া রাগরাগিণী গাহিয়া কত বাহবা লই, কিন্তু এ তো সে মূল রাগিণীর বাহিরের ছায়াও স্পর্শ করে না। সুরে যেমন কোমল-কঠিনতার তারতম্যে, দিবস-রজনীর সময়ের পার্থক্যে, পর্দ্দা ও কড়ি-কোমলের পার্থক্যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয় ও গীত হয়, জীবনেরও সেইরূপ কত রাগ আছে। ভৈরবী সেই অতি প্রত্যূষে আর পূরবী সেই সন্ধ্যাকালে, এই রাগে গীত এই সময়ে গাহিলে যেমন সুন্দর শোনায়, অন্য সময়ে তেমন লাগে না। সময়ের পার্থক্যে নির্দ্দিষ্ট রাগের কতটা সার্থকতা এই অর্থে পাওয়া যায় যে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারি। আনন্দের সময়ও সঙ্গীত মনোরম, দুঃখের সময়ও সঙ্গীত শান্তিদায়ক। এতো সাধারণ মানব-সঙ্গীতের এরূপ পরিচয়। কিন্তু জীবন-রাগিণীর সঙ্গীত কিরূপ, ইহার তুলনায় তাহা ধারণায় আসাও সম্ভব নহে। বীণা বাজিলে পঞ্চম রাগে মূর্চ্ছনার চাপে যে ঝঙ্কার উঠে সে তো শুধু বাদ্যকরের অঙ্গুলির স্পর্শের নয়। তাহার অঙ্গুলি কেন, সমস্ত প্রাণমনই সেই সেই চালনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। যে বাঁশী বাজায় সে কাল সময় সকল ভুলিয়া ভিতরের হৃদয়কে টানিয়া জোর দিয়ে বাজায় তবে তো বাহিরের অমন স্বর হয় যে, মানুষ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। যদি সাধারণ বাদ্য ও সঙ্গীতের এত মাদকতা, এত মহিমা, সেই অমর জীবন-রাগিণীর সৌন্দর্য্য কতদূর তাহা আমরা শ্রবণে হীন বলিয়া শুনিতে পাই না বা উপলব্ধিও করিতে পারি না। সাধারণ সুরের রাগিণীকে আরো পবিত্রভাবে গাহিয়া জীবন-রাগিণীকে বাহির করিতে হয়। সুরের রাগিণীতে যেরূপ ভৈরবী, গান্ধার, সিন্ধু, খাম্বাজ ইত্যাদি আছে, জীবনের রাগিণীতেও তেমনি সুখ দুঃখের রাগিণী—আশা নিরাশার রাগিণী, শোকের আনন্দের রাগিণী হাসি, ও কান্নার রাগিণী আছে।

কখন এই জীবনরাগ বাজে?—আর কেন বাজে?—এর আলোচনায় যত প্রবেশ করা যায় তত যেন আলোচনা আরো গাঢ়তর হইয়া

উঠে। Merchant of Veniceএ Lorenzoর মুখে শোনা যায় যে, স্বর্গীয় দেবদূতেরা দিবারাত্র অমর রাগিণীতে সঙ্গীত করিতেছেন; আমরা কিন্তু দিবারাত্র স্বার্থমোহে, পার্থিব সুখে, মরজগতের ব্যাপারে এতই অভিভূত যে সে সঙ্গীত আমাদের কর্ণের মধ্যে প্রবেশই করে না। ঐ যে নির্জ্জন গহনে গভীর সাধনে মগ্ন জিতেন্দ্রিয় যোগী, যিনি জগতের সকল সম্পর্কহীন, যেখানে সংসারের কোন ঝঞ্ঝাটের শব্দ নাই বা ইন্দ্রিয়ের সহিত পরিচয়ে তাহার দাস হইয়া জীবন কাটাইবার প্রলোভনের অবসর নাই—সেখানেই সেই তপস্বী কেবল সেই অমর সঙ্গীত শুনিতে সমর্থ।

আমাদের জীবনরাগিণীও কত বেজে যাইতেছে, গিয়াছে! তাহা শুনিবার মত অবসরও নাই, নিজেরা এতই অনুপযুক্ত! সে যোগ্যতা থাকিলে তো সে রাগিণী শুনিব। ঝঙ্কার দিয়ে বেজে যায় রাগিণী কখন কোন সময় থেকে, তাহা মানুষ জানে না। যখন তাহা তাহার কর্ণের ভিতর গেল, যখন সংসারের আবর্ত্তে ধ্রুবতারা হারাইয়া ভগ্নতরীর ন্যায় মন এদিক্-ওদিকে লক্ষ্যহারা হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, যখন শোকের পর শোকের আঘাতে সকল অবলম্বন, সকল প্রিয়কে হারাইয়া হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যায়—যখন পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অসারতা বুঝিয়া বীতরাগ হয় মন, যখন কপটতার, খলতার ঘাত-প্রতিঘাতে মন নিয়ত জর্জ্জরিত হইয়া উঠে—সব দিকে এরূপে নিপীড়িত যখন মানবমন সার সেই ভগবানের চরণে কেঁদে পড়ে, তখন তাহার জীবন-রাগিণী পূর্ণ মাত্রায় বেজে তাহাকে জাগ্রৎ করে দেয়। সে রাগিণী আমাদের জীবনে বাজান সেই গীতবাদ্যাকর যিনি স্রষ্টা। ইহা জীবনে যখন শোনবার মত যোগ্যতা আসে, তখনই শোনা যায়। তখন সেই শোকের মধ্যে প্রাণ অমর রাগিণীতে গেয়ে ওঠে তাঁরই বন্দনা। মায়ার বন্ধন ছিন্ন হলে, মন যখন ফাঁকা হয়ে যায়, তখন সকল সময়েই মন যেখানে হারানো প্রিয়জনেরা আছে সেই উদ্দেশ্যে ধায়, তখন জীবন-রাগিণী বাজিয়ে কাণের মধ্যে প্রবেশ করে আর বলে "একদিন কোন পথে চলেছিলে এবার দেখ কোথায় যাও।"

এ যে অন্তর্জীবনের রাগিণী; এতো সে বাহিরের সেতারের রাগিণী নয়! এর তালের মানের ত্রুটিই বা কি ত আর বেতালই বা কি? মনের পবিত্রতার হিসাবে এ রাগিণী বাজিবে, যত জড়দেহের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, ততই বিদেহি-ধামের অমর রাগিণী জীবনে বাজে। কেন বা ইহা বাজে? না বাজলেই বা কি হতো?

নাই যদি এই জীবন-রাগিণী বাজিত, নাই যদি বিশ্বপতি এ রাগের সঞ্চার হৃদয়ের ভিতরে দিতেন, তবে কখনো কি সে "শান্তি" বলিয়া বস্তু পৃথিবীতে থাকিত? যে পতি-পুত্রহারা দুঃখিনী নারী, যাহার নয়নের জল সম্বল, আর ভগবানের করুণা পাথেয়, তাহার "শান্তি" এইখানে তো, এই জীবন-রাগিণীর বাজান তানে!—সে জড়দেহে ইন্দ্রিয়-বিমুক্ত হইয়া বিদেহীর রাগিণী শুনিতে পায় নিজের জীবনে।

এই অন্তরের রাগিণীর উপলব্ধি কখন্ কোন্ শুভক্ষণে হয়, তাও যদি জানিতাম! আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনে সে সম্যক বিকশিত হয় তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষ যোগ-

সাধনে এত পবিত্রও হয় যে, সে জড়দেহধারী হইলেও বিদেহীর মত সকল অমর রাগিণী শুনিতে পায়। বাজান সেই বিশ্ববাদ্যের মালিক যিনি! শ্রোতা ধন্য সেই মানব! যার মনের এত উৎকর্ষ আছে যে, সেই অন্তর্যামীকে ধ্যানে ধারণায় আয়ত্ত করিতে পারে ও নিজের জীবনে তাঁহারই প্রেমের সঙ্গীতের রাগিণী বাজিলে শ্রবণ করিতে পারে!

এ জীবন-রাগিণীতে পর্দ্দাও বাঁধা নাই। সুখের সময় দয়ালের দয়া স্মরণ করে, সুখ তাহার দান মনে করে, সুখের রাগিণী বাজে; আর মনও তাহার সহিত গাহিয়া উঠে! দুঃখের নিরাশের ঘাতেও সেই বিষাদ-রাগিণী বাজে। মন জানে বাহিরের সুরের সহিত ইহার কত প্রভেদ, এ বিষাদও কত শান্তিদায়ক; আর জানেন অন্তর্যামী। নিস্তব্ধ রজনীতে শান্তচিত্তে কোন দিন যদি ভগবানের নাম স্মরণ করা যায়, মনে হইবে বুঝি বা প্রকৃতির সকলই তাঁহাকে মনের সহিত যুক্ত হইয়া স্মরণ করিতেছে! তখনই এ রাগিণীর নীরব শব্দের তান কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া যায়। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তমাত্র; পরক্ষণেই মন অন্য চিন্তায় মগ্ন। দেবতার সঙ্গীতের সঙ্গে জীবন-রাগিণীকে বাজাইতে পারিলে সার্থকতা যে চরম, তাহা জানি, কিন্তু সে পুণ্য কোথায়? কয়জনেই বা তাহা পারে? সে একাগ্রতার শক্তিও নাই, সে ধ্যানের গাঢ়তাও নাই। যদি পূতমনে সমাহিতচিত্তে সারা জগৎ-মাঝে নিখিল দেবের রূপ দেখার মত যোগ্যতা আসে, সেইদিনই মাত্র জীবনের রাগিণীকে যে তাঁহার অমর বীণাধ্বনির প্রতিশব্দের তালে বাজানো যাইতে পারে, এ সত্যি তখন পাওয়া যায়।

শ্রীমণিকা রায় চৌধুরী।

দম্পতি।

শরীরে হৃদয়ে মনে পরাণে আত্মায়
ধরমে করমে আর ভাবে ভাবনায়
দু'জনে দু'জনা মাঝে হয়ে একাকার
খুঁজে দেবতার পদে ঠাঁই আপনার!

সংসার-মরুর বুকে পাতি' খেলাঘর
দু'জনার বুকে জাগে এক মধু স্বর,
সুখে দুঃখে রোগে শোকে হরষে ব্যথায়
আলোকে আঁধারে কিবা আশা-নিরাশায়!

পিতা মাতা সখা গুরু দোঁহার দু'জনে
দোঁহার সর্ব্বস্ব দোঁহে জীবনে মরণে,—
দোঁহাকার স্নেহ প্রেম প্রীতি আত্মদান
মরতে লইয়া আসে অমৃত-সন্ধান!

মিলিত যুগল নদী সাগর সঙ্গমে
লোক-লোকান্তর প্লাবি' জনমে জনমে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সংবাদ।

১। সংপ্রতি লালা গঙ্গারাম হিন্দু ও শিখ বিধবাদের শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে লাহোরনগরে সোয়ার মলে একখণ্ড জমি গবর্ণমেণ্টকে দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই মহৎ দান গ্রহণ করিয়াছেন এবং দাতার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবেন এই সুসংবাদ প্রচার করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সাধারণ ও শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত ৮০টি হিন্দু ও শিক বিধবা স্থান পাইবেন।

২। বালীগঞ্জে ৪৬ নং ঝাউতলা রোডে ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল মহিলাদিগকে বিনা ব্যয়ে চরকায় সুতাকাটা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৫ই ডিসেম্বর হইতে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ হইবে। যাঁহারা এই সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় সেক্রেটারীকে পত্র লিখিবেন।

৩। ঢকাবিভাগের ইনস্পেক্টর মিঃ বিস সংপ্রতি বরিশালে গমন করিয়া তথায় বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা-প্রবর্ত্তনে কিরূপ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার তদন্ত করিয়াছেন।

৪। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে হেষ্টিংস স্কুল উঠিয়া যাইবে। ইহার ব্যয় অত্যধিক, কিন্তু ছাত্র সংখ্যা অত্যল্প হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ইহা উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন।

৫। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এই আদেশ করিয়াছেন, যাঁহারা অল্প পেন্সন পান তাঁহাদের পেন্সন বৃদ্ধি করা হইবে।

৬। মনীষাসম্পন্ন সুপরিচিত অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় মহীশূর রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭। এখন এক বৎসর করিয়া ইউরোপীয় এবং এক বৎসর করিয়া দেশীয় ব্যক্তি সেরিফ পদে নিযুক্ত হন। পিক্‌ফোর্ড সাহেব সেরিফ ছিলেন। তাঁহার স্থানে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর এবার কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। মাদ্রাজে এবার রাও সাহেব মুনিয়া চেট্টি সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। "নিউ এম্পায়ার" সংবাদ দিতেছেন, বঙ্গের গবর্ণর লর্ড রোণাল্‌ডশের এডিকং কাপ্তেন হসকেট স্মিথ বিহারের নব নিযুক্ত গবর্ণর লর্ড সিংহের এডিকং নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি হইবেন সিনিয়র এডিকং এবং ইনিই গবর্ণরের মিলিটারী সেক্রেটরীর কার্য্য করিবেন। স্বতন্ত্র মিলিটারী রাখিবার অধিকার কেবল বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গের গবর্ণরের আছে। বিহারে গবর্ণরের স্বতন্ত্র মিলিটারী সেক্রেটরী রাখিবার অধিকার নাই। তাই বিহারের গবর্ণরের সিনিয়র এডিকংই মিলিটারী সেক্রেটরীর কার্য্য করিবেন।

৯। ব্রহ্মদেশের থারাওয়াড়ী জেলায় জিগোন সহরে জনসাধারণের এক সভায় স্থির হইয়াছে, ব্রহ্মদেশে গোহত্যা বন্ধ করিতে হইবে। কারণ, গোরক্ষায় ব্রহ্মদেশের যথেষ্ট উপকার হইবে। সভা সমস্ত ব্রহ্মবাসীকে গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

প্রণাম।

পুত্রশোকে কাঁদে মাতা
ধরাতলে লুটিয়া লুটিয়া,
তখন আসিয়া যিনি
আঁখিজল দেন মুছাইয়া—
মা বলে ডাকিয়া তাঁর
লাঘবিতে চান হৃদিভার,
চরণকমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার।
শ্রাবণে সাজানো মেঘ
স্তরে স্তরে আকাশের গায়,
অবিরত বারি ঝরে,
পথ ঘাট সবি ভেসে যায়,
গৃহহারা ভিজিতেছে,
দেখে প্রাণে দয়া আসে যাঁর,
চরণ কমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার।

পৌষ মাসে ঘরে ঘরে
কাটা ধান রাখিছে তুলিয়া,
ম্লানমুখে উপবাসী
সেই দিকে রয়েছে চাহিয়া।
যিনি বুঝিবেন মনে
কত ব্যথা মরমে তাহার,
চরণ কমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার।
অতীতের স্মৃতিগুলি
সযতনে হৃদয়ে ধরিয়া,
অভাগা পতিত কাঁদে
অনুতাপে জ্বলিয়া জ্বলিয়া।
তখন আসিয়া যিনি
মুছাইয়া দেন অশ্রুধার,
চরণ-কমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

বড়র বিপদ।

বড় গাছে ঝড় লাগে ভেঙে যায় ডাল,
ছোটর নাহিক ভয় নাহিক জঞ্জাল;
চাঁদেরে গ্রাসয়ে রাহু তারাদলে নয়,
কষিতে সোণার কষ্ট পিতলে কি ভয়?
সরোবরে চার ফেলে রোহিতের তরে,
পুঁটির কি ভয় তায়—তাহে নাহি ধরে;
ব্যাধবাণে পক্ষী হত, পতঙ্গে কি ভয়,
শার্দ্দূল শিকারী-ভীত, ছাগশিশু নয়;
তুফানে তরীর ভয়, ডিঙ্গি যায় চলে,
বড়র সদাই ভয় এ মহীমণ্ডলে;
গুরুর সদাই ভয় শিষ্য হিত তরে,
পুত্রের মঙ্গল হেতু পিতা ভেবে মরে;
রাজার নাহিক নিদ্রা নিশা কেটে যায়;
প্রজার কি ভয় তায় নিশ্চিন্ত নিদ্রায়?
বড়র বিপদ্ তাই সদা ধরাতলে।
ছোটর নাহিক ভয় সুখে যায় চলে।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

---

৫৮ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনা।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। ডিসেম্বর, ১৯২০।

সূচী

৫৭ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীঅনুকূলচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৬৯ নং [illegible] লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৹;

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 688. December, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৮৮ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। ডিসেম্বর, ১৯২০। | ১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

তোমার হাসি।

আমি যখন আকাশ পানে চাহি,
তুমি হাস;
নিশীথ-রাতের তারার সনে গাহি,
তুমি হাস!
কাজের-মাঝে হঠাৎ যখন বাজে
তোমার নামটি আমার বুকের মাঝে,
তুমি আড়াল হ'তে মুখ বাড়িয়ে বল—
'আমায় ভালবাস!'
ভুবন-জোড়া মোহন মেলা মেলে'
বসে আছ,
প্রেমের যখন একটি প্রদীপ জ্বলে—
তুমি হাস!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

লীনার শিক্ষা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(৮)

গির্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে, পার্স'ন লীনার সঙ্গেই আসিলেন ; কুঠির কাছাকাছি হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে আপনি এবার যান্, মিঃ পিকক্, বোধ হয়, এতক্ষণ শিকার শেষ করে ফিরেছেন। আমি আর এখন গিয়ে আপনাদের জ্বালাতন করব না।"

হঠাৎ মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লীনা বলিল, "এমন করে উল্টা চাপ লাগাবেন যদি, তা হ'লে বলপ্রয়োগ করে নিয়ে যেতে বাধ্য হব, তা বলে দিচ্ছি কিন্তু !—"

উচ্ছ্বসিত কৌতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া পার্স'ন বলিলেন—"বলেন কি, বলেন কি !—আপনি হঠাৎ রাতারাতি এমন কুস্তি-গীর পালোয়ান হয়ে পড়েছেন যে, আমার ওপর বল-প্রকাশ করতে চান ? অবাক্ করে দিলেন যে ! কিন্তু না না,—সত্যি বল্‌ছি, সত্য বন্ধু, খেয়ে দেয়ে আজ এখন আমার খানিক ক্ষণ পড়াশুনোর মাঝে ডুব মারতে হবে, তা পর মিশন স্কুলের কাজে ছুট্‌তে হবে, জানেন তো ? 'Good luck to you both'. (আপনাদের সময় আনন্দে কাটুক।) বিদায়।"

'Good luck t' ye, Miss", বলিয়া হাসিমুখে বিদায় লইয়া লীনা কুঠিতে ঢুকিল। পার্স'ন চলিয়া গেলেন।

বারেণ্ডায় জুম্মন অপেক্ষা করিতেছিল। লীনাকে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া দরজাটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে লীনা বলিল, "সাহেব এসেছেন ?"

জু।—জী, না।

লী। কখন আসবেন্ বলে গেছেন কিছু ?

জু। কিছু না, হুজুর।

অজ্ঞাতেই লীনার চলন্ত পা-দুই খানা আড়ষ্ট ও নিশ্চল হইয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ ও নির্ব্বাক্ থাকিয়া কম্পিত স্বরে সে আবার বলিল, "কিছুই বলে যান নি ? কোন কথাই না ? কোন্ দিকের জঙ্গলে শিকার করতে গেছেন, তাও বলে যান নি ?"

লীনা নিজে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সেই নিম্নশ্রেণীর আশিক্ষিত মূর্খ ভৃত্যটা বুঝিল, —সেই ক্ষুদ্র প্রশ্ন-কয়টার মধ্যে কতখানি ব্যাকুল-কাতরতা আত্মপ্রকাশ করিল !—মাটীর দিকে চোখ রাখিয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে ভৃত্য উত্তর দিল, "নেহি জনাব, কুচ নেহি।"

লীনা আস্তে আস্তে আসিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিল। একটা সোফার উপর আড় হইয়া পড়িয়া দুহাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া সে নিঝুম হইয়া ভাবিতে লাগিল। কোন কথাই বলিবার অধিকার নাই তার ! প্রকাণ্ড অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা অনু-নয়ের আবেদন জানাইবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই,—এমন অক্ষম ! দুর্ভাগ্যের বোঝা ঘাড়ে লইয়া সে পৃথিবীর মাটীর উপর দাঁড়াইয়া আছে !—উচ্ছৃঙ্খল-দাম্ভিকতার দর্পে 'দিশে-হারা' হইয়া ঐ যে মানুষটি নিজের খেয়ালের

হুজুগে মাতিয়া, পত্নীকে প্রচণ্ড অবহেলা করিয়া চলাই তাঁহার পৌরুষের একমাত্র অকাট্য প্রমাণ ঠাহরাইয়া রাখিয়াছেন,—তাঁহার শরীরের অনিষ্টকারিণী, মনের অবনতি-কারিণী যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত স্ত্রীর কর্ত্তব্যের অধিকার লীনার কোথায় ? ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা সকলের পক্ষে অব্যাহত থাকা প্রার্থনীয়। কিন্তু এই স্বাধীনতার ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচার, এর বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অধিকার,—সেটুকু পত্নী বলিয়াও কি তাহার প্রাপ্য নয় ?

লীনার মনে পড়িল, পিককের অতীত জীবনের ইতিহাস।—তিনি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু বাপ-মার শাসন-শৈথিল্যের দোষে অল্পবয়সেই কুসংসর্গে মিশিয়া বিষম উচ্ছৃঙ্খল, দৌরাত্ম্যপরায়ণ হইয়া উঠেন। সতের বছর বয়সেই এমন কিছু কাণ্ড করিয়া বসেন, যাহার জন্য পিতা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। সুবোধ পুত্র বাহির হইবার সময় পিতার কিছু অর্থ লইয়া সরিয়া পড়েন। পিতা মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে কি একটা বড়দরের কাজে নিযুক্ত ছিলেন ; সপরিবারে সেইখানেই থাকিতেন। পিকক ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

লেখাপড়া শিখিয়া, টাকার উপায় করিয়া পিতাকে জব্দ করিবার সাধু সঙ্কল্প আঁটিয়া পিকক সটান বিলাত চলিলেন। সেই জাহাজে লীনার পিতা ব্যারিষ্টার শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভগ্ন-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিলাত যাইতেছিলেন; সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ইটালিয়ান-সুন্দরী পত্নী—লীনার মা, এবং দুই মেয়ে—বড় হেলেনা, ছোট লীনা। লীনার বয়স তখন বছর বারো।

ধূর্ত্ততা ও চাতুরীবলে লোক ভুলাইতে পিককের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। নানা-ছলে এই ধনী পরিবারের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিলেন, এবং নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া, বড় বড় কথার চটকে লীনার পিতাকে ভুলাইয়া পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন, তিনি একজন মৃত লক্ষপতির একমাত্র সন্তান। পিতা মরিবার সময় কিছু দেনা রাখিয়া মারা যান, সে-জন্য পাওনাদারগণকে তিনি স্বেচ্ছায় উদারচিত্তে সম্পত্তির আয় ছাড়িয়া দিয়া কায়ক্লেশে উপার্জ্জন করিয়া লেখা পড়া শিখিতে বিলাত চলিয়াছেন।

পিককের সুন্দর প্রিয়দর্শন চেহারাটি ছিল তাঁহার দোষ ঢাকিবার অমোঘ অস্ত্র। বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে ছেলেটিকে বিশ্বাস করিলেন, এবং পিকক যদি খনি-বিদ্যা শিখিয়া গিয়া ভারতবর্ষে তাঁহার নূতন-কেনা কয়লার খনিগুলির তত্ত্বাবধান-ভার লইতে রাজী হয়, তবে তিনি মাহিনা বাবদ পাঁচ বছরের পড়ার খরচ পিককে অগ্রিম দিতে রাজী আছেন, সে কথা জানাইলেন। পিকক উৎফুল্লচিত্তে স্বীকার করিলেন ; বণ্ড লেখা হইল, টাকাও দেওয়া হইল। তাহার পর জাহাজ হইতে নামিবার পূর্ব্বেই পিকক কে জানে কি মন্ত্রে কিশোরী হেলেনাকে মুগ্ধ ও বশীভূত করিয়া একেবারে বিবাহ-পণে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

চট্টোপাধ্যায়-পরিবার ইটালী গেলেন। পিকক ইংলণ্ডে গিয়া সেই টাকা লইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সিবিল সার্ব্বিস পড়িতে ঢুকিলেন।

ভাগ্য পিককের সহায় ছিল, তাই মিথ্যা চাতুরী প্রকাশিত হইবার আগেই লীনার মাতা পিতা মারা পড়িলেন। পিতার পাকা উইল ছিল,—'সম্পত্তি দুই কন্যা ও ভাগিনেয় সমান ভাগে পাইবে; যদি অপুত্রক অবস্থায় কোন কন্যা মারা যায়, তাহার অংশ অন্য কন্যা পাইবে। আর যদি দুইজনেই অপুত্রক অবস্থায় মারা যায়, তবে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয় মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাইবেন!'

পিকক্ লম্বা লম্বা চিঠিতে প্রশংসার স্তবগান শুনিয়া দূর হইতে স্কুল-বালিকা হেলেনাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন। সিবিল সার্ব্বিসে পিককের শেষ পরীক্ষার পরই বিবাহ হইবে; সমস্ত ঠিক ঠাক;—হঠাৎ নিউমোনিয়া হইয়া হেলেনা মারা গেল।

পিককের পরীক্ষা তখন মাথায় মাথায়। পরীক্ষা দিয়াই তিনি লীনার কাছে ছুটিয়া আসিয়া "চরণতলে লুটায়ে পড়িবার" আবেদন জানাইলেন। লীনা তখন সতের বৎসরের বালিকা। পিককের প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমটা সে ভয় পাইল, অসম্মতি জানাইয়া সবিনয়ে প্রত্যাখান করিল।—যে লোকটি আজ পাঁচ বছর ধরিয়া তাহার ভগিনীকে সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিয়াছেন,—ভগিনীর মৃত্যুশোক ভুলিতে না ভুলিতে তিনি আজ লীনার পাণি-প্রার্থী! বিষম অদ্ভুত ব্যাপার! লীনা কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিল। এ কি হৃদয়হীনতা!—

কিন্তু পিককের যে চাতুরীর কাছে লীনার পিতা ঠকিয়াছিলেন, সে-চাতুরীর কাছে লীনাকে শীঘ্রই হার মানিতে হইল। তোষামোদ-গুঞ্জনে মুগ্ধ হইয়া শেষে লীনা মত ফিরাইল। বিবাহ হইয়া গেল।

মধু-চন্দ্রযাপন খুব আড়ম্বর-সহকারেই শেষ হইল। সেই সঙ্গে পিকক্ খুব অপ্রতিভ-ভাবে সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া, অর্দ্ধাঙ্গীকে নিজের প্রকৃত পরিচয় এবং শিক্ষা-চাতুরীর খবরটা জানাইয়া দিয়া, লীনার পিতাকে প্রতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া পরম অনুতাপের অভিনয় করিয়া তোষামোদের ছটায় লীনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অর্দ্ধাঙ্গীর কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে লম্বা লম্বা উপদেশ ঝাড়িতেও ক্রটি করিলেন না। হতবুদ্ধি লীনা নিরুপায়-ভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া লইল। লোকসমাজে স্বামীর নীচতা-গোপনের জন্য নির্ব্বিবাদে সমস্ত গ্লানিবিষ নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া লওয়াই পত্নীর কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিল। সে প্রাণ-পণে সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিল,—কিন্তু আভ্যন্তরিক-যন্ত্রণা-পেষণে লীনার সমস্ত হৃদয় পলে পলে পিষিয়া যাইতে লাগিল। তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া,—কিছুদিন পরেই শরীরের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিল।—তখন লীনার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং পিকক তখন চাকরী পাইয়া সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তি।

শিশুটি জগতে আসিয়া যখন তাহার মাতাকে পুরাতন জীবনের সমস্ত দুঃখ-ক্রটি উচ্ছল স্নেহের স্রোতে ভুলাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন শিশুর বাবার পত্নী-প্রেমে যেন হঠাৎ শনির কোপদৃষ্টি পড়িল এবং শনির কোপটা বেচারা শিশুর উপর এমন নিষ্করুণ নির্দ্দয় হইয়া উঠিল যে, শিশুর বাবার চোখের দৃষ্টি ও রসনার ভাষা হইতে অষ্ট প্রহর আক্রোশের আগুন ছুটিতে লাগিল—হতভাগ্য শিশুকেই লক্ষ্য করিয়া!—অজুহাত, অবশ্য

নানা রকম, এবং সেগুলা লোকসমাজে অপ্রকাশ্য থাকাই ভাল।

লীনা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল, স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিতে লাগিল, এবং শেষে তাহার পরিণাম এমন হইয়া দাঁড়াইল যে চিকিৎসকেরা স্পষ্ট জেদের সঙ্গে স্থান-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন। চক্ষুলজ্জার খাতিরে পিকক্ সে বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিলেন এবং লীনার কাতর অনুনয় ও বেদনার অশ্রু তিনি ধমকে ঠাণ্ডা করিয়া ছেলেটিকে ছিনাইয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিলেন। বাহিরের বন্ধু-সমাজ শুনিল, কর্ত্তব্যপ্রিয় স্বামীর প্রাণ পত্নীর মঙ্গলকামনায় একান্ত উৎকণ্ঠিত, তাই তিনি পত্নীর ঝঞ্ঝাট হাল্কা করিয়া আদর্শ মানুষের মত নিজের ঘাড়ে শিশুর ভার লইলেন। চারিদিক্ হইতে দুইশত বাহবা চারিশত ধন্যবাদ শুনিয়া লীনার কোমল মন গলিয়া গেল। সকলেই যেটা ভাল বলিতেছে,—সেটাকে ভাল নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার সাহস রহিল না ; সেও স্বীকার করিল, তাই ভাল !—

কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে যে 'মায়ের মনটা গোপনে বিরাজ করিতেছিল, সেটার অপরিসীম ক্ষোভের কান্না লীনা কিছুতেই থামাইতে পারিল না। স্বামীর কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ছাঁচে নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে ঢালাই করিয়া, এক এক সময় লীনা গায়ের জোরে ধমক দিয়া মনকে থামাইতে চাহিত,—কিসের এ দুর্ব্বল ব্যাকুলতা ? সুশিক্ষিতা ধাত্রীর স্নেহময় কোলে পুত্র 'মানুষ' হইতেছে, পুত্রের উপর চোখ রাখিয়াছেন স্বয়ং তাহার পিতা !—'

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ! ঐখানে আসিয়াই লীনার চিন্তা আপনা আপনি কেমন অশান্ত অস্থির হইয়া থামিয়া যাইত।

আজও ঠিক তেমনি হইল। চিন্তা পথে চলিতে চলিতে ঐ পর্য্যন্ত আসিয়া হঠাৎ কি যেন অদৃশ্য চাবুকের আঘাত খাইয়া উদ্দাম বিদ্রোহে চিন্তাসূত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গোঁ ভরে পাছু হটিয়া দাঁড়াইল। লীনা অধীরভাবে সোফা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। দুয়ারের সামনেই আয়া দাঁড়াইয়া ছিল। লীনার মুখপানে চাহিয়া সে ভয়ে ভয়ে বলিল, "হুজুর, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।" পাশেই একটা টেবিল ছিল, সেইটার উপর ভর দিয়া লীনা শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, "নিয়ে এস।"

আয়া চলিয়া গেল। একটা চেয়ার টানিয়া লীনা বসিয়া পড়িল। বারেণ্ডার দিকে কাচের জানালার পাশ দিয়া জুম্মন কি একটা কাজে যাইতেছিল। লীনা হঠাৎ ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল, "জুম্মন জুম্মন্ !—"

"জী" বলিয়াই হাতের জিনিসগুলা [illegible] আড়ালে নামাইয়া রাখিয়া জুম্মন [illegible] আসিয়া দাঁড়াইল। উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল [illegible] তুলিয়া লীনা বলিল, "মার্ম্মাস কি এখন [illegible] হাঁটতে শিখেছে, জুম্মন ?"

উৎফুল্লমুখে জুম্মন বলিল, "হাঁ [illegible] খুব ! কুঠির পাশে ময়দানে, কুকুর [illegible] পেছু পেছু বেত নিয়ে তাড়া করে এমন [illegible] ছুটি করেন, সে এক জবর তামাসা ! [illegible] দের ভারি হাসি লাগে।"

আগ্রহোজ্জলমুখে লীনা বলিল, "[illegible] তাকে খুব ভালবাসো নয়, জুম্মন ? খুব [illegible] দাও কেমন ? তোমরা সবাই তার [illegible] খুসী আছ ?"

সবিনয়ে ভৃত্য বলিল, "জী হাঁ। সাহেব যতক্ষণ কুঠিতে না থাকেন, ততক্ষণ ছোট সাহেবকে নিয়েই আমাদের খেলার আমোদ জমে। তিনি বেশ ঘুমিয়ে আছেন, মেমসাব।"

অন্য দিকে চাহিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া লীনা ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা সাহেব কি—"

কিন্তু হঠাৎ নিজের মধ্যে চমক খাইয়া লীনা থামিয়া গেল! কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছে, সে? পিতা পুত্রকে আদর-যত্ন উপযুক্তরূপে করেন না? হাঁ তাই বটে! ...... ধিক্, অসহ্য অভদ্র বর্ব্বরতা! পিতৃ-স্নেহের ওজন-যাচাই-সম্পর্কে, স্বামীর উপর গুপ্ত গোয়েন্দাগিরি! অমার্জ্জনীয়, নির্ল্লজ্জ মূঢ়তা! মূর্খ নির্ব্বোধ ভৃত্যটা না হয় কিছুই মনে করিল না, কিন্তু লীনার মধ্যে যে ভদ্র নারীত্বটা রহিয়াছে, সেটা কি নিজের কাছে নিজে অপমানে ছোট হইয়া যাইবে না? লীনার মুখখানা লজ্জায় ঘৃণায় নীল হইয়া গেল।

আয়া ঔষধ-পত্র লইয়া সামনে আসিল। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া ঔষধ ঢালিতে ঢালিতে লীনা বলিল "আচ্ছা, তুমি এবার নিজের কাজে যাও, জুম্মন।"

আয়া ঔষধ খাওয়াইয়া, চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সাহেব তো এখনো এলেন না, আপনার খানা কি—"

চেয়ারের পিঠে হেলিয়া পড়িয়া লীনা ক্লান্ত স্বরে বলিল, "থাক্ এখন থাক্। তিনি এলেই খাব।"

আয়া চলিয়া গেল। লীনা দুইহাতে চোখ চাপিয়া ধরিয়া নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিল। দুইচোখ ভরিয়া উচ্ছ্বসিত ক্ষোভে অশ্রুজল ঠেলিয়া আসিতেছিল,—কান্না, শুধুই অর্থহীন, দুর্ব্বোধ্য বেদনার কান্নামাত্র! বড় নিরুপায় যন্ত্রণার পীড়ন!—হা ভগবন্!

শুষ্ক কণ্ঠে উপর্য্যুপরি ঢোক গিলিয়া লীনা নিঃশব্দে দুরন্ত উচ্ছ্বাস সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চারিদিকেই লোকজন,—ছিঃ, ওরা কি মনে করিবে?

(৯)

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া, পিকক্ বন্দুক ঘাড়ে করিয়া ধীর মন্থর গমনে কুঠিতে ঢুকিলেন। নিজের শুইবার ঘরে গিয়া চুপ চাপ খানিকটা বিশ্রাম করিয়া, পোষাক বদলাইয়া স্নানের ঘরে ঢুকিলেন। তাহার পর আবার শয়ন-কক্ষে ঢুকিলেন। আদেশমত সেইখানেই আহার্য্য গেল।

লীনা নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া সমস্ত শুনিল। চাকর-দাসীদের সামনে বাহির হইল না। শঙ্কিতচিত্তে নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিয়া গেল। বুকের স্পন্দনবেগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন মূর্চ্ছার অবসাদ টানিয়া আনিবার উপক্রম করিতেছিল। অতিকষ্টে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সে সামলাইয়া রাখিল।

আয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আপনার রাত্রের খাবার কি এইখানেই আনা হবে?"

লীনা উত্তর দিল "নিয়ে এস। বেশী

কিছু নয়, শুধু এক টুকরা পাউরুটী আর একটু দুধ।”

প্রতিবাদ করিয়া আয়া বলিল, “সে কি? আপনি তো ও-বেলা ডিনারে বসেন নি, ‘লাঞ্চ’ও—”

উদাস-কণ্ঠে লীনা বলিল, “ভুলে গেছি, ভুলে গেছি! আচ্ছা, যা খেতে হবে নিয়ে এস।”

খাবার আনিয়া টেবিলে সাজান হইল। চেয়ারটা সরাইয়া টেবিলের কাছে গিয়া লীনা সভয়ে বলিল, “ও বাবা, এত!”

স্নেহভরা কর্তৃত্বের সঙ্গে আয়া একটা ছোট ধমক দিয়া বলিল, “এত আবার কি? বসে বসে খান, সব খাবার ফুরিয়ে যাবে। কাল রাত্রে আমি আবার ভূত দেখেছি,—সমস্তদিনে বল্‌তে সময় পাই নি; এইবার বলি, শুনবেন, কেমন?—”

পার্সনের কাছ হইতে বিদায় লইয়া অবধি সমস্ত দিনে লীনা আর হাসিবার অবকাশ পায় নাই। তাকে ভূতের গল্প বলিয়া ভুলাইয়া খাবার খাওয়াইতে চায় দেখিয়া, সে এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিল না! প্রসন্ন কৌতুকে আয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, “আচ্ছা, ভূতের সঙ্গে তোমাদের এত ভাব হোল কি করে বল দেখি? যখন তখনই ভূত দেখ্‌ছ! মানে কি?”

আয়া খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, “খেতে আরম্ভ করুন না, তারপর কথা হচ্ছে। আচ্ছা ভূত বলে একটা জিনিষ আছে, এটা কি মানেন না?”

ঘাড় নাড়িয়া লীনা বলিল, “তা খুব মানি কিন্তু খামকা অত সস্তায় ভূত দেখ্‌তে পাওয়া আমি সহজ বলে মনে করি না। তারপর গল্পটা চলুক,—কটা হাতওলা ভূত দেখেছ?”

আয়া অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, “কিন্তু মান্দ্রাজে যে ডিপুটী কমিশনার সাহেবের মেয়ের কাছে আমি থাকতুম,—তিনি রাতের বেলায় ভূতের ভয়ে ডরাতেন। আমাকে একদণ্ডের জন্যে কাছ-ছাড়া করতেন না।”

লীনা হাসি চাপিয়া বলিল, “তা কি করব্‌ বল? আমার দুর্ভাগ্য, রাত্রে কেউ থাক্‌লে আমার মোটেই ঘুম হয় না, সে ভূতের দোহাই দাও, আর যাই কর।”

আয়ার মুখখানা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কি একটা কথা বলিবার জন্যই বোধহয়,—যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু লীনা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই খাইতে লাগিল। একটু পরে সহসা কি যেন মনে পড়ায়, লীনা চকিত দৃষ্টি তুলিয়া দ্রুত-স্বরে বলিল, “জনের কাছে খবর নাও, সাহেব শুয়ে পড়েছেন কি?”

আয়া বাহিরে গিয়া দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “না, ঘুমের পোষাক পরেছেন, কিন্তু এখনো বসে বই পড়্‌ছেন।”

লীনা অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইতেই হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়িল। অনেক খাবার পড়িয়া রহিল বলিয়া আয়া ক্ষুণ্ণ অভিযোগের উপক্রম করিতেই লীনা ব্যস্তভাবে বলিল, “টেবিল পরিষ্কার করে শীঘ্র চলে যাও, বিরক্ত কোরো না এখন।”

আয়া আজ্ঞা সমাপন করিয়া চলিয়া

গেল। লীনা কেমন যেন অশান্তচিত্তে, অস্থিরভাবে ঘরের ভিতর বার-কতক পায়চারি করিয়া, শেষে ধীরে ধীরে স্বামীর ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, একটু কাশিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আর্থার, আমি আস্‌তে পারি ঘরে?"

পিকক্‌ সংক্ষেপেই উত্তর দিলেন, "পারো।" লীনার বুকের ভিতর ধড়াশ্‌ ধড়াশ্‌ করিয়া উঠিল। তীব্র জ্বালাময় বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মত তাহার মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল—কাল রাত্রির সেই রূঢ় দুর্ব্যবহারের স্মৃতি! একটা দুর্ব্বিষহ ক্লেশভারে লীনার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিল! আড়ষ্ট স্তব্ধভাবে কিয়ৎক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ধীরে দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল।

পিকক্‌ চোখের সামনে একটা বই খুলিয়া ধরিয়া আর্ম চেয়ারে আড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। লীনা পাশ কাটাইয়া গিয়া আর একটা চেয়ার লইয়া একটু দূরে বসিল। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সেইদিকে চোখ রাখিয়া শুষ্ক কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "সমস্ত দিন জঙ্গল ঘুরে তোমার কি শিকার জুটল, আর্থার? কই, কিছুই তো আন নি।"

মুখের উপর বই আড়াল রাখিয়া পিকক্‌ শঙ্কিতভাবে সন্দিগ্ধ বক্র কটাক্ষে লীনার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, তারপর বইয়ের দিকে চোখ [illegible] সংযতস্বরে উত্তর দিলেন [illegible] ভাল হয় না?"

লীনা মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরস্বরে বলিল, "তুমি আজ ডিনার নিলে কোথায়? সঙ্গে কোন বন্ধু পেয়েছিলে কি?"

পিকক্‌ বেশ একটু কড়া আওয়াজেই উত্তর দিলেন, "সে সব অনধিকার চর্চ্চায় তোমার কোন দরকার নাই।"—একটু থামিয়া বইয়ের দিকে চোখ রাখিয়া পুনরায় কর্কশ কর্ত্তৃত্বপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কয়লার খনির হিসাব-বইগুলা কোথা? কাল সকালে সেগুলো আমার চাই, আট-টার ট্রেণে আমি চলে যাব।"

শান্তদৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া লীনা বলিল, "কালই চলে যাবে? এখনো তোমার দু'দিন ছুটি আছে তো?"

হাতের বইখানা সশব্দে কোলের উপর ফেলিয়া রুক্ষ-বিরক্তির সহিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পিকক্‌ বলিলেন, "সে খোঁজে তোমার দরকার কি? তোমার বাবা তোমার জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আয়ের কয়লার খনি রেখে গেছেন, তুমি তাই নিয়ে সুখ ভোগ কর। আমার ক্রীতদাসের জীবন—দাসত্বময়! তোমার কি?—"

কি কথায় কি উত্তর! লীনা হতবুদ্ধির মত কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌ছ, এখন বিদায় নেওয়াই আমার পক্ষে ভাল। কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে একবার ভেবে দেখ দেখি, তোমার দাসত্বের জন্য তুমি কি নিজেই দায়ী নও? আমার বাবার পরামর্শ শুনে চল্‌লে,—"

সক্রোধে পিকক্‌ বলিলেন, "চুপ করে থাক। একটা কালা ইণ্ডিয়ানের মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে আমি বাধ্য হয়েছি, এই আমার

যথেষ্ট ঘৃণার বিষয়, লজ্জার বিষয়! তোমার বাবার পরামর্শ শুনে কাজ করি নি,—সে আমার স্বাধীন-চিত্ততার প্রমাণ!

উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে লীনা বলিল, "উত্তম, স্বাধীন-চিত্ততার পরিণাম—কঠোর দাসত্ব তবে শ্লাঘনীয় মনে করাই উচিত! ওর জন্যে আমার ওপর আক্রোশ-বর্ষণ দিচ্ছ! আর কালা ইণ্ডিয়ানের মেয়েকে বিয়ে করা—এর জন্যে তুমিই সর্ব্বতোভাবে দায়ী! এ বিবাহে কেউ তোমায় বলপূর্ব্বক বাধ্য করে নি।—আমি তো আন্তরিক অনিচ্ছার সঙ্গে বার বার তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। শপথ করে সত্য বল—হাঁ কি না?"

দুর্দ্দান্ত হিংসোন্মত্ত বাঘ যেমন হঠাৎ শক্তিশালী ঐন্দ্রজালিকের সামনে পড়িলে, চোখ লুকাইবার জন্য ভয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, পিকক্ ঠিক তেমনি ব্যস্তভাবে সভয়ে চোখ নামাইলেন। লীনা সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিল, "ওঃ! হাতের মুঠোয় পেয়ে, ক্রূর হিংসার অত্যাচারে পলে পলে আমায় পিষে মারতে সুরু করেছ? দিনে দিনে আমার জীবন তিক্ত বিষময় করে তুলছ,—সমস্ত নিঃশব্দে সহ্য করে যাচ্ছি; কারণ, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বড় জটিল-বাঁধনে বাঁধা! লজ্জা করে না তোমার? আমার একমাত্র শিশু,—যার পিতা তুমি, হিংসার আক্রোশে তাকেও তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছ! চুপ করে সয়ে যাচ্ছি সব, কিন্তু বুক আমার প্রতিমুহূর্ত্তে যন্ত্রণায় পিষে যাচ্ছে না?" ক্রোধে ক্ষোভে লীনার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, আপাদ-মস্তক থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পিকক্ লীনার এ মূর্ত্তি কখনও দেখেন নাই, আজ প্রথম দেখিলেন। বিস্ময়-ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতেই জড়িতস্বরে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, আমি তাকে হত্যা করবার মতলবে নিজের কাছে রেখেছি?"

লীনার চোখ হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তীব্র স্বরে বলিল, "তার চেয়েও বেশী অনিষ্ট তুমি করবে তার! হত্যায় মানুষ একবার মরে, কিন্তু নীচ-প্রকৃতি পিতা মাতার চরিত্রের আদর্শে যে শিশুর শৈশবজীবন গঠিত হয়, সে চিরজীবনের মত নীচতা-পাপে, হীনতা-গ্লানিতে, দূষিত অভিশপ্ত হয়ে যায়। হত্যা, তার চেয়ে সহস্র গুণে ভাল! মৃত্যু সে হেয় জীবনের সব লাঞ্ছনা একেবারে শেষ করে দেয়।"

পিকক্ স্তব্ধ-নিরুত্তর-ভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই উদাস ধৈর্য্যটা পরম সাত্ত্বিকতার লক্ষণ, কি অতিবড় ক্রূর-বুদ্ধি মানুষের স্বভাবোচিত প্রচণ্ড অগ্রাহ্যের ভাবের প্রমাণ, তা ঠিক করিয়া বলা কঠিন।

লীনা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল; স্বামীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "স্বামী তুমি, তোমার স্বামিত্ব আমার কাছে পূজনীয়, হাঁ, যথেষ্ট পূজনীয় ছিল। কিন্তু সে সম্মান নিজের হাতে ধ্বংস করে ঘৃণিত পশুত্বের দম্ভে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে, নির্ব্বিচারে নির্য্যাতন-শক্তি প্রকাশ করাই যদি স্বামিত্বের—স্বেচ্ছাচার প্রভুত্বের, একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে কর, তবে,………তবে, স্ত্রী

আমি, তোমায় অভিশাপ দিতে আমার রসনা অসাড় হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু মনে রেখো, মনে রেখো,…এজগতে সকলের ওপর সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বলে একজন আছেন; তাঁর ন্যায়-দৃষ্টি সকলের ওপর সমানভাবে অহরহঃ জেগে আছে। তাঁর সূক্ষ্ম বিচার কোন দাম্ভিকের অন্যায় দম্ভকে ক্ষমা করে না, কথনো ক্ষমা করে না।"

পরমেশ্বরের নাম পিকক্ সহ্য করিতে পারিলেন না; জ্বলিয়া উঠিয়া, উত্তেজিত গর্জ্জনের সহিত মেঝের কার্পেটে জুতা ঠুকিয়া বলিলেন, "তোমার বুজ্‌রুকী রাখো। গোটাকতক বুজ্‌রুক গির্জ্জাওয়ালা আর বাচাল মিশনরী মেমের সঙ্গে জুটে তুমি উচ্ছন্ন গেছ! খবরদার আমার কাছে বুজ্‌রুকী করতে এসো না! পরমেশ্বর ফরমেশ্বর তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি।—দূর হয়ে যাও।"

ঠিক কাল এমনি দুর্ব্বাক্যের গলাধাক্কা খাইয়া লীনা বিদায় লইয়াছিল, আবার আজ! মুহূর্ত্তের জন্য বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে পা টানিয়া লইয়া লীনা আবার ফিরিল; নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। প্রবল উত্তেজনামত্ত দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ধাক্কায় বুকের পাঁজরগুলা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

নিজেকে সামলাইবার চেষ্টায় মিনিটখানেক চুপ থাকিয়া, লীনা অকুণ্ঠিত স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া বলিল, "খুব ভাল, তাই হোক্! এস, আজই তাহলে এ বিষয়ের একটা শেষ মীমংসা করে নেওয়া যাক্। এই প্রতিমুহূর্ত্তের ইতর-সংঘাতপূর্ণ ঘৃণিত পশু-জীবন যাপনের চেয়ে, দু জনে তফাৎ হয়ে ভদ্রভাবে জীবন-যাপনের চেষ্টা ঢের ভাল। তোমারও পায়ের বেড়ি খসে যাক্, আমারও হাত-কড়া খুলে পড়ুক! মানুষের জীবনে,—মনুষ্যত্ব-নাশি-হীনতা-বহন আর সহ্য হয় না।"

পিকক্ লীনার চোখের উপর চোখ রাখিতে পারিলেন না। অধীর চঞ্চলভাবে দুই একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, হঠাৎ ফশ্ করিয়া আলোটা নিবাইয়া দিলেন। হতবুদ্ধি লীনা কোন কথা বলিতে না বলিতে পরক্ষণেই পিকক্ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন; তারপর দ্রুত-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কয়লার খনির সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ, আয়-ব্যয়ের হিসাব কাল সকালেই আমার চাই। কাল সকালেই যেন সমস্ত পাই। সমস্ত আমি নিয়ে যাব।"

অসহ্য ক্রোধে লীনার শরীর জ্বলিয়া উঠিল! চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তীব্র ঘৃণার স্বরে সে বলিল, "কালা-ইণ্ডিয়ানকে প্রতারণা করে টাকা নিয়ে যে বিদ্যা শিখেছ, কালা ইণ্ডিয়ানের মেয়ের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়টুকু এইবার সেই বিদ্যার জোরে আত্মসাৎ করতে চাও, কেমন? তোমার মনুষ্যত্বের মহিমা ধন্য হোক্! অনেক সহ্য করেছি, ঐ 'অনেক সহ্য করার' একটা দারুণ-গ্লানি-পূর্ণ ঘৃণাও আমার ভেতর দিনে দিনে অসহ্য যন্ত্রণায় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, আর নয়! তোমার সঙ্গে বিবাহিত হওয়াই মস্ত ভুল হয়ে গেছে, তার পর প্রাণপাত চেষ্টায় প্রাণান্তিক লাঞ্ছনা সহ্য করেও তোমার স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা করেছিলাম, সেও আমার প্রকাণ্ড মূর্খতা—অপরাধ! আমার স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা কর। আজ থেকে এই পর্য্যন্ত!—"

লীনা নিজের শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দ্বাররোধ করিল। পিপক্ মিনিট-কতক চুপ চাপ থাকিয়া, তীব্র জিঘাংসা-পূর্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "মাঝখানে হতভাগা মাসি আছে যে, তার সম্পত্তির ব্যবস্থা কি হবে? সে বেঁচে থাকতে, তোমার কোন তেজবাজি টিকবে কি?"

কথাটা লীনার শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত পরিষ্কার-রূপেই পৌঁছিল, কিন্তু লীনার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গ্রন্থকার।

নমি আমি তব পদে ওহে গ্রন্থকার,
জগতের পূজ্য তুমি মঙ্গল-আধার;
তব উচ্চ পদ হেরি এই ভূমণ্ডলে,
মানবের হিত হয় তব কৃপাবলে;
অজ্ঞানেরে জ্ঞান দাও, উচ্চ কর মন,
তোমার গুণের কথা না যায় কথন;
সৌধবাসী ধনিজনে কর শিক্ষা দান,
তব জ্ঞানে বাড়ে তার ধনের সম্মান;
অজ্ঞান কুটীরবাসী তব শিক্ষাদানে,
জ্ঞানচক্ষু লাভ করে, সুখী হয় প্রাণে;
নিরাশেরে আশা দাও, কর বল দান,
শোকার্ত্তে সান্ত্বনা দাও, সুস্থ কর প্রাণ;
উচিত অঙ্কুশ দাও জ্ঞানিজন-করে,
প্রমত্ত বারণ-রিপু দমিবার তরে।
মহাব্রত তব হেরি ওহে গ্রন্থকার,
বাঞ্ছা সদা মানবেরে করিতে উদ্ধার,
তাহার করিতে ভাল ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ,
তব সম বিশ্ববন্ধু কে আছে এমন?

* * *

তব ঋণ শোধ দিতে পারে কোন্ জন!
সবারে উদারহৃদে দাও আলিঙ্গন;
পরনিন্দা স্তুতিবাদে নহ হে চঞ্চল,
তোমার কর্ত্তব্য যাহা করিছ কেবল;
রাত্রি নাই, দিবা নাই, নাহিক আহার,
জগৎ তোমার হৃদে জাগে অনিবার;
তার তরে করিয়াছ লেখনী ধারণ,
সুন্দর সাহিত্যমালা করিছ গ্রন্থন;
তব মালা শিরোপরে যে করে ধারণ,
শোভায় সুবাসে হয় পুলকিত মন।
ধন্য তুমি গ্রন্থকার ধন্য ধরাতলে,
মহারত্ন পায় নর তব করতলে;
নির্ধন হলেও তুমি ধনীর প্রধান;
তব ধনে সাধে মহা জগৎ-কল্যাণ

* * *

শ্রীভুবনমোহন দে

দণ্ডবৎ।

প্রভাতী—একতালা।

প্রভাতে উঠিয়া ভূতলে লুটিয়া
হইব দণ্ডবৎ ;
স্নান সমাপনে বসি' নিরজনে
হইব দণ্ডবৎ।
জপিব তোমার মঙ্গল নাম,
সঘনে বাজিবে সুধা প্রাণারাম,
তোমার প্রকাশে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে
পূরিবে হে মনোরথ,—
পূজা সমাপনে একান্ত মনে
হইব দণ্ডবৎ।

ক্ষুৎ-পিপাসায় তোমার দয়ায়
যা' জুটিবে মম ভাগে,
তব দান বলি' তাই লব তুলি
তোমারে নমিয়া আগে।
সকল কর্ম্মে সকল বিরামে,
নিঃশ্বাস ব'বে তব প্রিয় নামে ;
সুখে ও দুঃখে তোমার সৌখ্যে
খুলিবে শান্তিপথ ;
সবখানি প্রাণ করিয়া প্রদান
হইব দণ্ডবৎ॥

রচনা—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
I I {সা ঋা মা। মা পা পা I পা পা দা। না দা পা।
প্র ভা তে উ ঠি য়া ভূ ত লে লু টি য়া

০ ১ ২´ ৩
I মা মা গা। সা -া ঋা I মা -া -া। -া -া া}।
হ ই ব ণ্ ড ব • • • ত্ •

০ ১ ২´ ৩
I র্সা -া র্সা। র্সা ঋর্সা া I না র্সা না। দা পমা া
স্না ন স মা পনে • ব সি' নি র জনে

০ ১ ২´ ৩
I মা মা গা। সা -া ঋা I মা -া -া। -া -া া I I
হ ই ব দ ণ্ ড ব • • • ত্ •

অন্তরা।

১ ২´ ৩
II {মা মা পা। পা দা দা I ধা -ননা না। সা -া -া I
জ পি ব তো মা র ম ঙ্গ ল না ০ ম

০ ০ ১ ২´ ৩
I র্সা র্ঋা র্ঋা। র্ঋা র্সা র্সা I না র্সা না। দা পা -া I
স ঘ নে বা জি বে সু ধা প্রা ণা রা ম

০ ০ ২´ ৩
I {র্সা র্গা র্গা। র্গা র্গা র্গা I র্মা র্গা র্ঋর্ঋা। র্ঋা র্সর্সা -া} I
তো মা র প্র কা শে প্র তি ধা সে খাসে ০

০ ১ ২´ ৩
I র্সা র্সা র্গা। র্ঋা র্সা র্সা I র্সা -না -র্সা। -া -া -া I
পূ রি বে হে ম নো র ০ ০ ০ থ ০

০ ১ ২´ ৩
I {র্সা র্সা র্সা। র্সা র্ঋা র্সা I না র্সা -ননা। দা -পা পা} I
পূ জা স মা প নে এ কা ন্ত ম ০ নে

০ ১ ২´ ৩
I মা মা গা। সা -া ঋা I মা -া -া। -া -া -া II
হ ই ব দ ণ্ ড ব ০ ০ ০ ত্ ০

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩
II {সা -া -ঋা। মা মা মমা I মা মা পা। পা দাঃ -পাঃ I
স্তু ০ ত্ পি পা সায় তো মা র দ য়া ক

০ ১ ২´ ৩
I মা গা ঋা। সা সা ঋা I মা -া মা। -া -া -া} I
যা' জু টি বে ম ম ভা ০ গে ০ ০ ০

২´ ৩
I{মা গা ঋা। -সা সসা । I ন্‌া -সা দ্‌া। ন্‌া সসা. প}।
ত ব দা ন্ বলি ০ তা ই ল ব তুলি ০

০ ১ ২´ ৩
Iসা সা ঋা। মা মা মা I গা -া -ঋা। সা -া -া।
তো মা রে ন মি য়া আ ০ ০ গে ০ ০

আভোগ।

০ ১ ২´ ৩
I{মা মা পা। পা -া দা I দা না না। র্সা র্সা র্সা।
স ক ল ক র্ মে স ক ল বি রা মে

০ ১ ২´ ৩
Iর্সা -র্ঋর্ঋা র্ঋা। র্ঋা -া র্সা I মা র্সা মা। দা পা পা}।
নি শা স ব ০ বে ত ব প্রি য় মা মে

০ ১ ২´ ৩
I{র্সা র্গা র্গা। র্গা -া র্গা I মা র্গা র্গা। র্ঋা -া র্সা।
সু খে ও দু : খে তো মা র স ঊ খো

০ ১ ২´ ৩
Iর্সা র্সা র্গা। র্ঋা -া র্সা I র্সা -না -র্সা। -া -া -া}।
খু লি বে শা ন্ তি প ০ ০ ০ ০ থ

০ ১ ২´ ৩
Iর্সা র্সা র্সা। র্সা র্ঋা -র্সা I মা র্সা না। দা পা -া।
স ব খা নি প্রা ণ ক রি য়া প্র দা ন

০ ১ ২´ ৩
Iমা মা গা। সা -া ঋা I মা -া -া। -া -া । II II
হ ই ব য় ণ্ ত ব ০ ০ ০ ত্ ০

জাহাজ-ডুবি।

(১৩)

অমরকুমার সীতাকুণ্ডুর এণ্টান্স স্কুলের শিক্ষকতা করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহে কিছু-দিন হইল একটী নূতন অতিথির আবির্ভাব হইয়াছে। প্রায় এক বৎসর হইল, আশালতা একটী সুকুমার পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। নবকুমারটীকে লইয়া জীবনে যে কি সুখ, কি আনন্দ প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করিবার নহে। সেই সুকুমার শিশু স্বর্গের বিমল সুধা আনিয়া মাতাপিতাকে প্রদান করিয়াছিল। শিশুর কল-হাস্যে অমরকুমারের সেই ক্ষুদ্র গৃহে নন্দনের পারিজাত ফুটিয়া উঠিত; শিশুর বাতাসে অমরকুমারের গৃহ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহের রূপের ছটায় যেন দিগন্ত পূর্ণ হইয়াছিল। ক্ষুদ্র শিশুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আকর্ণ-বিস্তৃত কৃষ্ণতারকা-মণ্ডিত চক্ষুর্দ্বয়, নধর গোলাপি কপোল, ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয়, তন্মধ্যে দুই চারিটী দন্ত;—কি সুন্দর! সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা-সদৃশ দন্ত বাহির করিয়া যখন সে কল-হাস্য করিয়া উঠিত, তখন তাহা দেখিয়া মাতাপিতার আনন্দের সীমা থাকিত না। সে যে স্বর্গের সুধা, নন্দনের পারিজাত, বিধাতার দান! সে ত এ পাপ-তাপময় পৃথিবীর নয়, সে স্বর্গীয়! বৈকালে স্কুল হইতে ফিরিয়া অমরকুমার যখন শিশুটিকে বক্ষে লইয়া ক্ষুদ্র বারান্দাটীতে পদচারণা করিতেন, তখন আশালতা মনে করিত, "এই স্থানের মাটী হইয়া মিশাইয়া যাই!" ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর নাই, সংসারের ঝন্‌ঝট নাই, ক্ষুদ্র সংসারটি স্বচ্ছ, নির্ম্মল, পবিত্র শান্তিনিকেতন! আশালতা স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিত, স্বামীর পরিচর্য্যা করিত, সন্তান-পালন করিত। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অসন্তোষ নাই, বিলাসিতার চিহ্নমাত্র নাই। ইহাদের দেখিলে কে বলিবে ইহারা একদিন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন! কে বলিবে আশালতা ধনাঢ্যের কন্যা, ধনাঢ্যের বধূরূপে জীবনের প্রথম অঙ্ক অতিবাহিত করিয়াছিল! পত্নীর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অমরকুমারের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিত। অমরকুমার ভাবিতেন, 'জন্ম-জন্মান্তরের বহু সাধনা-বলে এমন পত্নী লাভ করিয়াছি।' সংসারের দুঃখ-দৈন্য কোন দিন অমরকুমারকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব দান করিয়া রাজর্ষির ন্যায় সন্তোষ লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সে মহান্ উদার প্রশস্ত হৃদয়ের ধারে দিয়াও কোন দিন অশান্তি-বিষাদ উঁকি দিতে সাহস করে নাই। প্রত্যহ দুইটি বেলা বেড়াইয়া বেড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দর্শন করা এবং নিয়মিত রূপে স্কুলে গিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দান,—এই দুইটী কার্য্যই তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে কতকগুলি দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকটে পাঠাভ্যাস করিতে আসিত; তাহাদিগকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না; যথানিয়মে শিক্ষা দিতেন।

একদিন কোনও পর্ব্ব-উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। দিবা দ্বিপ্রহরকালে অমরকুমার তাঁহার শয়নকক্ষ-মধ্যে একখানা তক্তপোষের উপরে সামান্য একটি শয্যায় শয়ন করিয়া-

ছিলেন। আশালতা আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। এমন সময় একটী অন্ধ ভিখারী বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মাগো! অন্ধকে দুটী ভিক্ষে দাও মা!" আশালতা উঠিয়া এক রেকাবী চাউল ও চারটী পয়সা তাহাকে দিয়া আসিল। অন্ধ অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেল। আশালতা বহির্দ্বারটা রুদ্ধ করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার অমরকুমারের নিকটে আসিয়া বসিল। আশালতাকে একদিন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে লইয়া গিয়া অমরকুমার জব্দ হইয়াছিলেন বলিয়া আর কোথাও তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতেন না। কিন্তু আজ আশালতা ধরিয়া বসিয়াছে, বিরূপাক্ষদেব দেখিতে যাইবে। যদিও চন্দ্রনাথ-পাহাড় অপেক্ষা বিরূপাক্ষ পাহাড় অনেক ছোট, তথাপি আশালতা পর্ব্বতারোহণের যে নমুনা একদিন দেখাইয়াছিল, সেই কথা মনে করিয়া আশালতার গতি-সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ করিতেন। যে কোমল পদযুগল কেবলমাত্র অন্দরের গণ্ডীটুকু ব্যতিরেকে কোন দিন সদরেও পদার্পণ করে নাই, সেই অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলার চরণযুগল যে কঙ্করময় উপলখণ্ডপূর্ণ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে অশক্ত হইবে, সে বিষয়ে অমরকুমারের মনে অভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল। তাই আজ আশালতার কথা শুনিয়া অমরকুমার হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বেশ নিয়ে যেতে রাজি আছি—কিন্তু নিজের পায়ে হেঁটে আসতে পারবে ত? কাউকে কাঁধে করে আন্‌তে হবে না?" আশালতা বলিল, "আমাকে বুঝি কেউ কাঁধে করে নিয়ে এসেছিল?"

মৃদু হাসিয়া অমরকুমার বলিলেন "সেই রকমই ত মনে হয়! গরুড়ের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজে যে সহজভাবে চলে আসতে পেরেছিলেন, সেটার ত অনুমান হচ্ছে না!"

পরাজিত হইয়া আশালতা দৃঢ়ভাবে বলিল, "তা আমি জানি না! একদিন আমাকে দেখিয়ে আনতেই হ'বে। নিজের রোজ যাওয়া হয়, আর আমি বুঝি একটি দিনও বিরূপাক্ষদেব দেখতে পাব না?"

অমরকুমার বলিলেন, "সেটা বড় আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নেই!" বলিয়াই তিনি তাঁহার নিদ্রিত শিশুটীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ—ছেলেটা যে বড্ড ঘুমুচ্ছে!" বলিয়া নিদ্রিত শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। আশালতা কৃত্রিম কোপসহকারে বলিল, "বেশ! ঘুমন্ত ছেলেটাকে তুল্লে, কাঁদলে পরে তুমি ভুলিও, আমি পারব না!"

সহাস্যে অমরকুমার বলিলেন, "ছুটীর বেলা নাই ঘুমুলো একদিন, রোজই ত ঘুমোয়!" নাড়া পাইয়া খোকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু সে ক্রন্দনের কোন লক্ষণই দেখাইল না। পিতার বক্ষের উপর শয়ন করিয়া মাথা তুলিয়া পিতার মুখ দর্শন করিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অমরকুমার পুত্রকে আদর করিতে লাগিলেন। আশালতা অমরকুমারের গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিল "বল্লে না নিয়ে যাবে কি না?"

অমরকুমার বলিলেন, "আচ্ছা, হুকুম যখন হয়েছে, তখন অবশ্যই তামিল হবে তার জন্যে আর ভাবনা কি? কিন্তু খোকাকে নেবে কে?"

আশা। কেন?—তুমি!

অ। ভাল, তাই হবে।

এই বলিয়া অমরকুমার আবার খোকার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় দ্বারে কে করাঘাত করিল। অমরকুমার বলিলেন, "দেখতো খোকাকে; ছেলেরা বোধ হয় পড়তে এসেছে। দোরটা খুলে দিয়ে আসি।" অমরকুমার উঠিয়া বহির্দ্বরজা খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন, তাঁহার ছাত্রবর্গ নহে, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ভৃত্য কানাই! অমরকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি রে তুই এতদিন পরে আজ হঠাৎ কোথা থেকে এলি!"

কানাই তাহার হস্তস্থিত ক্যাম্বিসের ব্যাগটা ভূমিতে নামাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া দুই হস্তে অমরকুমারের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া মাথায় দিল; বলিল, "হুজুর! এ গোলাম চিরদিন আপনার চাকর। আপনার কাছে ভিন্ন কি আমার আর কারও কাছে কাজ করা পোষায়? হুজুর! কি কষ্টে যে এতদিন কাটিয়েছি, তা আমিই জানি। ডাকাত-ব্যাটার পা টিপতে টিপতে মনে হত ঝাং করে পাটা আর কেটে ফেলি। কেবল আপনার জন্যেই এতদিন এ কষ্ট সহ্য করেছি!"

অমরকুমার বলিলেন, "আমি যে এখানে আছি তা কেমন করে জানলি?"

কানাই বলিল, "নিকুঞ্জবাবু আপনার ঠিকানা যোগাড় করে দিলেন।" এই বলিয়া কানাই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার আশালতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। আশালতা হঠাৎ কানাইয়ের আবির্ভাব দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া বলিয়া উঠিল, "একি! কানাই কেমন করে এলি?"

কানাই সহাস্যে বলিল, "আজ্ঞে তা আপনাদের আশীর্ব্বাদে এক রকম ক'রে এসে পড়লুম!"

আশা। ভাল আছিস?

কা। হাঁ।

আ। জেঠামশাইদের বাড়ীর সকলে ভাল আছেন?

কা। হাঁ।

আ। জমীদারবাবুদের বাড়ীর সবাই ভাল?

কা। হাঁ। শীগ্‌গির তাদের সাগরপারে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে!

আশালতা এ কথায় কোনও অর্থ বুঝিতে সমর্থ না হইয়া বলিলেন "তোর খাওয়া হয়েছে?"

অমরকুমার বলিলেন—"কোথেকে আর হবে? এঞ্জিনের ধোঁয়া খেতে খেতে এইতো এসে পৌঁছুলো!"

"বাঃ—বেশ খোকাটী হয়েছে! ঠিক বাবুর মতন!" বলিয়া যেমন কানাই কোলে করিবার অভিপ্রায়ে দুই হস্ত বিস্তারিত করিল, খোকা অমনি সহাস্যে ঝাঁপাইয়া কানাইয়ের কোলে গেল। আশালতা অমরকুমারকে বলিল, "দেখ, দেখ—কানাইয়ের সঙ্গে যেন ওর কত কালের চেনা-পরিচয়! ছুটে কোলে গেল।" হাসিয়া অমরকুমার উত্তর করিলেন, "ওর না হোক, ওর বাবার সঙ্গে কত কালের আলাপ পরিচয় সেটা ও জানে।"

আশালতা বলিল, "কানাই, খোকাকে নাবিয়ে দিয়ে চান করে নে। আমি দুটি ভাত চড়িয়ে দিইগে।"

খোকা কিন্তু কিছুতেই আর কানাইয়ের কোল হইতে নামিতে চাহিল না। অমর-

কুমার তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইলেন। কানাই তাহার ব্যাগটী দেয়ালের গায়ে একটা ... দুলাইয়া রাখিল। তাহার পর কুমার ... মাথায় দুই ঘটি জল ঢালিয়া চান করিয়া লইল এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শুখাইতে দিল। আশালতা তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত গোটাকতক সন্দেশ আনিয়া এক লটী জল গড়াইয়া কানাইকে খাইতে দিল। কানাই জলযোগ করিয়া খোকাকে কোলে লইয়া পৃষ্ঠতলে বসিয়া আবার গল্প যুড়িয়া দিল। কানাই যে সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিলাসের উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় নিঃস্ব অমরকুমারের সেবা করিতে অমরকুমারের নিকটে আসিয়াছে, ইহাতে অমরকুমার মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। কানাইকে নিকটে বসাইয়া সেই অতীত শৈশবকালের ন্যায় কত কথা তিনি বলিতে লাগিলেন; কত প্রশ্ন করিলেন! কানাইও প্রফুল্ল অন্তরে প্রত্যুব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে লাগিল। দরিদ্র প্রজাগণের নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া অমরকুমারের দয়ার্দ্র হৃদয় বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, 'ভগবান্! এর জন্যে দায়ী কি আমি? কিন্তু আমি তো কোন অবৈধ কাজ করি নি। যাঁর প্রজা তিনি যদি তাদের সুখ-শান্তির হন্তা হন, সে দোষ কি আমার? আমি কে?"

অমরকুমার তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত বৈকালে আশালতাকে লইয়া বিরূপাক্ষদেবের দর্শনের বাসনায় বিরূপাক্ষ পাহাড়ে চলিলেন। কানাইও খোকাকে কোলে করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কানাইকে পাইয়া অমরকুমার খুব আহ্লাদিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি একটু শঙ্কিত হইয়াও পড়িয়াছিলেন। যদিও তিনি তাহাকে কোনও প্রকার পূর্ব্বকাহিনী প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে তিনি জমীদার-পুত্র নহেন, দিন-কতক জমীদারের সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন মাত্র, আর তাঁহার মাতাপিতার পরিচয় অজ্ঞাত—এ কথা প্রকাশ হইলে পরে তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না, এবং যদিও কানাইও মনযোগসহকারে তাঁহার কথাগুলি শুনিয়াছিল, এবং কোন কথা বলিবে না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, তথাপি অমরকুমারের মনের আশঙ্কা একেবারে দূর হয় নাই।

আজ পাহাড়ে উঠিবেই বলিয়া আশালতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। সে তাহার দেহের সমস্ত শক্তি এবং মনের সমস্ত বল একত্র করিয়া অতিসন্তর্পণে সোপানাতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের উপরে উপস্থিত হইয়া সানন্দে সগর্ব্বে অমরকুমারের মুখের দিকে চাহিল। অমরকুমার তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "ওঃ—আজ মস্ত একটা কাজ করে ফেলে দেখছি যে! সার্টিফিকেট দিতে হবে।" পতিপত্নী উভয়ে ঠিক পাশাপাশি চলিতে লাগিলেন। কানাই তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু মন্দির-সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া অমরকুমার ভীত হইয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন এবং স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আশালতা ভীত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কিগো, অমন ক'রে কি দেখছো?"

অমর কুমার একটী অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া

বলিলেন, 'দেখ না' !

আশালতা চাহিয়া দেখিল, মন্দিরের নিকটে মন্দিরের ছায়াতলে একজন ভদ্রমহিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার শিয়রে জনৈক পুরুষ বিমর্ষচিত্তে একহস্ত কপোলে স্থাপন করিয়া অপর হস্ত ধীরে ধীরে রমণীর মাথায় বুলাইয়া দিতেছেন।

তখন সকলে সেই মহিলাটির নিকটবর্ত্তী হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কারণ, মূর্চ্ছিতা মহিলাটির আকৃতি অবিকল অমরকুমারের পালয়িত্রী মাতা নবদুর্গার মত। মাথার কেশগুলি হইতে হস্তপাদের নখগুলি পর্য্যন্ত সমস্তই ঠিক্ নবদুর্গার মত! কোন অংশে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। মানুষের সহিত মানুষের যে এতদূর সাদৃশ্য থাকিতে পারে, অমরকুমার ইতঃপূর্ব্বে তাহা আর কখনও দেখেন নাই। অমরকুমারের মনে হইতে লাগিল, বুঝি নবদুর্গা স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া এই দেবমন্দিরের দ্বারে শ্যাম দূর্ব্বাস্তরণের উপর পতিত রহিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু-দুইটি নিমীলিত, মুখভাব প্রসন্ন, অধরপ্রান্তে যেন ঈষৎ হাস্যরেখা লুক্কায়িত রহিয়াছে। বোধ হয় তিনি যেন কোনও সুখস্বপ্ন দর্শন করিতেছিলেন। অমরকুমারের মনে হইতে লাগিল, যে-দিন নবদুর্গা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সে-দিন তিনি ঠিক্ এমনই ভাবে—এমনই প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে শয়ন করিয়াছিলেন, সে-দিনও এমনই উজ্জ্বল আভা তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে বিকীর্ণ হইতেছিল। মৃত্যুর করালছায়া সে দেবী-অঙ্গ বিন্দুমাত্র ম্লান করিতে সমর্থ হয় নাই। আর এমনই বিষণ্ণভাবে গণ্ডে হস্ত-স্থাপন করিয়া উপেন্দ্রকিশোরবাবু তাঁহার শিরোদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। আর পদপ্রান্তে বসিয়া অমরকুমার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন! মৃত্যুর ক্ষণপূর্ব্বে তিনি অমরকুমারকে বুকের কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া অমরের শিরে হাত দিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে চক্ষু-দুইটি জন্মের মত নিমীলিত করিয়াছিলেন। অমরকুমার তাঁহার চরণতলে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িলে, উপেন্দ্রকিশোরবাবু তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হন নাই। অমরকুমার যে তাঁহাকে আশৈশব গর্ভধারিণী জননী বলিয়াই জানিতেন। আর সেই দেবীও তাঁহাকে মনে প্রাণে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মাতৃসত্তাটুকু অমরকেই দান করিয়াছিলেন। সেই অতীত কাহিনী আজ হঠাৎ অমরকুমারের স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাঁহার চক্ষুদুইটী সজল করিয়া তুলিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলেন, "তুমি যে আমার গর্ভধারিণী নও, আমার সে ভ্রম দূর করে দাও।"

শিরোদেশে উপবিষ্ট পুরুষটির মূর্ত্তিও অতি-সুন্দর, সৌম্য ও প্রশান্ত! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অতিমনোহর শারীরিক গঠন। মুখভাব প্রশান্ত! মাথার কয়েকগাছি শুক্লকেশ প্রৌঢ়ত্বের পরিচয় দান করিতেছে।

অমরকুমারের মনঃপ্রাণ যেন উভয়ের চরণে লুটাইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অমরকুমার ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া অতিবিনম্রনম্র বচনে বলিলেন; "মহাশয়! ইনি কি মূর্চ্ছা গেছেন?" পুরুষটি একাকী এই নির্জ্জন স্থানে মূর্চ্ছিতা পত্নীকে লইয়া

বড়ই বিপাকে পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ নিকটে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শ্রুত হওয়ায় তাঁহার প্রাণে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনিও স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন, "হাঁ আমরা এই বিরূপাক্ষ-দেব দর্শন করবার জন্য এসেছি, কিন্তু এখানে এসেই হঠাৎ আমার স্ত্রী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। একলা বড়ই বিপদে পড়েছি, কি করব যে এঁকে নিয়ে, কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছি না।" অমরকুমার যদিও চিকিৎসক নহেন, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি স্বেচ্ছা-সেবকদিগের সহিত মিলিত হইয়া পীড়িতের শুশ্রূষা করিতেন; তাহাতে তাঁহার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি মহিলাটীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অত্যন্ত দুর্ব্বল!"

তিনি আর কোনও কথার প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে উৎসের নিকটে গিয়া নিজের উত্তরীয় ভিজাইয়া সুশীতল জল লইয়া আসিলেন এবং সেই উত্তরীয় নিংড়াইয়া জল লইয়া রমণীর চক্ষে ও মুখে দিতে লাগিলেন; কানাই একটা পার্ব্বত্য বৃক্ষের বড় বড় পাতা লইয়া, কাঠি বিঁধিয়া, পাখার আকারে নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া খোকা সেই সমতল ভূমিতে মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কখন সে নীল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, কখনও বা দোদুল্যমান গাছের পাতা-গুলিকে দুইহস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক 'আয়' 'আয়' বলিয়া ডাকিতে লাগিল; আবার কখনও সানন্দে 'তাই' 'তাই' বলিয়া তালি দিতে লাগিল। আশালতা খোকার জন্য বোতলে করিয়া দুধ ও ঝিনুকবাটী আনিয়াছিল। সে সেইদুগ্ধ একটু উষ্ণ করিয়া ঝিনুকে করিয়া অল্প অল্প রমণীর মুখে দিতে লাগিল। প্রথমে সে-দুগ্ধ তাঁহার ওষ্ঠ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা অল্প অল্প গলার মধ্যে যাইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। ভদ্র-লোকটি কৃতজ্ঞভরে অমরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আজ আপনারা আমাকে যে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন তার ঋণ জীবনে পরিশোধ করতে পারব না।"

রমণী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা, কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালে? আমি কেমন সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলুম!" তাহার পরে অমরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এছেলেটি কে গা?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এঁর সাহায্যেই আজ তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে পেরেছি, কমলা! নইলে আমি ত মনে করেছিলুম, আজকের এ ঘুম বুঝি তোমার চিরদিনের ঘুম হয়ে যায়! তোমাকে যে আবার এমন করে কথা কইতে শুনবো, তা আর মনে করি নি!"

কমলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন, দেখিলেন তাঁহার পাশে একটি শুভ্র মল্লিকাকুসুমের ন্যায় সুকুমার শিশু খেলিয়া বেড়াইতেছে। শিশুর নিকটে একটী তরুণী। তিনি আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খোকাটি বুঝি, তোমার মা!"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা আশালতা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, 'হ্যাঁ।'

তিনি বলিলেন, "একবার কোলে দেবে?"

আশালতা তাড়াতাড়ি শিশুটীকে লইয়া তাঁহার কোলে দিল। তিনি শিশুটীকে

কোলে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া পরম তৃপ্তি বোধ করিলেন। ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিল। দীননাথ রক্তরাগ-রঞ্জিত হইয়া অস্তগমনোন্মুখ হইলেন। অমরকুমার ভদ্রলোকটীকে বলিলেন, "আর এখানে বসে থাকা উচিত নয়; চলুন এঁকে আস্তে আস্তে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক্।"

সকলে ভক্তিভরে বিরূপাক্ষ-দেবকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আশালতা খোকাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া কানাইয়ের কোলে দিল। সর্ব্বাগ্রে কানাই খোকাকে কোলে করিয়া অবতরণ করিল। যাইতে যাইতে অমরকুমার ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাসা কোন্খানে?"

তিনি উত্তর করিলেন, "সবে আজ এখানে এসেছি। এখনও বাসা ঠিক্ করি নি; মনে কচ্ছি, যে ক'দিন থাকি ডাক-বাংলায় থাকব।"

বিনীতভাবে অমরকুমার বলিলেন, "আজ্ঞে ডাক-বাঙ্গালায় প্রায়ই সাহেব-সুবোরা এসে থাকে। এঁকে নিয়ে সেখানে থাকাটা কি সুবিধে হবে?" ভদ্র লোকটি বলিলেন, "কি করি! শুনেছি এখানে সে রকম সুবিধে মত বাসা পাওয়া যায় না।"

অমরকুমার বলিলেন, "আমার এখানে একটা ছোট বাসা আছে। যে-ক'দিন থাকবেন, যদি দয়া ক'রে সেখানে থাকেন, তা হলে বড় সুখী হব।" ভদ্রলোকটি অমরকুমারের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। অমরকুমারও আনন্দিত হইলেন।

যথাসময়ে সকলে অমরকুমারের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশালতা রান্না চড়াইয়া দিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে রন্ধন শেষ করিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটি ও অমরকুমারকে খাইতে দিলেন। ভদ্রলোকটি আহারে বসিয়া আশালতার রন্ধনের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আহার শেষ হলে আশালতা তাঁহাদের পান দিয়া খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া, কানাইকে ভাত দিল, এবং তৎপরে কমলার জন্য ও নিজের জন্য ভাত বাড়িল।

কমলা একখানা চাদর মুড়ি দিয়া শয্যার একপ্রান্তে শয়ন করিয়াছিলেন। আশালতা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতে বসাইল। আহার করিতে করিতে আশালতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা একলা বেড়াতে এসেছেন? ছেলে পুলে সব কোথায় আছেন?"

কমলা কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি শুনিতে পান নাই মনে করিয়া আশালতা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ছেলে পুলে কা'কেও সঙ্গে আনেন্ নি কেন?"

অবারিত অশ্রু সংবরণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া পুত্রহীনা রমণী উত্তর করিলেন, "ছেলে পুলে কোথায় পাব মা? আজ পঁচিশ বৎসর হ'ল আমার একমাত্র ছেলেকে যমের হাতে দিয়েছি।"

(১৪)

বিজনকুমার বাটী হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথ ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ প্রশস্ত সোজাপথ দিয়া গমন করিয়া, একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথে ঢুকিয়া পড়িলেন। এত সরু গলি যে, তাহাতে কষ্টে

একজন মানুষমাত্র কোনও প্রকারে চলিতে পারে। পথের দুইপার্শ্ব কণ্টকাকীর্ণ, জঙ্গলে পরিপূর্ণ! মধ্যে মধ্যে বাবুল-বৃক্ষের এবং সেয়াকুলের ডাল পথের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে পথিকের অঙ্গ এবং বস্ত্র, দুই-ই ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। বিজন-কুমার অতিসাবধানে সন্তর্পণে নিজের অঙ্গ এবং বস্ত্র বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদূর গিয়া একটা অস্পষ্ট পথ ধরিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহাতে বন্যবৃক্ষপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল! অভ্যস্ত ব্যক্তি ব্যতীত তাহার অভ্যন্তরে গমন করে, কাহার সাধ্য! জঙ্গলের মধ্যে একটা লোক একটা ক্ষুদ্র পুঁটুলী-হস্তে অপেক্ষা করিতেছিল। বিজনকুমার একবার শিশ দিবামাত্র সে ব্যক্তি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া পুঁটুলিটা বিজনকুমারের হস্তে অর্পণ করিল। বিজনকুমার তন্মধ্য হইতে বস্ত্রাদি বাহির করিয়া লইয়া অতিশীঘ্র নিজের পরিধেয়-বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। যে-ব্যক্তি পুঁটুলি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সে পুনর্ব্বার বিজনকুমারের পরিত্যক্ত বসন-গুলি লইয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। বিজনকুমারও জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে পূর্ব্বোল্লিখিত পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় পৃষ্ঠদেশে যেন কাহার মৃদুকরস্পর্শ অনুভব করিলেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল। বিজন-কুমার ত্রস্তে ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দৃষ্ট হইল না। তিনি পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু আঘাত করিল। তিনি আবার দাঁড়াইলেন; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন কিন্তু কোন দিকেই কোন মনুষ্যচিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পায়ের নিকট দিয়া একটা শৃগাল ছুটিয়া চলিয়া গেল; মাথার উপর দিয়া একটা কাল পেচক বিকট চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল। স্থানটা নিরাপদ্ নহে—গোরস্থান। বহুদিন পূর্ব্বে অতীত যুগে নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর আমলে ভদ্রমুসলমান অধিবাসীদিগের মৃতদেহ এই স্থানে সমাহিত করা হইত। তখনকার দিনে এ সমাধি-স্থানের শোভা-সমৃদ্ধি যথেষ্টই ছিল। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশে এখন আর সেই পূর্ব্বসমৃদ্ধির চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। বহুদিন সংস্কারাভাবে সমাধিস্তম্ভগুলি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ ধূলি-সাৎ হইয়া পড়িয়াছে; সেই ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ বড় বড় অশ্বত্থ, বট এবং বন্যবৃক্ষরাজিতে সমাকীর্ণ হইয়াছে। সমতলক্ষেত্র পুষ্পবৃক্ষের পরিবর্ত্তে কণ্টকময় বনাবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভূতের ভয়ে এখন এখানে মনুষ্য-সমাগম রহিত হইয়াছে। কচিৎ কখনও রাখাল বালকের দল গরু চরাইতে চরাইতে এখানে আসে, এবং গ্রামে গিয়া গ্রামবাসী-দিগের নিকটে তাহাদের ইচ্ছামত কল্পিত "মামদো" ভূতের অত্যদ্ভুত কৌতুকাবহ কাহিনী-সকল বলিয়া গ্রামবাসীদিগের অন্তরে ভয় ও কৌতুকের সৃষ্টি করিয়া দেয়। অবশ্য বিজনকুমারের মনে ভূতের ভয় ছিল না। তাহা হইলে দিনেই কি রাত্রেই কি, তিনি এ পথে আসিতে সাহস করি-তেন না। কিন্তু এক্ষণে তিনি মনুষ্যের করস্পর্শ অনুভব করিলেন, অথচ কিছু দেখিতে

পাইলেন না, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া আরও দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবার স্পর্শ নহে, তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন কে যেন মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, "আপনার এত ভয়!"

বিজনকুমার আবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "কে তাঁহার সহিত এরূপ কৌতুক করিতেছে? এ কি ভূত না মানুষ?" যেই হউক, মূর্ত্তি তাঁহার অতিনিকটে। অন্ধকার ভেদ করিয়া তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেন, ভূতই হউক বা মানুষই হউক, আকৃতি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাহার আকার প্রকার কিরূপ, বা বেশভূষা কিরূপ, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নীরব নিস্তব্ধ মনুষ্য-সমাগম-শূন্য অন্ধকার রজনীতে সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাঁহার বুকটা যেন কেমন ধক্ করিয়া উঠিল। মূর্ত্তি পুনর্ব্বার মৃদু হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল—"আপনার এত ভয়? তা-হলে গোয়েন্দাগিরি করেন কি করে? এ-কাজ আপনার পরিত্যাগ করাই উচিত!"

ভয়ের সহিত বিস্ময় আসিয়া বিজনকুমারের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তিনি ছদ্মবেশে এমন সুনিপুণ যে তিনি যখন ছদ্মবেশ-পরিগ্রহ করেন, তখন তাঁহার অতিপরিচিত ব্যক্তিও তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হয় না। এ ব্যক্তি তবে চিনিল কি প্রকারে? এ কি তবে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত দেখিয়াছে না কি? কে এ ব্যক্তি! তবে কি এ শত্রুর চর? বিজনকুমারকে তদবস্থায় দেখিয়া মূর্ত্তি পুনর্ব্বার সহাস্যে বলিল, "বড় ভয় পেয়েছেন দেখ্‌ছি! একবার মনে কচ্ছেন ভূত, আবার মনে কচ্ছেন, শত্রু-পক্ষের লোক। কিন্তু আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই; আমি এ দু'য়ের একটাও নই।"

এবার বিজনকুমার নির্ভয়ে কথা কহিলেন, "কে আপনি? কণ্ঠস্বরে ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন? এমন ভাবে নির্জ্জনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতেরই বা কারণ কি? আপনার অভিপ্রায়টা কি?"

মূর্ত্তি উত্তর দিল, "একটা বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাই আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি।

বি। কি?

মূ। শত্রুরা আপনাকে সন্দেহ করছে। আপনাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে। হাবা-কালা সেজে তাদের চখে ধুলো দেওয়া সহজ কথা নয়! তা'রা মস্ত ধড়িবাজ! তা'রা আপনার মতন, অথবা আপনার চেয়েও কত প্রবীণ ডিটেক্‌টিভ্‌কে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে।

বি। আপনি কা'কে কি বলছেন? কে ডিটেক্‌টিভ?

মূ। এখনও আপনার সন্দেহ! যান, আর আপনার সময় নষ্ট করব না। একটী ভদ্র-লোকের মান ইজ্জত সমস্ত আপনার হাতে। আর অশোকবনে সীতাদেবীর মত, বালিকা যে দস্যুকারাগারে বন্দিনীভাবে অবস্থান কচ্ছে, ইংরাজ-রাজের পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে সেটা নিতান্ত কলঙ্কজনক। এখন যত শীঘ্র পারেন তা'কে উদ্ধার করুন। কিন্তু আপনি একা বড় দুঃসাহসিক কাজ কচ্ছেন। আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে, সকলকারই হাত

পোড়বার আশঙ্কা আছে। আপনি ভালো ভালো কেবেন, ওরা পাতায় পাতায় ফেরে। ওদের সহজ লোক মনে করবেন না। সবরক্তে ওদের হস্ত রঞ্জিত হয়ে আছে। আপনার উচিত একেবারে লোকজন নিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করা।"

বিজনকুমার কিয়ৎকাল নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি কি ওদের সমস্ত জানেন?"

উত্তর হইল—"জানি।"

বিজনকুমার বলিলেন, "আপনার কি অনুমান হয় এ ব্যক্তি উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর পুত্র নয়?"

উত্তর হইল, "না।"

বিজনকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এতদিন আমরা যাকে উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর পুত্র বলে জানতাম, আমাদের সেই অমর-অমরবাবুই কি উপেন্দ্রকিশোর বাবুর পুত্র?"

উত্তর হইল, "না।"

বিজনকুমার বলিলেন, "তিনিও নয়? উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর পুত্র তবে কোথায়?"

উত্তর হইল, "তা' বোলব না।"

বিজনকুমার বলিলেন, "বলবেন না? তবে আপনার সমস্ত মিথ্যা কথা! নিশ্চয় আপনি শত্রুপক্ষের চর। আমাকে প্রবঞ্চিত করাই আপনার অভিপ্রায়! আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না।"

উত্তর হইল, "কি করতে ইচ্ছা করেন?"

বিজনকুমার দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব।"

ধীর প্রশান্তভাবে তিনি বলিলেন, "নিয়ে যান।" বলিয়াই বিজনকুমারের দিকে দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিলেন। বিজনকুমার তাহা দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে সে-হস্ত নরঘাত-দস্যুর মত নয়, রমণীর হস্ত-তুল্য সুকুমার! বিজনকুমার তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "অন্ধকারে আপনাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পেলেই বুঝতে পারতুম দস্যু কি না।"

তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সেটা অনেকেই পারে। কিন্তু অন্ধকারে লোক চেনাই গোয়েন্দার কর্ত্তব্য।"

বিজনকুমার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চাই না, কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে!"

মূ। কি?

বি। আপনি যা যা জানেন, আপনাকে তা' বলতে হবে। দস্যুদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।

মূ। না, আদালতে দাঁড়িয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারব না।

বি। কেন তাতে বাধা কি?

মূ। আমার ইচ্ছা!

বি। তবে আপনাকে আমি ছাড়তে পারব না, থানায় নিয়ে যাব।

মূ। বলছি ত' সচ্ছন্দে নিয়ে যান! আমি বলব, আমি কিছুই জানি না। বিজনবাবু আমাকে বলপূর্ব্বক ধরে এনেছেন।

বিজনকুমার পুনর্ব্বার চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা ওদের ধরিয়ে দেবার জন্যেই বা আপনার এত আগ্রহ কেন? তাতে আপনার লাভ কি?"

উত্তর হইল, "কিছুই নয়।"

বিজনবাবু বলিলেন—"তবে ?"

তিনি বলিলেন, "আপনারা ডোমীর দস্যু ধরিতে সমর্থ হচ্ছেন না। এ রকম ভয়ঙ্কর লোক ধৃত না হলে সংসারের আরও কত অনিষ্ট সাধন করবে ? তাই আপনাকে পরামর্শ ও উপদেশ দিতে এসেছি। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, কি গুরু ভার স্কন্ধে নিয়েছেন ! অনর্থক বিলম্ব না করে লোক-জন নিয়ে এক সঙ্গে সকলকে গ্রেপ্তার করুন। এই উত্তম সুযোগ। এ সুযোগ হারালে আপনাকে অনেক পশ্চাতে পড়ে থাকতে হবে। চিন্তিত হইয়া বিজনকুমার বলিলেন, "কি অপরাধে গ্রেপ্তার করব ! অপরাধের প্রমাণই বা কি ?"

উত্তর হইল—"ধরা পড়লে অনেক প্রমাণই বেরিয়ে পড়বে। উপস্থিত বালিকা-হরণই কি গুরুতর অপরাধ নয় ?" বিজনকুমারকে নীরব দেখিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "আর আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না; দেখছি আপনার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। আপনি একেবারে সব প্রমাণগুলো হাত করতে চান। কিন্তু তা'তে কি বিপদ কি অনিষ্ট বুঝতে পাচ্ছেন না।" এই বলিয়াই তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন; যাইতে যাইতে বলিলেন, "আর দুটো দিন মাত্র সময় আছে, তিন দিনের দিন বিবাহের দিন স্থির করেছেন, সে খবর বোধ হয় রাখেন !"

তিনি চলিয়া গেলে বিজনকুমারও ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—"লোকটা কে ? কেনই বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিল। সে নিজের কোনও পরিচয় দানে ইচ্ছুক নয়। দস্যুদলকে ধৃত করিবার জন্য তাহার নিতান্ত আগ্রহ দেখা গেল। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতে সম্মত নয়। এ-প্রহেলিকা বোঝা দুরূহ। লোকটি যেই হউক, সে তাঁহার অপেক্ষা যে প্রখর-বুদ্ধিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লোকটা দৈব-বাণীর ন্যায় তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া গেল। তাঁহার প্রতি যে দস্যুদলের কোনও প্রকার সন্দেহ হইয়াছে, সে কথা তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। লোকটি বলিয়া গেল, একেবারে সকলকে গ্রেপ্তার করিতে। কথা যুক্তিযুক্ত হইলেও এ-স্থলে তাহা সম্ভব নয়। কারণ, রাধা-গোবিন্দবাবু লোকলজ্জা ও কলঙ্ক-ভয়ে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন; পুলিশ আসিয়া নীলিমার উদ্ধার-সাধন করিলে এ-কথা জন-সাধারণে প্রচার হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে নিন্দুকের রসনা শত সহস্র হইয়া অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইবে। লজ্জায় রাধাগোবিন্দবাবু জন-সাধারণকে মুখ দেখাইতে পারিবেন না।" অধিকন্তু নীলিমাকে উদ্ধার করিতে অন্যের সাহায্য লইতে হইবে, তাহা ভাবিয়াও বিজনকুমার লজ্জিত হইলেন। তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—"নীলিমাকে আমি একাই উদ্ধার করব, যেমন করে পারি।"

হঠাৎ আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল, বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। ক্রমে বড় বড় ফোঁটা, তাহার পর ঝমঝম করিয়া মুষলধারে জল আরম্ভ হইল। একে বন্য পথ, তাহাতে অন্ধকার-রাত্রি, তাহার উপর আবার অজস্র বারিধারা। বিজনকুমারের বস্ত্রাদি সমস্তই সিক্ত হইয়া গেল, তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

দ্রুত গমনে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল, এজন্য তিনি যথাশক্তি সাবধানে চলিতে লাগিলেন। সূচিভেদ্য অন্ধকারে পথের কিছুমাত্র [illegible]তছিল না। তিনি কেবল যন্ত্রচালিত [illegible] ন্যায় নিজের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পথ চলিতেছিলেন। একস্থানে একটা শুষ্ক, পতিত বৃক্ষকাণ্ডে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার দক্ষিণ পদ কাটিয়া যাইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যথাশক্তি দ্রুতবেগে চলিলেন, এবং প্রবল বারিধারা যেন তাঁহাকে উপহাস করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

প্রেম।

বিগত হইলে নিশা শ্রীরাম হ'বেন নরপতি,
হেনকালে বনে তাঁরে বিমাতা দিলেন পাঠাইয়া!—
চতুর্দ্দশ বর্ষ-অন্তে ফিরি রাম আপনার দেশে,
আগে বিমাতার পায়ে প্রণমিলা "মা" ব'লে ডাকিয়া।

পীলাত ঈশারে যবে বিনাশিল ক্রুশে বিঁধাইয়া,
অন্তিম সময়ে প্রভু বলিলেন সস্মিত আননে,—
"হে পিতঃ করিও ক্ষমা, এরা সব অবোধ অজ্ঞান,
তোমার সন্তানগণে পিতা তুমি রাখিও চরণে।"

"সর্ব্বজীবে কর প্রেম" প্রচারিলা নিমাই যখন,
জগাই মাধাই তাঁরে প্রহারিল শত শত বার।
আলিঙ্গিয়া দুইজনে বলিলেন শচীর তনয়,
"এসো এই বুকে এসো, তোমরাও ভাই যে আমার!"

আরব-প্রান্তর মাঝে ধূ ধূ করে উত্তপ্ত বালুকা,
মহম্মদ এসেছেন প্রচারিতে ধর্ম্ম ইসলাম;—
সবার প্রহারে তাঁর দেহে বহে শোণিতের ধারা,
মুখে বুলি—"ধর্ম্ম সত্য, সত্য হোক্ ঈশ্বরের নাম!"

যৌবনে ত্যজিয়া গৃহ শুদ্ধোদন-রাজার নন্দন,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" দেশে দেশে করিলা প্রচার;

ব্রাহ্মণেরা দিয়া বাধা সুচরিত্রে দিল অপবাদ,
হাসিয়া বলিলা বুদ্ধ—"অমঙ্গলে মঙ্গল আমার।"

হে মহাপুরুষগণ, নমি আমি তোমাদের পায়ে,
তোমরা সকলে আজ দীন হীনে কর আশীর্ব্বাদ,—
বিতরিতে পারি যেন ধরণীতে স্নেহ, ক্ষমা, দয়া,
সহস্র দুঃখেও যেন হৃদয়ে না আসে অবসাদ।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রঙ্গজীর মন্দির।—আধুনিক মন্দিরের মধ্যে রঙ্গজীর মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শেঠ লক্ষ্মীচাঁদের ভ্রাতা শেঠ গোবিন্দদাস এবং শেঠ রাধাকৃষ্ণ উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীরঙ্গজী বিষ্ণুর অপর একটী নামান্তর। শ্রীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামানুজ এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ রঙ্গজীর সেবায়েৎ। মন্দিরটী মান্দ্রাজী ধরণের এবং ইহা স্বামী রঙ্গাচার্য্যের নক্সা অনুসারে নির্ম্মিত। ১৮৪৫ খ্রীঃ মন্দির-গঠন আরম্ভ হয় এবং ১৮৫১ খৃঃ শেষ হয়। ইহার প্রস্তুতিতে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। বাহির দেওয়ালটী লম্বায় ৭৭০ ফিট এবং চওড়ায় ৪৪০ ফিট। ইহাতে একটী সুন্দর বাগান এবং পুষ্করিণী আছে। বিগ্রহের সম্মুখে তাম্রাচ্ছাদিত ধ্বজস্তম্ভ অবস্থিত; ইহা উচ্চে ৬০ ফিট এবং মৃত্তিকার নিম্নে ২৪ ফিট প্রোথিত। এই একটিতেই দশ সহস্র মুদ্রা খরচ হয়। মন্দির-দ্বারের একটু পার্শ্বে একটা ঘর আছে, তাহাতে রথ রক্ষিত। চৈত্র মাসে ব্রহ্মোৎসবের দিন এই রথে রঙ্গজীকে বাহির করা হয়। মেলাটী ১০ দিন থাকে। যখন রঙ্গজীকে পথে বাহির করা হয়, তখন বাদ্যোদ্যম এবং বাজী পোড়ান হয়। দেবতাটী অষ্টধাতু-নির্ম্মিত। যখন দেবতাকে রথে চড়ান হয়, তখন তাঁহার স্থান মধ্যে থাকে এবং দুই পার্শ্বে দুই জন ব্রাহ্মণ চামর ব্যজন করেন। যে-দিন রথ বাহির করা না হয়, সে-দিন দেবতা নানা প্রকারের যানে চড়েন:—যথা পুণ্যকোটী (পাল্কী), সিংহাসন, কদম্ব অথবা কল্পবৃক্ষ। কখন বা সূর্য্য, চন্দ্র, গড়ুর, হনুমান অথবা শেষনাগ, এবং কখনও বা ঘোড়া, সিংহ, মরাল এবং অষ্টপাদ শরভের উপর দেবতাকে দেখা যায়। এক একটী উৎসবে প্রায় ৫ সহস্র মুদ্রা খরচ হয়। রঙ্গজীর বার্ষিক খরচা ৫৭ হাজার টাকা; তন্মধ্যে ৩০ সহস্র মুদ্রা কেবল মাত্র ভোগে লাগে। এই ভোগ পূজারীগণকে অথবা বাকে গরীব লোকদিগকে দেওয়া হয়। প্রতিদিন ৫ শত শ্রীবৈষ্ণব মন্দিরে আহার পান

এবং প্রত্যহ বেলা ১০টার সময় এক তোলা আটা (গোধূমচূর্ণ) জাতিনির্ব্বিশেষে কোন প্রার্থীকে দেওয়া হয়। ৩৩টী গ্রাম লইয়া মন্দিরের জমিদারী। ইহা হইতে ১১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ৬৪ হাজার টাকা গভর্ণমেণ্ট করস্বরূপ লইয়া থাকেন। উক্ত ৩৩টী গ্রামের মধ্যে ১৩টী মথুরার এবং বাকী ২০টী আগ্রা-জেলার অবস্থিত। মথুরার গ্রামগুলিতে বৃন্দাবনেরও কতকটা অংশ আছে। লোকে যে সকল পূজা চড়ায় তাহার বার্ষিক মূল্য গড়ে দুই সহস্র মুদ্রা এবং পূজার জন্য যে সকল জমা আছে, তাহার বার্ষিক সুদ ১১ হাজার ৮ শত টাকা। ১৮৬৮ খ্রীঃ স্বামীজী সমস্ত জমিদারী স্বীয় সন্তানের উপর ন্যস্ত না করিয়া একটী কমিটীর হস্তে দেন। স্বামীজীর পুত্র একটী হস্তিমূর্খ ও পারদারিক ছিলেন। পূজারীর এ গুণ থাকিলে লোকেরা তাঁহাকে কেন পছন্দ করিবে? সুতরাং বদ নাম এত হইতে লাগিল যে তাঁহার পিতাও বিচলিত হইলেন। অবশেষে স্বামীজী সন্তানকে একটা বৃত্তিমাত্র দিয়া গুরুপদ হইতে বঞ্চিত করিলেন। অবশ্য মান্দ্রাজ হইতে অন্য গুরু পূজার জন্য আনয়ন করা হয় এবং কার্য্যভার ছয় জন লোকের একটী কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। কমিটির লোকদিগের মধ্যে শেঠ নারায়ণ দাস মন্দিরের হিতের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার নামে মন্দিরের সর্ব্বস্ব অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখা হয়। যে-দিন হইতে এই কার্য্যটী হইয়াছে, সেই দিন হইতে কি পূজা সম্বন্ধে, কি অন্য বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছে এবং জমীদারীও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

উক্ত জমীদারীর মধ্যে যে সকল গ্রাম আছে, তন্মধ্যে তিনটী গ্রাম মহাবনে এবং দুইটী জলেশ্বরে অবস্থিত। এগুলি জয়পুরের রাজা মানসিংহ দান করেন। যদিও ইনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন, কিন্তু তথাপি ইনি কখনও সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। ইনি রাজা পৃথ্বীসিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে ইনি জননী-জঠরে ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইহার অন্য ভাই প্রতাপসিংহ সিংহাসনের দাওয়া করেন। কিন্তু দৌলত রাও সিন্ধিয়া তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতার সিংহাসনে হক সাব্যস্ত করায়, ইনি বার্ষিক ৩০ সহস্র মুদ্রার বৃত্তিতে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই এবং যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন যোগি-বেশেই ছিলেন। ১৮৪৮ খৃঃ ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহার মৃত্যু হয়। ২৭ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইনি পদ্মাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন;—কখনও সে আসন তিনি ত্যাগ করেন নাই। সপ্তাহে কেবলমাত্র একবার মূত্র-পুরীষ ত্যাগের জন্য তিনি আসন ত্যাগ করিতেন, অন্যথা নহে। মৃত্যুর পঞ্চ দিবস পূর্ব্বে ইনি জানিতে পারেন যে মৃত্যু সমাগত হইয়াছে; সুতরাং, তিনি তাঁহার পুরাতন চাকরদিগের তত্ত্বাবধানের ভার শেঠের উপর দেন।

রাধারমণের মন্দির।—১৮৭৬ খ্রীঃ রাধারমণের মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। লক্ষ্ণৌনিবাসী সাহ কুন্দনলাল এই মন্দিরের নির্ম্মাতা। মন্দির তৈয়ার করিতে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

রাধা ইন্দ্রকিশোরের মন্দির।—রাধারমণের মন্দিরের ধাঁচে এই মন্দিরটী গয়ার নিকটস্থ টিকারী-নামক স্থানের হেতরাম-নামক জনৈক জমীদারের পত্নী রাণী ইন্দ্রজিৎ-কুমারী-দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটী প্রস্তুত হইতে ৬ বৎসর লাগে এবং ইহা ১৮৭১ খ্রীঃ শেষ হয়। মন্দিরের শিখরদেশটী তাম্রফলক-দ্বারা মণ্ডিত; একা শিখরদেশের নির্ম্মাণেই ৫ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রাধাগোপালের মন্দির।—রাধাগোপালের মন্দিরটী গোয়ালিয়রের মহারাজার দ্বারা নির্ম্মিত। মহারাজের গুরু ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাস মন্দির নির্ম্মাণে তত্ত্বাবধান করেন। এই মন্দির-নির্ম্মাণে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়।

বৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ইমারতের নাম ঘেরা। জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা সওয়াই জয়-সিংহ যখন আগ্রার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে বাস করিতেন। নদী-সম্মুখে ঘাট-রাজী দেড় মাইল ধরিয়া অবস্থিত। নদীর সর্ব্বোচ্চ যে ঘাট আছে, তাহা কালীয়-মর্দ্দন-ঘাট নামে খ্যাত। এখানে কদম্ব বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কদম্ব বৃক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণদেব কালীয় সর্পের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। সর্ব্বনিম্নে কেশী-ঘাট। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কেশী-দৈত্যকে সংহার করেন। কেশীঘাটের সন্নিকটে ভরতপুরের রাজা রণজিৎ সিংহ এবং রণধীর সিংহের রাণী কিশোরী এবং লক্ষ্মী দুইটী সুন্দর নিকেতন তৈয়ার করান। ধীরসমীরের সন্নিকটে নদী-সম্মুখে কতকগুলি বৃক্ষ অবস্থিত, সে-গুলি ভরতপুরের প্রথম রাজা সূর্য্যমল্লের পিতাঠাকুর বদন সিংহ এবং সূর্য্যমল্লের রাণী গঙ্গা দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই ধীরসমীরকে উল্লেখ করিয়া জয়দেব গীত-গোবিন্দে লিখিয়াছিলেন :-

"ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী"।

ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে বস্ত্রহরণ-ঘাট দর্শনীয়। এই ঘাটটী শাহজীর মন্দিরের পশ্চাতে এবং যমুনার তটে অবস্থিত। এখানে যাত্রিগণ স্নান করে। ঘাটের সন্নিকটে একটী পুরাতন কদম্ববৃক্ষ আছে। তাহার শাখাতে কাপড়ের টুকরা বাঁধা থাকে।

সেবাকুঞ্জ।—একটা পাকা ঘেরার ভিতর নানা প্রকারের লতা এবং তমালাদি অনেক পুরাতন বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উক্ত ঘেরার ভিতর একটী ক্ষুদ্র মন্দিরও আছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণাদির মূর্ত্তি অবস্থিত। অভ্যন্তর ললিতাকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। এখানে হাজার হাজার বানর বাস করে। যাত্রিগণ বানরগণের আহার যোগাইয়া থাকে।

বংশী বট।—গোপেশ্বরের কিছু আগে একটী পুরাতন বটবৃক্ষ আছে। তাহার সন্নিকটে এক প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আর রাসলীলার চিত্র দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সেদিনের গাথা।

সে-দিন—ছিল বাঙ্গালীর প্রতি মেটে ঘরে
ধানের মরাই থরে থরে থরে,
যার বলে সবে অহঙ্কার ভরে
যেত না মাটিতে পা দিয়া,—
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া !

সে-দিন—নিজ বাগানের কাঁচা পাকা ফল,
নিজ পুকুরের সুশীতল জল
পাইয়া সকল বাঙ্গালীর দল
আনন্দে উঠিত নাচিয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া !

সে-দিন—পল্লীগ্রামবাসী তন্তুবায়গণ
স্বদেশী তুলায় করিত বয়ন,
কত শত বস্ত্র নয়ন-শোভন
কপালের ঘাম মুছিয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া !

সে-দিন—প্রতিগৃহস্থের গোয়ালের আলো
ছিল কত গাভী লাল, সাদা, কাল,
খাটী ক্ষীর সব ছানা খেয়ে ভাল
বাঙ্গালী থাকিত বাঁচিয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া !

সে-দিন—প্রাতঃকালে উঠি' গৃহলক্ষ্মীগণ
গোময় প্রাঙ্গণে করিত লেপন
ঘড়া লয়ে কাঁকে স্নানের কারণ
পথ দিয়া যেত হাঁটিয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া !

সে-দিন—নিজ-হাতে মাতা অন্নপূর্ণা প্রায়
বিবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিত হেলায়,
পরিতুষ্ট করি' খাওয়ায়ে সবায়
সুখী হ'ত নিজে খাইয়া,—
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া।

সে-দিন—অতিথির সেবা হ'ত প্রতি ঘরে,
অন্নহীনে অন্ন খেত পেট ভরে,
আরো কিছু নিয়ে পরদিন তরে
"জয়" গাহি' যেত চলিয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া।

সে-দিন—ব্রাহ্মণের ছেলে উপনীত হ'য়ে
যেত গুরুগৃহে বিদ্যার আশয়ে,
নানা শাস্ত্র শিখি' অনুমতি লয়ে
সংসার করিত আসিয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া।

সে-দিন—বৃদ্ধ মাতাপিতা নিজ পুত্র-করে
বিষয় বৈভব দিয়া সব ধরে
আত্মার উন্নতি-কামনার তরে
থাকিত বনেতে যাইয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া।

সে-দিন—ব্রাহ্মণের কাজ দেব-আরাধনা,
ক্ষত্রিয়ের ছিল অস্ত্রে ঝনঝনা,
বৈশ্য করিত ব্যবসা'-চালনা,
শূদ্র যাইত সেবিয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া।

সে-দিন—পবিত্রসলিলা-ভাগীরথী-পথে
বেদ-মন্ত্র পূত উঠিয়া প্রভাতে
ওঁঙ্কার—ওঁঙ্কার—ওঁঙ্কার সহিতে
যাইত গগন ভেদিয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া।

সে-দিন—ব্রাহ্মণ ছিল সর্ব্বশিরোমণি
স্বার্থত্যাগী, যোগী, পরম জ্ঞানী,
রোষানলে যাঁর ছোট বড় প্রাণী
যাইত ভস্ম হইয়া,
সে-দিন গিয়াছে চলিয়া।

যে-দিন—ভারতের পণ্য থাকিত ভারতে,
　হ'তো নাকো পরমুখাপেক্ষী হ'তে ;
　হেসে খেলে দিন যেত যাতে তাতে
　　বিভুর আশিস্ পাইয়া,
　　সে-দিন গিয়াছে চলিয়া।

যে-দিন—বুদ্ধ-শঙ্করাদি নরোত্তমগণ
　প্রকাশি' মুক্তির পথ অগণন
　এক সত্য ধর্ম্ম করি' প্রবর্ত্তন,
　　গেছেন অমর হইয়া,
　　সে-দিন গিয়াছে চলিয়া।
　(আর না আসিবে ফিরিয়া।)

শ্রীধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ।

১। ত্রিহুত-মজঃফরপুর-সাহথা গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাবু আউরঙ্গ বিহারী সহায়ের শ্রাদ্ধদিনে পঞ্চাশটী দরিদ্র বিধবাকে পঞ্চাশটী সূতা কাটিবার চরকা দান করা হইয়াছে।

২। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, নবদ্বীপের রামচন্দ্রপুর চরে সাড়ে চৌদ্দ হাত ভূমির নীচে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের নির্ম্মিত মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাড়ে চারি শত বৎসর পরে ইহার আবিষ্কার।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য 'বৃন্দাবনকথা,'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের সাহায্য ভাণ্ডারে ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই দান গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। গত সমরকালে প্যালেষ্টাইন ও মিশরের রেলের সংযোগ-সাধনের জন্য সুয়েজ-খালের উপর এক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। কারণ, ইহাতে ভবিষ্যতে খালের অপকার হইতে পারে। ইহার পরিবর্ত্তে এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইবে। এই সুড়ঙ্গযোগে প্যালেষ্টাইন ও মিশর রেলের সংযোগ সাধিত হইবে।

৫। কাশীধামের শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল ইউরোপীয় যুদ্ধ-স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার প্রস্তাব,—কাশীধামে এক "সর্ব্বধর্ম্ম হর্ম্ম্য" প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। এই সম্পর্কে তুলনামূলক ধর্ম্ম এবং দর্শন অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকিবে; আর সর্ব্ব ধর্ম্মের সর্ব্ব শ্রেণীর পবিত্র গ্রন্থসমূহও ইহাতে সংগৃহীত হইবে।

৬। সংবাদপত্রে প্রকাশ- মডেল হাই স্কুলের ড্রইং মাষ্টার মহাশয় বিলাতীবর্জ্জনের নিদর্শনস্বরূপ মস্তকে গান্ধি টুপি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, জব্বলপুর ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল তাঁহাকে সাসপেণ্ড বা অস্থায়িভাবে পদচ্যুত করিয়াছেন।

৭। গত ১লা ডিসেম্বর হইতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় আইনকার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

আমুদাবাদের রাজা শিববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

৮। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সৈয়দ হাসান ইমাম ৯ই ডিসেম্বরের "সার্চ্চ লাইট" পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমার মতে অসহযোগিতাবর্জ্জনের আন্দোলনটী কার্য্যতঃ নিষ্ফল নহে, রাজনৈতিক হিসাবেও ইহা অসঙ্গত এবং ছাত্রদের পক্ষে ইহা একেবারে প্রাণঘাতক।"

*৯। দীর্ঘায়ু :—পেনসিলভেনিয়ার অন্তর্গত জিমেট-সহরের রেভারেণ্ড এলনাট ভোজেল যুক্তরাজ্যের মধ্যে একজন প্রাচীনতম কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তাঁহার বয়স ১০২ বৎসর। এখন পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তিনি দৈনিক জীবনকে নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছেন; তিনি নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও বহু-দূরব্যাপী ভ্রমণ করেন; তামাক বা মদ্য খান না; মধ্যে মধ্যে নৌকা-ভ্রমণ করেন ও বিবেক-অনুযায়ী কার্য্য করেন। এই সকলের জন্যই অত বয়স সত্ত্বেও তিনি এখনও সুস্থ দেহে বর্ত্তমান আছেন।

*১০। পশুর বয়স :—পশুরাজ্যে বোধ হয় হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন বাঁচে। তাহারা ১০০ হইতে ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। পশুজীবনীতে উল্লেখ আছে যে হস্তী ৩১০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। তিমি মৎস্যেরও হস্তীর ন্যায় ৩০০ বৎসর-ব্যাপী দীর্ঘ জীবন। উষ্ট্র ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। সিংহ ৪০ বৎসর ও ব্যাঘ্র ২৫ বৎসর মাত্র জীবিত থাকে।

*১১। হোপী ইণ্ডিয়ানগণের বিবাহ-প্রস্তাব ও বিবাহ :—হোপী ইণ্ডিয়ান কুমারী নিজের পছন্দমত বর ঠিক করিলেই তাহাকে বিবাহ করিতে পায় না।' সে মনোনীত বরের মাতার নিকট গিয়া সরল অথচ দৃঢ়ভাবে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করে। সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইবার পূর্ব্বে কর্ণদ্বয়ের উপরে চুল দিয়া দুইটি গোলাকার খোপা তৈয়ার করে। ইহাই নাকি তাহাদের দেশের বিবাহপ্রস্তাব করিবার চিহ্ন। তাহার ভাবী শাশুড়ী সম্মত হইলে, সে তিন দিন থাকিয়া ভাবী শ্বশুর-গৃহে যাঁতাভাঙ্গার কার্য্য করিবে। এ-দিকে পাত্রটীও যে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবে, তাহা নহে। সেও ভাবী পত্নীর বিবাহ-পরিচ্ছদ বুনিতে থাকিবে।

*১২। অন্ধ নারীর কাজ—১৯১৯ সালে Ohio stateএ অন্ধ নারীগণ নিজ হস্তে স্পর্শে বুঝিয়া ১৮৮০০০ তোয়ালে সেলাই করিয়াছে ও ৪৮০০০ apron (বস্ত্র-রক্ষণী) সেলায়ের কলে তৈয়ার করিয়াছে। (Bangor Daily News.)

*১৩। আমেরিকার নাপিতের মাহিনা :—Boston Globeএতে একটী নাপিতের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। তাহার মাহিনা সপ্তাহে ৭৫৲ টাকা, অর্থাৎ মাসে ৩০০৲ টাকা।

---

* সংগ্রহীত্রী—শ্রীমতী সুষমা সিংহ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 689. January, 1921.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৮৯ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২৭। জানুয়ারী, ১৯২১। | ১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

"নিমন্ত্রণ।"

(১)

রবাহূত আমি নহি!—
গঞ্জনা মোরে দিও না তোমরা,
অনাহূত আমি নহি!
তোমরা যেয়ো না সকলে চলিয়া,
আমার পথের মাঝারে ফেলিয়া,
মরিব অচেনা এ পথে ঘুরিয়া;
সাথী আর কেহ নাহি।
অবহেলা মোরে করিস্ নে ভাই!
দাঁড়া মোর মুখ চাহি।

(২)

আহা!—যেথায় তোমরা যাবে গো!
কত না শান্তি বিরাজিত সেথা—
কত আনন্দ পাবে গো!
সেথা সব সুন্দর, সকল সত্য
সব মঙ্গল, সকল নিত্য,—
তারি তরে মোর ধাইছে চিত্ত,
পায়ে ধরি সাথে লও গো!
আহা! যেথায় তোমরা যাবে গো!

(৩)

অনাহত সুরে আহ্বান তার
উঠে অম্বর ছাপিয়া;
সেই আমন্ত্রণ শুনি প্রাণে প্রাণে
আসিয়াছি আমি ধাইয়া!
গিরি কান্তার অনিল অনল
ছুটেছে সকলে উধাও বিভল,
তটিনী চলেছে হেসে খল্খল,
আমি কি রহিব পড়িয়া?—
অনাহূত ভেবে অবহেলা ভরে
যেয়ো না আমারে ফেলিয়া!!

(৪)

বিরাট আমন্ত্রণে—
তোমরা তাঁহার যোগ্য অতিথি,
চলেছ ফুল্ল-মনে।
নত সম্ভারে পূর্ণ করিয়া
পূজা উপহার নিতেছ বহিয়া;
তোমাদের তিনি নেবেন তুলিয়া
সাদর সম্ভাষণে!—
তাই চলেছ ফুল্ল মনে!

(৫)

ওগো ! দাঁড়াও ক্ষণেক তরে—
আমি ত কাহারো করিব না ক্ষতি
নিয়ে গেলে সাথে করে !
অক্ষম আমি রিক্ত ভিখারী !—
তাঁরে দিতে কিছু নাই যে আমারি।
নিজের দীনতা শুধু মনে করি
অশ্রু পড়িবে ঝরে !
ওগো ! নিয়ে যাও সাথে করে !
শুধু একধারে ঘৃণা কুড়াইয়া
থাকিব কেবল পড়ে !

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

জাহাজ-ডুবি।

(১৫)

নূতন জমীদার এবং তাঁহার পারিষদবর্গের অত্যাচারে দেশের লোক উত্যক্ত হইয়া তাঁহাদের নির্ব্বাসন কামনা করিতেছিল। কোন কোন মহলে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছিল এবং সুবিধা পাইলে সময়ে সময়ে জমীদারের অত্যাচারী লোক-জনকে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। উপেন্দ্র-কিশোর বাবুর সুবৃহৎ জমীদারীর মধ্যে ধীরে ধীরে একটা বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতে-ছিল। এই অল্পকালের মধ্যেই প্রজাদিগের মধ্যে যেরূপ বিদ্রোহভাব জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জমীদারি-রক্ষা-সম্বন্ধে জমীদার যে চিন্তাকুল হইয়া উঠেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বিলাস-সাগরে মগ্ন, গৃহের বাহিরে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা দেখিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না; এবং প্রজাদের মধ্যে কিরূপে শান্তি স্থাপিত হয়, সে বিবেচনার শক্তিও তাঁহার ছিল না। তাই তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হারাধন কৌশল করিয়া রাধাগোবিন্দবাবুকে হস্তগত করিবার সংকল্প করিল। হারাধন ভাবিয়া-ছিল এ-বিবাহের প্রস্তাব রাধাগোবিন্দ-বাবুর নিকটে উপাপন করিলে, তিনি অসম্মত হইবেন না। একদিন যাহার বেতনভোগী কর্ম্মচারিমাত্র থাকিয়া তাঁহার এতটা খ্যাতি-প্রতিপত্তি, আজ তাঁহার পুত্রের হস্তে পৌত্রী-সমর্পণ করা ত তাঁহার পক্ষে পরমসৌভাগ্যের বিষয়! তিনি যে ইহাতে অসম্মত হইবেন, তাহা তাহারা মনে করিতে পারে নাই। তাই তাহারা পরামর্শ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার জন্য রাধাগোবিন্দবাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। রাধাগোবিন্দ-বাবু যখন ঘৃণা-ভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন হারাধনের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহার দৃঢ় সংকল্প হইল, যে প্রকারেই হউক্ রাধাগোবিন্দবাবুর পৌত্রীর সহিত জমীদারের বিবাহ দিতেই হইবে! এক্ষণে অন্য কোনরূপ উপায় না থাকায়, তাহারা নীলিমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া মনঃস্থ করিয়া, তাহারই সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; এবং দৈবক্রমে সে সুযোগ উপস্থিতও হইল।

তাহারা নীলিমাকে লইয়া গিয়া একটী কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আর—দুই দিন পরে শুভলগ্নে জমীদারের সহিত

তাহার বিবাহ দিবে। সপারিষদ জমীদারের অন্তরে মহাহর্ষ! আর দুইটা দিন যেমন তেমন করিয়া কাটিলে হয়! অসামান্য রূপসী তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী হইবে! সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত শুভ্র মল্লিকাকুসুমের মত একটী সুকোমল সুন্দরী বালিকা তাহার খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি-দুইটী লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে। আর তিনি সেই অপ্সরোবিনিন্দিত সুকুমারী বালিকাটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া জীবন ধন্য করিবেন। সেই কল্পনাতেই জমীদার বিভোর!

বিবাহের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত, কিন্তু কার্য্যটা খুব গোপনেই সম্পন্ন করিবার সংকল্প হইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের তালা দিয়া পুরোহিত-ঠাকুরের মুখ বন্ধ করা হইয়াছে। তিনি এ-কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ না করিয়া গোপনে জমীদারের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ভট্টাচার্য্য [illegible] রাধা-গোবিন্দবাবুর সহধর্ম্মিণী মহামায়ার সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী-ব্রত-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রচুর অর্থ এবং নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভারাদিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পরে স্বয়ং জমীদার এবং তাঁহার দুই হস্তস্বরূপ দুই পারিষদ হারাধন ও পরাণ—এই ত্রিমূর্ত্তি দ্বিতলের একটা প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া সুরাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত। কক্ষের মধ্যস্থলে একটা মর্ম্মর-প্রস্তরের বৃহৎ টেবিল। টেবিল ঘেরিয়া চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি স্প্রীংয়ের গদীযুক্ত সুদৃশ্য কাষ্ঠাসন। তাহারই তিনখানি অধিকৃত করিয়া ত্রিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছিলেন। টেবিলের উপর বোতল গ্লাস এবং রূপার ট্রে করিয়া নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য যথানিয়মে সজ্জিত ছিল। সুরাদেবী তখনও তাঁহাদের উদর অতিক্রম করিয়া মস্তকে উঠিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের এই সান্ধ্যভোজনের আয়োজন করিয়া দিত কানাই। কানাই চলিয়া যাইবার পরে এ কার্য্যভার পাইয়াছিল বলাই। কিন্তু আজ তাঁহাদের এ অমূল্য সময়টুকুতে বলাই অনুপস্থিত। গ্লাসে মদিরা ঢালিয়া দিবার জন্য আজ কেহই তাঁহাদের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া নাই। আজ তাঁহারা নিজেরাই স্বকরে মদিরা ঢালিয়া গলাধঃকরণ করিতেছিলেন। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাদের কষ্ট ও অসুবিধার সীমা ছিল না। অনেক ডাকাডাকির পরও যখন শ্রীমান্ বলাইচাঁদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন হারাধন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "বলা ব্যাটা আজ গেল কোন চুলোয়?" ক্রুদ্ধস্বরে পরাণ বলিল, "নিশ্চয় ব্যাটা কোনও কু-মৎলবে ফিরছে। ব্যাটা থাকে থাকে একেবারে যেন কোথাও উধাও হয়ে যায়।" এমন সময়ে পায়ের হাঁটুতে খানিকটা নেকড়া জড়াইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্বয়ং বলাইচাঁদ সশরীরে তথায় উপস্থিত হইল। ধমক দিয়া হারাধন বলিল, "কোথায় গেছলি রে ব্যাটা-ছেলে! এতক্ষণ ছিলি কোথায়? কাজের সময়ে ব্যাটাকে যদি একবার দেখতে পাওয়া যায়! উল্লুক, গাধা কোথাকার—!"

বলাইচাঁদ ইঙ্গিতে জানাইল, সন্ধ্যার পর পুকুরে গা ধুইতে গিয়া পা পিছলাইয়া সে জলে পড়িয়া গিয়াছিল। পুষ্করিণীর সোপানে আঘাত লাগিয়া তাহার পায়ের হাঁটুটা কাটিয়া গিয়াছে;—শম্ভু চাকর যদি সেই সময়ে আসিয়া

না পড়িত, তাহা হইলে তাহাকে আজ সেই পুকুরের জলেই পঙ্কত্ব পাইতে হইত।

ক্রুদ্ধ হইয়া পরাণ বলিল, "ব্যাটা আমাদের ফাঁকা পরেছে; আমরা কিছু বুঝি না?" এই বলিয়া পরাণ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে বলাইয়ের একটা হাত ধরিয়া তাহাকে সজোরে এক পদাঘাত করিল। বলাই পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাতরভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া জমীদারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া জমীদারের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি পরাণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা, কি ও। ও একটা হাবা কালা গো-বেচারা মানুষ, ওকে তোমার সন্দেহ কর্‌বার কোনও কারণ নাই। দাও দাও ও-বেচারাকে ছেড়ে দাও।" এই বলিয়া তিনি বলাইকে বলিলেন, "যা যা, তোর নিজের কাজ কর্‌গে যা! আর কোনও দিন এমন সময় কোথাও যাস্ নি; জানিস্ এ সময়ে আমাদের খাবার সময়।" পরাণ জমীদারের অনুরোধে বলাইয়ের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিল, বলাইচাঁদ চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বকার্য্যে চলিয়া গেল।

হারাধন ও পরাণ নীলিমাকে আনিয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিল; তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। 'তাহার কোনও ভয়ের কারণ নাই, তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; সে এই গৃহের একমাত্র কর্ত্রী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিবে; এ গৃহ বিষয়-সম্পত্তি, হীরা-মুক্তার গহনা, সমস্তই তাহার'—এই সকল কথা নীলিমাকে বুঝাইতে তাহারা কিছু মাত্র ত্রুটি করে নাই। স্বয়ং জমীদারও তাহাকে আকর্ষণের বহুতর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু বন্দিনী নীলিমা এই সকল প্রবোধবচনে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না। বিফলমনোরথ হইয়া জমীদার চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার বন্ধুদ্বয় নীলিমাকে একটি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

এই কক্ষে আশালতা ও অমরকুমার শয়ন করিতেন। আশালতার আমলে কক্ষটি যেমন সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহার লেশমাত্র নাই। চেয়ার, টেবিল, আয়না প্রভৃতি আসবাব-পত্রগুলি অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। খাটের উপর শয্যারও সেই অবস্থা। তবে আজ নীলিমার জন্য ভৃত্য আদেশমত তাহার ধূলি ঝাড়িয়া ময়লা চাদরখানা তুলিয়া গদির উপর একখানা পরিষ্কৃত চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। নীলিমা কিন্তু সে শয্যা স্পর্শও করে নাই। যে কক্ষে যে শয্যায় বসিয়া নীলিমা আশালতার সহিত কত গল্প করিয়াছে, তাহার কাছে বসিয়া কত শিল্পকার্য্য শিখিয়াছে, আশালতা বিহনে সে কক্ষ তাহার শ্মশান-সদৃশ বোধ হইল। যাহার অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করিয়া সে নিজের গৃহ ও আত্মীয়-স্বজনের কথা বিস্মৃত হইয়া যাইত, আজ তাহার সেই স্নেহময় কাকাবাবু ও স্নেহময়ী কাকীমা কোথায়! তাঁহারা থাকিলে আজ তাহাকে দস্যু-হস্তে বন্দিনী হইয়া এই কক্ষে এমনি ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত না। নীলিমা এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। এই শত্রু-পুরী হইতে উদ্ধারের কোন উপায়

নিরূপণ করিতে না পারিয়া সে হতাশ হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে হারাধন রূপার থালায় করিয়া নানাবিধ খাদ্য এবং একটা রূপার গ্লাসে করিয়া এক গ্লাস শীতল জল লইয়া আসিয়া নীলিমাকে তাহা আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু নীলিমা কিছুতেই তাহা খাইতে সম্মত হইল না। তখন আর অধিক পীড়াপীড়ি করিয়া গোলযোগ-বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নয়, মনে করিয়া সে তাহা গৃহের এক পার্শ্বে রাখিয়া পুনর্ব্বার দ্বারে তালা লাগাইয়া প্রস্থান করিল এবং নিজেদের পান-ভোজনে রত হইল; ভাবিল, ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আপনিই খাইবে। কিন্তু নীলিমা হতভাগ্যদিগের সে-খাদ্য স্পর্শও করিল না। সে সমভাবেই গৃহতলে পড়িয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল।

পরাণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বলাইচাঁদ নীলিমার রুদ্ধ কক্ষদ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষ-মধ্যে একটা রঙ্গিন আলোকের ঝাড় জ্বলিতেছিল। তাহার উজ্জ্বল নীল আভায় কক্ষটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। দরজার ফাঁক দিয়া বলাই দেখিল, নীলিমা গৃহতলে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার কবরী-বন্ধন শিথিল হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। এই শোকাবহ দৃশ্য-দর্শনে বলাইয়ের ইচ্ছা হইতে লাগিল, একটা পদাঘাতে গৃহের কপাটটা বিচূর্ণ করিয়া এই পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীকে মুক্ত করিয়া তাহার গৃহে রাখিয়া আসে। কিন্তু এই শত্রু-পুরীর মধ্যে শত্রু-বেষ্টিত থাকিয়া একাকীর এ-কাজ সহজসাধ্য নয়, মনে করিয়া বলাই মনে মনে অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিল—"ভয় নাই!" লিখিয়া কপাটের ফাঁক দিয়া কাগজের টুকরাটুকু গৃহমধ্যে ফেলিয়া দিল। নীলিমা কপাটের পার্শ্বেই শয়ন করিয়াছিল; কাগজের টুকরাটুকু তাহার ঠিক সম্মুখেই পড়িল। সে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সেই অক্ষর-চারটি পড়িয়া তাহার কোনই মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। কে এ শত্রু-পুরী-মধ্যে 'ভয় নাই' বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দান করিতেছে? এ কি দেবতার অভয়-বাণী, না শত্রুর চাতুরীজাল? মানুষ বিপদে পতিত হইলে স্বভাবতঃ তাহার মনে কুচিন্তারই উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং নীলিমার মনেও তাহা শত্রুর চাতুরী বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। যে মুহূর্ত্তেই বলাই কাগজের টুকরাটুকু কক্ষ-মধ্যে নিঃক্ষেপ করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কালান্তক যম-সদৃশ পরাণ বলাইয়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিল, "ব্যাটা! শুয়োর, এখানে কি হচ্ছে? তালা ভাঙ্‌বার চেষ্টায় আছ বুঝি? তুমি না বড় সাধু!" এই বলিয়াই বলাইয়ের একখানা হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া পার্শ্বের ঘরে লইয়া গেল। বলাই কাতরভাবে ইঙ্গিতে জানাইল, তাহার কোনও অপরাধ নাই। ঘরের ভিতর একা মেয়েটা কি করিতেছে, তাহাই সে একবারমাত্র উঁকি দিয়া দেখিতেছিল। তাহা ভিন্ন তাহার অন্য কোনও অপরাধ নাই। পরাণ তাহার এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "জানিস ব্যাটা! তোর জীবন আমার হাতে।" তাহার পরে তাহাকে একটা

ভীষণ ধাক্কা মারিয়া সেই কক্ষ-মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গৃহদ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া তাহাতে সুদৃঢ় তালা লাগাইয়া দিল। বলাই সেই কক্ষ-মধ্যে বন্দী হইয়া রহিল।

(১৬)

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। বলাই সেই কক্ষ-মধ্যেই আবদ্ধ রহিল, কেহ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিল না কিংবা হত্যা করিতেও আসিল না। সে পলে পলে মুক্তি অথবা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে এক একবার মনে করিতে লাগিল, হয় তো স্বয়ং জমীদার আসিয়া দয়া করিয়া গৃহের কপাট খুলিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়া যাইবেন। কেন না, বলাই না হইলে ত তাঁহার একদণ্ডও চলিবে না। আবার একবার সে মনে করিতে লাগিল, পরাণের কু-পরামর্শে তিনিও নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; এখনি পরাণ আসিয়া একটা লাঠির আঘাতে কিংবা একটা গুলির ঘায় অথবা এমনিই একটা কিছুর দ্বারা তাহার জীবন-প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়া যাইবে। রাত্রির পর প্রভাত, প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন, তাহার পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর আবার রাত্রি, এইরূপ করিয়া সুদীর্ঘ ছত্রিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গিয়া আবার রাত্রি দেখা দিয়াছে। সে সেই একভাবেই সেই কক্ষমধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে; কেহ তাহাকে কিছুই খাইতেও দিয়া যায় নাই, কিছু বলিতেও আসে নাই। ক্রমশঃ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার গা মাথা যেন কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে সেই গৃহতলে হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতেও সে স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক্ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল কোথাও কোনও প্রকারে পলায়নের পথ আছে কি না, কিন্তু সে উপায় কিছুই দেখিতে পাইল না। গৃহের জানালা, কপাট সুদৃঢ়। জানালার লৌহদণ্ড-সকল সুদৃঢ় ভাবে জানালার পথ রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক গরাদেটিকে সে প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া দেখিল, কোনটা ভাঙ্গা যায় কি না; কিন্তু তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, দুই হস্তে দুইটা গরাদে ধরিয়া বাহিরের বাগানের দিকে চাহিয়া সে কত কি ভাবিতে লাগিল। অধিকক্ষণ এরূপভাবে সে দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য সে শুইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল, তাহার স্থিরতা নাই। যখন সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তখন রাত্রির গভীর অন্ধকারে ঘর পূর্ণ! হঠাৎ তাহার মনে হইল, কিসের যেন একটা খট খট শব্দ হইতেছে। প্রথমে সে তাহা গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু শব্দ যেন ক্রমশঃ আরও নিকটে, তাহার পার্শ্বে, জানালার নীচে বলিয়া অনুমিত হইল। সে একবার ভাবিল, উঠিয়া দেখে—ব্যাপারটা কি! কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই, মাথা ঘুরিতেছে। চক্ষু বুজিয়া সে শুইয়াই রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল জানালা দিয়া যেন কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া কে কি অনুসন্ধান করিতেছে। তখন সে মনে করিল, বোধ হয় চোর ঢুকিয়াছে। নচেৎ সহজ পথ পরিত্যাগ

করিয়া এ-ব্যক্তি বাগানের দিক্ হইতে জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিল কেন? আগন্তুক যখন ধীর পাদবিক্ষেপে কক্ষ-মধ্যে বিচরণ করিতেছিল, বলাই তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—"কে?" আগন্তুক ধীরে ধীরে বলিল—'চুপ!'

ব। কে তুমি? কি চাও?

আ। উঠে আসুন, বল্‌চি!

বলাই চম্‌কিয়া উঠিল, স্বর যেন তাহার পরিচিত বলিয়া মনে হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আগন্তুকের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ভালরূপে দেখিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। আগন্তুক পূর্ব্ববৎ অতিধীরে ধীরে বলিল, "শীগ্‌গির শীগ্‌গির, আর দেরি নয়! জানালার নীচে মই লাগানো, আপনি আগে নেমে যান, তার পরে আমি যাচ্ছি।"

বলাই আর কিছু বলিল না, স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির মত বিনা-বাক্যব্যয়ে ক্ষিপ্রগতিতে বাতায়ন পথ দিয়া মই বহিয়া পলায়ন করিল। অভুক্ত ক্লান্তদেহে সে কোথা হইতে যেন অসুরের বল পাইল। নীচে নামিয়া একবার তাহার নীলিমার কথা মনে হইল। এমন সময় আগন্তুক তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বলিল, "কি এখনও দাঁড়িয়ে কেন?" বলাই বলিল, "নীলিমা—"

বাধা দিয়া আগন্তুক বলিল, "সে ভার আমার!" বলিয়াই হস্তোত্তোলন করিয়া সে কি ইঙ্গিত করিল। আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে বলাই চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনিই কি কাল রাত্রিতে আমাকে সাবধান করে দিলে-

আগন্তুক বলিলেন, "সে পরিচয় দিবার এখন সময় নয়।"

তখন কৃষ্ণা নবমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোক গাছের ফাঁক দিয়া উঁকি দিতেছিল। বলাই-চাঁদ আর কিছু না বলিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক পলায়ন করিল। এদিকে আগন্তুক পূর্ব্ব উপায় অবলম্বনে নীলিমার গৃহের জানালার নীচে মই লাগাইয়া জানালার কাঠ কাটিয়া গোটা-দুই গরাদে সরাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছিল। নীলিমার চক্ষেও ঘুম ছিল না। আগন্তুক এতক্ষণ এত সন্তর্পণে চোরের মত যে সিঁধ কাটিতেছিল, নীলিমা তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। হঠাৎ ঘরের ভিতর মানুষ দেখিয়া ভয়ে সে একেবারে কেমন হইয়া পড়িল। যদিও আগন্তুকের আকৃতিতে দস্যুর কোনও চিহ্ন বিদ্যমান ছিল না, তবুও নীলিমা তাহাকে দস্যু বলিয়াই অনুমান করিয়া লইল।

আগন্তুক বলিল, "ভয় কোর না, আমার সঙ্গে এস! আমি শত্রুপক্ষের লোক নই। আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

নীলিমা কোনও উত্তর করিল না, সেই-ভাবেই বসিয়া রহিল। তাহাকে এইরূপভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আগন্তুক ব্যস্তভাবে বলিল, "শীগ্‌গির এস, আর দেরী করবার সময় নাই।" তথাপি নীলিমাকে নীরব ও সন্দিগ্ধচিত্ত দেখিয়া আগন্তুক বলিল, "বিশ্বাস কর, নীলিমা! আমি তোমার শত্রু নই। যদি তুমি এতে দেরী কর, তাহলে আর হয় তো তোমাকে উদ্ধার করতে পারব না। সে মা

অমনি সশব্দে গৃহের কপাট খুলিয়া গেল। পরাণ কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া রূঢ়স্বরে বলিল, "বলা ব্যাটা! সিঁধ কেটে পালিয়ে এসেছ বুঝি? ব্যাটা, চোরের উপর বাটপাড়ী!" তাহার পর আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "না ত বলা নয়! কে তুই?" তাহার পর নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোরস্বরে বলিল—"কে ও?"

নীলিমা তখন ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; পরাণচন্দ্রের কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। পুনর্ব্বার পরাণ ঐ প্রশ্ন করিল। তখন ভয়ে ভয়ে জড়িতস্বরে নীলিমা বলিল, 'জানি না'! পরাণ পূর্ব্ববৎ কর্কশস্বরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কে হয় ও তোমার?" নীলিমা তেমনি ভাবে উত্তর করিল—"কেউ নয়!"

মুখ ফিরাইয়া পরাণচন্দ্র চাহিয়া দেখিল আগন্তুক পলায়নপর। তখন সে ক্রোধে নিষ্ফল গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং নীলিমাকে অন্য কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। নীলিমা নির্জ্জীব যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এমন সময়ে স্বয়ং জমীদার সুরাদেবীর প্রসাদে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া টলিতে টলিতে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরাণ নীলিমাকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি ক্রোধে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, "পাজী, বুড়ো বয়েসে এখনও এত লোভ? আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে এসেছ? এত বড় স্পর্দ্ধা!"

উত্তেজিত ভাবে পরাণ বলিল, "কা'কে কি বল, তার হিসেব নেই? মুখ সাম্‌লে কথা কও?"

জমীদার তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ইঃস্‌! ভয় দেখানো হচ্ছে! তোর বাবার বিষয় নাকি?"

তবুও পরাণ ক্রোধ দমন করিয়া ধীরভাবে বলিল, "বেতর খেয়েছ, এখন তোমার মাথা ঠাণ্ডা নেই, তাই ক্ষমা কচ্চি! কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, চটিও না আমায়, আমি তোমার ভাল করতেই যাচ্ছি।" এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সে সমস্ত বর্ণনা করিল। চুরমাতাল জমীদার-মহোদয়ের তখন সে সকল কথা কর্ণগোচর হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। তিনি পরাণের কথার কোনও উত্তর না, দিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, "ভাগো হিঁয়াসে! জলদি ভাগো! উল্লুক কাঁহাকা!"

পরাণ আর সহ্য করিতে পারিল না। অদম্য ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া পরাণ বলিল, "বটে! ভারি তেজ হয়েছে দেখ্‌তে পাই যে! যত কিছু বল্‌ছি না বলে বুঝি? জানিস তোর এতেজ এখুনি বার করে দিতে পারি! ভাল চাস তো, এখনও সরে যা বলছি; নইলে তোর হাড়ীর হাল করে, তবে ছাড়ব, তা জানিস্‌! আমাকে অপমান করলে তোর ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া জমীদার বলিলেন, "ও! ব্যাটা আমার লাট সাহেব হয়েছেন দেখ্‌তে পাই! আমাকে চোখ রাঙানো হচ্ছে! আমি যেন ওঁর বিষয় খাচ্ছি আর কি!"

প। কে কার ...... বিষয় খাওয়ায় দেখিয়ে দিচ্ছি!

জমীদার "রাম সিং, রাম সিং! তেওয়ারি, জলদি ইসকো কান ধরকে পাকাড়কে নেকাল দে'ও", বলিয়া হাঁক দিলেন। অদম্য ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে পরাণ বলিল, "কে কা'কে নেকাল দেয় দেখাচ্ছি!" সুরাপানাসক্ত উন্মত্ত জমীদার পরাণকে তখন এক ভীষণ পদাঘাত করিলেন। পদাহত পরাণ ক্রুদ্ধ কৃষ্ণসর্পের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এর শোধ তুলব, তবে জল গ্রহণ করব।" বলিয়াই সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে ব্যস্তভাবে হারাধন আসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে। জানলা ভেঙে বলাই পালিয়েছে। নিশ্চয় সে কোন কু-মতলবেই গেছে।" তখন বোধ হয়, জমীদারম-হাশয়ের নেশা কিঞ্চিৎ ছুটিয়া গিয়াছিল; তিনি স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "অঁ্যা!" হারাধন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, গৃহের জানালা ভাঙিয়া বলাই পলায়ন করিয়াছে এবং ঐ রকম জানালা ভাজিয়া নীলিমাকে লইয়া পলাইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন সময় দৈবক্রমে পরাণ আসিয়া পড়াতে নীলিমাকে কেহ লইয়া যাইতে পারে নাই; কিন্তু শত্রু পিছু লাগিয়াছে।

জমীদারবাবুর সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। হারাধন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "তুমি ভেব না, আমি এখুনি এমন একটা ব্যবস্থা কচ্চি যে রাধা-গোবিন্দ আর তোমার কোনও অনিষ্ট কর্ত্তে পারবে না। তা'কে হাত কর্ত্তে পারলে, আর কোন ভাবনা থাক্‌বে না।" বলিয়াই সে সে-স্থান হইতে দ্রুত চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই হারাধন পুরোহিত-ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল এবং বলিল, "ঠাকুর এই রাত্রেই বাবুর বিয়ে দিয়ে দাও, আমাদের সমস্ত উদ্যুক্ত হয়ে আছে।" পুরোহিত-ঠাকুর বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে হারাধনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ এক্ষুনি কেমন করে বিয়ে হতে পারে?"

হা। কেন পারে না?

পু। আজ তো বিয়ের লগ্ন নেই।

হা। আরে তা নাই থাক্‌লো, তুমি লগ্ন দেখে ঠিক করে নাও না।

পুরোহিতঠাকুর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাও কি হয়? পাঁজিতে লগ্ন নেই যে!"

উত্তেজিতভাবে হারাধন বলিল, "আরে রেখে দাও ঠাকুর, তোমার পাঁজি-পুঁথি। তোমরা নিজেরাই ত পাঁজি-পুঁথি, ঠাকুর। এই যে কোন কোন খানে দেখ্‌তে পাই, আশ্বিন মাসে বিয়ে হয়! সে বিয়ে হয় কি করে? তোমরাই তো তার বিধান দাও। আবার তোমরাই বলে থাক, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিয়ে নেই। নাও ঠাকুর, শীগ্‌গির ক'রে দিয়ে ফেল, আমি ততক্ষণ এ-দিকে সব গোছ-গাছ করে ফেলি। দক্ষিণা ডবল পাবে, না হয়, আরও কিছু বেশী দেওয়া যাবে।"

পুরোহিতঠাকুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা অমুক শাস্ত্রেতে আছে বটে, অরক্ষণীয়া কন্যা-সম্বন্ধে আলাদা ব্যবস্থা চলে। তা এও যখন আজ বিয়ে না হ'লে নয়, সুতরাং তখন অরক্ষণীয়াই ধর্ত্তে হবে।" বলিয়া তিনি একটা তাঁহার কল্পিত শ্লোক আওড়াইলেন।

হারাধন বিবাহের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল। দালানে পীড়ি পাতিয়া, ফুল-চন্দন, সিন্দূর, ঘৃত, অগ্নি, খই প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্তই আসিয়াছিল। জমীদার টোপর মাথায় দিয়া লাল চেলী পরিধান করিয়া বর সাজিয়া পীড়ির উপরে বসিলেন। এইবার নীলিমার পালা। উপর্য্যুপরি এতক্ষণ যে ব্যাপার তাহার চক্ষের সম্মুখে ঘটিল, সেই ঘাত-প্রতিঘাতে ভয়ে সে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। এই বার তাহাকে বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করা হইলে সে কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইল না, কাঁদিয়া কাটিয়া মহা অনর্থ বাধাইয়া তুলিল। এদিকে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, তৃতীয় প্রহরও যায় যায়। বিবাহের জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন বাটীর একজন দাসী আসিয়া বহুকষ্টে নীলিমার বস্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে আনিয়া শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া বরের পার্শ্বে পীড়ির উপর বসাইয়া দিল। পুরোহিত-ঠাকুর মন্ত্র উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইতেছেন, অকস্মাৎ তাঁহার জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইল, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তাঁহার মুখে এক প্রকার অস্বাভাবিক রূপ ফুটিয়া উঠিল। তিনি আঁ আঁ করিতে করিতে বিকট-শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কারণ, যে সময়ে তিনি আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়া দক্ষিণার বহরটা স্মরণ করিয়া মনে মনে খুব আহ্লাদিত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় সাক্ষাৎ শমন-সদৃশ ডিটেক্টিভ বিজনকুমার সানুচর তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! সকলে স্তম্ভিত! বিজনকুমার সহাস্যে জমীদার-মহোদয়কে বলিলেন, "আপনার এই শুভ বিবাহের দিনে কিঞ্চিৎ উপহার এনেছি, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করে অধীনকে বাধিত করুন।" এই বলিয়াই তিনি তাঁহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দুইজন কনষ্টেবলের হাতে তাঁহার রক্ষার ভার দিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার অনুচরগণ হারাধনকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। বিজনবাবু তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি আমাদের জামাইবাবুর বন্ধু, সুতরাং আপনাকেও আমরা প্রীতিউপহার দান করতে কুণ্ঠিত হ'ব না।" ইহার পরই তিনি অঙ্গুলি-দ্বারা পুরোহিতকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে ভট্টাচার্য্য-ম'শাই বাদ পড়েন কেন? এঁকেও বঞ্চিত করা হবে না।" তিনি আঁ আঁ শব্দে চীৎকার করিতে করিতে অনেক কষ্টে বলিলেন, "আমি আমি পুরুত, আমাকে কেন! আমাকে বাঁধ্‌চ কেন? আমি পুরুত, নির্দ্দোষ; আমি পু .পু পুরুত।" আর তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

যথাকালে বিচার-আরম্ভ হইল। বিচারে অদ্ভুত রহস্য-সকল প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিজনকুমারের পরামর্শে পরাণ সরকারী সাক্ষী হইয়া তাহাদের সমস্ত কথা প্রকাশিত করিয়াছিল। উপেন্দ্রবাবুর পুত্ররূপী ব্যক্তিটি বরিশাল-জেলার একজন বিখ্যাত দস্যু এবং সে ও হারাণ-নামধারী ব্যক্তি তাহার অনুচর। খুন, ডাকাতি প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধের জন্য ইঁহাদের সকলের নামেই বহুতর ওয়ারেন্ট্‌ আছে। কিন্তু পুলিশ ইহাদিগকে এতদিন ধরিতে পারে নাই। পরাণের সাক্ষ্যে ইহাও জানা গেল যে, তাহারাই উপেন্দ্রকিশোরবাবুর বৃদ্ধ ভৃত্য

শঙ্করের হত্যাকারী ; এবং উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর পুত্র জীবিত, কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট ! বিচারে সকলে যথাযোগ্য দণ্ড লাভ করিল ! একমাত্র পরাণ সরকারী সাক্ষী হওয়ায় সে নিষ্কৃতি পাইল। পুনর্ব্বার উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের উদ্দেশ্যের ভার বিজন-কুমারবাবুর হস্তে অর্পিত হইল।

(১৭)

এই বিরাট ব্যাপারের বিচার শেষ হইয়া যাইবার পরে গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া বিজন-কুমারকে কয়েক হাজার টাকা ও একটা রিভল্‌ভার পুরস্কার দিলেন এবং তাঁহার পদোন্নতি ও বেতন-বৃদ্ধিও করিয়া দিলেন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্থানান্তরে বদ্‌লিও করিয়া দিলেন। এখান হইতে বদ্‌লি হওয়াতে বিজনকুমার কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। অনেকদিন তিনি এখানে কাজ করিতেছিলেন, এখানকার প্রত্যেক লোকটী, প্রত্যেক স্থানটি তাঁহার পরিচিত এবং প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কি করিবেন !—পরের চাকুরী তাঁহার ইচ্ছা-সাপেক্ষ নয় !

একদিন সন্ধ্যার পরে বিজনকুমার রাধা-গোবিন্দবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন ; ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তখনও রাধাগোবিন্দবাবুর সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ হয় নাই। তাঁহার অপেক্ষায় বিজনকুমার তাঁহার দ্বিতলের বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া রহিলেন। তিনি অন্যমনস্কভাবে একখানা মাসিক-পত্রিকা লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছিলেন, এমন সময় দরজার পার্শ্বে ঝুন্ ঝুন্ করিয়া হাত চুড়ীর মৃদু শব্দ উত্থিত হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, নীলিমা ! চাহিবামাত্র চক্ষে চক্ষ সংমিলিত হওয়ায় নীলিমার অন্তরটা যেন কেমন পুলক-প্রবাহে নাচিয়া উঠিল। তাহার শরীরের সমস্ত রক্তটা যেন মুখের উপর আসিয়া জমাট বাঁধিয়া গেল। বিজনকুমারও নীলিমার সহিত এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ-কারে যেন কেমন হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ করিয়া প্রস্থানোদ্যতা নীলিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি নীলিমা ! আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না ?"

লজ্জিত হইয়া নীলিমা বলিল—"না, তা নয়, আমি মনে করেছিলুম দাদাবাবু এসেছেন, তাই।"

মৃদু হাসিয়া বিজনবাবু বলিলেন, "আর তাই বুঝি, তিনি নাই দেখে পালিয়ে যাচ্ছিলে ! আর একটী অতিথি যে তোমার ঘরে বসে আছে, সেটা বুঝি লক্ষ্য কর নি ?"

নীলিমা লজ্জায় মুখ নত করিল ; কোন উত্তর করিল না। বিজনকুমার বলিলেন, "আমাকে এখান থেকে বদলী করে দিয়েছে ! আমি যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।" ক্ষুব্ধ হইয়া নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আস্‌বেন ?" বিজনকুমার বলিলেন, "আর এখানে কি করতে আস্‌ব ? আমার এখানকার কাজ যে ফুরিয়ে গেল ! আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না !"

ইতোমধ্যে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া রাধা-গোবিন্দবাবু তথায় আসিলেন এবং বিজন-কুমারকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিভরে বলিলেন, "বাঃ, এই যে বিজনবাবু ! আমার পরম সৌভাগ্য !"

বিজনকুমার সহাস্যে বলিলেন, "ঐ বাবু-শব্দটা ছেড়ে দিয়ে শুধু বিজন শব্দটাই ব্যবহার কর্‌বেন্; ঐটেই আপনার মুখে শুনতে মিষ্টি লাগে।"

হাসিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, তাই হবে, তাই হবে। ভগবান্ যদি দিন দেন!"

বিজনকুমার বলিলেন, "আমাকে যে এখান থেকে বদলি করে দিয়েছে!—শুনেছেন কি?"

রা। কই না!

বি। গভর্ণমেণ্ট আমার পদোন্নতি আর বেতন-বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

সন্তুষ্ট হইয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "বেশ! বেশ! যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পুরস্কারই দিয়েছেন।"

বি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদলীও করে দিয়েছেন। আপনাদের ছেড়ে যেতে হবে, মনটা তাই উঠ্‌ছে না। আপনার কাছে বিদায় নিতেই এসেছি।

রাধাগোবিন্দবাবু অতিস্নেহ-কোমল-স্বরে বলিলেন, "বিদায়" কথাটা বোল না ভাই। তবে কাজের জন্যে যাচ্ছ, দু'দিন ঘুরে এস গে! আমরা তোমাকে ছাড়্‌তে পারব না। আবার তোমাকে আস্‌তেই হবে।"

তাঁহার কথার প্রকৃত অর্থ-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া বিজনবাবু কিছু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "তা তো নিশ্চয়! আপনাদের মায়া কি আর এ জীবনে ভুলতে পারব!"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "আমিও মনে কচ্ছি, অমরের কাছে একবার সীতাকুণ্ডুতে যাব। অনেক দিন তাকে দেখি নি। তা ছাড়া এখন এ-বিষয়-রক্ষার ভার যে তারই! যতক্ষণ না উপেন্দ্রবাবুর প্রকৃত পুত্রকে পাওয়া যায়—।"

বিজনকুমার বলিলেন, "তা তো বটেই। আমিও সংকল্প করেছি, অমরবাবুর বাপের সন্ধান আর উপেন্দ্রবাবুর ছেলের সন্ধানটা নিয়ে তবে অন্য কাজে হাত দোব।"

সন্তুষ্ট হইয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "উত্তম! তুমি যে কাজে হাত দেবে, নিশ্চয় সে কাজ সফল হবে। তোমার উপর বিধাতার অপার করুণা। নইলে এতদিন কেউ যা পারে নি, তুমি সেই শঙ্করের হত্যাকারীকে খুঁজে বার কর্‌লে! সোজা কথা নয়!"

এই সময় নীলিমা এক রেকাবি জল-খাবার ও এক গ্লাস জল আনিয়া বিজনকুমারের সম্মুখে স্থাপন করিল। বিজন কুমার একবার নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; নীলিমা সলজ্জভাবে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। রাধাগোবিন্দবাবু স্নেহ-কোমলস্বরে বলিলেন, "নাও ভাই একটু মিষ্টি মুখ কর। খাবারগুলো তোমার ঠাকুরমা নিজে তৈরী করেছেন!"

সহাস্যে বিজনকুমার বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ তাই না-কি!" বলিয়াই তিনি সুবোধ বালকের মতন সেই মিষ্টি হাতের' 'মিষ্টিগুলির সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তবে যিনি মিষ্টি তৈয়ারি করিয়াছিলেন, তাঁহার যে তাহা আনিয়াছিল, তাহার হাতটাই বিজনকুমারের নিকট অধিক মিষ্ট হওয়া সম্ভব। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

মিলন-ক্ষণ।

নবোঢ়া কিশোরী যথা দিবসের কর্ম্ম-কোলাহলে
পতি হ'তে রহে দূরে, কখন যদি বা কোন ছলে
হেরিতে দেখিতে পায়, ত্রস্ত-করে গুণ্ঠনে আবরি'
ব্রীড়া-নম্র স্মিতানন, সচকিতে দূরে যায় সরি',
কহে না একটী কথা, যেন তার নাহি পরিচয়
জীবন-দেবতা সাথে। পুনঃ সে যে নিশীথ-
সময়
সর্ব্ব-কর্ম্ম-অবসানে সুনীরব নিভৃত নির্জ্জনে
সকল সঙ্কোচ ত্যজি' প্রাণেশের গাঢ় আলিঙ্গনে
আপনা হারায়ে ফেলে। সেই মত হে প্রিয়
আমার,
সারাদিন নানা কাজে মগ্ন হ'য়ে রহি অনিবার,
তোমা হ'তে কত দূরে আত্মহারা ঘুরিয়া
বেড়াই,
চাহি না জানি না তোমা তার পর যবে
চারি ঠাঁই
অন্ধকারে ঘিরে আসে, হ'য়ে যায় নিস্তব্ধ
নিশ্চল
বাহিরের হট্টগোল—সাগরের তরঙ্গ উচ্ছল
অশ্রান্ত দিগন্তব্যাপী, মৃদুপদে কম্পিত হিয়ায়
তব কাছে আসি নাথ! মুহূর্ত্তেকে জীবন
জুড়ায়
ও নিবিড় ভুজ-পাশে। কোন বাধা-
ব্যবধান আর
নাহি রহে, নাহি রহে বলিবার কিছুই আমার,
সর্ব্বস্ব বিলায়ে মোর ও-রাতুল চরণ-কমলে
নির্ব্বাক্‌ আনন্দে দেব, ভাসি বুঝি
পূতঅশ্রু-জলে
তব বুকে রাখি মুখ। মনে হয় এ মিলন-ক্ষণ
কত জন্মজন্মান্তের কত তীব্র সাধনার ধন!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা।

বহু প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই মনে চিন্তার উদয় হইয়াছে। এই বিষয়ে কত আলোচনা কত গবেষণা, কত পরীক্ষা, কত নূতন নূতন প্রস্তাবের সূত্রপাত হইয়াছে এবং প্রত্যেকেরই কত শত অনুকূল ও প্রতিকূল তীব্র সমালোচনা দেখা গিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, মানব এ বিষয়ে যে তিমিরে ছিল, সে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। এ-বিষয়ের সর্ব্ববাদিসম্মত সমাধান করিতে মানব-বুদ্ধি পরাস্ত হইয়াছে। এই বিষয়-সমাধানের মূল-সূত্রটীকে যে মানব কখন কখন ধরিতে না পারিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিতে পারিয়াই মানুষ পুনঃ পুনঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছে।

আমাদের দেশীয় কবি যে গাহিয়াছিলেন—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

ইহা অতিসত্য কথা। দেহের এক অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া থাকিলে অন্য অঙ্গের কি স্বচ্ছন্দে ও সুচারুরূপে কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না, সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়? দেহের ন্যায় মানব-সমাজের এক অঙ্গ পুরুষ ও অপর অঙ্গ নারী। পুরুষ বিদ্যায়, জ্ঞানে, শক্তিতে, স্বাধীনতায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, আর নারী অজ্ঞানতার অন্ধকারে, দুর্ব্বল, পরমুখাপেক্ষিণী, অশিক্ষিতা অবস্থায় পঙ্গু হইয়া পড়িয়া থাকিল! ইহাতে কি জাতীয় জীবনের কিংবা সমাজদেহের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে? কথনই নহে। ইহা আপামর সকলেই বুঝিতে পারে। এই কারণেই অধুনা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা-ও স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ে এত চিন্তা ও এত আলোচনা।

স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে নানা জনের নানা প্রকার মত। কেহ বলেন—(১) স্ত্রী এবং পুরুষের শিক্ষা একইরূপ হওয়া উচিত। কারণ, স্ত্রী এবং পুরুষের শিক্ষা একরূপ না হইলে, পুরুষ এবং নারীর চিন্তা, কার্য্য ও শক্তি কখনই একত্র মিলিত হইয়া দেশ এবং সমাজের সেবা করিতে পারে না—জগতের উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে না। নারীকে যদি পুরুষের সহযোগিনীরূপে কার্য্য-ক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে উভয়ের চিন্তার ধারা যাহাতে একই দিকে প্রধাবিত হয়, উভয়ের শক্তি যাহাতে একই কার্য্যের জন্য নিয়োজিত হয়, উভয়ের আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ যাহাতে একই দিকে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

(২) আবার কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী এবং পুরুষের শিক্ষা একইরূপ হওয়া কখনই যুক্তি-সিদ্ধ নয়। পুরুষের এবং নারীর প্রকৃতি ও শারীরিক গঠন যখন ভিন্ন, উহাদের উভয়ের কার্য্যক্ষেত্রও যখন পৃথক্, তখন উভয়ের শিক্ষাও ভিন্নরূপ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কোমলপ্রকৃতি নারীদিগকে কঠোর-প্রকৃতি পুরুষের সমকক্ষ করিয়া একইরূপ শিক্ষা দিলে সমাজ ও সংসারে মহা অকল্যাণ ঘটিবে; বঙ্গের শান্তিময় গৃহে আর গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তি দেখা যাইবে না; তৎপরিবর্ত্তে বিলাতের "সফবিজেটের" প্রাদুর্ভাব ঘটিবে। নারীর কার্য্যক্ষেত্র তাহার নিজ-গৃহের অন্তঃপুরে, পতি, পুত্র, পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ-বিধানের মধ্যেই, সেবার মধ্যেই, শৃঙ্খলা-সাধনের মধ্যেই আবদ্ধ। নারীর এই যে কার্য্যক্ষেত্র, এই কার্য্যক্ষেত্রের জন্য তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করাই মহাকল্যাণজনক। অন্য শিক্ষা তাহার মহা অনিষ্টকর।

(৩) আর এক দল বলেন, নারীকে কেবল তাহার নিজগৃহ-পরিজনের সুখ-শৃঙ্খলা-সাধনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে ও সেইরূপ শিক্ষা দিলে কিংবা পুরুষের কার্য্য, চিন্তা ও শক্তির পরিপুষ্টির সুবিধার জন্য তাহাদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে ও সেই শিক্ষালাভে তাহাদিগকে সহায়তা করিলে কখনই নারীদিগের প্রতি সুবিচার করা হয় না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পুরুষ তাহার নিজের স্বার্থের দিকে চাহিয়াই নারীকে তাহার প্রকৃত অবস্থায় পৌছাইতে দেয় নাই। নারীকে পুরুষ তাহার ক্রীড়ার পুত্তলিকা ও সুখ-স্বার্থ-সিদ্ধির যন্ত্ররূপেই

এতদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছে, এখনও যদি তাহাদের এই অবস্থাতেই রাখা হয়, তাহা হইলে এ জাতির বিনাশ অনিবার্য্য।

এই কারণে ইউরোপের কোন কোন প্রদেশের নারীগণ আজীবন পুরুষের এই স্বার্থের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পবিত্র পরিণয়-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার মূলোচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

নারী পুরুষের ন্যায় ভগবানেরই সৃষ্টি, তাহারও বুদ্ধি আছে, স্মৃতিশক্তি আছে, জ্ঞান-পিপাসা আছে, বিবেকবুদ্ধি আছে, ন্যায়-অন্যায়-বিচারের ক্ষমতা আছে, সর্ব্ববিষয়ে শৃঙ্খলা-সাধন ও কর্ম্মপরিচালনের দক্ষতা আছে। সৌন্দর্য্য ও শান্তির রসাস্বাদন করিবার শক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীরই প্রবল এবং গুণ ও গুণীর আদরের স্থান নারী-হৃদয়েই সমধিক। পুরুষের ন্যায় নারীরও সকল ইন্দ্রিয় সতেজ ও সজাগ। যে-সকল গুণ, যে-সকল উচ্চশক্তি, যে-সকল ইন্দ্রিয় ও নিপুণতার জন্য পুরুষ জগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে, নারীও সেই সকল গুণরাজী ও সেই সকল উন্নত শক্তিনিচয়ের দ্বারা বিভূষিতা। সুতরাং, এই সমগুণান্বিতা নারীদিগকে ত জগতের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিবার সুযোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নারীর শিক্ষা, জ্ঞান ও কার্য্যক্ষেত্র কখনই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে। নারীর চিন্তা ও শক্তি-সকল ক্ষুদ্রতার গণ্ডি এড়াইয়া যাহাতে অবাধে অসীম অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ধাবিত হইতে পারে, নারীর জ্ঞানপিপাসা যাহাতে ক্ষুদ্র পুঁথির মধ্য হইতে জগতের কার্য্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে—সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া চরিতার্থ হইতে পারে, নারীর কার্য্যক্ষেত্র নিজ গৃহ-পরিবারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাহাতে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইতে পারে, এইরূপ শিক্ষার আলোকই নারীর প্রাণে দিতে হইবে। সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া নারী যাহাতে উদার মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইতে পারে, ভাবে, চিন্তায় ও কার্য্যে যাহাতে মহিমময়ী হইয়া সে নিজের গন্তব্য পথ, নিজের স্থান নিজেই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বাধীনতার পথই তাহাদের নিকট খুলিয়া দিতে হইবে, এমনই জ্ঞানালোক তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে এই যে মন্তব্য ও আলোচনা, ইহা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কোনও অকাট্য সিদ্ধান্তে কেহই উপনীত হইতে পারেন নাই এবং কেহ যে কখনও পারিবেন সেরূপ বিশ্বাসও আমার নাই। মানুষের প্রকৃতি এবং রুচি যখন বিভিন্ন, তখন শিক্ষা-সম্বন্ধে মতও কখনই এক হইবে না বা হইতে পারে না। তবে স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়া শিখানর বিষয়ে যেমন বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত-ব্যক্তিমাত্রেরই অল্পাধিক পরিমাণে মত ও সহানুভূতি আছে, তেমনি আর একটী বিষয়েও বোধ হয়, জ্ঞানিমাত্রেই একমত হইবেন। সে বিষয় এই যে, নারীজীবনে ধর্ম্মভাবের প্রকৃত উন্মেষের চেষ্টা করা ও তাহাদিগকে অধ্যাত্মজ্ঞান-বিষয়ে উন্নত করা। এই উভয়বিধ ব্যবস্থার দ্বারাই আমার মনে হয়, পুরুষ নারীর মধ্যে নারী-জীবনে যাহা দেখিতে ও পাইতে চাহিতেছেন, তাহা লাভ করিবেন।

মানুষের মধ্যে বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি যে গুণ এবং দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে শক্তি রহিয়াছে, এইগুলিকে সৎশিক্ষা ও সাধন-দ্বারা যথার্থ ভাবে ও যথোপযুক্তরূপে ফুটাইয়া বিকশিত করিয়া তোলাই ধর্ম্ম। ইউরোপীয় সভ্যতার আলোক এই ভূ-ভারতের অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্ব্বে গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্য দিয়া এদেশের নারীদিগকে শৈশব হইতেই ব্রত, নিয়ম, পূজা, ভগবদ্-অর্চ্চনা দ্বারা ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া হইত। এই যে ব্রত, নিয়ম, পূজা, অর্চ্চনার বিধি, ইহার পালনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর হৃদয়ে সংযম, নিষ্ঠা ও ভক্তির উদয় হইত এবং সংযম, নিষ্ঠা ও ভক্তি হইতেই প্রাণে শক্তির সঞ্চার এবং দয়া ও প্রেমের বিকাশ হইত। তাই আমরা সে-নারীদের মধ্যে পদ্মিনীকে দেখিতে পাই, রমাবাইকে দেখিতে পাই।

সংযমী হইয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে ভগবদ্-অর্চ্চনায় যখন মানুষের মন প্রবৃত্ত হয়, তখনই মানুষ ঐহিক লালসা পরিত্যাগ করিয়া দেশের ও দশের জন্য আত্মপ্রাণ বলি দিতে পারে, তখনই মানব-হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখনই মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মের জন্য সকল নিন্দা, সকল অপমান, সকল সুখ, পুত্র, আত্মীয় প্রভৃতি প্রিয়-জনকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনই ধন-ঐশ্বর্য্যের মোহকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনাকে মানুষ মানুষ বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ হয়; তখনই বলিতে সমর্থ হয়—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম,
তেনাহং কিং কুর্য্যাম্।" অর্থাৎ

"যাহা লইয়া আমি অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব?"—এ-কথা মানুষের মন কতদূর উচ্চে উঠিলে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের বিকাশ কতদূর হইলে তবে মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে পারে? এই জন্যই আমরা আজ ঋষিপত্নী গার্গীর মুখে এই বাক্যের সন্ধান পেয়েছি। নারীর মুখ হইতেই সর্ব্বপ্রথম আমরা এই বাক্য বহির্গত হইয়াছে, দেখিতে পাই। তখনকার শিক্ষা নারীকে কতদূর উচ্চ-জ্ঞানের মধ্যে লইয়া গিয়াছিল, ইহা তাহারই একটী দৃষ্টান্তমাত্র। ভগবদ্‌জ্ঞানের, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের সাধনার দ্বারা মানুষ কতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, তাহা দেখান যাইল। সে যুগ সেই প্রাচীনকালের ঋষিদিগের অধ্যাত্মজ্ঞান-সাধনার যুগ। বর্ত্তমান যুগ আমাদিগের জড়-বিজ্ঞান-সাধনার যুগ। এখন দেহতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হইতেছে। পাশ্চাত্ত্য জাতি এই জড় সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইতেছেন, তাহা এখন সকলেই দেখিতেছেন ও জানিতেছেন, সে বিষয় বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন দেখি না।

এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হইতেছে বর্ত্তমানে নারীর শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? যে শিক্ষার একদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা-পদবাচ্য হইতে পারে না। অতএব আমাদের আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বর্ত্তমান-সময়ের উপযোগী পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা এবং পূর্ব্বকালের অধ্যাত্ম-জ্ঞানলাভের ব্যবস্থার একত্র সমাবেশ করিতে হইবে। কেবল জড়বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া কি করিবে, যদি অধ্যাত্ম-জ্ঞান না জন্মে! জড়তত্ত্ব আলো-

চনা করিতে যাইলে, আমরা দেখিতে পাই, কত আশ্চর্য্য ব্যাপার ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে! একটী ফুলের সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যখন আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন তাহার জন্ম হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত কি অপূর্ব্ব ব্যাপারসমষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, দেখিতে পাই! ফুলটীর উৎপত্তি কিরূপে হইল! কোথা হইতে কোন্ মধুমক্ষিকা বা বায়ুপ্রবাহ পরাগ আনিয়া দিয়া তাহার জন্মের সাহায্য করিল, রূপের ও বিকাশের সাহায্যের জন্য সূর্য্য, জল, বায়ু আশ্চর্য্য-কৌশলে তাহার পুষ্টি সাধন করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল; শেষে সেই পুষ্পটী ধীরে ধীরে পৃথিবীর অঙ্কে ঝরিয়া পড়িল।

এই যেমন একটী ফুলের আলোচনা করিতে যাইয়া জড়রাজ্যের নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হইল, তেমনি ইহার সহিত যদি অধ্যাত্ম জ্ঞানের যোগ হয়, তাহা হইলে মানুষ ঈশ্বরের শৃঙ্খলার বিষয় উপলব্ধি করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারে; নতুবা সে এই বাহ্য জগৎ লইয়াই থাকিবে। এই জড়দেহের অবসানে, জড়তত্ত্বালোচনার পর কোথায় তাহার গতি হইবে, সে তাহা ধারণাও করিতে পারিবে না। তখন—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিমকুর্য্যাম্'—পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে হইবে এবং ভোগলালসায় ও স্বার্থচিন্তায় মানব মগ্ন হইয়া জগতের মহা অনিষ্ট সাধন করিবে। ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান য়ুরোপের পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে।

জড় ও অধ্যাত্মজ্ঞান-শিক্ষাই পূর্ণ শিক্ষা। প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে যে শিক্ষার স্রোত বহিয়া গিয়াছে ও বহিতেছে, তাহাই একীভূত করিয়া আমাদের শিক্ষার আদর্শকে দাঁড় করাইতে হইবে এবং এই আদর্শদ্বারাই জগতের মহা কল্যাণ হইবে। এই শিক্ষার দ্বারাই নারী প্রকৃত স্বাধীনতা ও উচ্চজ্ঞান লাভ করিয়া মনে, চিন্তায়, জীবনে মহতী হইয়া সকল মহত্ত্ব লাভ করিবে। নারী যখন এই মহত্ত্বের অধিকারিণী হইবে, তখনই সে জাতীয় কল্যাণের জন্য, সমাজের জন্য, গৃহ পরিবারের কল্যাণের জন্য মুক্তহৃদয়ে নিঃস্বার্থভাবে পুরুষের পার্শ্বে নির্ভয়ে দাঁড়াইতে পারিবে এবং চিন্তায়, শক্তিতে, কার্য্যেতে, বুদ্ধিতে তাহাকে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে চিরোন্নতির পথে লইয়া যাইতে এবং নিজেদের স্থান নিজেরা অধিকার করিয়া জগতে মহাশান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীমতী ——

লীনার শিক্ষা

(১০)

তীব্র মানসিক পীড়নের ভিতর দিয়া অর্দ্ধ নিদ্রা ও অর্দ্ধ জাগরণ ক্লান্তিতে সারা রাত কাটাইয়া ভোরের দিকে লীনা বেশ গভীর শান্তিতেই গাঢ় নিদ্রার স্পর্শে সব ভুলিয়া আত্মবিস্মৃতির মাঝে আরাম পাইয়াছিল। কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ পাশের ঘরে একটা উগ্র

অসহিষ্ণুতাপূর্ণ ধুপ্ ধাপ্ ড়ম্ ড়ম্ ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ বিচিত্র আওয়াজ উঠিয়া লীনার ঘুমের শান্তিটুকু ভাঙ্গাইয়া দিল।—অতিমাত্রায় ভয়-ব্যাকুল লীনার আপাদমস্তক এক মুহূর্তে ঘামিয়া উঠিল! অপক-সুপ্তিজ্বালা-ভরা চোখদু'টা খুলিয়া সে জানালার দিকে চাহিয়া কষ্টে দেখিল, ভোরের আলো পরিষ্কার-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লীনা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল! দিনের আলোয় চোর-ডাকাতে ঘরের ভিতর এত শব্দ-উপদ্রব করিতে পারে না,—নিশ্চয়ই বাড়ীর কোন অসাবধান ঝি-চাকর! লীনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে ক্লান্তস্বরে বলিল, "উঃ, বড় শব্দ! আস্তে, আস্তে রে।"—কথা-কয়টা বলিতে লীনার যন্ত্রণা পীড়িত মাথা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল।

পাশের ঘরের শব্দটা মিনিট-কতকের জন্য ক্ষান্ত হইল। লীনার চোখ আলস্যে আবার জড়াইয়া আসিল, অর্দ্ধ-নিদ্রামগ্নের কাণে আবার অস্পষ্ট স্বরে বাজিতে লাগিল, ঠক্ ঠক ঠক্!—লীনা শুনিতে শুনিতে গাঢ় শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘড়িতে বেলা আটটা বাজিবার শব্দ শুনিয়া লীনার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চট্ করিয়া মনে পড়িল, আজ পিক্‌কের যাইবার দিন, আটটার ট্রেনেই তিনি যাইবেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইবার জন্য লীনা উঠিয়া বসিল। মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিয়া গেল! ক্লান্ত অবসন্নদেহে বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া সে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

আয়া দুয়ারের বাহির হইতে সাড়া দিল: লীনা ডাকিতে ঘরে ঢুকিল। ভীতদৃষ্টিতে লীনার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আপনার শরীর খুব খারাপ হইয়াছে কি?"

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া লীনা বলিল, "না। স্নানের ব্যবস্থা ঠিক করে দাও। সাহেব জুম্মন্‌কে নিয়ে চলে গেছেন?"

কুণ্ঠিত হইয়া আয়া বলিল, "হাঁ, ছ'টার সময় চলে গেছেন। প্রাতরাশ পর্যন্ত খেয়ে যান্ নি।"

বিচলিত হইয়া লীনা নড়িয়া চড়িয়া বসিল; মাটীর দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া অত্যন্ত জোরের সহিত বলিল, "যেতে দাও। আমার স্নানের জন্যে ঠাণ্ডা জল চাই, তার ঠিক কর।"

লীনা উঠিয়া স্খলিতচরণে স্নানের ঘরের দিকে গেল। আয়া মুখ ধুইবার সরঞ্জাম গুছাইয়া লইতে লইতে নিজমনেই মাথা নাড়িয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল, "এ, সকল মোটেই ভাল হইতেছে না। একটা কিছু ভয়ানক কাণ্ড না ঘটিয়া গেলে, এ চা যায়!"

স্নানাহারের পর, উত্তেজনার অবসাদ-শ্রান্তি দূর হইলে. লীনা মাথা ঠিক করিয়া গত রাত্রির ব্যাপারটা ভাল করিয়া ভাবিয়া লইবার জন্য লাইব্রেরী-ঘরের নির্জ্জনতায় বই লইয়া বসিতে গেল। দুয়ারের কাছে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, তালা বন্ধ!—অসহিষ্ণু বিরক্ত কণ্ঠে ভৃত্যকে ডাকিয়া সে বলিল, এখন তালা বন্ধ কেন?"

ভৃত্য ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, "সাহেব নিজে বন্ধ করে কুলুপের চাবি পকেটে পুরে নিয়ে গেছেন।"

গম্ভীরমুখে নিঃশব্দে শুইবার ঘরে ঢুকিয়া, লীনা ভিতরের দুয়ার খুলিয়া লাইব্রেরীতে ঢুকিবার চেষ্টা করিল,. কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য!

লাইব্রেরীর ভিতর হইতে সে দুয়ারেও একটা কুলুপ বন্ধ। অসহ্যক্রোধে লীনার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল,—আড়ালে লোক-চক্ষুর অগোচরে সুপ্রচুর অপমান করিয়াও পিককের আশা মিটিল না, প্রকাশ্যে সকলকে জানাইয়া এইরূপ অপমানের আয়োজন! ঝি চাকরদের সামনে মুখ দেখাইবার পথ পর্য্যন্ত বন্ধ! ধিক্ !—

কিন্তু তবুও মুখ দেখাইতে হইল, এবং চাকরকে ডাকিয়া দুয়ারটার কুলুপ ভাঙ্গিবার আদেশ, খুব শান্ত-সহজ স্বরেই দিতে হইল। কুলুপ ভাঙ্গা হইল, দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া, লীনা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—একি কাণ্ড! ——লাইব্রেরীর এক কোণে লীনার অত্যন্ত সখের যে সুদৃশ্য মেহগ্নি-কাঠের প্রকাণ্ড সিন্দুকটি ছিল, সেটা ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হইয়াছে। পূর্ব্বে সেটার কয়লার খনি সম্পর্কীয় কাগজ-পত্র রাখা হইত। দিন-কয়েক হইল, ম্যানেজারের হিসাব মিলাইয়া লইবার জন্য লীনা কাগজগুলা বাহির করিয়া নিজের শুইবার ঘরে একটা খোলা ড্রয়ারের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল; তুলিতে মনে পড়ে নাই। এ সিন্দুকে মূল্যবান্ গহনার কেস্‌গুলা ও পিতার পুরাতন হিসাব-পত্রগুলা ছিল। সে-গুলা সমস্তই নিষ্প্রয়োজন; শুধু পিতার স্বহস্তে লেখা বলিয়া লীনা সেগুলি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিল। পিতার 'ডায়রী'টাও ছিল এই সকলের মধ্যে। সেটা অবশ্য নিষ্প্রয়োজন নয়।

লীনা চাহিয়া দেখিল ভাঙ্গা সিন্দুকটা শূন্য-গর্ভে হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে; কতকগুলা কাগজ মেঝের উপর বিশৃঙ্খলভাবে লণ্ড ভণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে; ঘরের এককোণে কার্পেট সরাইয়া একরাশ কাগজ পোড়াইয়া ফেলান হইয়াছে; তাহার ছাইগুলা স্তূপাকার হইয়া আছে; মূল্যবান্ গহনার কেস্‌গুলার কোন চিহ্নই ঘরের কোথাও নাই!

লীনা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিল। বহুদিন আগের পড়া—ঈশপের গল্পে একটা নীতি-উপদেশ তাহার মনে পড়িয়া গেল—যারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যাচারী বা শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করে, তাদের আশ্চর্য্য হওয়া উচিত নয়, অত্যাচারটা যদি শেষে তাদের বিরুদ্ধেই ঘুরে দাঁড়ায়!

লীনা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। নাঃ, আজ তারও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই! এইরূপ ইতর অত্যাচার সহিবার জন্য আগে হইতেই তার প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল। তার প্রিয় পিতার স্মৃতিগুলির মর্য্যাদা তার হৃদয়ের কাছে আদরণীয় বলিয়া সেগুলার উপর পর্য্যন্ত হিংস্র পশুত্বের অত্যাচার! স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হইলে, এ ব্যাপারের সম্ভাবনা পূর্ব্বেই সে অনুমান করিয়া লইতে পারিত;—পারিতে বাধ্য হইত!

হেঁট হইয়া কম্পিত হস্তে কাগজগুলা উল্টাইয়া লীনা পিতার ডায়ারী খুঁজিতে লাগিল। না, সেটা নাই; পিকক্ সেটা লইয়া গিয়াছেন, কিংবা পুড়াইয়া দিয়াছেন।—হাঁ পুড়াইয়া দেওয়াই সম্ভব; কারণ, পিকক্ ও পিককের প্রতিশ্রুত খনি-বিস্থা শিখিবার জন্য টাকা লওয়ার বণ্ড-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই তাতে লেখা ছিল। বণ্ড-খানা অবশ্য লীনা বিবাহের পরেই পিককের সামনে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু পিতার হাতে লেখা ডায়ারিখানা লীনা নষ্ট করিতে পারে নাই; কারণ, পিতার জীবনের

প্রধান ঘটনাগুলা তাতে লেখা ছিল।

উঠিয়া গিয়া লীনা সাবধানে একটা কলমের ডগে করিয়া ছাইগুলা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।—হাঁ ঠিক্, ডায়ারির মোটা মলাট-দুইখানা সম্পূর্ণ পুড়িতে পারে নাই, আধ-পোড়া হইয়া ছাইয়ে চাপা রহিয়া গিয়াছে! বাকী সমস্ত পাতাগুলা ছাই হইয়া গিয়াছে।

মাথায় হাত দিয়া খানিটা হতবুদ্ধি নির্বাকের মত বসিয়া থাকিয়া, লীনা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাজার টাকার যে ব্যাগটা সিন্ধুকে ছিল সেটাও লইয়া গিয়াছেন, বোধ হয়!—

শান্ত ধৈর্য্যের সহিত উঠিয়া এদিক ও দিক্ খুঁজিয়া লীনা দেখিল টেবিলের উপর খোলা ব্যাগটা উল্টাইয়া পড়িয়া আছে, নোটগুলা সমস্তই অন্তর্হিত!

তীব্র ঘৃণাভরা বিদ্রূপের হাসি লীনার ওষ্ঠ-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল! বাহবা,—মহামান্যবর স্বামীর সর্ব্বব্যাপী প্রভুত্ব প্রতাপের দাপটে সে আজ কপর্দ্দক-শূন্য ভিখারি হইয়া পড়িল! আর কি সৌভাগ্য এর বেশী আছে!—টাকা আনা-ইবার জন্য কয়লার খাদের ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিবার খরচা পর্য্যন্ত লীনার তহবিলে আজ নাই!

মস্তিষ্কের ভিতর বোঁ বোঁ শব্দে তীব্রবেগে রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল। টলিতে টলিতে সরিয়া গিয়া গোলাপ-জলের শিশিটা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া সে সোফায় বসিয়া পড়িল; মাথায় খানিকটা জল চাপড়াইয়া নিঝুম হইয়া শুইয়া, আত্ম[illegible] জন্য ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে লীনার [illegible] বহিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল,—কি দুর্ব্বহ লজ্জা-জনক এই ঘৃণিত বিপদ্! কোন বন্ধুর কাছে, মুখ ফুটিয়া প্রতিকার প্রার্থনা জানাইতে,—এতটুকু সাহায্য চাহিতে ঘৃণায় মাথা-কাটা যাইতেছে! বেশী কি, ঐ ঝি চাকরগুলার সামনেও যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। ধিক্! আঃ, ভগবন্, ধন্যবাদ তোমায়! হেলেন মরিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছে, না হইলে এই কাপুরুষ পশুর অধীনে পড়িয়া আজীবন তাকে এই সকল ঘৃণিত লাঞ্ছনার চাপে পদে পদে পিষিয়া মরিতে হইত।

উগ্রচিন্তা-পীড়নে ক্লান্ত মস্তিষ্কটা বেদনা অধীর হইয়া উঠিল! টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া স্মেলিং সল্টের শিশি লইয়া বার কতক ঘ্রাণ লইয়া লীনা মাথার যন্ত্রণা কমাইয়া ফেলিল। তার পর একটুক্রা কাগজ লইয়া পার্সনকে লিখিল, "বড় দরকার, শীঘ্র। গোটা-পঞ্চাশ টাকা দেন।"

বাহিরে আসিয়া, কাগজটুকু চাকরের মার্ফৎ পার্সনের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, লীনা আবার ঘরে ঢুকিল। সিন্ধুকের কাছে যে কাগজগুলা পড়িয়াছিল, একসঙ্গে জড় করিয়া আনিয়া সেগুলা সেই ছাইয়ের স্তূপের উপর রাখিল। তারপর সমস্তগুলায় আগুন ধরাইয়া দিয়া, পুড়াইয়া ছাই করিয়া, সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল; বাহিরে আসিয়া অন্য চাকরকে ডাকিয়া ঘর পরিষ্কার করিবার আদেশ দিল।

অল্পক্ষণ পরেই পার্সনের নিকট হইতে টাকা লইয়া ভৃত্য ফিরিল। লীনা টাকা লইয়া কয়লার খনি ম্যানেজার মিঃ মরিস্কে টেলিগ্রাম করিল—"শীঘ্র আমার দশহাজার টাকা চাই। আপনিও অবিলম্বে আসুন, কয়লার

খাদ আপনাকে ইজারা-বন্দোবস্ত করে দিয়ে আমি পর সপ্তাহের জাহাজে বিলাত যাব।"

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া লীনার মাথার উপর হইতে যেন একটা অসহ্য উদ্বেগ-দুর্ভাবনার বোঝা নামিয়া গেল। সে মাথা ঠিক্ করিয়া শান্ত হইয়া নিজের অবস্থাটা আগাগোড়া ভাবিয়া লইতে বসিল। নিরুপায় অত্যাচার-পীড়িতা লীনা এই যে অভদ্র ইতর অত্যাচারের পাল্লা এড়াইয়া ভদ্রভাবে মানে মানে সরিয়া পড়িবার ব্যবস্থাই প্রায়ঃ ঠিক করিল, বাহিরের লোক সমাজ কোন্ দৃষ্টিতে এটাকে বিচার করিবে?—তাহারা বিচার করিবে সেই দৃষ্টি লইয়া, যে দৃষ্টিতে মিঃ ক্লাউডেনের পরদার-প্রিয়তা লোক-সমাজের চোখে তত দোষাবহ নয়, যতটা দোষাবহ ক্লাউডেন পত্নীর নীরব বেদনায় স্বতন্ত্র অবস্থান পাপটা! ক্লাউডেন-পত্নীও তো স্বামীকে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভালবাসেন, কিন্তু স্বামীর জঘন্য পাপাচরণগুলা অন্ধ-ভক্তিতে চোখ বুজিয়া পূজা করিতে পারেন না বলিয়া স্বামীর পক্ষ-সমর্থক উদারচেতা বন্ধু বান্ধবের দল কতখানি উগ্র অসন্তোষের দৃষ্টিতে ঐ হতভাগিনীর দিকে চাহেন! এবং কত রকমেই তাঁকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন!—হায় রে হায়, পৃথিবীর অভিশপ্ত নারীর দল! —কোন ছুতায় যদি তোমরা দেবতাদের প্রসন্নদৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য হারাইয়াছ, তবে প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও,—উপদেবতাদের ঘৃণার পদাঘাতে তোমাদের আপাদ-মস্তক জর্জ্জরিত হইবে-ই!

এই যে এতদিন ধরিয়া লীনা এত অন্যায়ের অত্যাচার কঠোর ধৈর্য্যে সহিয়া আসিল, গোপনে গোপন বেদনার অশ্রু মুছিয়া ক্ষত বিক্ষত প্রাণের জ্বালাময় অভিযোগ-উত্তেজনা প্রাণের ভিতরই চাপিয়া রাখিল,—গায়ে জোর নাই বলিয়া গায়ের জোরের অত্যাচার নিশ্চেষ্ট ভাবেই সহিতে বাধ্য হইল,—এই নিস্তেজ সহ্য শক্তিটুকুর দ্বারা সংসারে কার কি উপকার করিতে পারিল? স্বামীর স্বভাব ইহাতে সংশোধিত হইল কি? প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল কি? স্বামীর মনুষ্যত্বের উন্নতি-মর্য্যাদা বাড়িল কি?—আত্মার মঙ্গল হইল কি? —শুধু ঘৃণিত বাজে ইণ্ডিয়ানের লাঞ্ছিতা মেয়ের ব্যক্তিগত বেদনা লইয়া থাকিত গোরা ইউরোপীয়ানের কাছে নয়,—সমগ্র নারী-সমাজের, যেখানে যত অন্যায়-পীড়িতা নারী আছে, সকলের লাঞ্ছিত নারীত্বের তরফ হইতে পৃথিবীর কাছে সবিনয়ে এ প্রশ্নের উত্তর ভিক্ষা কর,—দেখিবে, সভ্য মনুষ্যত্বের মাঝে যে মানুষের আত্ম-চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কেবল মাত্র সেই মানুষ-কয়টি ছাড়া বাকী সব প্রাণীগুলি বিরাট বিজ্ঞতার দর্পে বিকট অট্টহাস্য করিয়া, আকাশ ফাটাইয়া প্রচণ্ড চীৎকারে উত্তর দিবেন,—"এ সব অদ্ভুত প্রশ্ন, শুধু নভেল-বিদ্যার ফল!"

থাক্ পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সুলভ সুবিধার অনুকূল ঐ সব সম্প্রদায়ের বিধি-বিধান এবং ততোধিক সভ্য শাসন-বিচার-প্রণালী! লীনার নিজের অবস্থা যখন নিজেকে মর্ম্মে মর্ম্মে তীব্র যন্ত্রণায় বুঝিতে হইতেছে, তখন যথোচিত ব্যবস্থার ভারটা যথাশক্তি নিজের ঘাড়েই বহিতে হইবে! লেখকের কাছে যখন লীনার হৃদয়ের কোন মর্য্যাদাই লেশমাত্র নাই, শুধু কয়লার খনি হস্তগত করিবার লোভটাই এত ভীষণ,

প্রচণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন লীনার পক্ষে নিজের হৃদয়ের দাবীটা মানে মানে ফিরাইয়া লইয়া, কেলেঙ্কারী বাড়িবার পথ বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়াই ঠিক! পিক্কের অশান্তির কাঁটা দূর হউক,—যেখানেই তিনি থাকুন, প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন, আর কোন প্রার্থনা নাই।—এই যন্ত্রণা-ভগ্ন মনের বোঝা বহিয়া লীনা আর কত দিনই পৃথিবীতে টিকিবে? কিসের ভয় তবে? যে ক'দিন বাঁচে—শান্তি না থাক্, তবু একটু নির্ঝঞ্ঝাটে নিজের মনুষ্যত্বটা বাঁচাইয়া থাকার চেষ্টা করাই ভাল।—

কিন্তু এক মহৎ দুঃখ শুধু, হতভাগ্য মার্সি!—হঠাৎ উৎক্ষিপ্তচিত্তে উঠিয়া গিয়া লীনা লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল। বইয়ের মাঝখানটা ফস্ করিয়া খুলিতেই দেখিল, সেই পাতার এক স্থানে Wordsworth এর উক্তি উদ্ধৃত রহিয়াছে:—

"Say what is honour but the nicest sense
Of justice the human heart can frame.
Intent each lurking frailty to disclaim
And guard the ways of life gainst all offence
Suffered or done?"

অর্থাৎ—মানুষের উৎকৃষ্ট-জ্ঞান-মার্জ্জিত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচার বুদ্ধি, যে বুদ্ধি চরিত্রের গুপ্ত দুর্ব্বলতাকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং যাহা অত্যাচার করা ও অত্যাচার সহ্য হইতে জীবনের পথ রক্ষা করে, সেই শ্রেষ্ঠতম সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সুন্দর-বোধ-শক্তি ছাড়া,—মনুষ্যত্ব আর নাই!

লীনা মন্ত্র-মুগ্ধের মত সেই অক্ষর-কয়টার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, উদ্বেল-বক্ষে, দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

(১১)

পরস্পর-বিরোধী কতকগুলা জটিল মনোবেদনার দ্বন্দ্ব ও অসহ্য উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া লীনার দু'দিন দু'রাত সময় কেমন করিয়া কাটিল, কেহ জানিল না। লীনার সৌভাগ্যবশতঃ বন্ধুরাও কেহ এই দু'দিন কোন খোঁজ-খবর লইতে পারিলেন না। সহরের বাহিরে কোন কটা জায়গায় খুব কলেরার মড়ক লাগিয়াছিল; মিশনের লোকজন লইয়া পার্সন ও মিস্ লীন স্বেচ্ছাসেবক-রূপে সেখানে গিয়াছেন। মিসেস ক্লাউডেন্ কাল এখানে ফিরিয়াছেন, তাঁরাও দু ভাই-বোনে সে দলে যোগ দিতে গিয়াছেন। মৃত্যু-মহারাজের ক্ষুধার গ্রাস হইতে অসহায় দরিদ্র মানবগুলাকে রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহারা প্রাণের আনন্দে, প্রাণপণ সংগ্রামে মাতিয়াছেন।—

লীনা বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া সব শুনিতেছিল, আর বেদনার নিঃশ্বাস ফেলিয়া এক একবার ভাবিতেছিল, আত্মবিস্মৃতির আরাম পাইবার জন্য যদি সেও ঐ সেবক-দলের সেবাব্রতে যোগ দিতে পারিত, কি আনন্দই সে পাইত আজ! কিন্তু হায়, সামর্থ্য নাই। শরীরে এতটুকুও সামর্থ্য নাই, বিষাদ-ভগ্ন মনটাকে যে, কোন কাজে যুড়িয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি পায়, সে সুযোগটুকু পর্য্যন্ত নাই! ভগবান্, ভগবান্, এই একান্ত স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, শোক-ব্যথার পীড়ন হইতে মনকে মুক্ত করিয়া দাও,—এই রুগ্ন জীর্ণ হৃদয়ের বোঝা বহিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে পারা

যায় না।—যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, মানুষকে মানুষের মত সজীব সতেজ প্রাণ লইয়া বাঁচিতে দাও! যে মানুষের সংসার-জীবনের সুখ-শান্তি জ্বলিয়া পুড়িয়া ধ্বংস হওয়াই অনিবার্য্য,—তাহার মনকে ব্যর্থতার বেদনা-পীড়ন হইতে বাঁচাও! বিশ্বব্যাপী বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে,—শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডিবদ্ধ আত্ম-সুখ, আত্মপরায়ণতা লইয়া ক্ষিপ্ত-ক্ষোভে হা হা করিয়া দিন কাটানই মনুষ্য-জীবনের পরম সার্থকতা নয়। নিজের পুত্র বলিয়া, মারসির শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্বভাবের পরিবর্দ্ধন জন্য ভালরূপ চেষ্টা করিবার সুযোগ পাইল না বলিয়া লীনার মন ব্যাকুল ক্ষোভে কাঁদিতেছে! কিন্তু হায়, স্বার্থপর প্রাণ! —নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়া একবার সমস্ত জগৎটার দিকে কান পাতিয়া শোন দেখি! ঐ একমাত্র লীনার পুত্র মারসি নয়,—অমন কত লক্ষ কোটী মারসি কত লক্ষ কোটী অভাবের শোচনীয় নিষ্পেষণে পিষ্ট হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদে জগৎ ভরাইয়া তুলিয়াছে! এক মারসির উপর মায়ের কর্ত্তব্য-পালনের অধিকারে বঞ্চিত হইলে বলিয়া বঞ্চনার ব্যথায় কাঁদিয়া মরিতেছে, কিন্তু ঐ জগৎ জোড়া হতভাগ্য মারসির দল,—ওদের মঙ্গল-চেষ্টায়, ওদের উপর তোমার স্নেহ ঢালিবার কর্ত্তব্যও যে আছে, এবং সে কর্ত্তব্যকে যদি পালন করিতে যাও, তবে ঈর্ষার অত্যাচারে প্রচণ্ড আঘাত দিয়া তোমার স্নেহকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, এমন নৃশংসপ্রাণ পিতা বা অভিভাবক ওদের খুব কমই আছে,—খুব কম! না হইলে মনুষ্য-জাতির চিহ্ন এত দিন ধরাতল হইতে মুছিয়া যাইত,—এটা একান্ত সত্য!

কত এলোমেলো চিন্তার ঝড় যে লীনার মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, তার ঠিক ঠিকানা নাই। স্বামীর সহিত বিরোধ এড়াইতে, নিঃশব্দে চির-বিদায় লইবার জন্য সে যতই মনে মনে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিতে লাগিল, পুত্রের জন্য বুকের ভিতরটা ততই 'হায় হায়' করিতে লাগিল। দুর্ব্বল কাতরচিত্তে এক একবার সে ভাবিতে লাগিল, পদাঘাত সহ্য করিতে হয় সেও ভাল, তবু স্বামীর পায়ে ধরিয়া পুত্রকে ভিক্ষাস্বরূপ, অন্ততঃ বছর দশের পর্য্যন্ত কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য, চাহিয়া লইবে। কিন্তু তখনই দুর্জ্জয় কঠোরপ্রকৃতি পিকের একগুঁয়ে জেদ মনে পড়িতে লাগিল,—তিনি দিবেন না, দিবেন না, কিছুতেই দিবেন না! একান্তই যদি কোন কারণে দিতে বাধ্য হন, তবে স্বহস্তে গলা টিপিয়া সন্তানকে হত্যা করিয়া তবে মৃত দেহটা দিবেন!—

নিজের চিন্তায় লীনা নিজেই শিহরিল! থাক, মারসি তোমার অদৃষ্টে যা আছে তা হইবে। মা হইয়া লীনা এত বড় অমঙ্গল চিন্তাটা করিতে পারে না আর, ভগবান্!—

তৃতীয় দিন প্রাতে মিঃ মরিস্ তাঁর প্রধান কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া কুঠিতে আসিয়া লীনার সহিত দেখা করিলেন। শিষ্টাচার মত সম্মান-বিনিময়-পর্ব্ব শেষ হইলে, বৃদ্ধ মরিস্ পকেট হইতে একটা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া লীনার সামনে রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই আমি প্রস্তুত হয়ে বেরুচ্ছি, এমন সময় মিঃ পিকের এই টেলিগ্রামখানা পেলুম। কিন্তু এর অর্থ

আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আপনি দেখুন দেখি।"

লীনা বৃদ্ধের মুখ-পানে চাহিতে সাহস করিল না; কম্পিতহস্তে টেলিগ্রামখানা তুলিয়া লইয়া, সেইটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল; দেখিল, পিকক্‌ গতকল্য তাঁহার আফিসের ঠিকানা হইতে জানাইতেছেন, "পিককের বিনানুমতিতে মিসেস্‌ পিককৃকে যেন অতঃপর টাকা-কড়ি কিছুই না দেওয়া হয়, এবং হালের হিসাবপত্র সমস্ত প্রস্তুত করিয়া মিঃ মরিস্‌ যেন অবিলম্বে পিককের প্রধান অফিসে উপস্থিত হইয়া সমস্ত হিসাব দাখিল করেন। মিঃ পিকক্‌ শীঘ্রই কলিয়ারী বিক্রয় করিবেন।"

লীনার হাত ভয়ঙ্কর কাঁপিতে লাগিল। মুহ্যমানভাবে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, টেলিগ্রামখানার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া লীনা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আপনি তা হ'লে টাকা আনেন নি?"

সুপক্ব দাড়ির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধ মরিস্‌ বেশ ধীর মোলায়েম স্বরে বলিলেন, 'মিঃ পিককের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা...সম্পর্কটা...হাঁ, সে অবশ্য আমার কাছে বিশেষ সম্মান্য, কিন্তু, আমি আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী। আপনার অনুমতি ছাড়া মিঃ পিক্‌কের আদেশ-পালনে আমি বাধ্য নই। আপনার টাকা, আপানার আজ্ঞামত আমি আন্‌তে বাধ্য হয়েছি নিশ্চয়ই, এবং আপনাকে দিতে কোন আপত্তি করবার অধিকার আমার নাই।

মিঃ মরিসের কর্ম্মচারী ব্যাগ খুলিয়া হাজার টাকার করিয়া দশখানি নোট বাহির করিয়া লীনার টেবিলে রাখিল। কলমটা তুলিয়া লইয়া লীনা বলিল, "হিসাবের খাতা দেন, সহি করে দিই।"

ব্যস্ত হইয়া মরিস্‌ বলিলেন, "থাক্‌ থাক্‌, তার জন্যে তাড়াতাড়ি নাই। কিন্তু কাজের কথাটা আগে হোক্‌। কলিয়ারী ইজারা দেওয়াই কি আপনার স্থির সঙ্কল্প?"

দৃঢ় স্থিরকণ্ঠে লীনা বলিল, "হাঁ অবশ্যই! মিঃ পিককের আপত্তির জন্যে আপনার ইতস্ততঃ করবার কোন কারণ আছে?"

হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মরিস বলিলেন, "কিছুমাত্র নয়। সম্পত্তির মালিক আপনি, সম্পত্তি-দান-বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অধিকার আপনার,—ইজারা দেওয়া তো সামান্য কথা! কারুর অন্যায় আপত্তি এতে টিক্‌বে না।"—

অধীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া লীনা বাধা দিয়া বলিল, "সেটা আমারও জানা আছে। বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের আয়যুক্ত সম্পত্তি থেকে আপনি আমায় মাসিক তিন হাজার পাউণ্ড করে খরচ দিচ্ছেন..."

আগ্রহের সহিত মরিস বলিলেন, "আহ্লাদের সঙ্গে! এ প্রস্তাব আমি পূর্ব্বেই করেছিলাম, আপনার মনে আছে, বোধ হয়। অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্যে আপনি যদি ঐ সর্ত্তে আমায় ইজারা দেন, তবে বলুন, আমি এখুনি চুক্তিপত্রে সহি করে দিচ্ছি, পাঁচ বৎসর পরে ঐ তিন হাজার পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে আমি ছ'হাজার পাউণ্ড করে আপনার মাসিক আয় বাড়িয়ে দেব। যদি এ-রকম আয় আমি না বাড়াতে পারি, তবে আমার এই বার্ষিক লাভ—চোদ্দ হাজার পাউণ্ড, পাঁচ বছর পরে এক সঙ্গে একলাখ চুয়াল্ল হাজার পাউণ্ড গুণে আপনাকে দণ্ডরূপে ফেরৎ দেব।"

সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধের শান্ত চক্ষু-দু'টি উৎসাহ-

আনন্দে জল্ জল্ করিতে লাগিল। লীনার মনে পড়িল,—এই বৃদ্ধ আজ ষোল বৎসর বিশ্বস্তভাবে ঐ কয়লার খনির পেছুতে খাটিতেছেন; অনেক যত্নে খনির আয় বাড়াইয়া তুলিয়া, তিন-শো টাকা মাহিনার কর্ম্মচারী হইতে আজ সাড়ে ন'শো টাকা মাহিনার কর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি নিজের সত্য-নিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত নহেন। তাহার বহু প্রমাণ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে।

লীনা নিঝুম হইয়া কয়-মুহূর্ত্ত ভাবিল, তারপর মুখ তুলিয়া চাহিয়া ধীরস্বরে বলিল, "পাঁচ-বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থাক্‌বার সুযোগ আমার হবে কি না, আমি জানি নে মিঃ মরিস্!—যদি বাঁচি, আপনি ছ'হাজার পাউণ্ড করেই আমায় দেবেন। কিন্তু যদি না বাঁচি, তবে তিন হাজার পাউণ্ডই আমার উত্তরাধিকারী পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার খরচের পক্ষে যথেষ্ট হবে। তার বিলাসিতা বা বদ-মাইসির খোরাক যোটাবার জন্যে বেশী অর্থ দিতে আমি ইচ্ছা করি নি। চলুন রেজিষ্ট্রী অফিসে; ও সম্পত্তি আমি আঠারো বছরের জন্যে আপনাকে রেজিষ্ট্রী করে দিচ্ছি। আমার পুত্র সাবালক হয়ে আপনার বা আপনার উত্তরাধিকারীর হাত থেকে সম্পত্তি গ্রহণ করবে। অবশ্য যদি সম্পত্তির অধিকারী হ'বার যোগ্য সচ্চরিত্র এবং সুশিক্ষিত হয়ে বাঁচে, তবেই সম্পত্তি পাবে, নচেৎ দেশের মঙ্গল কাজের জন্য ও-সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হবে।

চমকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "ভগবন্! ভগবন্! এ কি অর্থহীন চিন্তা আপনি মনে স্থান দিচ্ছেন? মিঃ ব্যানার্জ্জির দৌহিত্র তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হবেন নিশ্চয়ই।"

লীনার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল! হায় সরলপ্রাণ বৃদ্ধ, যদি জানিতে কত বড় অসম্ভব ঐ আশাটা! যে দুর্দ্দান্ত দাম্ভিক পিতার উগ্র অন্যায় দৃষ্টান্তের আব্‌হাওয়ার ভিতর তার শৈশব জীবন, বিষাক্ত সংস্কারে পরিপুষ্ট হইতেছে,—সে প্রভাব এড়াইয়া বিরুদ্ধভাবে বাড়িবার সম্ভাবনা তার পক্ষে নাই, নাই,—একেবারেই নাই!

চোখের জল গোপনের জন্য লীনা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, সংক্ষেপে দু একটা কথা বলিয়া, ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে একটা গাড়ী ভাড়া লইয়া, সকলে রেজিষ্ট্রার-আফিসে গেলেন। রীতিমত লেখা-পড়া রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন; কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রাত্রির আহারশেষে মিঃ মরিস্ কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া রাত্রির ট্রেনেই স্বস্থানে রওনা হইলেন।

তাঁহাদের বিদায় দিয়া কিছুক্ষণ সুস্থিরচিত্তে লীনা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাগুলা ভাবিয়া লইল। তারপর টেবিলের কাছে গিয়া একটা চেয়ার লইয়া পত্র লিখিতে বসিল:—

"প্রিয় স্বামী, ক্ষমা কর। আমার নামক কোন ব্যক্তিকে প্রিয় সম্ভাষণ জানাবার অধিকার বা সাহস আজ আমার নাই। শিক্ষাওয়ালাদের অনুগ্রহদত্ত স্বামি-সম্পর্ককেই প্রিয় সম্ভাষণ জানাচ্ছি, যদি এটাও তোমার অসহ্য—অপ্রিয় বোধ হয়, তবে জানিও আমায়,—এ স্পর্দ্ধা আর কখনো প্রকাশ করব না।

"জীবনে অনেক শিক্ষাই শিখলুম, সব চেয়ে তীব্র আঘাতের ভিতর দিয়ে ভগবান্ আমায় যে শিক্ষা শেখালেন,—সেই শিক্ষাই আজ আমার কাছে চরম! তোমার মঙ্গল হোক। কারুর নামে কোন অভিযোগ আজ আমার করবার নাই।"

হঠাৎ লীনার কলম বন্ধ হইয়া গেল! প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত অজস্র অশ্রুবাষ্পে দু চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া গেল! হায়, এ কি দুর্ব্বলতা,—এ কি মিথ্যা আত্ম-প্রতারণা! কাহারও নামে অভিযোগ করিবার কিছু নাই,—ইহা সত্য কি? ভুল, ভুল, সম্পূর্ণ ভুল!........ স্বামী বলিয়া একান্ত আগ্রহে ভালবাসিয়া যার হাতে অকপট প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তিনি যে পদে পদে বর্ব্বর-দম্ভে পদাঘাত করিয়া লীনার প্রেমকে লাঞ্ছনা-বিক্ষত করিয়া, সমস্ত জীবনটা বিষময় করিয়া দিলেন,—এ মর্ম্মান্তিক ক্ষতির বিরুদ্ধে মর্ম্মাহতা নারীর

কোন অভিযোগ………ওঃ ভগবান, বাঁচাও, বাঁচাও! এ অসহ্য চিন্তার উৎপীড়ন হইতে লীনাকে বাঁচাও!

লীনা যতক্ষণ পারিল, খুব কাঁদিয়া লইল। তারপর কলম তুলিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া আবার লিখিতে সুরু করিল:—

"না, আমি উপন্যাসের নায়িকা নই, নাটকের প্রধানা পাত্রী নই,—আমি শুধুই তোমার স্ত্রী ছিলাম, শুধু তোমারি বিশ্বস্তা সহধর্ম্মিণী হতে চেয়েছিলাম।………যাক সে দুরাশা-স্পর্দ্ধা রসাতলে! জীবনে স্বপ্ন দেখার ফুরসুৎ আমার ছিল না, আমি স্পষ্ট চোখেই আগাগোড়া বাস্তবটাকে লক্ষ্য করে আস্‌ছি, হাঁ খুব ভাল রকমেই লক্ষ্য করে আসছি,—অবশ্য আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধিতে যতটা শক্তি সম্ভবে, তার দ্বারাই।

"তুমি খেয়ালের বশেই একদিন আমায় চেয়েছিলে, পেয়েছিলেও অত্যন্ত সহজে। তোমার চাওয়া পাওয়ার খেয়াল শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি তোমার জীবনের পক্ষে একটা বিরক্তিকর গলগ্রহ মাত্র! তোমার বিরক্তি প্রতিদণ্ডে তোমায় অসংযত উগ্রতায় ক্ষেপিয়ে তুল্‌ছে, আর অশান্তির ঝাপ্টা খেয়ে আমায় মনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন একটা জায়গায় ঠিক্‌রে গিয়ে পড়ছে, যে জায়গায় চারিদিকেই শুধু অভাবের ব্যথা, ক্ষোভের হাহাকার, আর নৈরাশ্যের অবসাদ!—

"এ সংঘাত নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর,—মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও বেশী অসহ,—অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হচ্ছে। তুমি আকৃতিগত বৈষম্যটাই সব চেয়ে বড় খুঁৎ মনে করছ, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, প্রকৃতিগত বৈষম্যের বাড়া কঠোর অন্তরায় দাম্পত্য-প্রেমের মধ্যে আর নাই!

"চুলোয় যাক সে কথা। কালা ইণ্ডিয়ানের মেয়ে তোমার পথ ছেড়ে যাচ্ছে। আমার আন্তরিক শুভ কামনা গ্রহণ কর। বিবাহের দায়িত্ব-বন্ধন থেকে তোমায় মুক্তি দিলাম। তোমার প্রকৃতির উপযুক্ত, যোগ্যা সহধর্ম্মিণী খুঁজে নাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের দাম্পত্য-জীবন সুখময় হোক্।

"আগামী সপ্তাহের মেলে আমি রওনা হব। ইটালী যাবার ইচ্ছা আছে, যে ক'দিন বাঁচি বোধ হয়, সেইখানেই শেষ দিন ক'টা কাটাব।

"বৈষয়িক ব্যাপারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ভার নিজের হাতে নিলুম। কয়লার খাদের কাগজ-পত্রগুলা হস্তগত করার জন্য সিন্দুকটা ভেঙে দিয়ে, তুমি আমার বড়ই উপকার করে গেছ। তুমি খরচের টাকাগুলা না দিয়ে গেলে যদি, তাহলে টাকার অভাবে মিঃ মরিসকে টেলিগ্রাম করতে বাধ্য হতুম না। মরিস আজ এসেছিলেন। তাঁকে আঠারো বছরের জন্য খাদ ইজারা দিলাম। আমার মৃত্যুর পর বিষয়ের যেরূপ ব্যবস্থা হবে, সেটা আমার উইলে জান্‌তে পারবে। আপাততঃ তোমাদের না জানাই ভাল। মরিস্ বা কয়লার খাদের ওপর কোন কর্ত্তৃত্বের অধিকার আর তোমার বা আমার রইল না।

"মরিসের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলবার ছিল, কিন্তু ভয়ানক মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। শুধু একটা কথা, যাবার আগে তাকে একবার দু'ঘণ্টার জন্যে কি আমায় দিতে পারবে না? ইতি

তোমার অযোগ্যা স্ত্রী—লীনা।

চিঠি ভাঁজ করিয়া খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া, চাকরকে ডাকিয়া, পোষ্টবাক্সে ফেলিবার জন্য পাঠাইয়া লীনা যখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল, তখন সে অনুভব করিল যন্ত্রণায় তাহার মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, এবং সর্ব্বশরীরে ভয়ানক শীত-বোধ হইতেছে। কয়দিনের উগ্র-মানসিক দুশ্চিন্তার প্রতিক্রিয়া ভিতরে ভিতরে শরীরকে বড়ই অসুস্থ করিয়া তুলিতেছিল।—লীনা বুঝিল প্রতিক্রিয়াটা এবার বেশ জোর-তালেই কায আরম্ভ করিল।

আয়াদের ডাকিয়া পাশের ঘরে থাকিবার আদেশ দিয়া, লীনা বিছানায় গিয়া কম্বল-মুড়ি দিয়া শুইল। আধঘণ্টার মধ্যেই প্রবল জ্বরে লীনার সংজ্ঞালোপ করিয়া দিল।—(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 690. February, 1921.

"কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৯০ সংখ্যা। } মাঘ, ১৩২৭। ফেব্রুয়ারী, ১৯২১। ১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

চিত্তের চির নবীনতা—

ওরে বৃদ্ধ! ভুলিস্ নে তোর গান,
ও তুই হারাস নে তোর প্রাণ,
চির-যৌবনময় চিত্ত কি তুই
রাখ্‌বি সুপ্ত দিনযাম?—
হয়ে বিষাদ-ম্রিয়মাণ?
পাকুক্ না তোর চুল
হোক্ না দেহ ক্ষীণ,
বিদায়-বেলাও হাসিয়া চায় ফুল,
আবীর-বানে হয় রবি রঙীন!
বসুন্ধরা গাইচে সদাই গান
রূপ-সাগরে নিত্য করি স্নান;—
আকাশ গাহে, বাতাস গাহে,
তৃণ তরু-লতা গাহে,
তপন গাহে—তারা গাহে
আনন্দময় অণু-অণীয়ান্!
ওরে বৃদ্ধ বন্ধ করি' গান
তুইই র'বি সবার চেয়ে ম্লান?

প্রাণের ঠাকুর দেছেন প্রাণে গান
গাবার তরে সারা দিবস যাম—!
দুঃখে সুখে শোকে তাপে
ঝঞ্ঝা-রাতে গ্রহের শাপে,
সকল কাজেই গাইতে হবে গান!—
থামিয়ে সে গান, রইবি পরিম্লান?
যৌবনময় চিত্ত মোদের
গাইতে চাহে গান,—
কবি বলে,
কল্পনারি বার্দ্ধক্য-জাল বুনে'
ওরে মূঢ়,
অকালে তুই হস্ নে বিষাদ-ম্লান॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

লীনার শিক্ষা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১২)

জ্বরের ঘোরে প্রাণপণে যা-খুসী তাই বকিয়া বকিয়া যন্ত্রণা-বিকল অবস্থার ভিতর দিয়া, তিনটা দিন পুরাপুরী কাটাইয়া, চারি দিনের দিন লীনার যখন জ্বর ছাড়িয়া যন্ত্রণাটা দূর হইয়া গেল, তখন খুব একটা গাঢ় ঘুমের পর সে সুস্থ হইয়া চোখ চাহিয়া দেখিল, পার্স´ন বিছানার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথায় জলপটি লাগাইতেছেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া লীনা মৃদুস্বরে বলিল, "সুপ্রভাত বন্ধু, কবে ফিরিলেন? কেমন আছেন বলুন?"

হাসি-মুখে পার্স´ন বলিলেন, "ভালই আছি। কিন্তু আপনি তো চমৎকার মজার লোক! হঠাৎ এত ম্যালেরিয়া-বিষ সঞ্চয় কোরলেন কোত্থেকে, বলুন দেখি? বাপ্, আমাদের চক্ষু স্থির করে দিয়েছিলেন!-- একশো ছ' ডিগ্রির ওপর জ্বর চড়িয়ে, তোফা আরামে বকুনি জুড়ে দিয়েছিলেন। আমি তো পশু´ এসে অবস্থা দেখে অবাক্!"

ক্ষীণভাবে হাসিয়া, পর্স´নের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিবার জন্য পাশ ফিরিতে গিয়া, সহসা লীনা চমকিয়া দেখিল, তা'র দুই বাহুতে 'ইঞ্জেকসনের' ক্ষত! বিস্মিত হইয়া সে বলিল, "ও, তাই ব্যথা-বোধ হচ্ছিল। পার্স´ন, আমার অবস্থা কি খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া পার্সন বলিলেন, "কিছু না, কিছু না, তবে মাথার গোলমাল একটু বেশী মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল বলে ডাক্তাররা ভয় পেয়েছিলেন, বুঝি-বা 'মেরিঞ্জাইটীশ্ ফেরিঞ্জাইটীশ্' দাঁড়ায়।"—পার্সন সহসা চুপ করিয়া জানালার দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "দেখুন, একটা কথা বলে দিই, বন্ধুত্বের খাতিরে আমার এই অনুরোধটি আপনাকে রাখ্‌তে হবে।"

ধৈর্য্য-ভার-ক্লান্ত চক্ষু-দু'টি পার্সনের মুখের দিকে স্থাপন করিয়া লীনা বলিল, "কি বন্ধু?"

পার্সন নিজের হাতের আঙ্‌টি-টার দিকে চোখ রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, আমরা যে-সব আত্মীয়-বন্ধুদের বেশী ভাল বাসি, তাঁদের অল্প দুর্ব্যবহারই আমাদের কাছে মহাদুঃখ-জনক, তা খুব জানি। এই ধরুন, আমার কথাই বলি।—আমি আমার মাকে খুব ভাল-বাসি, কিন্তু'···বাধা দিয়া লীনা ঈষৎ অধীর ভাবে বলিল, "আমার সম্বন্ধে কি বল্‌তে চান্ বলুন। তাই, প্রলাপের ঝোঁকে আমি বোধ হয়···············?" লীনার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কথাটা অর্দ্ধপথে থামাইয়া উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে পার্সনের মুখ-পানে চাহিল।

পার্সন জলপটি বদ্‌লাইতে বদলাইতে উদাস-ভাবে বলিলেন, "না, না, প্রলাপ অবশ্য মাথা-গরম হওয়ার জন্যেই। সে প্রলাপের বাজে কথায় আমি কাণ দিতে চাই নে,··· ·····ও কি? বা! মিঃ পিকক্ যে হঠাৎ!" পার্সন ছুটিয়া জানালার কাছে গিয়া, বাহিরের ফটকের দিকে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিলেন।

লীনার আপাদ-মস্তক হঠাৎ যেন অপরি-সীম আতঙ্কে আড়ষ্ট-কাঠ হইয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া জানালার দিকে যে চায়, সেটুকু শক্তিও জুটিল না। স্তব্ধ নিনিমেষ দৃষ্টিতে পার্সনের দিকে চাহিয়া, শুষ্ক-কম্পিত বিবর্ণ ঠোঁট-দুটা সজোরে দাঁতে চাপিয়া সে আত্মসংবণের চেষ্টা করিতে লাগিল। পিকক্? হঠাৎ?—একি অদ্ভুত ব্যাপার! ....লীনার মাথা ঘামিতে লাগিল। পার্সন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসি-মুখে বলিলেন, "আপনাকে জানাবার অবকাশ হয় নি, মাপ করুন্। পর্শু মিঃ পিকক্‌কে আপনার অসুখের খবরটা আমরা টেলিগ্রামে জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম; কাল অবশ্য অপেক্ষাকৃত সুস্থতার খবরও জানিয়েছি। উনি এসে পড়েছেন, মিঃ ডবসন্ সঙ্গে রয়েছেন; ওঁর কাছে আজকের খবর পেয়েছেন নিশ্চয়ই। আমি এখন বিদায় নিই!—না, না, মিঃ পিকক্‌কের চা-খাওয়ার বন্দোবস্তটা করে দিয়ে যাই, কি বলুন? বিদায়।"

লীনার অসাড়-নির্জ্জীব ওষ্ঠাধর একবার মৃদু কাঁপিল, কিন্তু কণ্ঠে এতটুকুও শব্দ বাহির হইল না। পার্সন দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

ভয়ে, ক্ষোভে লীনার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। ইহাঁরা কেন লীনাকে না জানাইয়া তাহার অসুখের খবর পিক্‌কের কাছে জানাইলেন? এই যে পিকক্ লৌকি-কতা রক্ষা করিতে ভদ্রলোকের মত আসিলেন, ইহার ফলে লীনার ভাগ্যে কি লাঞ্ছনা জুটিবে, তাহার কোন অনুমান কি ইহাঁরা করিতে পারেন? হায় গো, হিতৈষীর দল, তোমাদের হিতৈষিতার অত্যাচারে লীনার কি বিপদ্

বাড়াইলে, তাহার কোন খোঁজ্ যদি রাখিতে!

বন্ধুদের উপর মন যতই তিক্ত হইয়া উঠুক্, কিন্তু উপস্থিত বিপদটা যে কেমন করিয়া সামলাইবে, লীনা তাহার কোনই সন্ধান পাইল না। তা ছাড়া, এখন সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবে, কি আয়াদের ডাকিয়া কষ্টে সৃষ্টে বাহিরে যাইবার উদ্যম করিবে, কিংবা যেমন অসাড়-নির্জ্জীব ভাবে পড়িয়া আছে, তেমনি নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকিবে, নিজের জন্য এ-তিনের কোনটা করিবে, কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না। মহাদুর্ভাবনায় উল্টা মাথা গরম হইয়া সমস্ত চিন্তাশক্তিকে ঘুলাইয়া দিল। হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া সর্ব্বাঙ্গে কাল ঘাম ছুটিতে লাগিল।

বাহিরে জুতার শব্দ হইল। আয়া দুয়ারের পর্দা সরাইয়া দিল। পিকক্ চৌকাঠ ডিঙ্গাইতেই, পর্দা টানিয়া দিয়া আয়া সরিয়া গেল।

মাথা হইতে টুপিটা নামাইয়া টেবিলে রাখিয়া, অপ্রসন্নভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পিকক্ রুক্ষ দৃষ্টিতে একবার শয্যার দিকে চাহিলেন। লীনা প্রাণপণে "মোরিয়া" হইয়া, দুর্ব্বল কম্পিত হাতখানা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া অস্ফুট জড়িত স্বরে কি একটা অভ্যর্থনাসূচক শব্দ করিল। পিকক্ সায়-উত্তর না দিয়া প্রচণ্ড তাচ্ছীল্যে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, বিছানা হইতে সব চেয়ে দূরে যে চেয়ারখানা ছিল, সেইটার উপর বসিলেন, এবং মিনিট-পাঁচ চুপচাপ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া, টুপিটা তুলিয়া লইয়া নীরবে প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

লীনার অধীর ব্যাকুল প্রাণটা যেন ঠিক্‌রাইয়া পাঁজর ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিবার জন্য আকুল-মত্ততায় বুকের ভিতর মাথা ঠোকাঠুকি করিতেছিল। সে স্বামীকে উঠিতে দেখিয়া মরণান্তিক চেষ্টায় শুষ্ক রুদ্ধ স্বরে বলিল, "একটু দাঁড়াও, একটু!"

তীব্র কঠিন স্বরে পিকক্ উত্তর দিলেন—"দাঁড়াবার সময় নাই, আধঘণ্টা পরেই আমার ট্রেণ।"

ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া লীনা বলিল, "এখনি যাবে?"

সটান্ চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়া পিকক্ উত্তর দিলেন, "হাঁ।"—পরক্ষণেই তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

লীনা স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে, কি পাতালে, কিংবা এ তিন লোকের অতীত কোন সুদুর্লভ শূন্যলোকে ভর দিয়া অবস্থান করিতেছে, সে-টা ঠিক করিয়া বুঝিতে মিনিট দশ কাটিয়া যাইবার পর, দেখিল, সামনের বারেণ্ডায় ডবসনের উচ্চ হাস্যধ্বনি ও পিকের রুষ্ট উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। বুকের রক্ত যতই হিম হইয়া আসুক্, এবং রুগ্ন-দুর্ব্বল মস্তিষ্ক যতই ক্লান্তি-বিকলতায় ভোঁ ভোঁ করিতে থাকুক, কিন্তু ঐ রাগভরা কথাগুলা শুনিবার জন্য লীনার প্রাণ চতুর্গুণ আকুল হইয়া উঠিল! হায় ভগবান্, এত লাঞ্ছনাও লীনার অদৃষ্টে লিখিয়াছিলে! নিজের অপরিসীম দুঃখের ভারে নিজে তো পিষিয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে-ই, তাহার উপর সে ঐ হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্রগুলির পর্য্যন্ত যে কত ক্লেশভোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেটা মনে পড়িলে যে লজ্জায় ঘৃণায় তাহার আত্ম-ঘাতী হইতে ইচ্ছা করে!—

দুয়ারের পাশে আয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

লীনার ইঙ্গিতে সে ঘরে ঢুকিয়া, বারেণ্ডার দিকের জানালাটা সাবধানে নিঃশব্দে খুলিয়া দিল। খাটের প্রান্তেই জানালা। লীনা সেই দিকে একটু সরিয়া গিয়া, একটা বালিশে ভর দিয়া উৎকর্ণ হইয়া বাহিরের কথাবার্ত্তাগুলা শুনিতে লাগিল।

পার্সন তখন খুব সংযত-ধীর-কণ্ঠে কি বলিতেছিলেন। কথাগুলা শোনা গেল না। উত্তরে পিকক্ বেশ একটু চড়া আওয়াজে তীব্র শ্লেষ-ভরে বলিলেন, "পয়সা,—একটি পয়সা উপায় করা, সে যে কি কষ্টের কায, সেটা যাদের পয়সা উপার্জ্জন করতে হয়, তাহারাই জানে! মিঃ ডবসন্ খোশ-খেয়ালে ছবি এঁকে লোক ঠকিয়ে সস্তা দরে পয়সা উপার্জ্জন করেন,—দাসত্বের দুঃখ শুনে ওঁর হাসির ভাবনা কি? ফাজিল, নিষ্কর্ম্মা, অপদার্থের হাসিই তো একমাত্র সম্বল! ও সব লোক আমি দু'টি চক্ষে পছন্দ করি না।"

ডবসন্ অম্লান-কৌতুকে টিপি টিপি হাসিয়া, চেয়ারটা সশব্দে সরাইয়া পিছু হাটিতে হাটিতে বলিলেন, "দোহাই মিঃ পিকক্, আপনার চক্ষুঃশূল হাসিটা আপনার চোখের সামনে হাসতে আমি মোটেই রাজী নই। মাপ করুন! আপনার চেয়ারের পাশে আমি আড়াল হয়ে নিরাপদে বসছি, এখন সুস্থির হয়ে কথা বলুন।"

পার্সন নিম্নস্বরে কি বলিলেন, স্পষ্ট শোনা গেল না। উত্তরে পিকক্ সজোরে টেবিল চাপড়াইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "দেখুন, স্ত্রীলোক চিরদিনই স্ত্রীলোক, আর পুরুষ চিরদিনই পুরুষ,—এইটুকু আপনারা ভাল করে মনে রাখবেন। স্ত্রীলোক যে পুরুষের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলতে যাবে, তা কখনই হতে পারে না।"

পার্সন একটু হাসিয়া বলিলেন, "স্ত্রী-লোকেরা যে কেবল পুরুষের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলবার জঘন্য দুরভিসন্ধি নিয়েই জগতে এসেছে, এ ছাড়া তাদের জীবনে আর কোন উদ্দেশ্যই নাই,—এ রকম অদ্ভুত প্রমাণ আশা করি ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের হাতে কিছু নাই? অন্ততঃ—"

বাধা দিয়া অসংযত-উত্তেজনার সহিত কর্কশ চীৎকারে পিকক্ বলিলেন, "নাই? কি বলেন আপনি? শরীর আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে ঐ জন্যে, রাগে আপাদমস্তক বিষিয়ে উঠেছে! স্ত্রী-জাতিটার জাতিতেই দোষ!—এমন লঘুচেতা বিশ্বাসঘাতী জাতিকে যে আহাম্মকেরা সম্মানের চোখে দেখে, তাদের উপর পর্য্যন্ত আমার ঘৃণা—দারুণ ঘৃণা হয়ে গেছে।—"

ডবসন্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেশ একটু ঝাঁঝালো বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "রাগ করবেন না মিঃ পিকক্, পাগ্‌লা-গারোদ এখান থেকে অনেক দূর, এবং বাড়ীতেই একজন অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগী বাস করছেন। আপনার কণ্ঠধ্বনির বিষের ঝাঁঝটা তাঁর স্বাস্থ্য-শান্তির পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। অন্ততঃ ভদ্রত্বের দোহাই দিয়ে কথাটা স্মরণ করাচ্ছি।"

পিককের আস্ফালন-উত্তেজিত, দাম্ভিক ঠোঁট-দুইখানা সহসা যেন ঘুসি খাইয়া থেঁতো হইয়া গেল। নিজের ভদ্রত্বের মর্য্যাদাটা অভিমান-ভরে অন্তরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। মনের বিষ মনেই চাপিয়া মানের দায়ে নিজের

অভদ্র চীৎকারটা বন্ধ করিয়া তিনি গুম্ হইয়া চা খাইতে লাগিলেন।

ডব্‌সন্ বারেণ্ডার এ-দিকে ও-দিকে পায়চারী করিতে করিতে, ফুলগাছের টব-গুলার শোভা-নিরীক্ষণে মনোযোগী হইয়া মিনিট-দুই নীরব থাকিয়া হাসি হাসি-মুখে যেন নিজ-মনেই বলিলেন—"পুরুষ চিরদিনই পুরুষ, কোন দিন কারুর খাতিরে তারা যে মেয়েমানুষ হয় নি, এ কথাটা গুলিখোর ঔপন্যাসিকরা ছাড়া আর সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, এবং অকুতোভয়ে, অধীনস্থ-দুর্ব্বলদের উপর বর্ব্বর দম্ভে, দৈত্যশক্তির সদ্ব্যবহারই যে পুরুষের চিরন্তন পৌরুষ-গর্ব্বের শ্রেষ্ঠতম গৌরব,—এ সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তার মতটা কি তা জানিনে বটে, কিন্তু শুনেছি সকল দেশের বিবাহিত মাতাল এবং পৈত্তিক বাতিকে উন্মাদগ্রস্তরা এ-বিষয়ে একমত! কিন্তু আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট-বন্ধুর আইন-বিদ্যাও যে এ মতের সমর্থক, তার কোন খবরই আমি জানতুম্ না!"

ঘরের ভিতর, সকলের চোখের আড়ালে বসিয়া যে প্রাণীটি ইহাঁদের কথাগুলা শুনিতে-ছিল,—ডব্‌সনের কথায় ভয়ে তার প্রাণ উড়িয়া গেল! অন্ধ অহঙ্কার-মত্ত দাম্ভিক সব ক্ষতি সব খেসারৎ সহিতে পারে, কিন্তু দম্ভের মাথায় এতটুকু আঁচড় লাগিলেই, রাগে সে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান হারাইয়া ফেলে!—বিশেষতঃ পিকক্! মনে মনেই ডব্‌সনের স্পষ্টবাদিতা ও সাহসের মুণ্ডপাত করিতে করিতে লীনা সত্রাসে কান খাড়া করিয়া বসিল,—এই বুঝি ডব্‌সনের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়!

কিন্তু পার্সনের কৃপায় ডবসনের চৌদ্দ-পুরুষ সে-যাত্রা নির্ব্বিঘ্নেই পরিত্রাণ পাইলেন কারণ, পার্সনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাঁহাদের ক্যাম্প হাঁসপাতালের দুইজন কলেরা-রোগীর অবস্থা সকাল হইতে অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে; সে হতভাগা দুইটাকে শেষ দেখা দেখিতে হইলে, অবিলম্বেই যাওয়া চাই। ক্রুদ্ধ পিকক্‌কে ক্রোধ-প্রকাশের অবসরমাত্র না দিয়া পার্সন হঠাৎ ব্যস্তভাবে বিদায় লইলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া বিদায় লইয়া ডবসন্‌ও পার্সনের সঙ্গে চলিলেন।

লীনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; শুইয়া পড়িয়া, ধীরে সুস্থে মনে মনে হিসাব ঠিক করিতে লাগিল, পিককের নিষ্ফল-আক্রোশে উদ্যত ক্রোধ-বজ্রটা এবার কার ঘাড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িবে? লীনার ঘাড়েই নিশ্চয়! কিন্তু লীনা আত্মরক্ষা করিবে কোন্ উপলক্ষ্য ধরিয়া?

কিন্তু উপলক্ষ্য ঠাওরাইতে লীনা বেশী সময় পাইল না। দুইমিনিট পরেই বালক-ভৃত্যটা পর্দ্দার বাহির হইতে ঘরে ঢুকিবার অনুমতি চাহিল। লীনা অনুমতি দিল। বালক ঘরে ঢুকিয়া শুষ্ক-ভীত-মুখে বলিল, "মিঃ মরিস্ যে চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছেন, সাহেব সেটা চাইচেন।"

লীনা শান্ত ধৈর্য্যের সহিত উত্তর দিল, "সেটা রেজিষ্ট্রী অফিসে আছে, আমার কাছে নাই

কথাটা বাস্তবিকই সত্য; লীনা সেই রাত্রে অসুখে পড়ে; দলিলটা-রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে তুলিয়া আনাইবার সময় পায় নাই।

'বয়' চলিয়া গেল এবং দুই মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিয়া লীনার হাতে একটুক্‌রা

কাগজ দিল। কাগজে লেখা আছে--"স্ত্রীলোকরা যে কেবলমাত্র পুরুষদের শাসনের ভয়েই সৎ ও পবিত্র থাকে, তা আমার খুব জানা আছে। হয় মানে মানে দলিল দাও, নয় আমি চাবুকের সদ্ব্যবহার কর্ত্তে বাধ্য হব।"

রাগে, অপমানে, ঘৃণায় লীনার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সঙ্গেই শারীরিক অত্যাচার-পীড়ন-ভয়ে, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল! অসহায়, সম্পূর্ণ অসহায় হতভাগ্য সে! আধমরা দেহ লইয়া মৃত্যুর দুয়ারে মাথা গলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—একটু, শুধু একটু হৃদ্‌স্পন্দন-বেগ হ্রাস-বৃদ্ধির অপেক্ষা মাত্র!—তাহা হইলেই নিরুপদ্রবে ইহজীবনের সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়! হে ভগবান্, সেটুকুর পরিবর্ত্তে পাশবিক হিংসার ক্রূর অত্যাচারে অপঘাত মৃত্যু......! কিন্তু থাক্ নিজের মৃত্যু-ভয়! আপাততঃ এই অভাগা দরিদ্র বালককে আগে বিপদের মুখ হইতে বাঁচান যাক্। পরের প্রাণ কেন অনর্থক নষ্ট হয়?--এর হাতে প্রত্যুত্তর পাঠাইলে, এ তো এখুনি আগে মরিবে!

ইসারা করিয়া ভৃত্যকে কাছে ডাকিয়া লীনা চুপি চুপি বলিল, "ঐ পিছনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে হাতার পাঁচিল টপ্‌কে পালাও।—সাহেব যতক্ষণ বাড়ীতে থাকবেন্, ততক্ষণ কুঠিতে ঢুকো না। পালাও শীঘ্র।"

জড়-বুদ্ধি বালক বিস্ময়-ভীত দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "পালাব? কোথায় পালাব?"

লী। যেখানে খুসী,—যমের বাড়ী! পালাও শীঘ্র! সাহেব চাবুক নিয়ে আস্‌ছেন ঐ, দৌড়!"

ছেলেটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পীড়নের ভয়, বড় ভয়ানক জিনিষ! এক লাফে জানালা ডিঙ্গাইয়া সে দ্রুত অন্তর্দ্ধান করিল।

লীনার চোখ ছাপাইয়া জল আসিতেছিল! হায় ভগবান্, যদি এমন ঘৃণিত-হীনতায় অঙ্কেই লীনাকে দাঁড় করাইবে, তবে ভদ্রের সাজ পরাইয়া কেন তাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলে? জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত সে পৃথিবীতে এমন কোন অন্যায়, কোন অধর্ম্ম, কোন অসত্যকে আশ্রয়দান করে নাই, যার প্রতিক্রিয়া-বশে, ন্যায়ের কাছে, সত্যের কাছে, ধর্ম্মের কাছে সে এতটুকুও দণ্ডিত হইতে পারে। তবু তাকে দণ্ডিত হইতেই হইবে,—এই সম্পূর্ণ অন্যায় অত্যাচারের কাছে? যে অত্যাচারের কারণ নাই, কৈফিয়ত নাই,—আছে শুধু শারীরিক-শক্তি-মাৎসর্য্যের দম্ভ, আর মানুষের হাতে-গড়া সম্পর্ক-বিধানের উগ্র কঠোর প্রভুত্ব-দর্প!.........উৎসন্ন যাক্ মৃত্যু-ভয়! মরিতে একদিন হইবে-ই। অনেক অত্যাচার স্পর্দ্ধাকে নীরবে সহিয়া, সে অত্যাচারীর পাপ-স্পর্দ্ধাকে অনেক প্রশ্রয় দান করিয়াছে, আর নয়! নিজের নিরঙ্কুশ ভদ্রত্বের মান বাঁচাইবার জন্য, স্বামীর অমানুষিক স্বামিত্ব-দম্ভের চরণে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া সে নিজের মনুষ্যত্ব-টুক্ নিঃশব্দে বলিদান দিয়াছে, আজ সেই পাপই সংহার-মূর্ত্তি ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে নয়?—এবার কোনও ভদ্রতা কোনও ভালমানুষী তাকে বাঁচিবার পথ বলিয়া দিতে পারিবে কি?—না, অসম্ভব! মানুষকে বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিতে—শুধু তার মনুষ্যত্বের দাবীটুক্, আর কেউ নয়;—অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে আর কেউ নয়!

বারেণ্ডা হইতে পিকক্ গর্জ্জিয়া হাঁকিলেন "বয়।"

লীনা বিছানার উপর সোজা হইয়া বসিয়া প্রাণপণ শক্তিতে উত্তর দিল, "নাই সে এখানে। আমি তা'কে অন্যত্র পাঠিয়েছি।"

পিকক্ গট্ গট্ শব্দে দুয়ারে আসিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কার হুকুমে সে গেল?"

স্থির দৃষ্টিতে সেই মূর্তিমান উগ্র-দম্ভের দিকে চাহিয়া লীনা উত্তর দিল—"আমার হুকুমে। এ বাড়ীর সমস্ত দাস-দাসীরা আমারই বেতন-ভোগী। তুমি তাদের ওপর প্রয়োজন-মত আদেশ দানের অধিকারী ছিলে বটে, কিন্তু অন্যায় অত্যাচার করবার কোন অধিকার তোমার ছিল না; সেটা আজ সুস্পষ্ট স্বরেই তোমায় জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আর তুমি চাবুকের ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে বলপূর্ব্বক দলিল আদায় করতে চাও? বাস্তবিকই তোমার এতদূর নৈতিক উন্নতি হয়েছে! এ কি সত্য?"

পিকক্ চোখ পাকাইয়া উদ্ধত-ভাবে বলিলেন, "হাঁ হয়েছে, তার হবে কি? তোমার তাতে কি?"

লীনার আপাদমস্তকে বিষাক্ত-উত্তেজনার বিদ্যুৎ-ঝিলিক্ বহিয়া গেল। কোথা হইতে যে শক্তি জুটিল, বলা যায় না! তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র কণ্ঠে লীনা বলিল, "আমার কি? বটে! তুমি নিজের ভদ্রত্বের সম্মান ভুলে গেছ অনেক দিনই, তবু তোমার সম্মান রক্ষার জন্য, অকাতরে আমি অসহ্য-অপমান সহ্য করে আসছি এতদিন,— সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। কিন্তু আর নয়।—বিবাহটা যে লোহার পিঞ্জর নয়, আর বিবাহিতা পত্নী যে সত্যিকার পিঞ্জরাবদ্ধ নিরুপায় পশু নয়, সে কথা আজ তোমায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেব।—চল পুলিশ ষ্টেশনে, তোমার চাবুকের দৌড় দেখে নিচ্ছি। স্বামিত্বের দোহাই দিয়ে, কত ভয়ানক-শূরত্ব প্রকাশের ক্ষমতা আছে, তা বুঝে নিচ্ছি আজ ভাল করেই।"

পিকক্ জীবনে অনেক অবস্থায় পড়িয়াছেন, এবং অনেক সঙ্কটের মাথায় অনেক রকম অদ্ভুত বুদ্ধি খাটাইয়া চট্ পট্ দায়োদ্ধার হইয়াছেনও সহজেই! এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়া, মনে মনেই নিজে নিজকে বিস্তর বাহবা দিয়াছেন! কিন্তু আজ তিনি জীবনে প্রথম চমৎকৃত, এবং বোধ হয় সব চেয়ে বেশী হত-বুদ্ধি হইলেন, লীনার মুখে পুলিশের নাম শুনিয়া! পিকক্ অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন! উগ্র-ক্রোধে অপ্রকৃতিস্থ লীনা, টলিতে টলিতে উঠিয়া জুতাটা পায়ে দিয়া যখন টুপিটা হাতে লইল, তখন হঠাৎ পিকক্ তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া, চক্ষের নিমেষে লীনার শীর্ণ দুর্ব্বল হাতের মুঠা হইতে কাগজের টুক্‌রাটা ছিনাইয়া লইয়া নিজের মুখে পুরিলেন। পর মুহূর্ত্তেই সেই বেপথু-মান দুর্ব্বল দেহটা ঘুরাইয়া শূন্যে তুলিয়া বিছানায় ফেলিয়া, এক এক টানে পায়ের জুতা দুইটা খুলিয়া টান-মারিয়া ঘরের কোণে ছুড়িয়া ফেলিয়া, উগ্রকণ্ঠে হাঁকিয়া বলিলেন, "কে আছিস্ ওখানে, জল্‌দি আইস্ ব্যাগ তৈরী করে আন্; আর খানিকটা ব্রাণ্ডি মেশানো দুধ।"—সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাগজটা দাঁতে চিবাইয়া পিণ্ড পাকাইয়া, তিনি জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

দুয়ারের বাহির হইতে বেয়ারা ও আয়ারা অভিবাদন জানাইয়া আদেশ পালনের জন্য দৌড়িয়া গেল।

আকস্মিক ঝাঁকুনী খাইয়া, অবসন্ন মূর্চ্ছাতুর লীনার বাক্‌শক্তিটা ক্ষণিকের জন্য সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ভিতরে অনুভব-শক্তিটা বেশ উগ্র-সচেতন ভাবেই কাজ করিতেছিল। স্বামীর এই অদ্ভুত ব্যবহারে সে হাসিবে কি কাঁদিবে, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করিল,—কে একজন যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া লীনার দেহের চামড়া ও পেশীর অভ্যন্তরের প্রত্যেক হাড়ের ভিতর চিম্‌টি কাটিয়া কাটিয়া, তীব্র-ব্যঙ্গে পরিহাস করিয়া অসহ্য বিদ্রূপাত্মক দরদ দেখাইতেছে!—

কখন যে 'আইস্ ব্যাগ' আসিয়া মাথায় চড়িল, এবং কেই-যে গলার ভিতর খানিকটা বিস্বাদ তরল পদার্থ ঢালিয়া, জোর করিয়া গিলাইল,· লীনা কিছুই ভাল টের পাইল না; যখন প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখ মেলিয়া চাহিল—তখন দেখিল, স্বামী মাথার কাছে আড় হইয়া শুইয়া 'আইস্ ব্যাগ' ধরিয়া আছেন, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই।

পাছে অবাধ্য চোখ দিয়া একনি হু হু-শব্দে জল ঝরিয়া পড়ে, সেই ভয়ে লীনা তাড়াতাড়ি চোখ বুজিল। কেন বলা শক্ত, কিন্তু নিজের উপর হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিতেই তাহার ইচ্ছা হইল!—পাছে আবার নূতন কিছু অধীরতা প্রকাশ করিয়া ফেলে, সেই-ভয়ে লীনা প্রাণপণে শক্ত হইয়া, আড়ষ্ট কাঠের মত পড়িয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে পিকক্ আস্তে আস্তে ডাকিলেন, "লীনা!"—লীনা চোখ বুজিয়াই উত্তর দিল—"কেন?"

পিকক্ সোজা হইয়া বসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা আমি যদি এখন তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত হই, তা হলে তুমি কি পূর্ব্বের রাগ-রোষ ভুলে গিয়ে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে নিরস্ত হও?"

উত্তপ্ত মর্ম্ম-ব্যথায় লীনার চোখ দিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুস্রোত ছুটিয়া আসিতে চাহিল।—হায় স্বামি! তোমার পায়ের কাছে নত-জানু হইয়া, কত দিন কাতর-কণ্ঠে লীনা তোমার একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহিয়াছিল,—শুধু একটা অনুগ্রহ, দীন প্রার্থনার ভাষায় ভিক্ষা চাহিয়াছিল,—'তোমার স্বভাবের দোষ-গুলা সংশোধন কর'!—কিন্তু মনে আছে কি,—কত নিষ্ঠুর, উদ্ধত অবজ্ঞার পদাঘাতে তুমি সেই মঙ্গলপ্রার্থি-ভিক্ষার্থীর হৃদয়টা গুঁড়া করিয়া দিয়াছিলে!......আজ তোমার সেই উগ্র অপ্রকৃতিস্থতা হঠাৎ শান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া গেল, কি মন্ত্রে? পুলিশের নামে! বাঃ! ঘৃণায় যে লীনার মাটীতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে! এই হৃদয়বল লইয়া তুমি কি না, লীনার উপর অপার—অসীম আধিপত্য প্রকাশের অধিকারী! বাঃ!—লীনা কোন উত্তর দিল না।

লীনাকে নির্ব্বাক নিস্পন্দ দেখিয়া, পিকক্ ঈষৎ অধীরভাবে বলিলেন, "তোমার মতলব কি খুলে বল। তোমার তিন হাজার টাকা আমি ফেরত দিতে রাজি আছি, তোমার 'হীরে' জহরৎ-এর গয়নাও আমি ফিরিয়ে দেব,—যার জন্যে আমার ওপর আজ তোমার এত আক্রোশ, সে সব আমি বুঝতে পারছি।

—তোমার সব জিনিস ফেরৎ দেব,—এখন বল, আমি যদি ক্ষমা চাই—"

বাধা দিয়া, প্রসারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, ঈষৎ-তীব্রতা-মাখানো ক্ষীণকণ্ঠে লীনা বলিল, "যদি ক্ষমা চাই! আর্য্যার, বিবাহিত জীবনটা কি কতকগুলা নীচ স্বার্থের চুক্তি-সূত্রে গাঁথা একটা ঘৃণ্য ব্যবসায়ের স্থান? তুমি আমার হীরে জহরৎ—মায় হাত খরচের টাকাগুলো পর্য্যন্ত সরিয়ে ফেলে, আমায় বড় জব্দই কর্‌তে চেয়েছিলে! সে চেষ্টা বিফল হোল দেখে, আজ দায়ে পড়ে,—সেইগুলোই উৎকোচ দিয়ে,—'যদি ক্ষমা চাই', এই স্তোক বাক্যের প্রলোভন ঝেড়ে, আমার অন্তরের স্বাধীনতাটুকু কিনে নিতে এসেছ?—কিন্তু না, আমায় ক্ষমা কর,—আমি তত নির্ব্বোধ নই।"—

পিকক্ গরজের দায়ে ঠেকিয়া যে ধার-করা শিষ্টতার মুখসটা পরিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তে সেটা খসিয়া পড়িল! গর্জ্জিয়া উঠিয়া, বিছানার উপর সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে! দুনিয়ার অল্পবুদ্ধি মেয়েগুলো যখন বড়াই করে প্যাঁচালো বুদ্ধি খেলাতে যায়, তখন আমার সর্ব্বশরীর জলে ওঠে! সাবধান বল্‌ছি, আমার ওপর বুদ্ধি খাটাতে চেও না। যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি সোজাসুজি তার জবাব দাও।"

অন্য সময় এই রকম ধমক-ধামক, তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিলেই লীনা ভয়ে থতমত খাইয়া, হতবুদ্ধি নিরুত্তর হইয়া পড়িত; কিন্তু আজ পিককের গর্জ্জন নিষ্ফল হইল। স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া লীনা বলিল, "তোমার অনেক আধিপত্যই আমাকে বলপূর্ব্বক সহ্য করিয়েছে, কিন্তু আমার বুদ্ধি, চিন্তা, মনের ওপর কোন আধিপত্য স্থাপন কর্‌তে পেরেছ কি কোন দিন? যাও, বৃথা কথা বাড়িয়ে, ক্রোধের আগুনে মস্তিষ্কটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ কোরো না।......তোমার আমায় মাঝের সম্পর্কটা যে খরিদ্দার-ঠকানো, মিথ্যা চাতুরীর দোকান-দারী দিয়ে গড়া নয়, এ সত্য যতদিন বিশ্বাস করছি, ততদিন তোমার কার্য্যোদ্ধারের "খদির" চুক্তিতে বাঁধা, কোন ক্ষমা চাওয়ার কথা আমায় বোলো না।"

পিকক্ গুম্ হইয়া খানিকটা ভাবিয়া রুষ্টস্বরে বলিলেন, "তুমি জানো, তোমায় কুকুরের মত দোরে দোরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবার ক্ষমতাটা এখনো আমার হাতের মুঠোয় আছে? তুমি সন্তানের সম্পত্তি চুরি করে পরের হাতে তুলে দিয়েছ, এ কথা আজ যদি আমি আইনের সাহায্যে আদালতে প্রমাণ করি, তা হ'লে আজ তোমার পৃথিবীতে দাঁড়াবার স্থান নাই, তা জানো?"

লীনা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ক্ষোভে কান্না আসিতে লাগিল, হায়,—দৈহিক শক্তিটা এমন দুনিবার রোগ-পঙ্কে ডুবিল যে, শিকলে বাঁধা বিড়াল-ছানার মত, উপর্য্যুপরি জুতোশুদ্ধ লাথি খাইয়া 'চিড়ে চ্যাপ্টা' হইয়া মরিতে হইবে? হে ভগবান, হে ভগবান, একবার শক্তি দাও, মুহূর্ত্তের জন্য শক্তি দাও।

লীনা উঠিতে গিয়া অবসন্নদেহে পড়িয়া গেল। দ্রুত শ্বাস টানিয়া, হতাশ ব্যাকুলভাবে সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল দেখিয়া পিককের অবাধে যথেচ্ছ বাক্য-স্রোত চালাইবার সুবিধাটা বাড়িয়া গেল! তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া

তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার সেই শাস্তিই ঠিক! তোমার চরিত্রের জঘন্য কলঙ্ক ঢাকবার জন্য লোকের চোখে অনেক ধূলো দিয়ে বেড়িয়েছি; ভুল করেছি আমি। দাঁড়াও, এবার তোমার সর্ব্বনাশ করছি।—"

মর্ম্মাহতা সিংহী যেন শূলের খোঁচা খাইয়া মরণান্তিক ঔদ্ধত্যে গর্জ্জিয়া উঠিল। মাথা তুলিয়া লীনা দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "কি? বল আর একবার, ভাল করে বল। আমার চরিত্রের জঘন্য কলঙ্ক? ঈশ্বরের দোহাই সত্য বল? ....."

পথের পাশে নিশ্চিন্ত-শায়িত কুকুর হঠাৎ বেত খাইলে যেমন আগে ছুটিয়া গিয়া মোড়ের আড়ালে আশ্রয় লয়, তারপর নিস্ফল-আক্রোশে প্রাণ খুলিয়া গর্জ্জিয়া ভয় দেখাইতে চায়,—পিকক্ ঠিক তেমনি ভাবে তীরবেগে ঘরের বাহিরে গিয়া, দুয়ারের পাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "তুমি অধঃপাতে গেছ, তোমার মৃত্যুই মঙ্গল! তুমি আমায় পুলিশে দিতে চাও, এত স্পর্দ্ধা তোমার? আমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তুমি টিকবে?.........তুমি দুশ্চরিত্রা,—তুমি নিজ হাতে সন্তানকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে গিয়েছিলে, আমি মুক্তকণ্ঠে আদালতে সে-কথা স্বীকার করবো।"

লীনার রুগ্ন-বিকল দেহ মন উন্মাদ-যন্ত্রণার প্রচণ্ড বিদ্যুত্তাড়নে সবেগে কাঁপিয়া উঠিল! স্তম্ভিত, আত্মবিস্মৃত লীনার মুখ হইতে হঠাৎ বজ্রবেগে নিদারুণ অভিশাপ-বাক্য খসিয়া পড়িল—"ভগবানের ন্যায় দণ্ড বলে যদি সত্য কোন জিনিষ থাকে, তবে সে মিথ্যাবাদীর মাথায় ভেঙে পড়ুক!'

পর-মুহূর্ত্তেই লীনা সভয়ে শিহরিয়া উঠিল! আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিতে গিয়া সহসা সংজ্ঞাহীন নির্জ্জীবের মত বিছানার উপর সে লুটাইয়া পড়িল! মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীটা যেন লীনার মগজের ভিতর ঢুকিয়া প্রলয়-উল্লাসে অট্টহাস্য করিয়া প্রবল ভূমিকম্পে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল!

পিকক্ নির্দ্দয় বজ্র-কটাক্ষে একবার লীনার দিকে চাহিয়া রুষ্ট-নিশ্বাসভাবে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন!

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মানবের মূঢ়তা

বিধাতার পেয়ে আশীর্ব্বাদ
হে মানব! আইলে ধরায়,
পদরেণু তাঁহার লইয়ে,
আপনার হৃদয়ে ধরিয়ে—
তাঁহার জ্ঞানের কণিকায়।

প্রীতিমন্ত্রে দীক্ষা ল'য়ে তাঁর
বলি' এলে পরশি' চরণ—
"হে বিভু! রাখিব তব মান
দিলে যদি বরদেহ দান,
তব মন্ত্রে নিয়োগি' জীবন।"

কিন্তু একি? কৃতঘ্ন মানব!
কোথা যায় শপথ তোমার?
যবে হেরি ভুলি' মন্ত্র তাঁর
নিরয়ের আন অত্যাচার!

একজন কেঁদে কেঁদে মরে
বিষাদের গাহি ক্ষীণ সুর,
পিশাচের অট্টহাস তুলি'
অন্যে তাহা করে দেয় চুর!

নিপীড়িত কাহারও হৃদয়
ফেলে যদি গোপনে নিশ্বাস,
অন্য জন সে বেদনা ল'য়ে
আড়ম্বরে করে পরিহাস!

অদৃষ্টের তাড়নার ভরে
মৌনী কেহ নাহি তুলে মাথা,
গঞ্জনার অঙ্কুশ-প্রহারে
অন্যে সুখী দিতে তারে ব্যথা!

শক্তিহীন একজনে হেরি'
নিপতিত আপন চরণে,
অন্যে শুধু প্রভুত্ব জানায়
সুনিষ্ঠুর পদ-বিদলনে!

দৈবের কৃপায় যদি কেহ
নিজগুণে লভে উচ্চতায়,
অন্যজন দহিয়া হৃদয়ে
রত তার অহিত-চিন্তায়!

একের ক্ষমতা হরি' হায়!
অন্যে চায় লভিতে শকতি,
একজনে করিয়া বন্ধন
অন্যে চায় আপন মুকতি!

বরজন্ম করিয়া ধারণ
বিধাতার আশীর্ব্বাদ পেয়ে,
এইরূপে সাধি' হীনতায়
প্রীতিমন্ত্র তাঁহার ভুলিয়ে,—

হে মানব! কর বৃথা তুমি
নরত্বের উচ্চ অভিমান,
বল কেবা মূঢ় তার চেয়ে
জ্ঞান পেয়ে যে হয় অজ্ঞান!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সমস্বর সঙ্গীত।

কল্যাণ মিশ্র——একতালা।

বালকগণ।— জীবন-প্রভাতে তোমার আলোকে
মেলিনু নয়ন-তারা ;

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য !

বালিকাগণ।— জননীর বুকে পাইনু পুলকে
স্বাদু দ্রব ক্ষীর-ধারা।

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য !

বালকগণ — পিতার বিপুল আদর সোহাগ
তোমার দয়ার দান ;

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকাগণ।— ভ্রাতা-ভগিনীর পূত অনুরাগ
প্লাবিছে শুষ্ক পরাণ।

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালকগণ।— বিতর' অন্ন হেরিলে খিন্ন,
তৃষাতুরে দেহ জল ;

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য !

বালিকাগণ।— ধরাময় তব চরণ-চিহ্ন,
সুন্দর সুশীতল।

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালকগণ। তোমার আলোক তোমার বাতাস
তোমারি বারতা কহে ;

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকাগণ।— তোমার ধরণী তোমার আকাশ
ঘরে ঘরে সুধা বহে !

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য !

বালকগণ।— সম্পদে সুখে চরম তৃপ্তি
তব নন্দন-ছাঁকা ;

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকাগণ।— বিপদে দুঃখে তোমার দীপ্তি
সৌম্য মমতা-মাখা।

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য

বালকগণ — ভোগে রোগে শোকে শিয়রে সতত
জাগ্রত ধ্রুবতারা;

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকাগণ।— দুকূল প্লাবিত সাগরের মত
অসীম করুণা-ধারা।

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালকগণ।— মঙ্গল তুমি, উজ্জ্বল তুমি,
বিমল সত্যময়;

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকাগণ।— সার্থক প্রাণ তব পদ চুমি,
জয় দয়াময় জয়।

সমস্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

রচনা——"দরবেশ।"

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতীমোহিনী সেন গুপ্তা

বালকগণ।

২
II র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সর্রা I না না না। ধা ধা ধা।
জী ব ন প্র ভা তে • তো মা র আ লো কে

৩
। পা পা পা। পা না ধা I পা -া -া। গা -া -া।
মে লি নু ন য় ন তা • • রা • •

বালক-বালিকাগণ।

গা -রা গা। মা মা -া I গা -া -রা। ন্া -সা -া।
ধ ন্য গো আ মি • ন্য • •

বালিকাগণ

০ ১ ২´ ৩
। রা গা রা। গা মা মা I গা রা রা। ন্া রা সা
জ ন নী র বু কে পা ই নু পু ল কে

০ ১ ২´ ৩
। সসা রা গা। গা ক্ষা ক্ষা I গা -পা -ধা। পা ।
স্বা দ্র দ্র ব ক্ষী র ধা • • রা •

বালক-বালিকাগণ।

। সা -ধা সা। সা রা -া I গা -ক্ষা -পা। পা -া -া II
ধ ন্য গো আ মি • • ধ • • ন্য •

বালকগণ।

I I গা গা গা। পা পা ধা I র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা -া।
পি তা র বি পু ল আ দ র সো হা গ

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্রা র্রা। র্রা র্রা র্রা I র্সা -র্রা -র্গর্রা। -র্গা -া -া
তো মা র দ য়া র দা • • • • • ম

বালক-বালিকাগণ।

০ ১ ২´ ৩
। র্গা -র্রা র্গা। র্মা র্মা -া I র্গা -া -র্রা। না -র্সা -া।
ন্য গো আ মি ধ • ন্য • •

বালিকাগণ।

০ ১ ২´ ৩
। র্গাঃ র্গঃ র্পা। র্গা র্রা র্রা I র্সা র্রা র্সা। না ধা -া
ভ্রা তা ভ গি নী র পূ ত অ নু রা গ
০ ১ ২´ ৩
। পাঃ -ধঃ না। না -া না I ধা না -র্সর্রা। -র্সা -া -া।
প্রা বি ছে শু য্ ক প রা ণ

বালক-বালিকাগণ।

৩
। গা -গা পা। ধা ধা -া I পা -ধা -র্সা। র্সা -া -া II
ধ ন্য গো আ মি ০ ধ ০ ০ ন্য

বালকগণ

২ ৩
I I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্রা I না না না। ধা -া ধা।
বি ত র' অ ন্ ন হে রি লে খি ন্ ন
০ ১ ২´ ৩
। পা পা পা। পা না ধা I পা -ক্ষা -গা। -া -া -া।
তৃ ষা তু রে দে হ জ ০ ০ ০ ০ ল্

বালক-বালিকাগণ।

০ ১ ২ ৩
। গা -রা গা। মা মা -া I গা -রা -া। না -সা -া।
ধ ন্য গো আ মি ০ ন্য ০ ০

বালিকাগণ।

২ ৩
। রা গা রা। গা মা মা I গা রা রা। ন্া -রা সা।
ধ রা ম য় ত ব চ র ণ চি ন্ হ
০ ১ ২´ ৩
সা -রা গা। গা ক্ষা ক্ষা I গা -পা -ধা। -পা -া -া।
সু ন্ দ র সু শী ত ০ ০ ০ ০ ল

বালক-বালিকাগণ।

```
        °              ১                 ২´               ৩
।  সা  -ধ্‌ সা। সা  রা  -া  I  গা  -ঋা  -পা। পা  -া  -া II
   ধ   ন্য গো  আ   মি   •      ধ    •    •   ন্য  •   •
```

বালকগণ।

```
        °              ১                 ২´               ৩
I I গা  গা  গা। পা  পা  -ধা  I  র্সা  র্সা  র্সা। র্সা  র্সা  -া ।
    তো  মা  র   আ   লো  ক       তো   মা   র    বা   তা   স
        °              ১                 ২´               ৩
।  র্সা  র্রা  র্রা। র্রা  র্রা  র্রা  I  র্সা  -র্রা  -র্গর্রা। র্গা  -া  -া ।
   তো   মা   র    বা   র    তা      ক    •    • •    ছে   •   •
```

বালক-বালিকাগণ।

```
        °              ১                 ২´               ৩
।  র্গা  -র্রা  র্গা। মা  মা  -া  I  র্গা  -া  -র্রা। না  -র্সা  -া ।
   ধ    ন্য  গো   আ   মি   °      ধ    •   •    ন্য  •    •
```

বালিকাগণ।

```
        °              ১                 ২´               ৩
।  র্গা  র্গা  র্পা। র্গা  র্রা  র্রা  I  র্সা র্রা  র্সা। না  ধা  -া ।
   তো   মা   র    ধ    র    ণী      তো   মা    র   আ   কা   শ
        °              ১                 ২´               ৩
।  পা  পা  ধা। না  না  নঃ  I  ধা  -না  -র্সর্রা। র্সা  -া  -া ।
   ঘ   রে  ঘ   রে  সু  ধা      ব   °   • •     ছে   •   •
```

বালক-বালিকাগণ।

```
        °              ১                 ২               ৩
।  গা  -গা  পা। ধা  ধা  -া  I  পা  -ধা  -র্সা। র্সা  -া  -া II
   ধ   ন্য  গো  আ   মি   •      ধ    •    •    ন্য   °   °
```

বালকগণ।

```
        °              ১                 ২´               ৩
I I র্সা  -র্সর্রা  র্সা। র্সা  র্সা  -র্রা  I  না  না  না। ধা  -া  ধা
    স    ম্প     দে   সু   খে   •      চ   র   ম   তৃ   প্‌   তি
        °              ১                 ২´               ৩
।  পা  পা  -া। পাঃ  -নঃ  ধা  I  পা  -া  -ঋা। গা  -া  -া
 • ভ   ব   • • নন্‌  দ   ন•     ছাঁ   •   •   কাঁ   •   •
   ৩
```

বালক-বালিকাগণ।

০ ১ ২´ ৩
। গা -ঋা গা। মা মা -া I গা -ঋা -া। ন্া -সা -া ।
ধ ন্য গো আ মি • ধ • • ন্য • •

বালিকাগণ।

০ ১ ২´ ৩
। ঋা গা ঋা। গা -া মা I মা গা ঋা। ন্া -ঋা সা।
বি প দে দু : খে তো মা র দী প্ তি
০ ১ ২´ ৩
। সা -ঋা গা। গা হ্মা হ্মা I গা -পা -ধা। পা -া -া।
স উ খ্য- ম ম তা মা • • খা • •

বালক-বালিকাগণ।

০ ১ ২´ ৩
। সা -ধ্া সা। সা ঋা -া I গা -হ্মা -পা। পা -া -া II
ধ ন্য গো আ মি • ধ • • ন্য • •

বালকগণ।

০ ১ ২´ ৩
I I গা গা পা। পা ধা ধা I র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা।
তো গে রো গে শো কে শি য় রে স ত ত
০ ১ ২´ ৩
। সা -র্ঋা র্ঋা। র্ঋা -া র্ঋা I র্সা -র্ঋা -র্গঋা। র্গা -া -া।
জা গ্র ত ক্ল • ব তা • • • রা • •

বালক-বালিকাগণ।

০ ১ ২´ ৩
। র্গা -র্ঋা র্গা। র্মা র্মা -া I র্গা -র্ঋা -া। না -র্সা -া।
ধ ন্য গো আ মি • ধ • • ন্য • •

বালিকাগণ।

০ ১ ২´ ৩
। র্গা র্গা র্পা। র্গা: -র্ঋ: র্ঋা I র্সা র্ঋা র্সা। না ধা ধা।
দু কূ ল প্লা বি ত সা গ রে র ম ত

	০			১			2´			৩		
।	পা	ধা	না।	না	না	না I	ধা	-না	-র্সা।	র্সা	-া	-া।
	অ	সী	ম	ক	রু	ণা	ধা	০	০০	রা	০	০

বালক-বালিকাগণ।

	০			১			2´			৩		
।	গা	-গা	পা।	ধা	ধা	-া I	পা	-ধা	-সা।	র্সা	।	-া II
	ধ	ন্য	গো	আ	মি	০	ধ	০	০	ন্য	০	০

বালকগণ।

	০			১			2´			৩		
I I	র্সা	-র্সা	র্সা।	র্সা	র্সা	-র্রা I	না	-না	না।	ধা	ধা	-া।
	ম	ঙ্গ	ল	তু	মি	০	উ	জ্জ্ব	ল	তু	মি	০

	০			১			2´			৩		
।	পা	পা	পা।	না	-া	ধা I	পা	-া	-হ্মা।	গা	-া	-া।
	বি	ম	ল	স	০	ত্য	ম	০	০	য়	০	০

বালক-বালিকাগণ।

	০			১			2´			৩		
।	গা	-রা	গা।	মা	মা	-া I	গা	-রা	-া।	ন্‌া	-সা	-া।
	ধ	ন্য	গো	আ	মি	০	ধ	০	০	ন্য	০	০

বালিকাগণ।

	০			১			2´			৩		
।	রা	-গা	রা।	গা	-া	মা I	মা	গা	রা।	ন্‌া	রা	সা।
	সা	র্থ	ক	প্রা	০	ণ	ত	ব	প	দ	চু	মি

	০			১			2´			৩		
।	সা	রা	গা।	গা	হ্মা	হ্মা I	গা	-পা	-ধা।	পা	-া	-া।
	জ	য়	দ	য়া	ম	য়	জ	০	০	য়	০	০

বালক-বালিকাগণ।

	০			১			2´			৩		
।	সা	-ধ্‌া	সা।	সা	রা	-া I	গা	-হ্মা	-পা।	পা	-া	-া II II *
	ধ	ন্য	গো	আ	মি	০	ধ	০	০	ন্য	০	০

দ্রষ্টব্য :— * এই পর্য্যন্ত গাহিয়া, গানটি কিন্তু শেষ করিতে হইবে (প্রথম কলির "জীবন প্রভাতে" হইতে ধরিয়া, বালক-বালিকাগণের দ্বারা সমস্বরে "ধন্য গো আমি ধন্য" পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি করিয়া)।

মন্তব্য ঃ—গানটির পংক্তিগুলি ধরিয়াই সুর দিয়া আমি স্বরলিপি করিয়াছি। রচিত স্বরলিপিটির মত অবিকল গাহিলে যে গান শ্রুতিমধুর হইবে না তাহা নহে ; কিন্তু বালকগণের দ্বারা সমস্বরে গেয় পংক্তিটির নীচে "ধন্য গো আমি ধন্য" পংক্তিটি গাওয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক, যদি একেবারে বালিকাদের দ্বারা গেয় পংক্তিটির নীচে "ধন্য গো আমি ধন্য" পংক্তিটি গাওয়া যায়, তাহা হইলে মধুরতর হইবে। এই হিসাবে, যদি ঐ পংক্তিটি, "ধন্য গো, মোরা ধন্য" "বলিয়া রচিত থাকিত, তাহা হইলে সঙ্গীত-কলাবিদ্যার দিক্ দিয়া যেন আরও ভাল হইত।

স্বরলিপি-লেখিকা।

জাহাজ-ডুবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

ফাল্গুন মাস। নব বসন্তের মলয়-সমীর মৃদু-মন্দ-গতিতে আপন মনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ; ধনীর প্রাসাদে, দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে সমভাবে প্রবেশ করিয়া সমান যত্নে সকলের দেহ শীতল করিয়া দিতেছে। পিককুল তরু-শাখায় বসিয়া পঞ্চমে গান ধরিয়াছে। নব-বসন্ত-সমাগমে শুষ্ক বৃক্ষরাজি নবীন পল্লবে সুশোভিত হইয়া মনোহর হইয়াছে। শীতের কুঝটিকাবরণ দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া প্রকৃতিরাণী বিশ্ববিমোহন রূপ ধারণ করিয়া নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

আজ বসন্তের পঞ্চমী। ছেলেদের দল সারদার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সমস্ত দিন মহানন্দে কাটাইয়া সন্ধ্যায় আবার আরতির আয়োজন করিতেছে। গৃহে গৃহে আজ দেবী-পূজার উৎসব। কি আনন্দ! কি উল্লাস! কি উৎসাহ! নব আম্রমুকুলের ও যবের শীষে মায়ের পদযুগল আবৃত! ছোট ছোট বালক-দিগের উৎসাহও বড় কম নহে। তাহাদের প্রধান উৎসাহ, আজ বিদ্যালয়ের বকে, পড়িতে হইবে না, পাঠ্যপুস্তক-স্পর্শ নিষেধ ; আজ সরস্বতী-পূজা!

অমরকুমারের বাসা-বাটীর ক্ষুদ্র উঠান-টিতে কতকগুলি বেল ও যুঁইফুলের গাছ ছিল। শুভ্র সুকোমল পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিতরণ করিতেছিল। শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্ররশ্মি যথাসাধ্য নির্ম্মল আলোক বিতরণ করিতেছিল। গৃহের দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া একটা হারি-কেন লণ্ঠনের সম্মুখে বসিয়া অমরকুমার একখানা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। অদূরে একখানি কুশাসনে বসিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটি সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছিলেন। কানাই উঠানের এক পার্শ্বে ইটের উনানে চায়ের জল গরম করিতেছিল। আশালতা রান্নাঘরে রুটি সেঁকিতেছিল। কমলা আশালতার পুত্রটীকে কোলে করিয়া রান্নাঘরের এক পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। সুকুমার শিশু তাহার বালসুলভ আধ আধ ভাষায় কমলার সহিত কত কি কথা কহিতেছিল। এখনও তাহার ভাল করিয়া

কথা ফুটে নাই, এখনও সে সকল কথা শিখে নাই। তাহার সেই কল-হাস্য, তাহার সেই অর্থহীন ভাষা কমলার কানে যেন সুধা-বর্ষণ করিতেছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিতেছিলেন। শিশু তাহাতে অধিকতর আনন্দিত হইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি সন্ধ্যাবন্দনা-সমাপনান্তে অমরকুমারের নিকটে আসিয়া বসিলেন। কানাই দুই পেয়ালা চা তৈয়ারি করিয়া তাঁহাদের দুইজনকে দিয়া গেল; এবং বাকী সমস্ত চায়ের জলটাতে খানিকটা দুধ ও চিনি মিশাইয়া এক নিঃশেষে নিজে পান করিয়া ফেলিল। অমরকুমার চা পান করিতে করিতে কাগজখানি পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা স্তম্ভে দৃষ্টি পড়াতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। গভীর মনোনিবেশ-সহকারে পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল।—

"অদ্ভুত কাণ্ড! আশ্চর্য্য ঘটনা!"

"প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আজীমগঞ্জের জমীদার স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোরবাবু নোয়াখালীতে তাঁহার কোনও বন্ধুর আলয়ে সস্ত্রীক বেড়াইতে যান। একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য উপেন্দ্রবাবুর পুত্রের রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত থাকিত। বালকের গলায় এক ছড়া বহুমূল্য হীরক-হার ছিল। একজন দস্যু একদিন ভৃত্যকে হত্যা করিয়া হার-সমেত বালকটিকে লইয়া পলায়ন করে। পুলিশকর্ম্মচারিগণ বহুচেষ্টা করিয়াও এতাবৎকাল পর্য্যন্ত দস্যুদিগের কোনও সন্ধান পা'ন নাই। গোয়েন্দা-পুলিসের সুযোগ্য ইনিস্পেক্টার বাবু বিজনকুমার মিত্র তাঁহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতা-বলে আজ পঁচিশ বৎসর পরে উক্ত দস্যুদলকে ধৃত করিয়া জনসাধারণকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। বিচারে তাহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত দস্যুগণের মধ্যে একজন উপেন্দ্রকিশোর বাবুর পুত্র বলিয়া আত্ম-পরিচয় দান করিয়া দশ-জনের চক্ষে ধূলি-নিঃক্ষেপপূর্ব্বক সকলের সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর বাটীতে বাস করিয়া তাঁহার সম্পত্তি দখল করিতেছিল। এরূপ অত্যদ্ভুত কাহিনী আর কখনও আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। যাহা হউক, বিজনকুমারবাবু পাপিষ্ঠদিগের সকল চক্রান্ত ভেদ করিয়া যথোপযুক্ত দণ্ডদানে সমর্থ হইয়াছেন, এজন্য আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার কল্যাণ কামনা করি। বিজনবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নিয়ত এইরূপ সংসারের মঙ্গল-কার্য্যে রত থাকুন্, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

ঘটনাটি পাঠ করিয়া অমরকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অমরকুমারের ভাব দেখিয়া ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকের কাগজে কোনও নূতন খবর আছে না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই যে দেখুন না!" বলিয়া অমরকুমার কাগজখানি তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঃ! আমি এর বিন্দু-বিসর্গও শুনি নি!"

সবিস্ময়ে অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাঁকে চিনতেন না কি?"

তিনি সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া

সংবাদপত্রখানা পুনর্ব্বার পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় কানাই আসিয়া বলিল, "একজন জ্যোতিষী এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অমরকুমার বলিলেন, "রাত্রিকালে জ্যোতিষী?" কানাই বলিল "আজ্ঞে হাঁ! তিনি বল্লেন, তিনি এইমাত্র কলিকাতা থেকে এসে পৌঁছুচ্চেন। তিনি আরও বলে দিলেন যে, তিনি এমন দৈব কাজ করতে জানেন যে তা'তে মানুষের অদৃষ্ট ফিরে যায়, খুব উন্নতি হয়।"

মৃদু হাসিয়া অমরকুমার বলিলেন, "বটে! কিন্তু এখানে ত তাঁর বিশেষ সুবিধা হবে না তা হ'লে! আমার অদৃষ্ট ফেরাবার কোনও দরকার নেই, বল্‌গে যা তাঁকে।"

এদিকে জ্যোতিষী-ঠাকুর তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ম'শায়ের দরকার না থাক্‌তে পারে, আমার বিশেষ দরকার আছে। এই হলো আমাদের জীবিকা। আপনাদের দুয়ার থেকে যদি দু'পয়সা না নিয়ে যাব, তবে খাব কি করে?"

সহাস্যে অমরকুমার একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, এই নিন্; এর বেশী দেবার আর আমার ক্ষমতা নেই। আমি গরিব মানুষ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাবার আমার অর্থ নেই, আবশ্যকতাও নেই। বড় লোকের বাড়ীতে যান, সেখানে বেশ দশটাকা উপার্জ্জন হবে।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে মুখটা কিছু ভার করিয়া বলিলেন, "মোটে একটা টাকা! এতো আমার গাঁজা আফিম কিছুতেই কুলুবে না, পেটে খাব কি?"

অমরকুমার আরও আট আনা পয়সা দিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর হটিবার পাত্র নহেন; তিনি সে পয়সা গুলিও কুড়াইয়া লইয়া রকের উপরে উঠিয়া মাদুরের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। অমরকুমার মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুর ভদ্র লোকটীর কাছে বসিয়া তাঁহার পাঁজি পুঁথি সেইখানে রাখিয়া হাঁকিলেন,—"মহারাজের জয় হোক্!"

ভদ্রলোকটী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এর ভেতর আবার মহারাজ পেলেন কোথায় ঠাকুর?"

ঠাকুর বলিলেন, "আমার গণনা অভ্রান্ত! আপনি ধার্ম্মিকব্যক্তি, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করবেন না। আপনি নিশাদলের রাজা সূর্য্যকুমার নন্?"

ভদ্রলোকটি আর কোনও কথা না বলিয়া নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। অমরকুমার সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, বুঝিলেন, তাঁহার অতিথি ভদ্রলোকটি ছদ্মবেশী নিশাদলের রাজা সূর্য্যকুমার বসু। রাজার কথা পূর্ব্বে তাঁহার কিছু কিছু শোনা ছিল। আজ নিজের চক্ষের সম্মুখে রাজার প্রকৃতি ও প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার মস্তক যেন নিজ হইতে সেই পবিত্র-চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। কি নম্র! কি মহান্ উদার প্রকৃতি! হৃদয়ে আত্মম্ভরিতার লেশমাত্র নাই।

সন্ন্যাসী-ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "মহা-

রাজের দর্শন-লালসায় মহারাজের বাটী পর্য্যন্ত গিয়েছিলুম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ সেখানে মহারাজের সাক্ষাৎকার পাইনি। তারপরে কত ক'রে কত দেশ ঘুরে ঘুরে তবে আজ মহারাজের সাক্ষাৎলাভ করতে সক্ষম হয়েছি। মহারাজের কাছে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি নিতান্ত দরিদ্র, কৃপা করতে হবে।"

মাথা তুলিয়া জ্যোতিষী-ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রাজা সূর্য্যকুমার বলিলেন, "দেওয়ানকে জানাইলে আপনার আবশ্যক মত সব পেতেন।"

হাসিয়া জ্যোতিষী ঠাকুর বলিলেন "মহারাজের দেওয়ানের কাছে যা পেয়েছি, তা যথেষ্ট; শেষে গরিবের এই মানব-জীবনটুকুতে পর্য্যন্ত তাঁর লোভ পড়েছিল। রাতা রাতি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, তাই রক্ষা!"

ক্রুদ্ধভাবে রাজা সূর্য্যকুমার বলিলেন "আমার অসাক্ষাতে আমার কর্ম্মচারীরা কি এই রকম করে আমার আদেশ পালন করে থাকে?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "না, মহারাজ! ঠিক্ তা নয়, আমার একটু অপরাধ ছিল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অপরাধ আপনার!"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমি গণনা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলাম, মহারাজ পুত্রহীন নহেন, মহারাজের পুত্র জীবিত।"

চমকিয়া উঠিয়া রাজা সূর্য্যকুমার বলিলেন, "আপনি কা'র সম্বন্ধে এ-কথা বলছেন? আমার পুত্র কোথায়?"

ধীর প্রশান্ত ভাবে জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "আমি মহারাজের সম্বন্ধেই বলছি। মহারাজ যে পুত্রকে মৃত বলে অনুমান কচ্ছেন, সে পুত্র মৃত নহেন, জীবিত।"

হতাশ-ভাবে রাজা সূর্য্যকুমার একটা মর্ম্ম-ভেদী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা উন্মাদ! এতদিন পরে তুমি আবার সে নিবোনো আগুন কেন জ্বালাতে এসেছ?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমি উন্মত্ত নই, মহারাজ! আমি যা বল্‌ছি তা বর্ণে বর্ণে সত্য! আপনারা যেমন দৈবক্রমে জাহাজ ডুবি হইতে রক্ষা পেয়েছিলেন, আপনার পুত্রও তেমনি দৈবানুগ্রহে রক্ষা পেয়েছিলেন; তবে নিয়তি-চক্রে পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদ ঘটেছে।"

অধীরভাবে রাজা সূর্য্যকুমার দুই হাতে নিজের বুকটা চাপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "চলে যাও ঠাকুর! চলে যাও! অনেক কষ্টে তা'র মুখ ভুলেছিলুম, আবার আজ কেন সে-কথা তুলে আমাকে কাঁদাতে এলে? আমার অভাগিনী স্ত্রী এ-কথা শুনলে শোকে অধীর হয়ে পড়্‌বে। যাও, তুমি শীগ্‌গির চলে যাও। তোমার কত টাকার দরকার বল, আমি দেওয়ানকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, গেলেই পাবে।"

জ্যোতিষী বল্‌লেন, "ব্যস্ত হবেন না, মহারাজ! দয়া করে আমার কথাটা শুনুন। বলুন দেখি, আপনার সে পুত্রকে এখন দেখলে চিনতে পারবেন?"

পুত্রের সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া কমলা এতক্ষণ বাহিরে এক পার্শ্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর তিনি স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া জ্যোতিষীর নিকটে

আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, সত্য কি আমার ছেলে বেঁচে আছে ?"

জ্যোতিষী বেশ মিষ্টস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ মা! আমি মিথ্যে কথা বলি না। কমলা ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "কোথায় আছে আমার ছেলে, বলে দাও।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আপনার সে ছেলেকে এখন দেখ্‌লে কি চিন্‌তে পারবেন মা! তা যদি না পারেন, তা হ'লে আপনার শোকানল আরও জ্বলে উঠ্‌বে। আর আমিও তা হ'লে প্রবঞ্চক জুয়াচোর প্রতিপন্ন হব যে!"

কমলা উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মা, আমি তাকে চিন্‌তে পার্ব না? তার সঙ্গে যদি আমার একশো বৎসর ছাড়াছাড়ি হয়, সে যদি হাজার লোকের মাঝ খানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবু আমি তার মুখখানি দেখ্‌বামাত্র চিনে ফেল্‌ব। তুমি দয়া করে আমায় বলে দাও ঠাকুর, সে আমার কোথায় আছে।"

সান্ত্বনা দিয়া জ্যোতিষী বলিলেন, 'ব্যস্ত হবেন না মা!' বল্‌ছি। আগে আপনি বলুন দেখি, তার অঙ্গে এমন কোনও চিহ্ন আছে কি, যা দেখ্‌লে তাকে আপনার পুত্র বলে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন?"

"চিহ্ন?" চিন্তিত হইয়া কমলা দেবী বলিলেন, "চিহ্ন! কই এমন কোন চিহ্ন ত তার দেহে ছিল না, যা বল্‌বার মত হতে পারে।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ভেবে দেখুন, ছেলে বেলায় তিনি কোথাও পড়ে টড়ে যান নি কি? কোথাও কাটা দাগ কি জড়ুল চিহ্ন, কি আর কিছু?—"

হঠাৎ কমলা একটু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে! আমাদের বাড়ীর সকলে এক দিন যে যার হাতে উল্কি দিয়ে নাম লিখ্‌ছিল, তাই দেখে, বাছা আমার তা'র নাম লিখে দেবার জন্যে বায়না ধরে। কিছুতেই যখন তাকে ভুলাতে পার্‌লুম না, তখন আমি নিজের হাতে তার পিঠে বড় বড় অক্ষরে তার নামটি লিখে দিলুম; আর দু'ধারে দুটো ছোট ফুল এঁকে দিয়েছিলুম!"

জ্যোতিষী ঠাকুর হ্যারিকেনটা হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া টপ্‌ করিয়া অমরকুমারের পিঠের জামাটা উঠাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখুন দেখি মা, আপনার হাতের সেই লেখা কি না?"

কমলা ছুটিয়া আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই সেই লেখা! এই সেই লেখা।" তাহার পর তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমরের মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ উন্মাদিনীর মত অমরকুমারকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'অমর! অমর! বাপ আমার!" আর মুখে কথা সরিল না। রাজা সূর্য্যকুমার বিস্ময়াভিভূত! আশালতা ও অমরকুমার স্তম্ভিত!

বলা বাহুল্য জ্যোতিষীটি আমাদের বিজন-কুমার বাবু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 691. March, 1921

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৯১ সংখ্যা।	ফাল্গুন, ১৩২৭। মার্চ্চ, ১৯২১।	১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

দুঃখ-কমল।

দুঃখ মোরে দিয়েছিলে?

—সে আজ শতদল!

অশ্রুজলে ধুয়েছিলে?

—সে আজ মুক্তাফল!

বেঁধেছিলে জীবনখানি

বহু যত্ন আয়াস মানি?—

আজ সুরে সুরে ভরিয়ে দিল

হৃদয়-তল!

তোমারি জয়—তোমারি জয়,

হে মহারাজ, তোমারি জয়!

ফুট্‌লো প্রাণে কুসুমচয়

সুনির্ম্মল!

দুঃখ আজি ধন্য মানি

পরম সুখের স্বর্গ জানি,

সে শতদল বক্ষে টানি'

ছুঁই চরণতল॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

লীনার শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(১৩)

দিন কাহারও সুখ-দুঃখের হাসি-কান্না শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে না, লীনার দিনও দাঁড়াইল না। তবে সে 'সব মাটী মাড়াইয়া' চলিয়া গেল, কি উড়ন্ত পাখীর মত হাওয়ার উপর ভর দিয়া উড়িয়া গেল, সে খবরের বিন্দু বিসর্গও লীনা টের পাইল না। নিজকে লইয়া সে বড়ই যন্ত্রণাভিভূত হইয়া রহিল।

পিকক্ লীনার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া, সটান কুঠি ছাড়িয়া চলিয়া যান। তখন তাঁর প্রথম ট্রেনের সময় নিশ্চয়ই বহিয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, পরবর্ত্তী ট্রেণ ধরিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন; কারণ তিনি আর কুঠিতে ফিরেন নাই। সমস্ত দিন তাঁর কোন খবরও পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার পর যখন তেজস্কর ঔষধ ও বলকারক পথ্যের সাহায্যে লীনার অবসন্ন-নিস্তেজ দেহটা একটু চাঙ্গা হইল, এবং গ্লানি-বিষাদ-জর্জ্জর মনটাও একটু সচেতন হইল, তখন পার্সন মিসেস্ ক্লাউডেন ও বৃদ্ধা মিশনরী মেম মিস্ নীলকে সঙ্গে করিয়া লীনার সহিত দেখা করিতে কুঠিতে আসিলেন।

নিজের অপরিমেয় দুঃখের সঙ্গে একান্ত অসহায়-ভাবে ধস্তা-ধস্তি করিয়া, ক্লান্তি-বিকল মনটা তখন একটু মানুষের সঙ্গ পাইবার জন্যই ছট্‌ফট্ করিতেছিল। বন্ধু-তিনটিকে দেখিয়া লীনা স্বস্তি পাইয়া বাঁচিল। ঘরের ভিতর বড়ই গরম বোধ হইতেছিল; বাহিরের জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া, একটু খোলা হওয়া পাইবার অভিপ্রায়ে লীনা বলিল, "চলুন, বাইরে গিয়ে বসা যাক্। আপনাদের আপত্তি হবে কি?"

সকলে সম্মত হইলেন। চাকরেরা আসিয়া চেয়ার ও আর্ম কেদারা বহিয়া বারেণ্ডার সামনে খোলা জায়গায় ঘাসের উপর পাতিয়া দিল। সকলে সেইখানে আসিয়া বসিলেন।

মিস্ নীলের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুলগুলি সব পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, দাঁতগুলি সমস্ত পাথর-বাঁধানো, কিন্তু তাঁর সমুন্নত সুন্দর দেহের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্তটুকুতে সজীব-স্বাস্থ্য-লাবণ্য যেন খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। মুখখানি প্রশান্ত হাস্যময়, দৃষ্টি এবং কণ্ঠস্বরে করুণা ও কোমলতা যেন ক্ষরিয়া পড়িতেছে। মিশনের সকলেই তাঁকে বড় ভাল বাসিত; পার্সন ছিলেন তাঁর প্রাণের স্নেহে গঠিতা, অনুগতা ছাত্রী ও আদরের বন্ধু। লোকহিত-ব্রতে জীবনের সমস্ত সময় উৎসর্গ করিয়া, মিশনের কাজেই তিনি আযৌবনকাল খাটিতেছেন।

মিসেস ক্লাউডেন্ একটু 'বেঁটে-খাট' ধরণের হৃষ্টপুষ্টা সুন্দরী; বয়স সাঁইত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে। তিনি সাধারণতঃ বেশ গম্ভীর, তর্ক-স্থলে কিন্তু রীতিমত অসহিষ্ণু-অধীরপ্রকৃতির মানুষ; কথাবার্ত্তা প্রায় অল্পই বলেন। মুখে

সর্ব্বদাই একটা বিষণ্ণ ঔদাস্যের ভাব। ডব্‌সন্ ও ক্লাউডেনের হাসি-খুসি ও আমোদ-প্রিয়তার রুচিটা ঠিক্ পরস্পর বিপরীত ছিল। সময় সময় ছোট ভাইয়ের ছিব্‌লামির উপর তিনি বিলক্ষণ চটিয়া উঠিতেন, অসঙ্কোচে শাসন-বকুনী যথেচ্ছভাবে দিতেন, কিন্তু ভাইয়ের প্রতি তাঁর স্নেহেরও অন্ত ছিল না। ভাইটিরও সংসারে ঐ ভগিনী ছাড়া আর কেহ সম্বল ছিল না।

সকলে মিলিয়া আশ-পাশের নানা কথা লইয়া কিছুক্ষণ জটলা করিলেন। পার্সনের স্বাভাবিক কৌতুক-প্রিয়তা, মিস নীলের সুমিষ্ট সদালাপ, এবং মিসেস্ ক্লাউডেন্ ও নীনার হাসি-খুসির ভিতর দিয়া বিশ্রামের অবকাশ-টুকু বেশ মনোরমভাবেই কাটিয়া চলিল। নীনা সমস্ত দিনের পর, একটু হাসির উপলক্ষ্য পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া, হাল্কা হইয়া আরাম পাইল।

কথায় কথায় পার্সন, নীনার স্বাস্থ্যের কথা তুলিয়া বলিলেন, "আপনার স্বাস্থ্যটা কই এখানকার জল-হাওয়ার সঙ্গে ভাল খাপ খাচ্ছে না তো! আচ্ছা, দিন-কতকের জন্য কোন শীতপ্রধান দেশ দিয়ে ঘুরে এলে কেমন হোত?"

পাঁচটা অন্য কথায় মিশিয়া নীনা নিজের কথাটা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া বেশ একটু স্বস্তি-বোধ করিতেছিল, পার্সনের কথায় আবার সব মনে পড়িল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে কাশিয়া বলিল, "যেমনই হোক্, আমি কিন্তু সেই সঙ্কল্পই ঠিক করেছি। জরটা হয়ে যদি আমায় এতটা কাবু করে না দিত, তা হলে আমি এই হপ্তায় মেলেই বিলাতে রওনা হতুম। দেখি, পারি তো আসছে হপ্তায় রওনা হব।"

মিসেস্ ক্লাউডেন নীনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ পিকক্ কি আপনার সঙ্গে যাবেন?"

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া, নীনা ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "তাঁর সরকারী চাকরী……।"

ক্লা। আপনার ছেলে?

অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া নীনা খুব উদাসভাবে উত্তর দিল, "এইখানেই থাক্‌বে।"

পার্সন এতক্ষণ চুপ করিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নীনার মুখভাব-পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; এই সময়ে হঠাৎ একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিচলিত ভাবে সরিয়া বসিয়া বলিলেন—"নীল, ভগবদ্-বিষয়ক কিছু গান করুন্ না, বেশ সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে!"

মিসেস্ ক্লাউডেন ফিরিয়া পার্সনের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "জ্যোৎস্নার আলোয় গান গাইবার ভারটা বৃদ্ধা নীলের ওপর পড়া উচিত নয়।" অল্পবয়স্কাদের ওপরই পড়া উচিত।

নীনা হাসিমুখে বলিল, "আমার দুর্ব্বল ফুস্‌ফুস্ গানের সুরের চাড় মোটেই সহ্য করতে পারবে না, মিসেস ক্লাউডেন,—সেটা আপনি অবশ্যই জানেন্।"

পার্সন হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া সবিনয় হাস্যে বলিলেন, "অতএব পার্সনের ওপরই পড়া উচিত! কেমন? কিন্তু কাল সারা-রাত্রিটা আমায় হাঁসপাতালে জাগ্‌তে হয়েছে, ঘুমে আমার চোখ-জ্বালা করছে, গলাটাও ধরে রয়েছে। সুতরাং আপনিও যে ক্ষমার পাত্রী, সেটা নিশ্চয়ই আপনি

ভুলে যান নি, মিসেস ক্লাউডেন !”

নীল্ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পার্সনের পিঠ চাপড়াইয়া সহাস্তে বলিলেন, “ধন্যবাদ, কথাটা আমি কিন্তু নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিলুম, পার্সন ! চল, আজ তোমায় শীঘ্র ঘুমাতে দিই গে। লীনা ! আজকের মত বিদায় ! গাল-গল্পের কোটা-বাড়ীটা আজ এই পর্য্যন্তই থাক্, ... আপনি এখন দু’-এক হপ্তা এখানে আছেন, আশা করি ?”

“সম্ভব।”—বলিয়া লীনা উঠিয়া সকলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, “আপনাদের মত স্নেহশীল বন্ধুদের ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।”

মিস্ নীল ও মিসেস্ ক্লাউডেন স্ব সৌজন্যে দুঃখসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লীনার স্বাস্থ্যের মঙ্গল কামনা করিলেন এবং এই সীমা-বদ্ধ ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে আবার তাঁহাদের পুনর্ম্মিলনের আশা যে খুবই সম্ভব, সেটুকু উৎসাহের সহিত জানাইলেন। পার্সন কিছু বলিলেন না, শুধু বিমর্ষ-গম্ভীর দৃষ্টিতে লীনার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন

মিস্ নীল্ ও মিসেস্ ক্লাউডন্ বিদায় লইয়া পথে নামিলেন। পার্সন সস্নেহে লীনার হাত ধরিয়া করুণা-শীতলকণ্ঠে বলিলেন, “বিদায় বন্ধু, এ-জগতে সকলের ওপর সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলে যিনি একজন আছেন, তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা অহরহঃ নানা আকারে আমাদের ওপর কাষ করছে, তাঁর করুণার ওপর বিশ্বাস রাখুন, জীবনে সুখী হবেন।”

লীনা চমকিয়া উঠিল ; হঠাৎ মনে হইল পার্সন এই কথাটাই তাহাকে শুনাইবার জন্যই বোধ হয় বৃদ্ধা নীলকে তখন ভগবৎ-সম্বন্ধীয় গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। লীনার আর্ত্ত বেদনাতুর মনকে একটু সান্ত্বনা দিবার জন্যই শুধু পার্সনের একান্ত আগ্রহ !—ক্ষুব্ধ বিষাদের হাসি হাসিয়া লীনা বলিল “সুখ ! পার্সন, পৃথিবীতে কোনও মানুষ কি কখনও প্রকৃত সুখলাভ কর্ত্তে পেরেছে ? এ পৃথিবী অনন্তদুঃখময়,—এখানে সুখ বলে কিছু নাই। আছে একটা প্রকাণ্ড জুয়াচুরি-ভরা মিথ্যার,—যেটাকে সুখ বলা হয়, সেই সুখের —ক্ষণিক ছলনামাত্র।”

লীনার হাত চাপিয়া ধরিয়া পার্সন সজোরে বলিলেন, “ভুল বন্ধু, ভুল ! আমায় optimist বল্‌তে চান্, বলুন,—কিন্তু বিশ্বাস করুন্ আমায়, আমি নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অভিজ্ঞ থেকে বলছি, ভাগ্য বলে একটা জিনিস আছে সত্য, এবং সে আমাদের অজ্ঞাতসারেই, আমাদের জন্য কতকটা সুখ-দুঃখ গড়ে দিয়ে থাকে, তাও খুব সত্য,—কিন্তু এটা ঠিক জানবেন' এ সসীম জগতে সকলের যেমন সীমা আছে, ভাগ্যশক্তির ও তেমনি একটা সীমা আছে। আমরা আমাদের নিজস্ব সুখদুঃখ-গুলা সমুদয় যদি নিঃশেষে ভগবানের পায়ে উৎসর্গ করে, অবহেলা-ভরে ভাগ্যটাকে কর্ত্তৃত্বের আসন থেকে টেনে নামাই, তা হলে ভাগ্যের প্রপিতামহেরও সাধ্য নাই, আমাদের মাথার ওপর বসে প্রভুত্বের দাপটে অত্যাচার করে কষ্ট দেয় ! লীনা, স্নেহের বন্ধু আমার, সাময়িক দুঃখের চোখরাঙানি দেখে অবসন্ন হয়ে পড়্‌বেন না, ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর স্থাপন করুন্ ! ভয় কি ? এ-জগতে চরিত্রের বাড়া শুভ বল নাই, সত্যজ্ঞানের বাড়া শুভ বুদ্ধি নাই, আত্মচেষ্টার বাড়া যথার্থ

হিতকারী বন্ধু নাই,—আর আত্মজয়ের বাড়া মহৎ শান্তি নাই, এটা ঠিক মনে রাখ্‌বেন। আর মনে রাখ্‌বেন, ভগবান্‌ বলে একজন আছেনই।"

পার্সনের কণ্ঠে যে গভীর সহানুভূতিপূর্ণ সুদৃঢ় আশ্বাসের বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, সে বাণী লীনার হৃদয়কে বড় গভীরভাবেই স্পর্শ করিল। সবলে পার্সনের দুইহাত মুঠাইয়া ধরিয়া লীনা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ধন্যবাদ! নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা নিয়ে বন্ধুদের বেদনা দিতে বড় ভয় পাই, বড় বেশী দুঃখ বোধ হয়। কিন্তু আর পারছি নে, মন বড় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে এসে আমায় এম্নিভাবে সৎপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। কাল সন্ধ্যার অবকাশে আপনার দেখা পাব আশা করি?"

পার্সন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "হাঁ, সমস্তদিনে একটুও কাল সময় পাব না, অনেক কাজ আছে। বিদায়!"

পার্সন চলিয়া গেলেন। অয়ার সাহায্যে লীনা শয়নকক্ষে গেল। লীনার কাণের ভিতর পার্সনের সেই শেষ কথা-কয়টা ক্রমাগতই দৃঢ় আশ্বাসের সুরে ধ্বনিত হইতে লাগিল;—"এজগতে চরিত্রের বাড়া শুভ বল নাই, সত্যজ্ঞানের বাড়া শুভ বুদ্ধি নাই, আত্ম-চেষ্টার বাড়া যথার্থ হিতকারী বন্ধু নাই, আর আত্মজয়ের বাড়া মহৎ শান্তি নাই।"

সত্যই কি তাই?......... হে পরমেশ্বর, শক্তি দাও, শক্তি দাও! যে শক্তিবলে পার্সন ইহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে, সেই শক্তিটুকু লীনার দুর্ব্বল প্রাণের ভিতর সঞ্চারিত করিয়া দাও! লীনাকে শিখাও, শিখাও ভগবান্‌,—এই দুর্জ্জয় যন্ত্রণাময় দুঃখের আগুনে দহন করিয়াই শিখাইয়া দাও,—তোমার কোন্‌ শুভ উদ্দেশ্য এত অশান্তি-দুঃখের মাঝে লীনার জন্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছ! তোমার সে শুভ উদ্দেশ্য সত্যই কি কোন দিন লীনার জীবনের মাঝে সিদ্ধ ও সফল হইবে?—সে শুভ দিন কতদূরে, ভগবান্‌, কত দূরে?

(১৪)

পরদিন সন্ধ্যার সময় পার্সন একলাই লীনার কুঠীতে আসিলেন। দুয়ারের কাছে অগ্রসর হইয়া লীনা অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। পার্সন সময়োচিত কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে চাহিয়া দেখিলেন, লীনার মুখ আজ বেশ স্ফূর্ত্তি-প্রফুল্ল।—মনে মনে অত্যন্ত খুসি হইয়া পার্সন গান-বাজনার প্রস্তাব করিলেন। লীনা উৎসাহের সহিত সম্মতি দিল। পার্সন পিয়ানোর কাছে বসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন। পার্সনের সুশিক্ষিত কণ্ঠের সুমিষ্ট সতেজ সঙ্গীতসুর লীনার কাণে বড় মধুর লাগিল; মুগ্ধ চিত্তে সে গান শুনিতে লাগিল।

গান-বাজনা চলিতেছে, এমন সময় বালক-ভৃত্য আসিয়া দুয়ারের নিকট হইতে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়া জানাইল, "একটা .তার আসিয়াছে।"

লীনা বিস্মিত-দৃষ্টিতে বালকের দিকে চাহিল। কাল সকালবেলা সেই যে লীনার হুকুমে জানালা টপ্‌কাইয়া সে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল, তারপর আর চাকরটার দর্শন পাওয়া যায় নাই। আজ এতক্ষণে সশরীরে আবির্ভূত হইল। লীনা মনে মনে পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, চাকরটির দেখা পাইলে, তার

স্পর্দ্ধা-ধৃষ্টতা-সংশোধনের একটু ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কিন্তু পার্সনের সামনেই প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ায় কাযেই মনের ভাবটা মনেই চাপিয়া রাখিয়া, ধীরে ধীরে সে বলিল "আবার তার? নিয়ে এস, ঠিকানা বদলে দিই।"

রসিদ ও খাম আনিয়া ভৃত্য লীনার হাতে দিল। পার্সন বাজনা বন্ধ করিয়া লীনার মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ পিককের বুঝি? আফিস সম্বন্ধীয়?"

খামের ঠিকানার দিকে না চাহিয়াই, লীনা দোয়াতে কলম ডুবাইতে ডুবাতে বলিল, "সে আর বল্‌তে? সকালে দু'খানা এসেছিল, redirect করে দিয়েছি, আবার এই!—"

কথাটা বলিতে বলিতেই লীনা খামের ঠিকানা ও নম্বরের দিকে চাহিতে গিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া গেল! না—না, এযে লীনারই নাম!......কে 'তার' করিলেন তবে? মিঃ মরিস্? না হইলে আর কে?

চট্ করিয়া রসিদে সহি দিয়া লীনা খাম ছিঁড়িয়া কাগজ বাহির করিল। আলোয় ঝুঁকিয়া এক নিঃশ্বাসে টেলিগ্রাম পাঠ করিল,—"শীঘ্র আপনি আসুন, মিঃ পিকক্ এখানে নাই। শিশু মার্‌সি ডিপথিরিয়া-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, অবস্থা বিপজ্জনক।

শেফার্ড। (ডাক্তার)"

অকস্মাৎ ভীষণ-শব্দে সমস্ত আকাশটা যেন ভাঙ্গিয়া লীনার মাথায় পড়িল! ঘূর্ণিত দেহে পাশের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িয়া শুষ্ক-বিকৃত কণ্ঠে সে বলিল "পার্সন ওটা পড়ে দেখুন, ওর মানেটা কি? বলুন, আমায়।"

পার্সন ত্রস্তে উঠিয়া কাগজখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে উপর্য্যুপরি পাঁচবার অক্ষর কয়টার উপর চোখ বুলাইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, "ডাক্তার শেফার্ড লোকটি কেমন? মিঃ ক্রাউডেনের ইয়ার্কিবাজ বন্ধুর মত নয় ত?"

অগাধ জলে পড়িয়া ডুবিবার মুখে মানুষ ব্যাকুলতার আবেগে তৃণ ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়। লীনা আকুল উৎকণ্ঠার স্বরে বলিয়া উঠিল, "তাই কি! তা হবে, পার্সন! কিন্তু শেফার্ড কি......?" লীনা হতাশ ভাবে থামিল।

সন্দিগ্ধস্বরে পার্সন বলিলেন, "মিঃ পিকক্ সেখানে নাই, এইটুকুতেই অবিশ্বাস ঠেক্‌ছে যে! তিনি তো কালই এখান থেকে চলে গেছেন! তা হলে তিনি গেলেন কোথা?"

বালক ভৃত্যটি টেলিগ্রাফ-পিওনকে রসিদ দিয়া আসিয়া, চুপ করিয়া এতক্ষণ টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়াছিল; একটা সাংঘাতিক সংবাদ লইয়া যে সভয়ে আলোচনা চলিতেছে, সেটা সে বুঝিতে পারিতেছিল। পিককের নাম শুনিয়া হঠাৎ সে চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "সাহেব তো এখানেই আছেন, সেই ফিরিঙ্গি-মেমের কুঠিতে।"

মাঝ-পথেই পার্সন গর্জ্জিয়া উঠিলেন "চুপ্ পাজি,—বেরিয়ে যা এখান থেকে।"

বালক সভয়ে চলিয়া গেল। লীনা ভৃত্যের কথাটায় কাণ দেয় নাই; সে চলিয়া যাইবার পর পার্সনের মুখ-পানে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল "কি বল্লে, ও?"

পার্সন টেলিগ্রামটার দিকে পুনশ্চ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরম তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর দিলেন, "কে জানে, কি ওর মাথামুণ্ডু খবর!—"

তারপর টেলিগ্রামটার দিকে চোখ রাখিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "শেফার্ড কি আপনাদের পারিবারিক চিকিৎসক ?"

লী। "হাঁ। খুব বিশ্বস্ত বন্ধু আমাদের, তিনি !"

পার্সন চেয়ারে বসিয়া, পায়ের উপর পা তুলিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরমুখে ভাবিতে লাগিলেন। লীনা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। গৃহ নিস্তব্ধ।

খানিকটা পরে পার্সন সজোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গাইয়া ধীর কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন—"লীনা !"

লীনা চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। পার্সন স্নেহময় স্বরে বলিলেন, "ভগবান করুন্ মার্‌সি ভালই থাক। কিন্তু দেখুন, আপনি যদি নিজে গিয়ে তাকে একবার দেখে আস্‌তে চান, তা হলে বলুন; আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে সেখানে যেতে রাজী আছি। যাবেন ?"

দুর্ব্বহ জড়দেহটার বাঁধন-ভার ছিঁড়িয়া সেখানে এই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যাইবার জন্যই যে প্রাণটা ধড়্‌ফড়্ করিতেছে !

হায় পার্সন, তুমি আবার লীনার কোন মতামতের অপেক্ষা কর ?—বেদনা-ক্লান্ত দৃষ্টি তুলিয়া কাতরকণ্ঠে লীনা বলিল, "আপনি অনুগ্রহ করে একবার যেতে পারবেন কি পার্সন ? আপনার কোন ক্ষতি হবে না তো ?—মিশনের কাযে ?" লীনার কণ্ঠস্বর ব্যাকুল আগ্রহ-বেদনাভারে ক্রন্ত কাঁপিতে লাগিল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া পার্সন বলিলেন, "কিছু না !—মানুষের কাছে কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যের জন্যই ! মানুষের সাহায্যে লাগতে পাওয়া, আমাদের পক্ষে ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়ার পুণ্য ! আত্মাভিমানে অন্ধ হয়ে আমরা যখন দৃপ্ত অনুগ্রহ-ভরে অসমর্থকে সাহায্য করতে দাঁড়াই, তখনই আমরা সব চেয়ে বড় মূর্খ, সব চেয়ে বড় আত্ম-প্রবঞ্চক ! যাক্ সে কথা। কাল সকাল সাড়ে-ছটায় একটা ট্রেণ আছে, সাড়ে সাতটায় একটা আছে, সেই দুটোর একটাতেই রওনা হব। এখন ষ্টেশনে চলুম, শেফার্ডকে একটা টেলিগ্রাম করে আসি।"

সেই মহানুভবা করুণাময়ী নারীর মুখ-পানে চাহিয়া লীনার দুই চক্ষু অপরিসীম সান্ত্বনা-ভরা বেদনার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। অসাড় রসনায় একটাও শব্দ সরিল না, নীরবে হাত বাড়াইয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া, শ্লথ ভাবে চেয়ারের পিঠে সে এলাইয়া পড়িল। লীনার শরীরের সমস্ত শক্তি যেন চুম্বকাকৃষ্ট হইয়া কোন দুর্নিরীক্ষ্য শূন্যদেশে হঠাৎ চলিয়া গিয়াছিল।

পার্সন বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সেই বালক ভৃত্যটি দুয়ারের পাশে ম্লানমুখে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পকেট হইতে কিছু নগদ-দক্ষিণা বাহির করিয়া ছেলেটির হাতে দিয়া পার্সন সহাস্য-মুখে তার কাঁধ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন, "বুড়ো-খোকাটি আমার ! একটা আলো নিয়ে চল তো একবার আমার সঙ্গে।" "আজ কাল পথে বড় সাপের ভয় হয়েছে।"

মিষ্ট কথা ও সারবান নগদ বিদায়ে মহা পরিতুষ্ট হইয়া বালক পার্সনের মুখ-পানে চাহিয়া সাগ্রহে বলিল, "সাপ তো ? উঃ ভয়ানক ! চাঁদনী রাত হলেও কুঠির রাস্তায় ঢের সাপ থাক্‌তে পারে ! চলুন, আলো নিয়ে

যাচ্ছি। আলো থাক্‌লে সাপই হোক, ভূতই হোক্, কেউ-কিছু বল্‌বে না।"

বালকের সূক্ষ্ম বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া পার্সন হাসিলেন! অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন প্রান্তরের ভিতর দিয়া একলা হাঁটিতে যে পার্সনের যথেষ্ট সাহস আছে, আজ হঠাৎ সেই পার্সন সাপের ভয়ে কাতর হইয়া পড়িয়াছেনই বটে! মনে মনেই হাসিয়া বলিলেন, "পথের স্যাপের বিষদন্তকে ভয় করি না বৎস, কিন্তু তোমার রসনার ভিতর যে বিষাক্ত-সত্য লুক্কায়িত আছে, তাহা আজ মরণাহ্‌তা লীনার প্রাণদাত্রী! সেই বিষকে আজ এখন মন্ত্রবলে সংরুদ্ধ করিতে হইবে। চল, আগে তোমায় কুঠির বাহিরে লইয়া যাই!—"

বালক আলো আনিল। পথে নামিয়া পার্সন বলিলেন, "ষ্টেশনে চল।"

বালক সভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ষ্টেশনে? আপনার কুঠিতে নয়? মাপ করুন্ মেমসাহেব, তাহলে আমি যেতে পারব না। আমার 'জান' যাবে।"

পার্সন নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "কেন?"

বালক অধিকতর ভীত হইয়া চুপি চুপি বলিল, "পিকক্ সাহেব যে এই সহরেই আছেন। সেই ফিরিঙ্গী মেমের কুঠিতে!—সেই ষ্টেশনের ওপারে লাল-বাংলায় যে মেম সাহেব থাকেন, তাঁর কুঠিতে সন্ধ্যা বেলায়ও আমি সাহেবকে দেখেছি। আমায় পথে দেখ্‌লেই সাহেব খুন কর্‌বেন, দোহাই মেম-সাহেব!"

পার্সন বালকের হাতের কব্জাটা চাপিয়া ধরিয়া গেটের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "চুপ করো, এখানে কোন কথা নয়। বাইরে চলো, সব শুন্‌ছি। কোন ভয় নাই তোমার। আমি তোমার জন্য দায়ী রইলুম।"

গেটের আড়ালে আসিয়া পার্সন যখন বালকের হাত ছাড়িয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন প্রথমেই সে হাউ মাউ করিয়া খুব এক চোট কাঁদিয়া লইল। তারপর পার্সনের মিষ্ট ধমকে ঠাণ্ডা হইয়া একে একে কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তার ভাগ্যে যা যা ঘটিয়াছে, সব বর্ণনা করিয়া ফেলিল। পার্সন শুনিলেন—কাল সকালে লীনার তাড়ায় জানালা টপকাইয়া পলাইয়া, বরাবর লাইন পার হইয়া সে মাসীর বাড়ী যায়। ঘণ্টা-দুই পরে, সাহেব চলিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া সে আস্তে আস্তে আবার ফিরে। পথে, সেই লাল-বাংলোর ফিরিঙ্গি মেমসাহেবের কুঠিতে সে ঢোকে; সেখানে তার মাসতুতো ভাই বাবুর্চ্চির কায করে। বাবুর্চ্চি-খানার পাশে দাঁড়াইয়া সে ভাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে, এমন সময় দেখে, মিঃ পিকক্ হন্ হন্ করিয়া আসিয়া কুঠিতে ঢুকিলেন। ভয়ে সে পুনশ্চ মাসীর বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। পিকক্ কাল হইতে সেখানে আছেন। ভাইয়ের কাছে সে খবর লইয়া জানিয়াছে, উক্ত মেম-সাহেবটি বিলাতী গণিকা। পিকক্ প্রায়ই মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ করেন। সন্ধ্যার সময় ভাইয়ের কাছে সে খবর পাইয়াছে যে, পিকক্ আজ মদ খাইয়া অত্যন্ত বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছেন। তাই সে সাহসে ভর করিয়া লীনার কাছে, অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ জানাইতে আজ রাত্রে আসিয়াছিল।

পার্সন স্থির-দৃষ্টিতে ছেলেটির মুখ-পানে চাহিয়া সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া লইয়া,—খুব ধীরে বলিলেন, "তুমি ঠিক চিনেছ ? তিনি মিঃ পিকক্ ?"

বালক দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল, "আপনি চলুন; আমি এখুনি মেম-সাহেবের কুঠিতে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছি।"

পার্সন চুপ করিয়া রহিলেন।—পিকক্ তো নির্লজ্জ ইতরামির চূড়ান্ত প্রমাণ দেখাইতেছেন, সকল তাতেই ! কিন্তু পার্সন তো ইতরের মুখস পরিয়া, তাঁহার ঘৃণ্য পশুত্ব দেখিবার জন্য ছুটিতে পারেন না। তা যদি সম্ভব হইত, তবে আজ কেন,—গত বারে পিকক্ আসিয়া যখন ঐ ফিরিঙ্গি-মেয়ের কুঠিতে গোপনে যান, তখন মিস্ নীলের সঙ্গে ঐ পথ দিয়া আসিতে আসিতে দিন-দুপুরের আলোয় পার্সন নিজে স্বচক্ষেই পিকক্‌কে ঐ কুঠির জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াও কি, সে কথা নীরব ঘৃণায় নিজের অন্তরের মধ্যেই নিঃশব্দে পরিপাক করেন ? অন্ধ-বিশ্বাসী লীনার স্বামী-সৌভাগ্য-গর্ব্বকে পার্সন স্নেহের চক্ষে দেখেন, সে বেচারার দুর্ব্বলতা তিনি ক্ষমা করিয়া চলেন ;—নচেৎ এই পৌরুষের দম্ভ-অভিমানী, ঘৃণিত কাপুরুষটাকে পার্সন কি উচিত শিক্ষা দিতে পারিতেন না ? কিন্তু দুঃখ হয়,—লীনা-বেচারা যে আঘাত পাইবে ! স্বামীর এ অধঃপতন-সংবাদ লীনা কি সহ্য করিতে পারিবে ?

পার্সনের পায়ের নোখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত দারুণ-ঘৃণাভরা উত্তেজনার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল ! এই শ্রেণীর মূঢ় অপদার্থদের পৌরুষ-দর্পই সব চেয়ে চড়া সুরে পৃথিবীর বাজারে প্রতিধ্বনিত হয় বটে। তাদের ইহাদের গলার জোরটা আছে, তাই হুঙ্কারের চোটে—নিজেদের মন ও চরিত্রের সর্ব্বনাশকর নীচতা, দুর্ব্বলতা ইহারা বেমালুম উড়াইয়া দিয়া পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির দিকে ঘৃণাভরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া, অপূর্ব্ব পৌরুষ-দম্ভ-বলে, পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারে ! পৃথিবীর সত্যকার-পৌরুষ-প্রতিষ্ঠিত পুরুষেরাও ইহাদের মহিমময় বিচার-দৃষ্টিতে, হেয়,—অবজ্ঞেয় ! ঐ যে নির্ব্বোধ হতভাগিনীর দল, এই সব পাষণ্ডের নিছক পশু-বৃত্তি-গঠিত মোহের খোরাক জুটাইতে মোহিনী সাজিয়া নরকে নামিল, নিজেদের দুর্লভ নারীত্ব-সম্মান-রত্ন মাথা হইতে ছিঁড়িয়া, পাপের আগুনে আহুতি দিল,—উহাদের ক্ষতির পরিমাণ না খতাইয়া, পৃথিবীর সরল-বুদ্ধি সাধু-সজ্জনেরা তাহাদিগকেই সকল অপরাধের মূল স্থির করিয়া, যত পারেন অভিশাপ বর্ষণ করুন, কিন্তু পার্সনের প্রাণ সে অভিশাপ-উৎসবে যোগ দিতে পারিবেন না। কারণ, পার্সনের বুদ্ধি অতটা সরল মোটেই নয়, এবং পার্সন যে আদৌ সাধু-সজ্জন নন, সেটা তো অকপট-চিত্তে সকলের সামনেই তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন !......

পার্সনের দেহ-বল, মনোবল ও চরিত্র-বলকে সৃষ্টিকর্ত্তা আর যে উপাদানেই গঠন করিয়া থাকুন,—মোম দিয়া যে গড়েন নাই, সেটার অনেক অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া, অকাতরে পারাপার হইয়া পার্সন সুনিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছেন ! সেইজন্য ভগবানের উপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর স্থাপন করিয়া, নিজের প্রাণশক্তির স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট অক্ষত উজ্জ্বল

রাখিয়া পৃথিবীর অনেক-শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে দ্বিধাহীন-চিত্তে অবাধে মিশিয়াছেন, এবং সাধুজন-নিন্দিতা ঐ গণিকা-শ্রেণীর নারীদের প্রাণের সত্য কাহিনী শুনিবার জন্য, প্রাণভরা কৌতূহল-আগ্রহে কান পাতিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পার্সনকে সত্য জানিতে হইয়াছে, বড় ভীষণ ভয়—বড় নিদারুণ ব্যথা পাইতে হইয়াছে,—সে-সকল হতভাগ্য প্রাণের শোচনীয় করুণ-কাহিনী শুনিয়া!

থাক্ সে চিন্তা। এখন কর্তব্য সকলের আগে! পার্সন, মুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ, আমার কাছে যা বল্লে, তা বেশ করেছ। কিন্তু সাবধান, এ-কথার বিন্দুবিসর্গও যদি মিসেস্ পিককের কাণে যায়, তা হলে আমার সেই শিকারি-কুকুর সায়েস্তা করবার 'হান্টিং' চাবুকটা দেখেছ তো?—সেটার ভয় রেখো।"

বালক শিহরিয়া উঠিয়া সভয়ে বলিল, "দোহাই মেম-সাহেব,—আমায় মারবেন না। আমি আমার মেম-সাহেবকে বুঝিয়ে দেব, যে ডবসন-সাহেব তাঁর ভগিনীর কুঠিতে আছেন, সেই কথাই আমি বলেছিলুম। সাহেবের কথা বলি নি।"

বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া পার্সন প্রীত হইলেন। হাসি চাপিয়া গম্ভীর-মুখে বলিলেন, "জংলী, মিথ্যাবাদি! তোমায় আমি বিশ্বাস করি না। আজ রাত্রে তুমি আর মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পাবে না, আমার কুঠিতে চাকরদের কাছে থাকবে চল। আপাততঃ ষ্টেশনে একবার এস।"

বালক কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল। নিজের নিষ্ঠুর আচরণে পার্সন মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু এই জড়বুদ্ধি বালককে ভয়ের শাসন ভিন্ন বশীভূত করা যাইবে না, সেই যে মহা মুস্কিল!

ষ্টেশনে গিয়া টেলিগ্রাম করিয়া পার্সন শীঘ্রই ফিরিলেন। নিজের তিনি কুঠিতে গিয়া রাত্রের আহার সারিয়া, বালককে খাওয়াইয়া, গোটাকতক মিষ্ট কথার মন্ত্র পড়িয়া, বুঝাইয়া সুঝাইয়া, সঙ্গে করিয়া লইয়া, আবার লীনার কুঠিতে আসিলেন। চাকরদের জিম্মায় কয়েদ-থাকিবার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, কৃতজ্ঞ-চিত্তে মহা-আড়ম্বরে সে পুনঃ পুনঃ শপথ করিতে লাগিল, লীনাকে সে কিছু বলিবে না, এক বর্ণও বলিবে না।

পার্সন, লীনার কুঠিতে আসিয়া দেখিলেন চারিদিক্ নিস্তব্ধ নিঝুম। দুয়ারের কাছে আয়া অপেক্ষা করিতেছিল; পার্সনকে দেখিয়া শঙ্কিত ম্লান মুখে অভিবাদন করিয়া সে জানাইল, লীনা শয়নকক্ষে গিয়াছেন। আয়ারা অনেক চেষ্টায় একটু দুধ খাওয়াইয়াছিল, কিন্তু লীনার পাকস্থলীতে সেটুকুও সহ্য হয় নাই, উঠিয়া গিয়াছেন। বিছানায় পড়িয়া লীনা বড় ছট্‌ফট্ করিতেছেন।'

সংবাদ দিয়া পার্সন শয়ন-কক্ষে ঢুকিলেন। লীনা স্তম্ভিত-মুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া, বড় ব্যাকুল কাতর ভাবে পার্সনের দিকে চাহিয়া রহিল! কিছু জিজ্ঞাসা করিতেই বোধ হয় তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না। পার্সন একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া শয্যা-শিয়রে বসিয়া, সংযত-স্বরে বলিলেন, "টেলিগ্রাম করে এসেছি, কাল সকাল ছ'টার মধ্যেই আমরা সত্য-মিথ্যা যাই হোক, একটা সঠিক খবর পাবো।"

লীনার চোখের পাশ বহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বেদনার্ত্ত দৃষ্টি তুলিয়া সে রুদ্ধস্বরে বলিল, "বড় কষ্ট, পার্সন, বড় কষ্ট! মাতৃত্ব ব্যথার মত এমন মহাযন্ত্রণাময় পীড়ন আর কিছুতে নাই!......উঃ কি কষ্ট, পার্সন, সন্তানের মত মহাশান্তিদাতা শত্রু পৃথিবীতে কেউ নাই, কেউ নাই।"

পার্সন নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কোন সান্ত্বনার ভাষা তাঁহার মুখে যোগাইল না।

লীনা কাতরভাবে এ পাশ ও-পাশ করিতে করিতে সহসা সবেগে গা ঝাড়া দিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এ কি অসহ্য পীড়ন! পার্সন, আমি পাগল হয়ে যাব না তো? আমার সংজ্ঞাটা শেষ পর্য্যন্ত ঠিক্ থাক্‌বে তো?"

লীনাকে ধরিয়া সযত্নে শয্যার উপর শোয়াইয়া দিয়া পার্সন শান্তস্বরে বলিলেন, "নিজে, নিজেকে সংযত করে তুলুন, মনকে অত উতলা ব্যাকুল করলে আপনি মায়াসিকে দেখ্‌তে যাবেন, কোন্ শক্তিতে? ঘুমোন, ঘুমুবার চেষ্টা করুন, দুর্ব্বল শরীরটাকে বিশ্রাম দেন, শান্ত হোন!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

জিজ্ঞাসা।

ধানেশ্রী—কাশ্মিরী-খেমটা।

আজি গন্ধ কাহার
আনে পবনে!
আমার হিয়ার কথা বেরিয়ে পড়ে
ছন্দে বরণে!
নীড়ের পাখী রাখ্‌তে নারি,
নীল গগনে দেয় সে পাড়ি
কাহার সন্ধানে!
আজি হৃদয় যে মোর হারিয়ে ফেলি
কোন্ সে স্বপনে!
ওগো আজি গন্ধ কাহার
আনে পবনে!!

রচনা—অচিন পাখী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা

আস্থায়ী।

১ ০ ১

II { মা পা -দা। পা -মা গা I ঋা ঋমা -া। ন্া -সা সা I

আ জি ০ গ ন্ ধ কা হা০ র আ ০ নে

০ ১ ০ ১

গা পা -র্সা। দমা -গঋা -সা I দা মা -পা। পা দা -া I

প ব ০ নে০ ০০ ০ আ মা র্ হি য়া র্

০ ১ ০ ১

না -র্সা র্সা। না র্ঋা না I দা -মা পা। মা -পা পা I

ক ০ থা বে রি য়ে প ০ ড়ে ছ ন্ দে

০ ১

না র্সা -া। মদপা -মগা -ঋসা I I

ব র ০ পে০০ ০০

অন্তরা।

০ ১ ০ ১

II { মা দা -া। পা না -র্সা I র্ঋা -া র্সা। না -র্ঋা র্সা I

নী ড়ে র্ পা খী ০ ০ রা থ্ তে না রি

০ ১ ০ ১

র্ঋা -া র্সা। র্ঋা র্গা -া I র্ঋা -া র্সা। না -র্সা র্সা I

নী ল গ নে ০ দে য়্ সে পা ড়ি

০ ১ ০ ১

I মা দা -পা। না -র্সা র্ঋা I না -র্সা -া। র্সা -না র্সা } I

কা হা র্ স ন্ ধা নে ০ ০ আ ০ জি

০ ১ ০ ১

{ না র্ঋা -া। না র্সনা -র্সা I না র্সা না। দা -না দা I

হৃ দ য় যে মো০ ন হা রি য়ে ফে লি

০ ১ ০ ১

পা -দা পা। মা দা -া I পা া -া। -মদা -নদা -পা } I

কো ন্ সে স্ব প ০ নে ০ ০ ০০ ০০ ০

০ ১ ০ ১

I নর্সা না র্ঋা। র্সা -না দা I মা পা -া। গা -া মা I

ওগো আ জি গ ন্ ধ কা হা র আ ০ নে

I পা দা -না। পদা -ঋগা -ঋসা II II
প ব ০ নে০ ০০ ০০

তান।

১ম :—

I ঋপা ঋদা নদা। পঋা গঋা ন্সা I
আ০ আ০ আ০ জি০ ই০ ই০

২য় :—

I দনর্সঋা গঋর্সনা ঋর্সনদা। পঋদপা ঋগঋগা ঋগঋসা I
আ০০০ আ০০০ আ০০০ জি০০০ ই০০০ ই০০০

উল্লিখিত দুইটি তান লওয়ার পর প্রারম্ভের স্বরলিপি অনুযায়ী, পুনরায় "আজি" কথাটি গেয়।

লেখিকা—

জীবনসঙ্গিনী

(গল্প)

সেদিন বৈকালে বেড়াইতে গিয়া যখন দীঘির ধারে বসিয়াছিলাম, তখন প্রকৃতির নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্য দর্শনে মনটা কেমন মুগ্ধ হইয়া গেল। কতকাল সহরে চাকুরি করার পর, পল্লীগ্রামের এই অকৃত্রিম শোভাতে চিত্ত বিভোর হইয়া উঠিল। এমন সাধের জন্মভূমিতে কেমন করিয়া আমার শৈশব কাটিয়াছিল, ক্রমশঃ তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। নিসর্গসুন্দরীর সে নিভৃতনিকুঞ্জে বসিয়া আমার স্বভাবগত দুঃখচিন্তাতে নিজেকে মগ্ন করিয়া দিতে বড় ভাল লাগিল; তাই অন্ত কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আমার সুদূর অতীতের উপরে যে কতশত মলিন চিত্র পড়িয়াছিল ধীরে ধীরে তাহাকে সরাইয়া দিতে লাগিলাম, আর প্রাণভরিয়া সেই পুরান কাহিনী আন্দোলন করিতে লাগিলাম।

এতক্ষণ বেশ সুস্থচিত্তে ভাবিয়া যাইতেছিলাম। ঘাটের যে দিক্‌টায় আমি বসিয়াছিলাম, তখনও কেহ সে দিকে আসেনাই; তাহাতে আমার সুবিধাই হইয়াছিল। হঠাৎ কতকগুলি মৃদুকণ্ঠস্বর আসিয়া কানে পৌছিল। ফিরিয়া দেখিলাম, কয়েকটী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতে করিতে সেইদিকে আসিতেছে। তাহাদের দৌড়া দৌড়া খেলা, প্রাণখোলা হাসি,—আধো আধো কথা,—দেখিয়া শুনিয়া আমার এত গভীর চিন্তা নিমেষ মধ্যে কোথায় উড়িয়া গেল।

তাহাদের সেই সরল ক্রীড়াকৌতুক

দেখিতে দেখিতে সহসা একটী নম্রপ্রকৃতি বালিকার উপর দৃষ্টি পড়িয়া গেল। সকলের মধ্যে তাহাকেই যেন বেশী সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। মেয়েটী তত সুশ্রী না হইলেও, আমি যেন চোক ফিরাইতে পারিলাম না,—পারিলেও ইচ্ছা হইল না। তাহার প্রস্ফুটিত-কমল-সদৃশ বিশাল আঁখিদুটি,—তাহার সলজ্জ-চঞ্চল দৃষ্টি,—তাহার ক্ষীণ-শীর্ণ-দেহ,—আমারই পূর্ব্বজীবনের ছায়া বলিয়া মনে হইল;—মনে হইল এমনই শ্যামবর্ণে এমনই রূপ-লাবণ্য পূর্ব্বে যেন কোথাও দেখিয়াছি। একবার ভাবিলাম, কাছে যাইয়া তাহার আলাপ পরিচয় লই; আবার ভাবিলাম, কেন এ নিরর্থক আকুলতা? ছেলেমানুষেরা আপন মনে খেলা করিতেছে; আমি গেলেই হয়ত তাহারা সঙ্কোচ বোধ করিবে, হয়ত ভয় পাইয়া খেলা ধূলা বন্ধ করিয়া দিবে। আমি গিয়া তাহাদের আমোদ প্রমোদের মধ্যে কেন বিষাদ আনিব?—ইচ্ছা হইলেও ভরসা হইল না; শিশুর অকপট বিলাসকে বিনা প্রয়োজনে, নৃশংসভাবে বাধা দিতে যেন মন উঠিল না।

কিন্তু কি কারণে হৃদয় এমন উদ্বেল হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; মাত্র একটী শিশু-কন্যার স্নিগ্ধ কান্তি দর্শনে হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি উন্মুখ হইয়া কেন সেইদিকে ছুটিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একবার বুঝিবার চেষ্টা করিলাম;—এই অস্পষ্ট ব্যাকুলতাকে বিশ্লেষণ করিবার জন্য অন্তরাত্মার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সে অতল বারিধিতলে ক্ষুদ্র জলকণার সন্ধান পাইলাম না। শুধু এইটুকু বুঝিলাম, যেন কোথাও দেখিয়াছি।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বালক বালিকারা যে যাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল; আমিও এটা সেটা ভাবিয়া একটু পরেই উঠিয়া পড়িলাম। বাড়ী আসিবার সময় মনটা যেন কেমন ভারী ভারী ঠেকিল। বোধ হইতেছিল, যেন মনের মধ্যে কিছু একটা অপরিস্ফুট রহিয়া গেল, যেন একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহার সমাধান হইল না।

* * * *

মধ্যরাত্রে যখন অর্দ্ধ পৃথিবী নীরবতায় সমাচ্ছন্ন,—সৃষ্টির অর্দ্ধেক জীব সুষুপ্তিমগ্ন,—তখন কোথা হইতে একখানি প্রীতিভরা মুখ চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। কোমল-হাস্য-দীপ্ত সে মুখখানি ক্রমে ক্রমে যেন একেবারে আমারই মুখের উপর আসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ ঘুমঘোরে কাহার মৃদুল কর-স্পর্শ অনুভব করিলাম; সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। কলকণ্ঠে যেন কে কর্ণকুহরে কহিয়া গেল, "ওগো! বহুকাল পরে তোমার কাছে এসেছিলাম; তুমিত কই ধরা দিলে না।"

শ্রীকমল কুমার সান্ন্যাল

ডাকটিকিটের ভাষা

পশ্চাত্ত্য-দেশবাসী পত্র-প্রেরক ডাকটিকিটের দ্বারা পত্রাধিকারীকে নিজের গোপনীয় কথাটী জানাইতে পারেন। পত্র-প্রেরক যদি খামের উপর টিকেট বামদিকের মধ্যভাগে মারেন, তবে "আমার ভালবাসা গ্রহণ কর" বুঝাইবে; টিকিট যদি বামদিকে উর্দ্ধভাগের কোণে উল্টা করিয়া লাগান হয়, তবে "আমি তোমাকে ভালবাসি" বুঝাইবে। দক্ষিণ দিকের কোণে কোণাকুণি ভাবে টিকিট বসান "চুম্বন পাঠাইলাম"র চিহ্ন। খামের মধ্যভাগের বামদিকে টিকিট লাগান "তোমার দর্শনাশায় উৎসুক" বুঝায়; মধ্যভাগের দক্ষিণ দিকে হইলে, "শীঘ্র পত্র দিও" বুঝাইবে। খামের নিম্নে বামদিকের কোনে উল্টা টিকিট লাগাইলে, "তোমার মঙ্গল কামনা করি" বা "তুমি সুখে থাক বুঝায়।" নিম্নে মধ্যভাগে হইলে "পিতা মাতা এ-বিবাহে অসম্মত বুঝায়।" নিম্নে বামদিকের কোণে সোজা টিকিট হইলে "আমি তোমার পরিচয় চাই" ইহাই প্রকাশ করে। নিম্নে দক্ষিণ দিকে থাকিলে "তুমি বড় নিষ্ঠুর" বুঝাইবে। (Boston Globe.)

শ্রীসুষমা সিংহ।

পারের ডাক

আসিবে রে যে-দিন পারের ডাক,
যেতে হ'বে সব ছাড়ি;
(ভাই) ত্যজি সবাকারে সে পারের তরে,
সঞ্চয় কর কড়ি!
যেতে হ'বে রে কোন্ সুদূর দেশে,
নাহি-ক আমার জানা!

তবুও তো ওরে যেতে হ'বে তোরে,
শুনিবে না কারো মানা!
(ও মন) তবে কেন মিছে মায়া-মোহ পিছে
রাখিস্ নিজেরে ধরি'?
ছিঁড়িয়া সকল মোহের শিকল,
চল রে তাঁহারে স্মরি॥

মুক্তি

দুঃখের লাগি অশ্রু যেমন
বেদনা করে হ্রাস।
পাপীকে তেমনি দেয় গো মুক্তি
প্রেমের পরকাশ॥

শান্তি প্রভা দাস।

জাহাজ-ডুবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১১)

দৈবযোগে সেই সময় রাধাগোবিন্দবাবুও সীতাকুণ্ডুতে অমরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথায় কথায় সমস্ত কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর স্ত্রী নবদুর্গা এবং কমলাদেবী দুই যমজ সহোদরা। যে দিন দৈব-দুর্ঘটনা-বশতঃ জাহাজ-ডুবি হয়, সে-দিন দুই ভগ্নীই এক জাহাজে ছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে কেহ কাহারও কথা জ্ঞাত ছিলেন না। আর নব-দুর্গার অবস্থা তখন তো একেবারে উন্মাদের! তাহার পর জাহাজ যখন জলমগ্ন হয়, তখন আরোহি-সকলেও জল মগ্ন হইল। কিন্তু সুযোগ্য কাপ্তেন সাহেবের ঐকান্তির চেষ্টায় এবং সাম্পেন-ওয়ালাদের যত্নে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, সকলেরই জীবনরক্ষা হইয়া-ছিল। সেই সময়ে নিয়তি-চক্রের আবর্ত্তনে কমলাদেবীর পুত্র নবদুর্গার অঙ্কে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে সকল কথা আর এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।—অমর কুমার এতদিনে জানিতে পারিলেন, তাঁহার পালয়িত্রী মাতা পর নহেন, তাঁহার আপন মাসী এবং কেন যে নবদুর্গা ও কমলাদেবীতে আকৃতিগত এত সৌসাদৃশ্য, তাহার কারণও বুঝিতে পারিলেন। এতদিনে প্রবীণ রাধা-গোবিন্দবাবুর অন্তর হইতেও একটা দারুণ সন্দেহ অপসৃত হইয়া গেল। কারণ, এ অমরে এবং সে অমরে তিনি কোনও পার্থক্য দেখিতে পাইতেন না, সেজন্য এ-সমস্ত ব্যাপার তাঁহার নিকটে যেন কেমন একটা প্রহেলিকা বলিয়া অনুমিত হইত। এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, যমজ-সহোদরার পুত্রদ্বয় ঠিক নিজ নিজ মাতার প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কাজে কাজেই উভয় ভ্রাতার প্রতিমূর্ত্তিও ঠিক্ একরূপ বলিয়া মনে হইত। বড় সুখেই মিলনের রজনী অতিবাহিত হইল।

রাধাগোবিন্দবাবু বিজনকুমারের সহিত নীলিমার বিবাহের দিন স্থির করিয়া সকলকে আজিমগঞ্জে লইয়া যাইবার জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ সাদর নিমন্ত্রণ কেহই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজা সূর্য্যকুমার এ বিবাহের দিন কিছু পিছাইয়া দিলেন; কারণ, তিনি দেবমন্দিরে ও দীন দুঃখীকে ধন বিতরণ করিয়া তাঁহার হারানিধি পুত্রের কল্যাণ-কামনা করিবেন বলিয়া, দেওয়ানকে সত্বর টাকা লইয়া আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। অগত্যা সকলেই সেই কয় দিন সীতাকুণ্ডুতেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অমর কুমারের ক্ষুদ্র বাসাবাটীটি লোক সমাগম এবং আনন্দ-হাস্য-রোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। বিজনকুমার ও নীলিমা উভয়েরই ভাব লক্ষ্য করিয়া রাধাগোবিন্দ-বাবুর বুঝিতে বাকি ছিল না যে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্যই তাহাদের এ বিবাহ দিয়া তাহা-দিগকে সুদৃঢ় মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া

উভয়কে সুখী করিবার জন্ত তিনি এ বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বিজন-কুমার ইহাতে আশাতিরিক্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনিও কয়দিন আসর জমকাইয়া অদ্ভুত অদ্ভুত ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী গল্প করিয়া নিজেকে ও অপরকে ফূর্ত্তি, কৌতুক ও আনন্দ দান করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল পুত্র-বিচ্ছেদের পরে একেবারে পুত্র-পুত্রবধূ এবং পৌত্র লাভ করিয়া রাজা-রাণীর অন্তরে যে কি সুখের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনাতীত! রাজার আদেশমত যথাসময়ে তাঁহার দেওয়ান টাকা লইয়া সীতাকুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজা পুত্রের মঙ্গল-কামনায় যাগযজ্ঞ হোম-পূজা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিস্তর অর্থব্যয় করিলেন, দীনদরিদ্রগণকে অকাতরে অর্থদান করিলেন; তাহার পর তিনি দেওয়ানকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "বড় শুভক্ষণে সীতা-কুণ্ডুতে এসেছিলাম। এইখানে আমার বহুদিনের হারান রত্ন পেয়েছি। আমার এ আনন্দের দিনে দেওয়ান, তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না। তোমার ছেলেকে পোষ্য পুত্র নেব বলেছিলাম। আমি তার প্রতি একেবারে অবিচার করব না। আমার জমীদারির এক তৃতীয়াংশ তাকে দান করব। আর যতদিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন তা'র ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার ব্যয় আমি বহন করব। আমার পুত্রের মতই সে আমার কাছে থাকবে।"

বিনীতভাবে দেওয়ান উত্তর করিলেন, "মহারাজের আনন্দে আমিও আনন্দিত, ক্ষুণ্ণ হব কেন? মহারাজ যে এতদিন পরে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে প্রাপ্ত হয়েছেন, এ বড়ই সুখের বিষয়!"

দেওয়ানের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্ত মহারাজ অমরকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "অমর! বাবা, ইনি দেওয়ান তোমার, বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ, এঁকে প্রণাম কর!" এবং অমর কুমারের একটা হাত ধরিয়া দেওয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেওয়ান! এই আমার হারানিধি!"

সহসা যদি আকাশটা নামিয়া দেওয়ানের চরণতলে পতিত হইত, তাহা হইলেও দেওয়ান, বোধ হয়, এতটা বিস্মিত হইতেন না। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে রাজা সুর্য্য-কুমারের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অমর আপনার ছেলে?"

প্রশান্তভাবে রাজা বলিলেন, "হাঁ! কেন? তুমি অমরকে আগে হ'তে চিনতে না কি?"

নতমস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া ধীরস্বরে দেওয়ান উত্তর করিলেন, "অমর, আমার জামাই।"

সানন্দে রাজা বলিলেন, "অঁ্যা, অমর তোমার জামাই? আমার মা-লক্ষ্মী তা হলে তোমার মেয়ে! তুমি আমার বেহাই! এস ভাই, এ আনন্দের দিনে তোমাকে প্রাণ-ভরে আলিঙ্গন করি!"

রাজা স্থান-কাল-পাত্র সমস্ত বিস্মৃত হইয়া বিমুগ্ধচিত্তে দেওয়ানকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। অমরকুমার পিতা এবং শ্বশুরের চরণে প্রণত হইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "আমার জন্যে সন্দিগ্ধ হয়ে

শ্বশুর-মহাশয় আমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেছিলেন।"

অবনীবাবুর কথাটা অমরকুমারের অন্তরে কাঁটার মত ফুটিয়াছিল, তাই আজ ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করিয়া কথাটা টপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন। অবনীবাবু অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নম্রভাবে বলিলেন, "অমর-আমাকে ক্ষমা কর! আমি তোমার বেতন-ভোগী ভৃত্য! তোমার পিতার অন্নে আমার দেহ পুষ্ট হচ্ছে!"

শ্বশুরের এইরূপ বিনয়-বাক্যে অপ্রতিভ হইয়া অমরকুমার বলিলেন, "আপনি গুরুজন, অমন কথা বলবেন না! দোষ আপনার নয়! দোষ আমার অদৃষ্টের! এতদিন গ্রহ-বৈগুণ্যে আমি আমার জীবন-কাহিনী জানতে পারি নি। না বুঝে পূর্ব্বকথা উল্লেখ করে আপনার মনে কষ্ট দিয়েছি। আপনিই আমাকে ক্ষমা করুন।"

আশালতা আসিয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিল। অবনীবাবু লজ্জায় কন্যার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে রাধাগোবিন্দবাবু সকলকে সঙ্গে করিয়া আজিম-গঞ্জের জন্য রওনা হইলেন। রাজা সূর্য্যকুমার, দেওয়ান অবনীবাবু, সকলেই নীলিমার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাধাগোবিন্দবাবু দেহে আজ যেন যৌবনের বল ফিরিয়া পাইলেন। পুলকিত অন্তরে পৌত্রীর বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এ-দিকে অমরকুমারের আগমন-সংবাদ পাইয়া আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, প্রজাসাধারণ, সকলেই বড় সুখী হইল। সকলেরই অন্তর আজ যেন পুলক-প্রবাহে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে লাগিল। কি প্রকারে অমরকুমারের অভ্যর্থনা করিবে সকলে মিলিয়া তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা ষ্টেশন হইতে অমরকুমারের বাটী পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপথ পুষ্পমাল্য ও আলোক-মালায় সুসজ্জিত করিল। নগর-তোরণ-দ্বারে নহবত মৃদু মধুরস্বরে আগমনী গাহিতে লাগিল। সকলেই তাহার স্ব স্ব গৃহদ্বারে কদলীবৃক্ষ, মঙ্গল-ঘট ও আম্রশাখা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য স্থাপন করিল। সন্ধ্যার পর যখন অমর কুমার ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন, তখন তিনি দেখিলেন বহুসংখ্যক লোক, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ষ্টেসনে সমবেত। তাঁহাকে দেখিবার জন্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া সকলে জনতাবৃদ্ধি করিয়া তুলিল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

অমর কুমার তাহাদের আরও প্রফুল্ল করিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে পদব্রজেই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অন্যান্য সকলে ঘোড়ার গাড়িতে উঠিল। অমরকুমার যখন সমভিব্যাহারী লোকদিগের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে পথাতিবাহন করিতেছিলেন, তখন পথিপার্শ্বস্থ দুই ধারের বাটীর বাতায়ন-পথ হইতে মহিলাগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ পথে দাঁড়াইয়া হরির লুট দিল। উলঙ্গ বালকের দল সন্দেশ ও বাতাসা কুড়াইয়া মহানন্দে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজপথ লোকারণ্য! দরিদ্র অধিবাসিগণ বলাবলি করিতে লাগিল, "ওরে এতদিনে আমাদের শনি কাটলো। গরিবের

মা-বাপ অমরকুমারবাবু ফিরে আসছেন, আর আমাদের কোনও ভাবনা নেই!" অমর কুমারের প্রতি জনসাধারণের এতাদৃশ প্রগাঢ় শ্রদ্ধাদর্শনে অবনীবাবু যেন কেমন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। অমর কুমার বাস্তবিক মনে মনে বড় প্রীত হইলেন। ইহারা যে তাঁহার চিরপরিচিত, তাঁহার কৈশোর যৌবনের কত স্মৃতি যে এই আজিমগঞ্জের সহিত বিজড়িত! এখানকার অধিবাসিবর্গ যে তাঁহার আপনার জন হইতেও প্রিয়! বাটীতে উপস্থিত হইয়া অমরকুমার সর্ব্বাগ্রে মহামায়ার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীতে গমন করিলেন; মহামায়ার পদধূলি লইয়া যথাযোগ্য ব্যক্তির সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। নীলিমা তাহার স্নেহময় কাকাবাবু আসিয়াছেন দেখিয়া তখনি তাঁহার স্নেহময়ী কাকীমা এবং তাহার নূতন ভাইটিকে দেখিবার জন্য তাঁহার সহিত চলিয়া আসিল। উপর্য্যুপরি প্রশ্ন এবং নিজের কাহিনী-সকল— কিরূপে দস্যুরা তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, কোন্ ঘরে কেমন অবস্থায় রাখিয়াছিল, বিজন বাবু কেমন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইত্যাদি সবিস্তার-রূপে বিবৃত করিতে আরম্ভ করিল। অমরকুমারকে ফিরিয়া পাইয়া সকলেই পুলকিত মহাহর্ষযুক্ত।

আশালতা বাটীতে প্রবেশ করিয়াই, কানাইকে লইয়া ঝাঁটা হাতে করিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইলেন। তাহাদের অনুপস্থিতিতে সমস্ত কক্ষগুলি হতশ্রী অবস্থায় পড়িয়াছিল। অন্দরের প্রকোষ্ঠগুলির আর্দৌ ব্যবহার হইত না। যে সমস্ত কক্ষগুলি অন্নদা নিজের হাতে অতিনিপুণভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সমস্ত কক্ষ যথাভাবে ঝুল, মাকড়সার জাল এবং পায়রাদের বিষ্ঠায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কক্ষস্থ আসবাবপত্রগুলি ধূলিরাশিতে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। আশালতা সেই সমস্ত ঝাড়িয়া মুছিয়া ধুইয়া যথাস্থানে রাখিতে লাগিল। কানাই আপন মনে গজ গজ করিয়া বকিতে বকিতে, বালতি করিয়া জল আনিয়া গৃহতল ধৌত করিতে লাগিল, এবং বদমায়েসদিগকে গালি দিতে লাগিল। আশালতা সহাস্যে বলিল, "ওরে কানাই, মুখটা একটু থামা, হাত একটু জোরে চালা! কতক-গুলো ঘর পরিষ্কার করে নে শিগগির শিগ্‌গির; নইলে এসব ঘরে শুতে পারা যাবে না। বাকি তখন কাল সব পরিষ্কার করা যাবে।

নীলিমা বলিল, "আচ্ছা কানাই, তুমি মিথ্যা কেন বক্‌চো বাপু? তারা তো আর তোমার এ-সমস্ত গাল আন্দামান থেকে শুনতে পাচ্ছে না! তোমারই মুখ ব্যাথা হচ্ছে?"

উদ্ধতভাবে কানাই উত্তর করিল, "এই দেখুন না, দিদিমণি! শালারা বাড়ীতে বসে মজা উড়িয়ে গেল, আর ঘরগুলো পর্য্যন্ত একটু পরিষ্কার রাখ্‌তে পারে নি! পশ্চাৎ হইতে বিজনকুমার মৃদুহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "সে দোষ তা'দের নয় কানাই, সে দোষ আমার! তারা তো বাবুলোক! তারা কি আর নিজের হাতে ঘর পরিষ্কার করতে পারে? আমিই তোমার কাজটা নিয়েছিলুম, আমারই উচিত ছিল ঘরগুলো পরিষ্কার করে রাখা। তাদের খানসামাগিরি করেছি বটে, কিন্তু ঝাঁটা ধরতে শিখি নি! কানাই পূর্ব্ববৎস্বরে বলিল "কেন তাদের কি আর অন্য ঝি-চাকর ছিল না?"

বিজনকুমারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া নীলিমা

একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, যেন দেহের সমস্ত রক্তটা তাহার মুখের উপর জমাট বাঁধিয়া একসঙ্গে জমা হইয়াছিল। বুকের ভিতর কেমন একটা স্পন্দনানুভূতি হইতে লাগিল। তাহার পর সে একেবারে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইল। মৃদু হাসিয়া বিজনকুমারবাবু বলিলেন, "কি নীলিমা, আমাকে দেখে অত ছুটেপালাচ্ছ কেন? আমি বাঘ না ভালুক? নীলিমা তখন সেদেশেও ছিল না!

মুখফোঁড়া কানাই তখন বলিয়া উঠিল, "তা বাবু উচিত কথা বলতে কি! আপনারা টিক্‌টিকি পুলিশের লোক, বাঘ-ভালুকেরও বাড়া! বাঘভালুকের ভয় বনে গেলে, আর আপনারা ঘরের ভেতর থেকে মানুষের ঘাড় ধরে নিয়ে যান!"

বলা বাহুল্য, কানাইয়ের ভাই বলাইরূপী লোকটা আমাদের বিজনকুমার। তিনি দস্যু-দিগের দাসত্ব করিয়া তাহাদের নিকটে থাকিয়া তাহাদের অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন।

অমর কুমার পুনর্ব্বার আসিয়াছেন, শুনিয়া তাঁহার পুরাতন দাস দাসী সকলে একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমর কুমারও কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া, সকলকেই তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মৃত ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে স্মরণ করিয়া কমলা দেবী দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন; বলিলেন, "দিদির ছেলের ভাতের সময় একবার আমি এখানে এসেছিলুম, তখন আমার অমর হয় নি! তখন এ বাড়ী লোকে লোকারণ্য! আমাকে দেখে উপেনবাবুর কি আনন্দ! আহা, আজ ছেলেটা যদি থাকত!"

নির্দ্দিষ্ট দিনে বেশ সমারোহের সহিত বিজনকুমার ও নীলিমার বিবাহ হইয়া গেল। এ-বিবাহে উৎসবের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। বাজী-বাজনা, নাচ-তামসা, মিষ্টান্ন-বিতরণ, সমস্তই যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়াছিল। রাজা সূর্য্যকুমার বিজনকুমারকে একখানা বার্ষিক দুই-সহস্র টাকা আয়ের তালুক, এবং নীলিমাকে প্রায় দশ সহস্র টাকার অলঙ্কার যৌতুক প্রদান করিলেন। এ বিপৎসঙ্কুল চাকরী পরিত্যাগ করিবার জন্য বিজনকুমারকে সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করিয়া প্রকৃত দোষীকে দণ্ড এবং নির্দ্দোষীকে মুক্তি দেওয়াই তাঁহার আনন্দ! এবং এই ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যে পুলিশের কলঙ্ক-ক্ষালন করাও তাঁহার উদ্দেশ্য। এইজন্য তিনি চাকরী পরিত্যাগ করিলেন না।

বিবাহের কয় দিন গোলমালে অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর রাজা সূর্য্য-কুমার পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্রকে লইয়া দেশে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বহু দিবস পরে জন্মভূমি দর্শনের জন্য অমরকুমারের মনও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার সেই গত জীবনের কাহিনী, শৈশব-সহচর-দিগের কথা মাতার নিকটে শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। শুনিতে শুনিতে তাহা যেন এক স্বপ্ন-রাজ্যের ঘটনা বলিয়া তাঁহার মনে হইত! সেই সমস্ত অতীত দিনের কথা শুনিতে শুনিতে যেন একটা ছায়ার মত তাঁহার সেই বাল্যের স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিত। আর অভাগিনী মাতা, সেই পঁচিশ বৎসরের পরে তাঁহার বক্ষের হারানিধি পাইয়া বুক হইতে আর নামাইতে চাহিতেন না! কিন্তু

এ হর্ষের মধ্যেও অমরকুমারের হৃদয়ের এক প্রান্তে একটা বিষাদের রেখা পড়িয়াছিল;—সব হইল, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্রকে পাওয়া গেল না। তাঁহাকে পাওয়া গেলেই পূর্ণানন্দ হইত। তাঁহাকে কেহ হত্যা করে নাই, তবে তিনি কোথায়? তিনি এক একবার ভাবিতে লাগিলেন, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুও কি সম্ভব নয়? বোধ হয়, তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে, নচেৎ এত করিয়াও তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না কেন? কিন্তু বিজনকুমার বলিয়াছিলেন, কে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল, উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র জীবিত, এবং তিনি কোথায় আছেন, তাহাও সে ব্যক্তি জানে, অথচ সংবাদ দিতে প্রস্তুত নয়। সে কি তবে মিথ্যা বলিয়াছিল? মিথ্যাকথা বলায় তাহার লাভই বা কি? সেই ব্যক্তিই না-কি শেষে কি-না বিজনকুমার ও নীলিমার মুক্তির উপায় করিয়া দিয়াছিল! তাহাকে ত তাহা হইলেও শত্রু বলা যায় না! অথচ তাঁহার সংবাদ না বলিবার কারণ কি? অমরকুমার ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি একদিকে জন্মভূমির দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, অন্য দিকে সেইরূপ উপেন্দ্রকিশোর বাবুর পুত্রের জন্যও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে একদিন তিনি সংবাদ পাইলেন, তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাঁহার অধীন হাবিপুর-গ্রামে অত্যন্ত বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তথাকার অধিবাসিবর্গ অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী। তাহাদের এইরূপ বিপদের কথা শুনিয়া অমরকুমারের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি রাধাগোবিন্দবাবু, বিজনকুমার এবং আরও একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ঔষধ-পথ্য, অর্থ ও দুইজন বিজ্ঞ চিকিৎসক-সহ তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ছুটিলেন।

গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামের দুর্দ্দশা দেখিয়া অমরকুমারের চক্ষে জল আসিল। জমিদার-দস্যুদিগের প্রবল অত্যাচারে গ্রাম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে! কাহারও পেটে ভাত নাই, কাহারও বা পরিধানে কাপড় নাই, কাহারও বা গোয়াল শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ হাল-গরু বেচিয়া জমীদারের খাজনা দিয়াছে, বীজ-ধান্য খাইয়া ফেলিয়াছে! গোলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া-গিয়াছে। পুনর্ব্বার চাষ-আবাদ করিবার কোনও উপায় নাই। অর্থ নাই যে, আবার এ-সমস্ত ক্রয় করিবে! তাহার উপর এই কাল-রোগের প্রাদুর্ভাব! যে পীড়াক্রান্ত হইতেছে, সেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে। গ্রামে নদী নাই; দীঘি পুষ্করিণী যাহা ছিল, সংস্কারাভাবে শৈবালে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোথাও বা সস্কার ভাবে শুষ্ক কোন পুষ্করিণীতে হাঁটু-প্রমাণ জল, তাহাও কর্দ্দমাক্ত! তাহাই লোকে পান করিতেছে! দেখিয়া অমরকুমারের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। জমীদার প্রজার অর্থে সুখ-সাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিবেন, অথচ প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধা বা জীবন ও স্বাস্থ্যের দিকে আদৌ লক্ষ্য করিবেন না! বাঙ্গলার এমনি স্বার্থপর জমীদারদিগের জন্যই আজ পল্লীবাসিগণের এমন দুর্দ্দশা। গ্রামের কি কি সংস্কার করা প্রয়োজন, অমরকুমার তাহার একটা তালিকা করিয়া লইলেন, এবং তথায় একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি ক্ষুদ্র পল্লী-

খানির গৃহে গৃহে ফিরিয়া যাহার যে অভাব, তাহা পূরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অভয়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দরিদ্র অধিবাসিগণের প্রাণে যেন কেমন একটা শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হইল, কৃতজ্ঞতায় তাহাদের হৃদয় ভরিয়া গেল! দুস্থের অন্নকষ্ট, পীড়িতের কাতর চিৎকার, শোকার্ত্তের হাহাকার, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, দেখিয়া দেখিয়া অমরকুমারের মনঃপ্রাণ বিষাদে ভরিয়া গেল। সে করুণ মর্ম্মভেদী হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করা যেন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। অমরকুমার ইহার যথাশক্তি প্রতিবিধান করিয়া, "কাল আসব" বলিয়া তাহাদের আশ্বাস দিয়া অপরাহ্ণে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। আসিবার সময় পথের পার্শ্বে একখানি কুটীরে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষের পলক পড়িল না। সেই কুটিরের অধিকারী তাহার স্ত্রীর সৎকার করিয়া আসিয়া নিজে পীড়াক্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার জ্ঞাতি বন্ধু-বর্গ পলায়ন করিয়াছে। একটী পাঁচবৎসরের উলঙ্গশিশু রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছে, আর একটি ভদ্রযুবক রোগীর নিকটে বসিয়া মাতার ন্যায় তাহার শুশ্রূষায় রত রহিয়াছেন। সেই নীচজাতীয় ব্যক্তির মলিন শয্যার উপরে বসিয়া তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে স্বহস্তে তাহার মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন এবং শিশুকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিতেছেন; নিজের উত্তরীয়খানি ছিন্ন করিয়া রোগীর দেহ মুছাইয়া দিতেছেন, এবং পরিধেয় বসনের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন করিয়া বিছাইয়া তদুপরি তাহাকে শোয়াইয়া দিয়াছেন। দরিদ্রের গৃহে শয্যা অথবা বস্ত্র বেশী কিছুই ছিল না। তিনি তাঁহার কাপড়খানি বিছাইয়া তাহার উপর কচি কদলীপত্র পাতিয়া অয়েলক্লথের কাজ করিয়া লইলেন। তাহার উপর তাহাকে শয়ন করাইয়া দিয়া যথাসম্ভব সে সমস্ত পরিষ্কার রাখিতে লাগিলেন। নিকটে একটা মৃৎপাত্রে জল, কিছু হোমিওপ্যাথি ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, আবশ্যক মত তাহাও ব্যবহার করিতে ছিলেন। তিনি নির্ভয় নির্ব্বিকার অবিচলিত ভাবে, এই দারুণ অনাথ হতভাগ্যে সংক্রামক রোগীর সেবায় রত। তাঁহার আকৃতি অতিসুন্দর, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল ও আয়ত; ললাট ও বক্ষ প্রশস্ত; কেশ কৃষ্ণ কুঞ্চিত মস্তকের উপর স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া বিধাতার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। অমরকুমার মুগ্ধচিত্তে অনিমেষদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন—"কে এই মহাপুরুষ! কে এমন নির্ভয় নির্ব্বিকারচিত্তে রোগীর কাছে থাকিয়া সেবা করিতেছেন? এত দয়া এত করুণা কাহার প্রাণে? ইনি কি বিধাতার বরলাভ করিয়া আসিয়াছেন?"

বিজনকুমার তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনিই সে-রাত্রে জানালার গরাদে ভেঙ্গে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন নয়?"

রাধাগোবিন্দবাবু সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ঠিক অমরের মতন দেখ্তে যে! বিজনকুমার তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া—"এই সেই! এঁকেই আমি পথে দেখেছিলুম, ইনিই আমাকে সেই রাত্রে দস্যুর হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন।"

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটী

এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না তিনি নীরবে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ একবার তিনি উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন, চালের নীচে বাঁশের আড়ার উপর একখানা খেজুর পাতার অর্দ্ধ নির্ম্মিত চেটাই রহিয়াছে। হতভাগা গৃহী সেখান নির্ম্মাণ করিতে করিতে অসম্পূর্ণ রাখিয়াছে; রাখিয়া পীড়িত হইয়াছে। উপস্থিত সেখানি শয্যায় পাতিবার জন্য, উঠিয়া সেখানা পাড়িয়া লইলেন। ইত্যবসরে বিজনকুমার তাঁহার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, এঁর দুই পায়েই ছটা করে আঙ্গুল! কিন্তু হঠাৎ দেখলে বোঝবার জো নেই। কি সুন্দর মানান সই!"

অমরকুমার বলিলেন, "তা হলে আপনিই আমার দাদা? বলুন, বলুন, আর আমাকে ধাঁধায় ফেলে রাখবেন্ না!"

কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত বা বিচলিত না হইয়া তিনি বলিলেন, "চুপ! দেখছ না, লোকটি সুস্থ হয়েছে, ঘুম এসেছে? ঘুম ভেঙ্গে যাবে যে!"

অমর কুমার বলিলেন, "আমি এর কাছে থাকবার জন্যে লোক বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, আপনি চলে আসুন!"

হস্তোত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, ব্যস্ত হয়োনা "অমর! ব্যস্ত হয়োনা!" সে কি মিষ্ট সম্ভাষণ! যেন চিরপরিচিত স্নেহময় ভ্রাতার ন্যায় মধুর সম্ভাষণ! পুলকে অমরকুমারের দেহ ভরিয়া উঠিল। ভাই কি জিনিষ! জগতে ভ্রাতার মত আর কিছু প্রিয় আছে বলিয়া অমরকুমারের মনে হইল না। দুই ভ্রাতায় মিলিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার একটা মধুর কল্পনা সেই মুহূর্ত্তে অমরকুমারের হৃদয় যুড়িয়া বসিল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, ইনিই উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র। রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "হাঁ এ যে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে সে বিষয়ে আর কোনও ভুল নেই! চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে! আর দেখুন কি আশ্চর্য্য! যমজ-ভগ্নীর ছেলে দুটীকে একসঙ্গে দাঁড় করালে ঠিক যমজ বলে মনে হয়! ঠিক এক রকম দেখতে!"

সে-রাত্রিটা সকলের সেই কুটীরেই অতিবাহিত হইল। উপেন্দ্রবাবুর পুত্রের ঐকান্তিক যত্নে পীড়িত লোকটী সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার রক্ষা এবং ঔষধ-পথ্যের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া সকলে গৃহে সমাগত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

ঊষা।

পূরব-সাগর-তীরে,
নীল অম্বর প্রতিবিম্বিত
যাহার সুনীল নীরে,
হেম বরণা পদ্ম-আননা
দাঁড়ায়েছে ঊষা স্থির-যৌবনা!-
স্বর্ণবরণ চিকুরজাল
এলায়ে পড়েছে!—রক্তিম ভাল!-
অবগাহে বালা সলিলে নামি
দিবা-জড়িতা, জ্যোতির রাণী!

তামসী নিশার নিবিড় তিমির
সবে গেছে দূরে সরিয়া—
বিবশ আবেগে চলিছে উর্ম্মি
জলধির বুক ভরিয়া,
তাম্র-বরণ গগনের কোলে
অস্ফুট ভাষা ওঠে ছলছলে,
শিশু ঢেউগুলি পড়িতেছে ঢলে
তরল পুলকে গলিয়া!—
উৎফুল আঁখি তপনো জগৎ
মেলে দি প্রভাত-কালে—
দীপ্তহস্ত হ'ল প্রসারিত
নির্ম্মল নভোভালে!
সপ্ত অশ্বে করি আরোহণ
বাহিরি আসিল তরুণ অরুণ,
হেরিল একটি কমল হিরণ
বিমল-সাগর জলে।

কম্পিত উষা চমকি উঠিল
শঙ্কা-জড়িত প্রাণে;
বক্ষের দ্রুত স্পন্দন-ধ্বনি
বাজিল সমীর-তানে!
নিখিল বিশ্ব রঞ্জিত করি
লজ্জার রাগ ফুটিল শিহরি;
ভাস্বর আঁখি তুলিয়া কিশোরী
চাহিল গগন পানে।

স্নিগ্ধ তাহার শ্বাস-সৌরভ
পুষ্প লইল লুটে!—
কনক শকটে ঘুরিল চক্র
উদয় গিরির তটে।
মীর তাজে বালা নেহারি তপনে,
মুখর নূপুর বাজিল চরণে;
হেম-কিঙ্কিনী-গুঞ্জন-গানে
কুঞ্জ মাতিয়া উঠে!

স্থাপিল সিক্ত নিচোল উপরি
মৃণাল-কোমল ভুজ-বল্লরী,—
কম-তনু ভাসে বায়ু-তরঙ্গে,
সুষমা-লহরী খেলিল অঙ্গে,
আলোক-লতার মত!—
অম্বরজাল সম্বরি ত্রাসে
এস্তচরণে লুণ্ঠিতকেশে
নীলাকাশে উষা আপনা লুকাল,
বসন হইতে ঝরিয়া পড়িল
শিশির-বিন্দু শত।

আদিম প্রভাতে সিন্ধুর কূলে
মণিময়-মালা-লম্বিত-গলে
প্রথমে যেদিন উদিল কুমারী,
ভানুর মুগ্ধ নেত্র-উপরি
ভাসিল স্বপন-ছায়া!
অধরের নব পল্লব-দু'টি
কলস-কণ্ঠ-সম ক্ষীণ কটী
পরশ-লালসে ব্যাকুল তপন!
অমরীর তরে অমর-বেদন
পূর্ণ করিল হিয়া!

তা'র পর গেল কতদিন চলি—
রথ-ঘর্ঘরে তুলি মেঘ-ধূলি
ছুটেছে তপন মিলন-পাগল,
সরে গেছে উষা ভীত চঞ্চল—
আলেয়ার মত চরণ!—
যুগ-যুগান্ত গিয়াছে চলিয়া
চির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধরিয়া
খুঁজিছে সবিতা চির-বাঞ্ছিত!—
বিশ্ব-গগনে চির অঙ্কিত
সে পিপাসিত অনুসরণ।

Bamabodhini Patrika, No 689-691 Registered No. C. 134. Jan., Feb., & March, 1921.

গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি।

প্রেসের অনিয়মিতা ও নানাবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত পত্রিকা প্রকাশে যার-পর-নাই বিলম্ব ঘটিল, এজন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি ও ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। এরূপ বিলম্ব যাহাতে পুনরায় না ঘটে, তজ্জন্য আমরা যথোচিত নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি ও করিতেছি। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, অতঃপর গ্রাহকবর্গের নিকট যথাসময়ে পত্রিকা পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে না। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যে সহায়তা করিলে কৃতার্থ হইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। অর্দ্ধ কলম মাসিক পৃষ্ঠা ... মাসিক

২। এক কলম বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ... „

৩। বিজ্ঞাপনের এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য অর্দ্ধ পৃষ্ঠা „

ঐ পূর্ণ পৃষ্ঠা „

৪। মলাট বা মলাটের সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ও ইহার পুস্তকের

প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা „

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাহানা

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী স্বরূপ। ভাষা অতি প্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের হাতে খেলার পরিবর্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারস সিটি।

বিজ্ঞাপন।

প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ মহাশয়ের সেই প্রসিদ্ধ "জীবন-সংগ্রামে" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা ইহা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বহুতর উপদেশপূর্ণ আখ্যান ও চিত্তাকর্ষক বিষয়ের সন্নিবেশ দ্বারা ইহাকে অধিকতর সুখপাঠ্য করা হইয়াছে। ৩৮ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ও ২৫।২ রূপনারায়ণ নন্দনের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানে পাওয়া যাইবে।

Reg. No. C. 134

৫৮ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

—১—

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

চৈত্র ১৩২৭—এপ্রেল, ১৯২১।

সূচী

৫৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, [illegible] প্রেসে শ্রী [illegible] সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৬৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 692. April, 1921.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৯২ সংখ্যা। চৈত্র, ১৩২৭। এপ্রেল, ১৯২১। ১২শ কল্প। ১ম ভাগ।

ভজন।

রাগ ভৈরব—তেতালা।

ভোরের আলোর সাথে আমি
গাব তোমার গান,
ভোরের পাখীর সাথে আমি
তুল্‌বো বীণায় তান!

ভোরের ফুলের সাথে আমি
গাঁথ্‌বো মালা হৃদয়-স্বামী,
আঁখি-ঝরা শিশির সজল
করবো মালা দান!

ভোরের বেলা আকাশ-পানে
ডাক্‌বো তোমায় কাতর প্রাণে;
বাতাস দিবে খবর এনে,
বল্‌বে তোমার নাম॥

কথা ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

১ | ২´ | ৩
II গা পা -গা -গা ঋা -া সা -সা | ন্‌া সা -া -া | দা -া ণা -া I
ভো রে • র্ আ • লো র্ | সা থে • • | আ মি

১ | ২´ |
I সা সমা -া া পা -া মা -া | গা -া ঋা -া | গমপা মগমা -া -মা I
গা ব • • • তো • মার্ • | গা • • • | • • • • • • • • ন

৩
I মা মদা -া দা | দা -া দা -া পা পা দা -া পা া মা া I
ভো রে • • র্ পা • খীর্ • সা থে • • আ • মি •

I পা -ণা দা -া | পা -া মা -া | গা -া ঋা -া | গমপা -মগমা -া -মা II
তু ল্ বো • | বী • ণায় ০ | তা • • ০ | ••• ••• • ন্

II মা -দা -া দা | না -া র্সা -া | ঋ্ঁা র্সা া া | না -া র্সা -া I
ভো• রে র্ | ফু • লের্ • | সা থে • • | আ • মি ০

I ঋ্ঁা -া -া ঋ্ঁা | ঋ্ঁা -া র্সা -া | না র্সা -া -র্সা | র্সণা দা -া পা I
গাঁথ্ •• বো | মা • লা • | হৃ দয় • • | স্বা ০ • মী

I পা পা দা -া | পা মা গা -া | মা দা -া -া | না -া র্সা -া I
আঁ খি • • | ঝ রা • • | শি শির্ ০ ০ | স • জল্ •

I পা -া ণা দা | পা -া মা -া | গা -া ঋা -া | -গমপা -মগমা -া মা II
ক • র্ বো | মা • লা • | দা ০ • • | ••• ••• ০ ন্

I মদা দা -া -দা | না -া র্সা -া | ঋ্ঁা র্সা -া -র্সা | না -া র্সা -া I
ভো• রে • র | বে • লা ০ | আ কা • শ্ | পা ০ নে •

I ঋ্ঁা -া -া ঋ্ঁা | ঋ্ঁা -া র্সা -া | না র্সা -া -র্সা | র্সণা দা -া পা I
ডাক্ • • বো | তো • মায় • | কা ত ০ র্ | প্রা • • ণে

I পা দা -া -দা | পা -া মা -গা | মা দা -া দা | না -া র্সা -া I
বা তা • স্ | দি • বে • | খ ব • র্ | এ • নে ০

I পা -া ণা দা | পা -া মা -া | গা -া ঋা -া | গমপা- মগমা -া মা II
ব • ল্ বে | তো • মার্ • | না • • • | ••• ••• • ম্

গ্রীক-নাট্যের অভিনয়।

গ্রীকের ধর্ম্মে এবং গ্রীকের জীবনে কেবল সৌন্দর্য্যের উপাসনা, কেবল মানবত্বের আবাহন। বিশ্বকে গ্রীসবাসী অসীম সুন্দরের অভিব্যক্তি বলিয়া জানিত; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সে এক দিব্যশৃঙ্খলার সমন্বয় দেখিত। প্রকৃতিকে সে মানুষ হইতে পৃথক্ বলিয়া ভাবিত

না; প্রকৃতির অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া প্রকৃতিকে আপনার করিয়া লইত। নদী ও পর্ব্বত, মেঘ ও নক্ষত্র—সকলের মধ্যেই সে নিজের অন্তর্মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিত। নিজ-হৃদয়ের অস্ফুট কাহিনী দিয়া নিসর্গ-সুন্দরীকে সে এক অপরূপ শোভায় বিভূষিত করিত। গ্রীসের অধিবাসী মিশরের নিরর্থক পৌত্তলিকতার উর্দ্ধে উঠিয়াছিল; তাহারা মানুষের জীবন, মানুষের ক্ষমতা এবং মানুষের সৌকুমার্য্যকেই পূজা করিত। মানুষকে তাহারা কেবলমাত্র পাশববৃত্তির সমষ্টি বলিয়া জানিত না; মানুষী শোভার মধ্যে কোন ব্যগ্রলালসার চিহ্ন দেখিত না; সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে স্নিগ্ধ কমনীয়তা আছে, যে তেজোময়, দীপ্তিময়, অজেয়, অকথিত, রহস্যময় মাধুর্য্য আছে, তাহাই তাহারা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিত, তাহাই তাহারা দিবরাত্র আরাধনা করিত; বাহের কুহকিনী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত দেবতাকে পূজা করিত। সীমার মধ্যে তাহারা সসীমকে দেখিত না; সীমার পরিধিকে লঙ্ঘন করিয়া এক অনন্ত সুন্দরের সন্ধান লইত; প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিকে শুধু প্রাণহীন জড়পদার্থ বলিত না; তাহার মধ্যে এক চিরন্তনী সত্তার অনুভব করিত। দেবরাজ জিয়ুসের (Jeus) মূর্ত্তি সেই অসীমের মূর্ত্তি; স্বর্য্যদেব য়্যাপোলোর (Apollo) মূর্ত্তি সেই অসীমের মূর্ত্তি; সুরাদেবতা ডায়োনিসসের (Dionysus) মূর্ত্তি সেই অসীমের মূর্ত্তি। সকলেই তাহাদের কাছে এক অনন্তের ছায়া। জীবনে মরণে তাহারা সেই ছায়ারই অনুসরণ করিত। কাব্য কিম্বা শিল্পে তাহারা কেবল সেই অজ্ঞাত সত্যকেই অন্বেষণ করিত। তাই গ্রীকের নাট্য ও গ্রীকের শিল্প লইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ আজ এত গৌরবান্বিত। তাই প্রাচীন গ্রীকের নাম শুনিলে, স্বতঃই হৃদয় স্পন্দিত হয়; তাই গ্রীকনাট্যের কথা শুনিলে প্রাণের ভিতর কি এক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে।

২। প্রাচীন গ্রীকদের মত ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, বোধ হয়, বর্ত্তমান সভ্যজগতে মিলিবে না। বিশেষতঃ, তাহাদের নাট্যের সহিত তাহাদের ধর্ম্মের যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাহা আধুনিক জড়বাদীর পক্ষে কল্পনা করাই সুকঠিন। গ্রীক্‌নাট্যের উৎপত্তিও দেবার্চ্চনায়, নিবৃত্তিও দেবার্চ্চনায়। দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্যই তাহারা নাটকের সৃষ্টি করিয়াছিল; দেবতার প্রীতিবিধানের জন্যই তাহারা অভিনয় করিত। ডায়োনিসসের পূজাকে অবলম্বন করিয়াই নাটকের আবির্ভাব হইয়াছিল; ডায়োনিসসের পূজাকে অবলম্বন করিয়াই সে বাঁচিয়া ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ গ্রীক অভিনয়কে ধর্ম্ম হইতে দূরে নিঃক্ষেপ করে নাই; অভিনয়কে ধর্ম্মের নূতন-মূর্ত্তিমাত্র বলিয়া জানিত। তাই গ্রীকের নাট্যশালায় কখন দ্বন্দ্বকোলাহল হইত না; তাই নাট্যশালার ভিতরে কেহ বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত করিলে, তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত।

৩। ধর্ম্মের সহিত নাট্যের এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল বলিয়া, অভিনয়ের যাবতীয় বন্দোবস্ত শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে করিতে হইত। প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল যদি শাসনের উদ্দেশ্য হয়, তবে একাধারে স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, কাব্য এবং কলা, এই তিনটীকেই সরল করিয়া লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থাপিত করে, সে-সম্বন্ধে যে শাসনকর্ত্তার

পক্ষে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সেইজন্য অভিনয়-প্রদর্শন কিংবা নাটক-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত দেশের কর্তৃপক্ষকে করিতে হইত। কিন্তু অভিনয়ের জন্য যাহা কিছু ব্যয়ের আবশ্যক হইত, তাহা সরকার নিজে বহন করিত না; গ্রীক্‌দের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী এবং সম্ভ্রান্ত, তাহাদেরই একজন স্বেচ্ছায় সে-ভার বহন করিতেন। ইচ্ছা করিয়া গ্রীকেরা কেন যে এরূপ অর্থব্যয় করিতে চাহিত, তাহা আমাদের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু কাব্য ও কলাকে তাহারা অর্থ হইতেও উচ্চ আসন দিতে জানিত। সুতরাং এরূপ সদুদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিবার জন্য তাহারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত।

৪। যখন অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া যাইত, তখন নিয়মিত দিনে এবং নিয়মিত সময়ে ডায়োনিসসের শোভাযাত্রা বাহির হইত। পরদিন সুরাদেবের সম্মুখে নানারূপ নৃত্যগীত চলিত; পরে তিন চারি দিন, বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটকের অভিনয় হইত। যখনই গ্রীসে ডায়োনিসসের পূজা হইত, তখনই এইভাবে নাট্যাদি চলিত। এই উৎসব সচারাচর গ্রীসের প্রধাননগরী এথেন্সেই হইত; তবে কখন কখন অন্যান্য নগরীতে ও গ্রামাঞ্চলে, ঐ সকল নাটকেরই পুনরভিনয় হইত।

৫। সারাবৎসরের মধ্যে এথেন্সে কেবল তিনবার নাট্যাভিনয় হইত। তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্য- এবং সমারোহ-হিসাবে সিটি ডায়োনিসিয়াই (City Dionysia) শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার পরেই লেনিয়া (Lenaea)। লেনিয়াতে যেমন মিলনান্ত নাটকের প্রাধান্য ছিল, সিটি ডায়োনিসিয়ায় তেমনি বিয়োগান্ত-নাটকের প্রাধান্য ছিল। উভয় প্রকার নাটকই, অবশ্য, ডায়োনিসসের স্তোত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কোন কালেই লুপ্ত হইবার নহে। মিলনান্ত-নাটকে কেবল আহ্লাদের চিত্র, বিয়োগান্ত নাটকে বিষাদের চিত্র। বিয়োগান্ত-নাটকের পর মিলনান্তনাটক, যেন শীতের পর বসন্তের সমাগম। তাই লেনিয়ার হাসি-তামসা বসন্তের অপেক্ষা শীতেই ভাল লাগিত; এবং সেইজন্যই সিটি ডায়োনিসিয়ার বিরাট, গাম্ভীর্য্যময় উৎসব বসন্তকালেই আরও প্রীতিকর বোধ হইত।

৬। যদিও মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক একই সুরাদেবের একই স্তোত্র হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি উভয়ের উন্নতি অবনতির জন্য দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি দায়ী। গ্রীকেরা সাধারণতঃ যে তিনটী জাতিতে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আয়োনিয়ন (যবন, Ionion) জাতিই সমধিক কলানুরাগী ছিল, এবং তাহাদের দ্বারাই শোকান্ত নাট্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রহসন কিংবা মিলনান্ত-নাটকের উন্নতি ডোরিয়ানদের (Dorion) হস্তেই হইয়াছিল, এবং তাহারাই প্রথমে হাস্যকর স্তোত্রের মধ্যে কথোপকথনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

৭। যখন নাটকের আদৌ সৃষ্টি হয় নাই, যখন নাটকের পরিবর্ত্তে কেবল নৃত্যগীতের উৎসব হইত, তখন বিয়োগান্ত নাটকের নাম

ছিল ছাগসঙ্গীত, আর মিলনান্ত-নাটকের নাম ছিল গ্রাম্য সঙ্গীত। উভয় সঙ্গীতেরই বিষয় এক; উভয় সঙ্গীতেই দেবচরিত্র বর্ণিত হইত। এই উভয় সঙ্গীতের পূর্ব্বে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে ছাগবলি হইত; উভয় সঙ্গীতেরই গায়কপ্রধান, ডায়োনিসসের অনুচর, কিংবা স্বয়ং ডায়োনিসস্ সাজিয়া, অন্যান্য গায়কদের সহিত সুরাদেবের কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেন। কিন্তু ছাগসঙ্গীতে দেবতার এক অনিন্দ্যসুন্দর গম্ভীর চিত্র অঙ্কিত হইত; গ্রাম্য সঙ্গীতে সুরাদেবকে একজন প্রফুল্লচিত্ত রসিকপুরুষের মত চিত্রিত করা হইত। ছাগসঙ্গীতের পরিণতি বিষাদ-গাম্ভীর্য্যে; গ্রাম্যসঙ্গীতের পরিণতি হাস্য-কৌতুকে।

৮। লেনিয়ার উৎসবে কেবল হাসি তামসা, সিটি ডায়োনিসিয়ার উৎসবে শোক-মালিন্য। লেনিয়ার উৎসব মাঘের দারুণ শীতে; সিটি ডায়োনিসিয়ার উৎসব মধুঋতুর মধুমাসে। লেনিয়ার উৎসব দেখিতে বিদেশ হইতে কেহই আসিত না, একা এথেন্স্‌বাসী নীরবে সে উৎসবকার্য্য সমাধা করিত। সেইজন্য রসিক কবি এরিষ্টোফেনিস্ একবার বলিয়াছিলেন, "এখন আমি যত ইচ্ছা এথেন্সকে গালি দিতে পারি; তাহাতে বিদেশী লোকের কাছে এথেন্সের নিন্দা রটিবে না,—গ্রীসের অন্যান্য জাতির কাছে এথেন্সের সম্ভ্রম কমিয়া যাইবে না।" শীতের পর যখন সমুদ্রের তুফান মন্দীভূত হইত, মলয়ানিলের স্নিগ্ধ হিল্লোলে বারিধির ক্ষুব্ধচিত্ত নম্র ও শান্তভাব ধারণ করিত, তখন সিটি ডায়োনিসিয়ার বিপুল আয়োজন দেখিবার জন্য সমুদ্রবেষ্টিত গ্রীসের দূরদূরান্তরভাগ হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া জনকোলাহলে এথেন্সকে পূর্ণ করিয়া ফেলিত। তখন করদ-রাজ্য হইতে রাজদূতগণ কর দিতে আসিত, তখন বিদেশ হইতে রাজদূতেরা তাহাদের রাজকীয় কার্য্য করিতে আসিত। কয়েক দিনের জন্য এথেন্স কি এক অপূর্ব্ব গরিমায় ভরিয়া উঠিত! গ্রীসের অপর সকল গ্রাম, নগর প্রায় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অভিনয় দেখিবার জন্য এক এথেন্সের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। সারা গ্রাম্ নিস্তব্ধ নিঝুম! সকলেই উৎসবে গিয়াছে! যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এ-সুখে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা বিষণ্ণভাবে কয়টা দিন কাটাইয়া দিতেছে! গ্রীসের তদানীন্তন অবস্থার কথা মনে করিলে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী ছত্র স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়:—

'বর্ষ এখনও হয় নাই শেষ,
　　এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা!
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথ-তরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল,
　　পারুল, রজনীগন্ধা!
অতিদূর হতে আসিছে পবনে
　　বাঁশীর মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে
　　হাসিছে পূর্ণচন্দ্র!'

৯। নাটক যখন সঙ্গীতের আকারে লুক্কায়িত ছিল, তখন নাটক দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ, সুরাদেবের স্তোত্র; আর একভাগ—এবং সে অতি সামান্য—দেবচরিত্র-সম্বন্ধে গায়কবৃন্দের মধ্যে কথোপকথন।

কথোপকথন হইতে নাটকের উৎপত্তি এবং স্তোত্র হইতে কোরাসের (chorus) উৎপত্তি। কোরাস্ বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, গ্রীক্-নাট্যের কোরাস্ সেরূপ ছিল না। আধুনিক নাটকে যেমন দুইটী অঙ্কের মাঝে ঐক্যতান-বাদন হয়, অথবা অভিনয়ের মধ্যে নৃত্যগীত হয়, গ্রীক্ কোরাস্ বলিতে সেইরূপ একসঙ্গে নৃত্যগীত এবং বংশীবাদন বুঝায়। কোরাস্ গায়কের কার্য্য যেন দর্শকের কার্য্য। তাহার সহিত প্রকৃত অভিনয়ের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না; তবে গায়কবৃন্দের সহিত অভিনেতার কথোপকথন চলিতে পারিত, এবং তাহারা রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিত। সাধারণতঃ তাহারা অভিনয়ের প্রথম হইতেই সভাস্থলে উপস্থিত থাকিত, এবং আসিবার সময় গান করিতে করিতে আসিত; কিন্তু কখন কখন অভিনয়ের মধ্যে, কোন গান না করিয়াও আসিত। মাইসিনিরাজ য়্যাগামেম্‌নের দুহিতা ইলেক্‌ট্রা যখন তাহার মাতার অসদ্ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, তখন ইলেক্‌ট্রার সখীবৃন্দ কোন গান না করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল।

১০। গায়কবৃন্দ যেন দর্শকমণ্ডলীর প্রতিনিধি, এইভাবে কথা বলিত ও গান করিত। দর্শকের হৃদয় যেমন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দুঃখে বিগলিত হয়, গায়কবৃন্দও তেমনি তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিত এবং সেইভাবে কথা বলিত। দর্শক যেমন কোন নাটকীয় উপাখ্যানের গূঢ়ার্থ বুঝিতে গেলে তাহার সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝে তাহাই বুঝিত, গায়কবৃন্দও তেমনি সাধারণ মনুষ্যোচিত মতামত প্রকাশ করিয়া ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতকে আরও সরল করিয়া দিত। তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই উপাখ্যান-সম্বন্ধে দর্শকের মনে যে ধারণা জন্মিত, তাহা আরও পরিস্ফুট এবং বদ্ধমূল হইয়া যাইত। আধুনিক বিলাতী অভিনয়ে যেমন গাঢ় করুণ রসের পরে নিরর্থক হাস্যরসের অবতারণা করা হয়, গ্রীক্‌দের সূক্ষ্মবোধের নিকটে তাহা কেমন অপ্রীতিকর লাগিত। যে গভীর মূর্চ্ছনায় তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তাহাতেই তাহারা একেবারে মত্ত থাকিতে চাহিত। তাই তাহাদের বিগলিত হৃদয়কে গীতিকবিতার মধুর আত্মকাহিনীময় ভাবের দ্বারা শান্ত করিতে তাহারা ভালবাসিত।

১১। গায়কবৃন্দ যে স্থলে আসিয়া দাঁড়াইত, সে স্থলটী দেখিতে বৃত্তাকার। তাহার তিন দিকে দর্শকমণ্ডলীর বসিবার স্থান, একদিকে রঙ্গমঞ্চ। বিখ্যাত পৌরাণিক (classical) অভিধান-প্রণেতা স্যর্ উইলিয়াম স্মিথ্ বলেন, "সম্ভবতঃ রোম্যান আক্রমণের পূর্ব্বে গ্রীসে কোন রঙ্গমঞ্চ ছিল না।" কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধানের দ্বারা যাহা প্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে এরূপ মত নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অধ্যাপক হে (Haigh) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এস্কাইলসের সময়ে কাষ্ঠনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চ ব্যবহৃত হইত; সে রঙ্গমঞ্চের উপরে কোন আবরণ ছিল না, এবং কয়েকখানিমাত্র দৃশ্যপট ছিল। শ্রোতৃবর্গের বসিবার স্থান-সকল পরস্পর এত নিকটে সংলগ্ন থাকিত, যাহাতে অতি অল্পপরিসর স্থানের ভিতরে বহুলোক বসিতে পারিত এবং একটু স্থানও অনর্থক পড়িয়া থাকিত না। নাট্যশালার উপরে কোন

আবরণ ছিল না বলিয়াই এইরূপ ঘন সম্মিলন সম্ভব হইত। সম্প্রতি গণিয়া দেখা গিয়াছে, না-কি এথেন্সের নাট্যশালায় প্রায় সপ্তদশ সহস্র (১৭০০০) লোক ধরিতে পারিত। এসিডরস এবং মেগালোপলিসের নাট্যশালাতেও প্রায় অত জন লোক ধরিত।

১২। এই বিশাল জনসঙ্ঘের প্রত্যেকেই কেমন করিয়া গায়ক ও অভিনেতার কথা শুনিতে পাইত, তাহা আমাদের নিকট বড় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্রীকেরা এ-সম্বন্ধে খুব যত্নবান্ ছিল। যে সকল গায়ক ও অভিনেতার কণ্ঠস্বর কিছুমাত্র দুর্ব্বল ছিল, তাহাদিগকে তাহারা অভিনয় করিতে দিত না। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নাট্যশালা কোন পর্ব্বতের পাদমূলে স্থাপন করিত, এবং পর্ব্বতগাত্রে শ্রোতৃবর্গের বসিবার স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিত। তৃতীয়তঃ রঙ্গমঞ্চ কাষ্ঠনির্ম্মিত হওয়ায় শব্দপ্রসারের আরও সুবিধা হইত। মহানুভব য়্যালেক্‌জ্যাণ্ডার যখন বর্ত্তলৌহের (bronze) দ্বারা একটি রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তখন অপর-লোকেরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তাহাতে শ্রবণবিষয়ে বিশেষ দোষ ঘটিবে। কেহ কেহ বলেন যে দর্শকদিগের বসিবার স্থানে এক একটী কুলুঙ্গী করিয়া তাহাতে শূন্যকলস রাখিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু আজকাল এই মত তত সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

১৩। গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বড় বিসদৃশ রকমের ছিল। আধুনিক রঙ্গমঞ্চের মত উহা এত প্রশস্ত ছিল না; সুতরাং আধুনিক অভিনয়ের মত উহাতে এত প্রকার দৃশ্যকৌশল দেখান সম্ভব হইত না। কেবল রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতের প্রাচীরে একখানি দৃশ্য-পট আঁকা থাকিত; তাহাই এখনকার যবনিকার কার্য্য করিত। যখন পর পর কয়েকটি অভিনয় প্রদর্শন করা হইত, তখন যাহাতে প্রত্যেকের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে এরূপ একখানি চিত্র অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু কিরূপে একখানি দৃশ্যপট কয়েকখানি নাটকের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব, তাহা আমাদের পক্ষে সহসা বুঝিতে পারা দুষ্কর। প্রকৃতপক্ষে ইহার কারণ ছিল এই যে, গ্রীক কবি সাধারণতঃ একটা মূল ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া একসঙ্গে তিন চারিখানি নাটক লিখিতেন, এবং যদিও এই প্রথা দিন দিন লোপ পাইতেছিল, তথাপি গ্রীকদের কয়েকখানি নাটক একত্র তুলনা করিলে সহজেই তাহাদের ভিতর একটী মূলসূত্র ধরিতে পারা যাইত। এস্কাইলসের "ওরেষ্টিয়ার (Oresteia) কথা মনে করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। "ওরেষ্টিয়া" তিন ভাগে বিভক্ত;—"য়্যাগামেম্নন" Agamemnon) যুদ্ধপ্রত্যাগত বীরের পত্নীকর্তৃক নৃশংসহত্যা; "কিয়ফরি"তে (Cheophori) পুত্রের দ্বারা পতিঘাতিনীর উপর প্রতিশোধ; "ইউমিনাইডিসে" মাতৃহত্যার অনুশোচনা। তদ্ভিন্ন, এমনও অনেক নাটক ছিল, যাহা ভিন্ন ভিন্ন কবির রচিত হইলেও, একটী মূলসূত্রকে অবলম্বন করিয়া লিখিত হইত।

১৪। গ্রীক অভিনয়ে দৃশ্যও যেমন অল্প ছিল, নট-নটীর সংখ্যাও তেমন অল্প ছিল। গ্রীকনাটকে সচরাচর একসঙ্গে তিনজনের অধিক অভিনেতার আবির্ভাব হইত না। তাহাতে অভিনয় কখন কখন বড় অপ্রাকৃত হইয়া পড়িত।

ইউরাইপিডিসের "ওরেষ্টিসে" যখন রাজ-প্রাসাদের উপর ওরেষ্টিস্ হার্মিয়োনিকে * মারিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছিল আর ওরেষ্টিসের বন্ধু পাইলেডিস্ তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তখন হার্মিয়োনির পিতা মেনেলিয়সের করুণ ক্রন্দনেও পাইলেডিস্ উত্তর দেয় নাই; তখন পাইলেডিসের হইয়া ওরেষ্টিস্ উত্তর দিয়াছিল। পাইলেডিসের এই নির্ব্বাগ্-ভাব নিতান্তই বিসদৃশ, নিতান্ত অস্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি ইহাতে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, আধুনিক অভিনয়ের মত কোন বিমিশ্র কথোপকথনের অবসর না থাকায়, নাটকীয় অন্বয় অতীব সরল হইয়া যাইত; এবং দশজনের কার্য্য একজনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ায়, অভিনয়ের আবেগপূর্ণ গতি কখন মন্দীভূত হইতে পারিত না। সে-জন্য দর্শকের পক্ষে সঙ্গীত কিংবা কথোপকথনের মর্ম্ম অনুধাবন করা খুব সহজ হইয়া পড়িত। দ্বিতীয়তঃ তিনজন মাত্র সুনিপুণ ও সুকণ্ঠ অভিনেতা অতি অল্প আয়াসেই পাওয়া যাইতে পারিত বলিয়া, অভিনয় প্রায়ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত; এখনকার মত নাট্যের সফলতা গৌণ-চরিত্রের অভিনয়ের উপর নির্ভর করিত না।

১৫। কিন্তু কেবল এই তিনটী মুখ্য অভিনেতা ব্যতীত, প্রায়ই দু'একটী অতিরিক্ত অভিনেতার প্রয়োজন হইত। অবশ্য তাহারা কয়েকটী কথা বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইত, অথবা হয়ত মোটেই তাহাদের কিছু বলিতে হইত না। কারণ, যখন প্রধান নটেরা পূর্ব্ব হইতে অভিনয়ে ব্যাপৃত থাকিত, কিংবা বালক-বালিকা-বেশে অভিনয় করার আবশ্যক হইত, তখনই এরূপ নির্ব্বাক্ বা অল্পভূমিক অভিনেতার আবির্ভাব হইত। ইউরাইপিডিস্ কিংবা সফক্লিসের 'ইলেক্ট্রায়' পাইলেডিস্-চরিত্র একবারে মূক; "ইডিপস্ কলোনিয়সে"র একটী দৃশ্যে থিব্স্-রাজ ইডিপস্-কন্যা ইস্মিনি নিঃশব্দ;—কারণ, এতক্ষণ যে নট ঐ চরিত্রের অভিনয় করিয়া আসিতেছিল, সে এখন অন্যরূপ অভিনয়ে ব্যস্ত ছিল। "ওরেষ্টিসে"র শেষ দৃশ্যে আধুনিক নাটকের মত যাবতীয় চরিত্রের সমাবেশ আছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে ইলেক্ট্রা, পাইলেডিস্, হেলেন এবং হার্মিয়োনি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। এইরূপ মূক অভিনেতা নিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ আসিত, যখন সন্তান এবং মাতাপিতার মধ্যে কারুণ্যপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হইত।

ইউরাইপিডিসের "মিডিয়ায়" (Medea) উহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। মিডিয়া তাহার স্বামীর জন্য জাতিকুলমান বিসর্জ্জন করিয়াছে, স্বামীর উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং গৌরব বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, আপনার ভাইকে হত্যা করিয়া স্বামীর প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু সেই স্বামী জেসন্ (Jason) আজ পত্নীর

* যে মোহিনী রমণীর সৌন্দর্য্য-অনলে সমস্ত ট্রয়নগর ভস্মে পরিণত হইয়াছিল, সেই লোকললামভূতা স্পার্টারাণী হেলেনের একমাত্র কন্যা রূপবতী হার্মিয়োনি। তাহার পিতা মেনেলেয়স্ মাইসিনিরাজপুত্র ওরেষ্টিসের সহিত তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করেন। ওরেষ্টিসের পিতা মেনেলেয়সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তাহার মাতা হেলেনের সহোদরা ভগ্নী। কিন্তু তথাপি এ-সম্বন্ধ প্রথমে ব্যর্থ হইয়াছিল। ট্রয়ের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া মেনেলেয়স্ প্রসিদ্ধ গ্রীকবীর য়্যাকিলিসের পুত্র নিয়প্টলেমসের সহিত হার্মিয়োনির বিবাহ দিলেন। তখন ক্রুদ্ধ ওরেষ্টিস্ নিয়প্টলেমস্কে হত্যা করিয়া ঐ লোকললামভূতা হার্মিয়োনিকে পত্নীরূপে লাভ করিলেন।

একান্ত অনুরোধ অবজ্ঞা করিয়া, তাহার নিঃস্বার্থ পতি-প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া, রূপের কুহকে ভুলিয়া অপর রমণীকে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। ক্রোধে দুঃখে মিডিয়া তাহার অকৃতজ্ঞ, অপ্রেমিক স্বামীর শেষ চিহ্ন দুইটিকে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। কিন্তু তাহার শিশুপুত্রদ্বয়ের নির্দ্দোষ, সরল মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার উত্তেজিত হৃদয় আর্দ্র হইয়া গিয়াছে; মুগ্ধ ও বিহ্বলচিত্তে সে কত অনুশোচনা প্রকাশ করিতেছে। এমন মধুর মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যে যদি দুইটি মূক বালক চরিত্রের আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে যে দৃশ্য যে একেবারে বিকলাঙ্গ হইয়া থাকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

লিপি

আপনা তুষিতে নাহি সময়
আপনে এমন হারায়েছি;
চিত্ত-বিহারী মধু-মলয়
দীর্ঘ-নিশাসে তাড়ায়েছি!
না আসে কবিতা উষার সাথে
কিংবা মধুর চন্দ্র-রাতে,
ঠেলিয়া তাহার ভ্রূকুটিপাতে
নীরস গহনে দাঁড়ায়েছি!

প্রভাত হইতে দিনের শেষ
খাটিব, কখনো বলিব না—
'এস রে কাব্য-স্বপ্ননিমেষ!'
প্রেমেতে মরম ছলিব না!
জীবন শুধু ত আগুন, যাগে—
কেবলি শোণিত-আহুতি মাগে!
ঢালিব রক্ত যতটা লাগে!
আপনি আগুন বাড়ায়েছি!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

লীনার শিক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৫)

রাত্রি সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত অনেক রকমে চেষ্টা করিয়া কিছুতে লীনাকে ঘুম পাড়াইতে না পারিয়া পার্সন শেষে মাদক-ঘটিত-ঔষধ-প্রয়োগে লীনাকে নিদ্রিত করিলেন। তারপর আমাদের সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া, তিনি নিজের কুঠিতে ফিরিলেন।

প্রার্থনা সারিয়া, শয়ন করিয়া পার্সন লীনার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। লীনার সেই যন্ত্রণা-কাতর, স্তম্ভিত শূন্য দৃষ্টি ও অনাবৃ

নির্জীব মুখের চেহারাটা যত বার পার্সনের মনে পড়িতে লাগিল, পার্সন তত বারই সনিঃশ্বাসে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেন। এ কি সবই ভাগ্যের খেলা?............সবই ভগবানের ইচ্ছা?.........হইতে পারে! শক্তিশালী দাম্ভিকদের উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল দুর্বুদ্ধির অত্যাচার,—যাহা অপর সাধারণ মানুষের বিবেকে তীব্র-আঘাত দান করে, ন্যায়বুদ্ধিকে প্রতিকার-স্পৃহায় উগ্র-ভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে,—যাহাতে মানুষ দৃপ্ত-অন্যায়কে ন্যায়ের শাসনে শৃঙ্খলিত, সংযত করিয়া, একের স্বেচ্ছাচার স্পর্দ্ধা খর্ব্ব করিয়া দশের মঙ্গল-সাধনে সচেষ্ট হইয়া ওঠে,—মানুষের সেই জীবন্ত বুদ্ধি, জাগ্রৎ বিবেককে ভগবানের ইচ্ছার দোহাই দিয়া ঘুম পড়ানি মন্ত্রে ঘুম পড়াইয়া নিশ্চিন্ত সুস্থই হওয়া যাক!—'সবই ভাগ্যের খেলা!—' এবং তার উপর আর একটু পরিষ্কার সাফা-ইয়ের রসনা লাগাইয়া দেওয়া হোক, যে, 'মানুষের জন্ম-মৃত্যুর উপর যেমন মানুষের কোন হাত নাই, তেমনি জীবন্ত মানুষের জীবনে, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কোন সৎকায মন্দকায, সুচিন্তা কুচিন্তা, সুবাক্য কুবাক্য,—কারুর উপরই মানুষের কোন নীতিধর্ম্ম-মূলক ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব চলে না, সবই পৃথিবীতে 'ভাগ্যবশে' চলিতেছে!... এমন কি পিকক্-নামক মানুষটির একান্ত স্বেচ্ছা ও নিতান্ত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, শিশু-পুত্র যখন মায়ের বুকছাড়া হইয়া, স্নেহ-বিকলা মার প্রাণকে পীড়িত করে,—তার পর প্রাণসঙ্কট রোগে মুমূর্ষু অবস্থায়,—পিতামাতার দ্বারা পরিত্যক্ত দুর্ভাগ্য অসহায়ের মত ধুঁকিতে বসে,—আর দূরের ব্যবধানে আটক থাকিয়া তার রুগ্ন-দুর্ব্বল মা যখন সেই খবর পাইয়া সাংঘাতিক যন্ত্রণায় জীবন্মৃত হইয়া পড়ে, তখন পিকক সে দুঃখের ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া গণিকালয়ে সুরা ও সুন্দরী লইয়া স্বর্গসুখ-ভোগটা যে অবাধে করিতে পারেন,—সেটাও 'ভাগ্য বশে' প্রাপ্ত সৌভাগ্য-যোগ ছাড়া আর কি হইতে পারে? স্ত্রীর ভাগ্যে নাই, কাযেই সে স্বর্গসুখ। ভোগের অধিকারে বঞ্চিতা, আর পুত্রের ভাগ্যে নাই, কাযেই সে পিতার কাছে স্নেহও পাইল না, মায়ের স্নেহ পাইলে কি হয়, ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিল না!—এর জন্য পিকক্ দায়ী নয়, দায়ী ঐ দুর্ভাগাদের দুর্ভাগ্য! পিককের কু-ইচ্ছার আধিপত্য বলিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম, অবিবেচনা, অত্যাচার বলিয়া কোন অভিযোগ ইহার মাঝে টিকিতে পারে না,—প্রমাণ 'ভাগ্য!'

পার্সনের আসন্ন তন্দ্রাটা হঠাৎ ধনুক-ছাড়া তীরের মত সবেগে ধাক্কা খাইয়া ছুটিয়া পলাইল! উত্তেজিতভাবে পার্সন উঠিয়া বসিলেন,—সবই ভাগ্য? মিথ্যাকথা!—সম্পূর্ণ মিথ্যা! মানুষ দুঃখ পায়, ভাগ্যের দোষে নয়, নিজের মূর্খতার দোষে! সাধারণ জুয়াচোর পরকে ঠকায়, কিন্তু অন্ধ অদৃষ্টবাদী দল নিজকে ঠকাইয়া, নিজের সর্ব্বনাশ করে! লীনা যদি এতটা ভালমানুষী দেখাইবার লোভ না রাখিত, তবে কখনই পিককের এতটা বদমাইসি করিবার সাহস হইত না! অত্যাচারীর কখনো ছলের অভাব হয় না, সে তো সর্ব্বজন-বিদিত সত্য! কিন্তু হতভাগ্য অত্যাচার-পীড়িতের দল, যতই নিরীহ মেষের মত মাথা হেঁট করিয়া সবিনয়ে সুযুক্তির দোহাই দিয়া, যতই চোখের জল খরচ করুক,

কি ফল পাইবে তারা? ঐ যেমন সুফল পাইতেছে হতভাগিনী লীনাটা!—

আকস্মাৎ তন্দ্রাহত উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে তেজস্বী চিন্তাস্রোত বিদ্যুদ্বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল! পার্সন সজোরে মাথা ঝাড়া দিয়া প্রবল মনোবেগ সংযত করিলেন। না, আজ রাত্রে মাথা গরম করিয়া ঘুম নষ্ট করিলে, কাল নিস্তেজ শরীর-মন লইয়া দুরন্ত খাটুনীর ধাক্কা সাম্‌লানো যাইবে না। পিককের উপর যতই রাগ করা যাক্‌, লীনার তাতে কোন সাহায্যই হইবে না, সেটা মনে রাখা চাই অবশ্যই।

মশারী খুলিয়া পার্সন বাহিরে আসিয়া ঘাড় ও কপাল ধুইয়া ফেলিলেন। ব্রাকেটের উপর হইতে এলার্মিং ঘড়ি পাড়িয়া ভোরে সাড়ে চারটার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য দম লাগাইয়া দিয়া, তাহা শয্যা-শিয়রে রাখিয়া দিলেন। তারপর শান্তভাবে ঘরের মেঝেতে বার-কতক পায়চারি করিয়া, মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং শীঘ্রই ঘুমাইলেন।

ঘড়ির শব্দে ঠিক সাড়ে চারটায় ঘুম ভাঙ্গিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া পার্সন তাড়াতাড়ি কাজে লাগিলেন্‌। আধ-ঘণ্টার মধ্যে প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া নিজের দুই-চারিদিন অনুপস্থিতির জন্য, যাহাকে যাহা বলিতে হইবে, দ্রুত-হস্তে তাহা লিখিয়া রাখিয়া, চাকরকে ডাকিয়া যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া পার্সন বাহির হইলেন।

তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ফোটে নাই, কাছাকাছি কোন বাড়ীর লোকজন কেহই জাগে নাই। শীতের আমেজ-ভরা ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল; গাছে গাছে পাখীগুলি সেই-সবে ঘুম-ঘ চোখে চাহিয়া ডানা ঝাড়া দিয়া গান ধরিতে সুরু করিয়াছে। পার্সন চারিদিকে চাহিয়া চলিতে চলিতে ভাবিলেন, এই সুন্দর প্রভাত আজ লীনার জন্য কি দিনই বহিয়া আনিবে, কে জানে!

হাতার ফটকের চাবি মালীটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ফটক তখনও ভেজানো ছিল। পার্সন নিঃশব্দে ফটক টানিয়া একটু ফাক করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই টেলিগ্রাফ-আফিসে গিয়া সংবাদ লইতে হইবে, যদি কোন টেলিগ্রাম আসিয়া থাকে। যদি এতটুকুও সুসংবাদ পাওয়া যায়, তবে লীনাকে সাহস দিবার একটা পথ হয় যে!

ফটকের পাশে দেয়ালের গায়ে একটা থামে বাঁ পা তুলিয়া, হাঁটুর উপর কনুইয়ের ভর রাখিয়া, সামনে ঝুঁকিয়া দু'হাতে মাথা ধরিয়া একটা লোক স্তব্ধ-নিষ্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ফটক খুলিয়া পার্সন বাহির হইলেন, শব্দটা তার কানে পৌঁছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না; ঠিক যেমন আড়ষ্ট-নিঝুম ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল।

এস্ত ভাবে গমনরত পার্সনের দৃষ্টি লোকটার উপর পড়িতেই হঠাৎ তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন! অজ্ঞাতেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে দারুণ বিস্ময়-ভরা সংশয়ের প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—"মিঃ পিকক্‌ না কি?"

লোকটা চমকিয়া মাথা তুলিয়া চাহিল।— পার্সন দেখিলেন, শুধু পোষাক-পরিচ্ছদে মাত্র নয়, মুখের গঠন এবং রঙে এ মানুষটাও পিককের মতই বটে! কিন্তু না—না, সেই

উদ্ধত দাম্ভিক পিককের গর্ব্ব-জ্বালা-ভরা উগ্র-দৃষ্টি এ চোখে তো নাই! এ মুখের ভাব………? না এ কখনখই নয়! এ মুখ যে পৃথিবীর কোন তীব্র-যন্ত্রণা-নিষ্পীড়িত, একান্ত হতাশ মুহ্যমান মহা-হতভাগ্যের মুখ! এ তো পিকক্ নয়!………এই মর্ম্মান্তিক বেদনা-ব্যথিত বিষাদ করুণ-দৃষ্টি!——ভুল ভুল! এ লোক কখনই পিকক্ হইতে পারেন না! এ ব্যক্তি যে-ই হউক, কিন্তু এ যে মানুষের একান্তই দয়ার পাত্র!

বিস্ময়-বিচলিত পার্সনকে চমৎকৃত করিয়া লোকটা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া টুপি খুলিল। সজোরে নিঃশ্বাস টানিয়া ভগ্ন-বিকল-কণ্ঠে সে বলিল, "মিস্ পার্সন, আপনি! হাঁ ম্যাডাম, আমি আপনাদের পরিচিত পিককই বটে! মাপ করবেন, আপনার পুরো নামটি, পার্সনস্-ই বোধ হচ্ছে, নয়?"

হাঁ তাই বটে! সংক্ষেপে 'পার্সন' বলিয়া ডাকা হইলেও পুরা নামটা তাঁহার 'পার্সন'স্-ই বটে! কিন্তু এ কি ভুল! পার্সন যে কিছুতেই ঠাহর পাইতেছেন না, যে, বাস্তবিকই এই লোকটা পিকক্। সেই লীনার স্বামী পিকক্! পার্সন অবাক্ হইয়া সেই উদ্ভ্রান্ত বিহ্বল মূর্ত্তিটার পানে চাহিয়া রহিলেন,— সত্যই ইনি পিকক্ তো?

পিকক্ ক্ষণিকের জন্য নীরব রহিলেন; তারপর নিজের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটার কথা ভুলিয়া গিয়া, দূর দিগন্তের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজমনেই বলিলেন, "পৃথিবীতে একশ্রেণীর কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ আছে, যারা কোন অতি-বড় প্রয়োজনের অনুরোধে,—কোন নীতির কাছে, সত্যের কাছে এতটুকুও মাথা-নোয়াইতে চায় না, কিন্তু তাদের একদিন সশব্দেই ঘাড় ভেঙ্গে পড়তে হয়,—এই পৃথিবীর ধূলোর উপরেই হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়্‌তে হয়, যেদিন ভগবানের হাত থেকে ন্যায়দণ্ড এসে সোজা তাদের মাথায় পড়ে!—

পিকক্ চোখ নামাইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া কি ভাবিলেন; তারপর যন্ত্রণার্ত্তকণ্ঠে ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, "আছে, আছে! ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার বলে একটা জিনিস এ পৃথিবীতে আছেই! যত বড় দুর্দ্দান্ত ক্ষমতাশীল অত্যাচারীই হোক্—সে দণ্ডের কাছে কারুর পরিত্রাণ নাই!"

পার্সন ভীতকণ্ঠে ডাকিলেন, "মিঃ পিকক্,—সুপ্রভাত!"

"সুপ্রভাত!"—বলিয়া পিকক্ অন্যমনস্ক ও বিকলভাবে পার্সনের হাতটা ছুঁইয়া, আবার পিছু হটিয়া দাঁড়াইলেন। পার্সন মৃদুস্বরে বলিলেন, "কুঠিতে চলুন, রাস্তায় আর কেন?"

অতিশয় সংযত-কঠিন স্বরেই পিকক্ উত্তর দিলেন, "কুঠিতে? না, মাপ করুন। লীনার সামনে—আর নয়!"

পার্সন এত ক্ষণের পর এইবার নিজের অকস্মাৎ বিপর্য্যস্ত বুদ্ধিটাকে সংযত—স্থির করিবার সুযোগ পাইলেন। পিককের মুখের দিকে চাহিয়া শান্তস্বরে বলিলেন, "আপনি এখন কোথা থেকে আস্‌ছেন? কর্ম্মস্থান থেকে?" প্রশ্নটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই পার্সনের দৃষ্টিতে তীব্র-ঘৃণা অলক্ষ্যে ফুটিয়া উঠিল!

সবেগে মাথা নাড়িয়া পিকক্ কঠিন-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "না, মোটেই না! লীনাকে অনেক রকমে কাঁদিয়েছি, অনেক জন্ম

করবার বুদ্ধি খাটিয়েছি, ভয়ঙ্কর অদ্ভুত অদ্ভুত বুদ্ধি নিয়ে, মনুষ্যত্ব-নাশকর, ঘৃণার্হ-উপায়ে তার ওপর নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করতে চেয়েছি! কি ভয়ানক বর্ব্বর হিংসাই তার উপর জেগেছিল, পার্সনস্! তাকে ঠকিয়ে, বঞ্চিত করবার জন্যে' বেশ্যার ...... দূর হোক্ সে জঘন্য নারকীয় কাহিনী! আর বল্‌তে পারছি নে। নিজের চারিত্র্য-বিশুদ্ধি, মনুষ্যত্ব,—সব, সমস্ত,—সমূলে, ঈর্ষ্যার মূল্যে বেচে খেয়েছি!—আজ ঠাণ্ডা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, নিজের সমস্ত আচরণগুলার হিসাব-নিকাশ করছি। উঃ! কি ঘৃণাময় জীবন আমার! পার্সনস্,—অকপটে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি,—আজ এই মুহূর্ত্তে, নিজেকে গুলী করে মারতে পারলে, আমি বড় শান্তি পেতুম!"

পার্সন অসহিষ্ণুভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; যথাসাধ্য কণ্ঠস্বর সংযত রাখিয়া বলিলেন, "কি পাগলের মত বকছেন আপনি? যত শোক, যত দুঃখ, যত কষ্ট আসুক্,—অপদার্থ কাপুরুষ ছাড়া কেউ নিজেকে গুলী করে মেরে,—কর্ত্তব্যকে,—মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্যকে ফাঁকী দিতে চায় না!"

বাধা দিয়া পিকক্ সজোরে বলিলেন, "ওই কথাটা, শুধু ওই কথাটা এখন প্রাণপণ চেষ্টায় মনে রেখে, এই প্রকাণ্ড প্রলোভনটা প্রচণ্ড-বলে দাবিয়ে রেখেছি! কাল বৈকালে মাতৃ-বিয়োগের সুসংবাদ পেয়েছি। মনটা বড় বিগড়ে গিয়েছিল,—বোতল বোতল পার করে, নিজের সমস্ত সংজ্ঞাটা নেশার আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে খানিকটা বেশ ছিলাম। তারপর আজ মহা সুসংবাদ!—আমার পুত্রবিয়োগ হয়েছে। এই ন্ নি আপনার টেলিগ্রামের উত্তর।—আমিই ওটা সই করে নিয়েছি।—যান্, লীনার বুকে মৃত্যুশেল মেরে হতভাগিনীর সকল আশা শেষ করে দেন। ভাগ্যবান্, মহাপুরুষ আমি; —জগতে নিজের সুখ অধিকারেই ব্যস্ত আছি, আমার আজ কাঁদতে বসা সাজবে না! এ-ব্যাপারে দুঃখ-প্রকাশের অধিকারটুকু পর্য্যন্ত আমার নাই! মারাসর শান্তিদাতা মুরুব্বি ছিলাম,—অন্ধ দর্পে শুধু শাসনের মুরুব্বিয়ানাই করেছি। একবারও ভাবি নি,—ভুলেও ভাবি নি, সে হঠাৎ এমন করে আমার চোখে ধূলো দিয়ে চলে যাবে!—চোখে ধূলো ...!

পিকক্ হঠাৎ চুপ করিলেন। পার্সন টেলিগ্রাম হাতে করিয়া নিষ্পলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তার লেফার্ড জানা-ইতেছেন রাত্রি সাড়ে বারটার সময় শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।"

পার্সনকে চম্‌কাইয়া দিয়া, পিকক্ সহসা দাঁতে দাঁত পিষিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "এই আমার ঠিক বিচার হয়েছে! কে বলে, 'ভগবান্ নাই' পার্সনস্? আসুক সে, আজ আমার যন্ত্রণা-উন্মাদ হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুক,—চির দিনের নাস্তিক দাগাবাজ, শয়তানী-বুদ্ধির গোলাম, এই পশু-হৃদয়টার মাঝে আজ ভগবানের হাতের চিহ্ন কি জলন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে লেগে গেছে, দেখে যাক্। না, না পার্সনস্, আমি ভুল বল্‌তে এসেছি; না,—লীনাকে বাঁচাবার চেষ্টা আর নয়! সে বেচারাকে মরে গিয়ে শান্তি পেতে দেওয়াই এবার ঠিক। সেই প্রার্থনাই করুন্। লীনা অনেক দুঃখ পেয়েছে, এবার মরে সুখী হোক্। বিদায়! মারাসির মৃতদেহটা এখনো

আছে। এই সাড়ে দু'টার ট্রেনেই চলুন। লীনাকে বল্‌বেন সব।"

পিকক্ প্রস্থানোদ্যত হইলেন। পার্সন বাধা দিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন, "দাঁড়ান দাঁড়ান,—এ খবর লীনাকে আমরা কি করে দেব?"—পরক্ষণেই নিজের অজ্ঞাতেই পার্সন মৃদের মত বলিয়া ফেলিলেন, "এ অবস্থায় তাকে শান্ত করা, সে কর্ত্তব্য যে আপনার!"

"আমার!"—পিককের ললাটের শিরা গুলা উৎকটবেগে স্ফীত হইয়া উঠিল! উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া, তীব্র কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মগজের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল্ যে! সবাই আমায় পাগল করে দিতে চায়?—আমি চিরদিন দৃপ্ত অবজ্ঞায়, পৃথিবীর সকল মানুষকে কৃপার পাত্র ঠাউরে চলেছি, আজ সেই পৃথিবীর চেহারা আমার কাছে আশ্চর্য্য রকমে বদলে গেছে!—আজ আমি আপনাদের কাছে, জগতের প্রত্যেকের কাছে কৃপা-ভিক্ষা চাইছি, কাতর প্রাণে অনুগ্রহ-ভিক্ষা চাইছি,—আমায় অনন্ত নরকবাসের অভিশাপ দিতে চান, দেন,—কিন্তু লীনার সামনে আমায় মুখ দেখাতে বল্‌বেন্ না! আমি তাকে হাজার রকমে বঞ্চনা করেও তৃপ্ত হতে পারি নি; শেষে তার একমাত্র পুত্রকেও—। প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, পার্সনস্, হত্যার পাপ আর কাকে বলে, বলুন দেখি! কি দিয়ে আজ নিজেকে সান্ত্বনা দিই? উঃ ভগবান্‌—আমার সমস্ত কিছু অবলম্বন আজ কেড়ে চুরমার্ করে দিলে! এ কি কঠোর দণ্ড!—" পিকক্ হেঁট হইয়া দু'হাতে সজোরে কপাল টিপিতে লাগিলেন।

হতবুদ্ধি পার্সন নিজেকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছেলের অসুখের খবর পেয়েই লীনা ভেঙ্গে পড়েছে, এ-খবর তাকে এখন কিছুতেই আমরা দিতে পার্‌ব না;—দিলে তাকে বাঁচাতে পার্‌ব না। আপনি যতই বলুন,—কিন্তু ঠিক জানবেন্,—এ দারুণ শোক লীনাকে সহ্য করিয়ে, তাকে সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে, বাঁচিয়ে তোলবার ক্ষমতা যদি কারুর থাকে,—তবে সে আপনার ধৈর্য্য, সংযম, আর ঐ একান্ত ব্যথিত-স্নেহের; যে স্নেহ আজ লীনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে,—তাকে পুত্রশোকের দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্যে, তার মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করতে চায়!—মিঃ পিকক্,—এপৃথিবীতে আমাদের ভুলের ক্ষতিটা যত বৃহৎ-ই হোক, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তের পথও একটা আছে;—সে পথ ভগবানের প্রসন্ন-আশীর্ব্বাদে মহিমোজ্জ্বল।

পিকক্ কপালের হাত সরাইয়া বিহ্বল-দৃষ্টিতে একবার পার্সনের দিকে চাহিলেন, তারপর দীন-কণ্ঠে বলিলেন, "জীবনে কারুর কাছে কখনো আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা করি নি,—ভগবানের উদ্দেশেও নয়! কিন্তু আজ আপনার কাছে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতে ইচ্ছা হচ্ছে।—এই পথের ধূলায় নতজানু হয়ে আপনার কাছে ওই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে নেবার ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি কি আমার মূঢ়তা ক্ষমা করবেন্?"

পার্সন চমৎকৃত হইয়া পিককের বেদনার্ত্ত-করুণ চোখ-দুটির পানে চাহিয়া রহিলেন! মৃত্যু, মৃত্যু!—কে বলে তুমি শুধুই ভীষণ অমঙ্গলময়! ভুল, ভুল! বহু—বহুদিন সঞ্চিত, মহা-মূঢ়তার বুকে প্রলয় ঘটাইতে তোমার চেয়ে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রকারিতা কার

আছে! শোক, তুমি স্বর্গীয়-ভাব-দ্যোতক মহাশক্তি! তোমার জয় হোক!

পার্সন ভুলিয়া গেলেন,—ঘণ্টা-কতক আগে এই মানুষটার গোটা-কতক নির্লজ্জ-মূর্খতা-ব্যঞ্জক কীর্ত্তির নীরব সমালোচনা করিতে গিয়া, তিনি ঐ মানুষটার সমস্ত মনুষ্যত্বটুকুর উপর কতদূর তীব্র ঘৃণা-ক্রোধে অধীর ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন! মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে-সকল অসংযম, কু-অভ্যাস একান্তই অপ্রার্থনীয়,—সেগুলা মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব-বলে অবহেলায় পদদলিত করিয়া চলুক,—ইহা লক্ষ বার, কোটী বার প্রার্থনীয় হউক, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের কোন একটা দুর্ব্বলতাকেই শুধু বৃহৎ করিয়া দেখা, এবং সেইটাই তাহার সমস্ত মনুষ্যত্বের যথাসর্ব্বস্ব ভাবিয়া, তাহাকে বিচার করিতে যাওয়া,—সেও কত বড় এক-চোখো বিচার!— কতখানি হৃদয়হীন নৃশংসতা!

নিজের নির্ব্বোধোচিত অবিচার-স্মৃতি বিদ্যুদ্বেগে পার্সনের মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পার্সনের স্মৃতিপটে, কে যেন জ্বলন্ত অক্ষরে সূক্ষ্ম-দর্শী মহাজনের মহত্তম উক্তি দাগিয়া দিল,—"To hate a man is to betray humanity"—একটি মানুষকে ঘৃণা করার,—সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা,—বিদ্রোহিতা—প্রকাশ করা হয়। হায়রে, ঘৃণা-দৃপ্ত উষ্ণ মস্তিষ্ক!—পরের দুর্ব্বলতা-বিচারের সময় যদি সে-নীতিটা স্মরণ রাখিতিস্!

পিকক্ দীনকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ চাহিলেন, পার্সনের অনুতপ্ত মন, নিজের নৈষ্ঠুর্য্যের ব্যথায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল! পার্সনের কণ্ঠ যেন করিয়া কান্নার রোল ছুটিয়া আসিতে চাহিল! পার্সন দ্বিধা ভুলিয়া, পিককের দুইহাত ধরিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,"না; আমায় ও-কথা বলে আমার অনুতাপ বাড়াবেন না।—আমাদের সকল ভাই সকল ভগিনীর অন্তরের অন্তঃস্থলে যিনি অন্তর্যামি রূপে বাস করছেন, তাঁর কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করুন্। যে মানুষ মঙ্গলের পথে চল্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়, তিনিই সে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়! আমরা তাঁর কাছেই আশীর্ব্বাদ পাব।"

"আঃ, ধন্যবাদ! আজ এ-সময় আমায় এমন কথা শোনাতে পারে, এমন একটি বন্ধুও আমার ছিল না!—বড় কৃতজ্ঞ হলুম, ম্যাডাম্! ভেতরটায় কি যে হচ্ছিল, বল্‌তে পারি নে, কিন্তু এখন শান্তিবোধ কর্‌ছি, অনেক শান্তি! ধন্যবাদ আপনাকে, বিদায়।"

পা। বিদায়। কায শেষ করেই ফিরবেন।

পি। ফিরব্। আমার পিতাও মৃত্যু-শয্যায়। দশ বৎসরের পর আজ আমায় স্মরণ করেছেন, 'শেষ-দেখা' করবার জন্য। জীবনে অনেক কর্ত্তব্য অবহেলা করেছি, কিন্তু এ কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের শক্তি আর নাই। তাঁর আদেশ পালন করেই লীনার কাছে আস্‌ব।

পার্সন চিন্তিতমুখে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তা হলে, সেখানে পৌঁছেই টেলিগ্রাম করুন্ যে, মারসি সুস্থ হয়েছে, লীনার যাবার প্রয়োজন নাই। আপনি মারসিকে সঙ্গে করে শীঘ্রই এখানে আস্‌ছেন।"

পি—"আবার প্রবঞ্চনা! তারই সঙ্গে! মারসির জন্যে!"

পার্সন ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "না হলে, আমরা লীনাকে বাঁচাব কি করে? সে যে

উৎকণ্ঠায় পেষণেই মারা যাবে!—"

যন্ত্রণার হাসি হাসিয়া পিকক বলিলেন, "তাই করব, পার্সনস্, আমার এই রুক্ষ উদ্ধত, নির্ম্মম, স্বার্থপর মূর্ত্তিটার পানে চেয়ে দেখুন, এর কোন খানে কোথাও এতটুকু দয়া, মায়া, স্নেহ-মমতার চিহ্ন খুঁজে পাবেন না! আমি তাকে চিরদিন অকাতরে দুঃখ দেবার জন্যেই তার স্বামিত্বের অধিকার গ্রহণ করেছি,—পাষাণ আমি! এ দুঃখও তাকে অকাতরে দেব, কি সৌভাগ্য আমার!"

পিকক্ স্খলিত-চরণে অগ্রসর হইলেন। পার্সন দেয়ালে ভর দিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, তারপর বৃদ্ধা নীলের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য ধীরে তাঁহার উদ্দেশে কুঠিতে চলিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু করুণা-ভরা ব্যথার অশ্রুতে টল্ টল্ করিতেছিল,—অন্তরের অন্তঃস্থলে একান্ত আগ্রহময় প্রার্থনার সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল,—'ফিরাও, ফিরাও ভগবান্, জগতের সকল হতভাগাকে এমনি করিয়া আঘাত দিয়া সচেতন করিয়া,—সৎপথে ফিরাও! তোমার হাতের আঘাত, সে যে কত বড় মঙ্গলের মহিমায় অলঙ্কৃত, প্রত্যেক মানবাত্মা তাহা প্রত্যক্ষ চেতনায় ধ্রুব-সত্য অনুভব করিয়া যথার্থ 'মানুষ' হইয়া উঠুক! বিশ্ব-চরাচর ধন্য হইয়া থাক্!'—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

"আনন্দ রাতি এল"

(মিশ্র বারোয়াঁ-ঠুংরী)

আজি আনন্দ রাতি এল
গেয়ে যা'রে মন!
আজি কোথা দুঃখ-শোক দূরে মিলাইল
প্রেমে গানে হৃদি যেন হল নিমগন!
আজি মানস-নিকুঞ্জে পিককুল গাহে
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল হৃদি উপবন!
আজি আনন্দ রাতে পাব প্রাণনাথে
কানে কানে ক'য়ে গেল মৃদু সমীরণ!
তাই আনন্দ-আকুল হৃদয় ব্যাকুল
এতদিনে হ'ল বুঝি সফল-সাধন॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

শিক্ষা

ঘরের সংখ্যা যখন লোক-সংখ্যা অপেক্ষা অনেকটা বেশী হইয়া পড়ে, তখন বাড়ীর সেই অবস্থাকে আমরা 'হাঁ হাঁ' করা বলি। চাঁদপুরের রায়-বাড়ীর অনেক বৎসর হইতে এইরূপ 'হাঁ হাঁ' অবস্থা। বাড়ীটা আমার প্রপিতামহের সম্পত্তি ;— উত্তরাধিকারি-সূত্রে পুরুষানুক্রমে আমরা সুখে ও দুঃখে ভোগ-দখল করিতেছি। সে-কালে নাকি সবই বৃহৎ ছিল। আমাদের বাড়ীটাও সেই পদবাচ্য। ইট-কাঠ-দুয়ার-জানালা-গঠিত সেই বিপুল উদর আমাদের সংসারের ৫।৬ জন লোকদ্বারা কিছুতেই পূর্ণ হইত না।

বাড়ীর ৫।৬ জন লোকের হিসাব দিতেছি। বাবা, মা, আমার তিন বোন্ আর আমি স্বয়ং। বৎসরের আট মাস কলিকাতায় কাটিত বলিয়া আমি 'বাড়ীর অধিবাসী' আখ্যালাভের স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। যে বুড়ী ঝি আমাদের মানুষ করিয়াছিল, সে বাড়ীতেই থাকিত, তবে বিশেষ কাজকর্ম্ম করিতে পারিত না। বিবাহিত বোন্-দুইটির মধ্যে অন্ততঃ একজন বৎসরে ছ'মাস চাঁদপুরে থাকিত। কাকাবাবু বাড়ীর ছেলে হইয়াও প্রবাসী ; কচিৎ কখন বাড়ীতে আসিতেন ;— দুই চারি দিন থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। সুতরাং, মোটের উপর বাড়ীর অধিবাসিগণের নিম্নতম সংখ্যা পাঁচ এবং ঊর্দ্ধতম সংখ্যা ছয়।

আমার পূর্ণজ্ঞান হওয়ার পর এই কয়টি বৎসরের মধ্যে বাড়ীর এই 'খাঁ খাঁ' অবস্থা তিনবার মাত্র দূর হইয়াছে। আমার দুই বোনের বিবাহ-উপলক্ষে ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত রায়-বাড়ীর প্রতিকক্ষ দুইবার ভরিয়া উঠিয়াছিল। আর আমার মেজ বোনের বিবাহের আগে কাকাবাবুর ছেলে অর্থাৎ আমার বড়দা'র বিবাহে একবার তাহার শূন্যতা পূর্ণ হইয়াছিল। তার পর কয়েক বৎসর সব চুপ্ চাপ্।

সে-বৎসর আমার ছোট বোনের বিবাহ হইয়া গেল। এক পক্ষের জন্য বাড়ীটা আবার সরগরম হইয়া উঠিল। কাকাবাবু ডাক্তার; তিনি আসিতে পারেন নাই। স-বৌদি দাদা, সকন্যা, খুড়িমা, আমার তিন মামা, মামীমা প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন। দিন-কয়টা কোলাহলের মধ্যে বেশ কাটিতেছিল!

এবার বৌদির ভাবটা বেশ নূতন। মেজ বোনের বিবাহের সময় যখন আসিয়াছিলেন, তখন আমার সহিত কথা কহিতেন না। তখনকার সংযত-বসনা, অবগুণ্ঠিতা সঙ্কুচিতা বালিকা-মূর্ত্তি এবার হাস্য-মুখরা, কৌতুকচঞ্চলা রমণীতে পরিবর্ত্তিত। কাকাবাবুর বাসায় যে প্রমোদ-উৎস রুদ্ধ ছিল সেবার তাহার পাষাণ-চাপ খুলিয়া গিয়াছিল। পরিহাস-রসিকতা শতধারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রসিকতার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রসিকতা আর বাক্যে অবসান হইত না; এই দুর্দ্দান্তায় দিনে বেশ ভূষাকেও আক্রমণ করিল। প্রথমে বড় ভগ্নীপতির দুইপ্রস্থ বসন লালরঙে রঞ্জিত হইয়া গেল। তারপর দিন হইতে মেজ ভগ্নীপতির সাধের আদ্দির পাঞ্জাবী-দুইটি খয়ের গোলা জলে চির জর্জ্জর হইয়া থাকিল।

স্বয়ং সেই অযাচিত করুণার প্রসাদ-কণিকা-লাভে বঞ্চিত হই নাই। বৌদি রঙের দাতা-কর্ণ ও বিশ্বকর্ম্মারূপে নূতন নূতন রঙ্ সৃজনে ও বর্ষণে নিরতা। আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত। বাটীস্থ সকলে সহানুভূতিশূন্য, নির্ব্বিকার ও অকুন্ঠিতচিত্তে আমাদের দুর্দ্দশাদর্শনে ব্যাপৃত। ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল।

যে-দিন সকালে আমার মস্তকের কেশের বন পান্তোয়ার রসে সিক্ত হইল, সেই দিনই দুপুরে বরযাত্রীর দল আমার ভাবী ভগ্নীপতিকে ঘেরিয়া চাঁদপুরে পদার্পণ করিলেন। কাজ ফেলিয়া দেখিতে গেলাম। কামিজের ইন্দ্র-ধনু বর্ণ তখনও শুকায় নাই। নিবারণ (বর) আমার বহুরূপী বেশের প্রতি চাহিয়া কি ভাবিতেছিল কে জানে? কিন্তু তাহার কোমল মুখশ্রী দেখিয়া আমার বোধ হয় মায়ার সঞ্চার হইল;—ভাবিলাম এই নিরীহ বেচারীর উপর আজ সন্ধ্যার পর কত উদ্ভট রকমের অত্যাচার হইবে। অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখি, বৌদি বাটনা শেষ করিয়া এক বাটি হলুদগোলা জল লইয়া দণ্ডায়মান। বলা বাহুল্য, সে জল আমাদের জন্য।

মনে দুর্বুদ্ধির উদয় হইল;—মনে হইল, বউদিকে একটু জব্দ করিয়া দিই। নিকটে একটা দইএর হাঁড়ি দেখিলাম। তাড়াতাড়ি সেটা বৌদির মাথায় ঢালিয়া দিয়া দ্রুতপদে সে-স্থান ত্যাগ করিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া বুঝিলাম, একটা গোল-যোগের সূত্রপাত হইয়াছে। মা'র ঘরে ভিড়! ঢুকিয়া দেখি বৌদি মেজের উপর শুইয়া আছেন, মা তেলের মত একটা কি তাঁহার চোখে ঢালিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'দস্যি ছেলে, অত বয়স হ'ল, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হ'ল না।" মেজ-বোন বলিল, 'দাদা, তুমি বৌদির মাথায় কি বলে চূণ ঢেলে দিলে?' আমি ত অবাক্। পাশে দেখিলাম খুড়িমা! তাঁর স্বভাবতঃ গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়াছে। তাঁর একমাত্র ছেলে, সাধ করে বিবাহ দিয়াছেন,— কাণা বৌ লইয়া কি করিয়া ঘর করিবেন্? বোধ হয়, এই সব কথা তিনি ভাবিতেছিলেন। আমি কোন কথা না বলিয়া বাহিরে দাদার কাছে গিয়া সব কথা জানাইলাম। তিনিও ডাক্তার। তাঁকে বলিলাম, 'আপনি যা হয় একটা ওষুধ দিন্'। তিনি মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'শুধু চূণ দিয়েছিস্, আর কিছু দিস্ নেই ত?' আমি কহিলাম, 'আর কি দিব?—মা তেল দিয়া দিতেছেন।' দাদা বলিলেন্, 'তেল নয়, পি, এম, বাগ্‌চীর কালী গোছের একটা কিছু।' আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। তারপর দু'জনেই ঘরের দিকে গেলাম। সকলেই চলিয়া গেল; আমি ঘরে ঢুকিলাম না, বাহিরে এক পাশে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। দাদা নিশ্চয় ভাবিয়া-ছিলেন, আমিও চলিয়া গিয়াছি। তিনি ভিতরে গিয়া বলিলেন, 'কি ব্যাপার! বাঃ, এ যে একেবারে পদ্মপলাশলোচন!' বৌদি কি বলিলেন শুনিতে পাইলাম না। আর দাঁড়াইয়া থাকা বিধেয় নয় ভাবিয়া চলিয়া আসিলাম।

বিবাহে আমার উৎসাহ মাটি হইয়া গেলেও শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। নিবারণের উপর বিশেষ কিছু করা হয় নাই। বউদি অনুপস্থিত; সুতরাং নেত্রী-বিহীন-সেনার ন্যায় রায়কন্যা ও রায়বধূরদল অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, অন্ন পরিমাণে লজ্জার প্রাবল্য, ততোধিক ভগ্নোৎসাহ, সর্ব্বোপরি

কোন অদৃশ্য শাস্তির অমূলক আশঙ্কা!—অন্ততঃ আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল।

বউদির সঙ্গে দেখা না করিয়াই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। বাড়ী হইতে পত্র পাইলাম, তাঁর চোখের কোন অনিষ্ট হয় নাই। যখন ছুটিতে বাড়ী গেলাম, ভাবিয়াছিলাম যে, এবার পাশের বৎসর, পড়াশুনা বেশ হইবে। কিন্তু একদিন বাবার মুখে শুনিলাম, আমার খুড়তুত বোন তরুর বিবাহ; সকলকে লইয়া যাইবার জন্য কাকাবাবু পত্র দিয়াছেন। এবার বিবাহ চাঁদপুরের বাড়ীতে হইবে না। কিন্তু কাকাবাবুর বাসায় যাইবে কে? বাবার শরীর খারাপ, তিনি নিজে যাইতে পারিবেন না। বড় বোনের খোকা হইয়াছে, মা'র যাওয়া হইবে না।

বিবাহের ভোজ খাইতে আমি আমার ছোট বোনকে লইয়া সেখানে গেলাম, আর রঙ্ খাওয়াইতে গোটা-কতক বেশী করিয়া কাপড়-জামা লইলাম। মনে ভাবিলাম, বউদির যখন চোখ্ সারিয়াছে, রঙের পালা পূরা দমে আরম্ভ হইবে। বউদির সঙ্গে প্রথমে কথা কহিতে লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু কথা আগে তিনিই কহিলেন। বাক্যবাণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল, তবে রঙের কোন হাঙ্গামা ভোগ করিতে হইল না। উত্তরের মধ্যে তাঁহার পদ্মপলাশলোচনের কথাটা একবার উল্লেখ করিতেই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, 'তুমি তখন কোথায় ছিলে?' তার পর তাঁহাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিয়া কার্য্যে যোগদান করিলাম।

শঙ্কা দূর হইলেও একেবারে নিঃশঙ্ক হইতে পারিলাম না। বউদি রঙের ভাণ্ডার না রাখিলেও একটা কিছু না করিয়া যে নিষ্কৃতি দিবেন, এপ্রবোধ মনকে দিতে সাহস হইল না। তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময় একবার যখন রসগোল্লা এবং রসগোল্লার রসের পার্থক্য ও আপেক্ষিক উপকারিতার বিষয়ে প্রশ্ন উঠিল, অমনি আমি সভয়ে বুঝাইয়া ও প্রমাণ করিয়া দিলাম যে মস্তকে রসপ্রদান অপেক্ষা উদরে রসগোল্লা নিঃক্ষেপ অধিকতর বাঞ্ছনীয় এবং মস্তকের জন্য সুবাসিত তৈলই অধিকতর উপকারী। তার পর একদিন বৌদি জিজ্ঞাসা করিলেন, লঙ্কাবাটা, চণের প্রলেপ ও লেবুর রস মিশ্রিত সরিষার তৈল, এই তিনটির ভিতর কোনটি উৎকৃষ্ট। চক্ষুরোগের জন্য যে কোনটাই হিতকর নহে, এই কথা সাধ্য মত বুঝাইতে প্রয়াস পাইলাম; কিন্তু বৌদির মৃদু হাস্য দেখিয়া বোধ হইল, সফলকাম হই নাই। বৌদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি উদ্বেগ-আকুল-চিত্তে কাকাবাবুর সহিত বাজারে চলিলাম।

অঙ্কশাস্ত্রে কোন কালেই মাথা ছিল না। বাজারে আমার হিসাবে বৃহস্পতির পরিচয় পাইয়া কাকাবাবু বলিলেন, 'যা তুই এগুলো নিয়ে বাড়ী যা; সকাল সকাল খেয়ে নিস্; আমি সব কিনে বাসায় যাব।' বাসায় আসিয়া দেখি বৌদি সত্য সত্যই লঙ্কা বাটিতেছেন। তিনি বরাভয় উচ্চারণ করিলেও তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিলাম। দাদা কতকগুলি জিনিশ আনিতে আবার ভিতরে পাঠাইলেন। চলিয়া আসিবার সময় পিছন হইতে একটি কোমল হস্ত চক্ষে কি একটা প্রলেপ লাগাইয়া দিল। জিনিশপত্র ফেলিয়া ছোট একটা আর্ত্তনাদ ছাড়িয়া চোখ

রগড়াইতে আরম্ভ করিলাম। দাদা বাহিরেই ছিলেন; তিনি ছুটিয়া আসিলেন। নিকটে যাহারা ছিল, তাহারাও আসিল। বউদি তখন অদৃশ্য; কারণ,পূর্ব্বেই কি একটা পতনের শব্দ শুনিয়াছিলাম। দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে?' আমি উৎকট ভঙ্গী করিয়া বলিলাম,লঙ্কাবাটা — মরে গেলাম!' দাদা বলিলেন,'দূর,তোর কপালে ত দেখ্‌ছি দুধের সর লেগে রয়েছে! আর তুই কি গোলাব জলেরও গন্ধ পাচ্ছিস্ না?' চাহিয়া দেখিলাম, দালানে যথেষ্ট লোক-সমাগম' দূরে খণ্ড বিখণ্ড শেখ ফসীউল্লার গোলাপের নির্য্যাসের শিশি,আর আমার দুই হাতে শ্বেতবর্ণ সরকণিকা। আশ্বস্তির নিঃশ্বাসে চতুর্দ্দিকের হাস্যরব কানে প্রবেশ করিল না।

যথাকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। শুনিলাম যে, শীঘ্রই রায়-বাড়ীর হাঁ হাঁ অবস্থা আর একবার দূরীভূত হইবে—পরীক্ষার পর খোকার ভাত আর তাহার মাতুলের বিবাহ। সে-বৎসর কি বিবাহ আমাদের বংশে দশমিকের পৌনঃপুনিক নিয়ম অনুসারে চলিয়াছিল? যাহা হউক্,এত কষ্টের পর যে শুভদৃষ্টি-পদার্থটা বুঝিতে পারিব, তাহা কখন ভাবি নাই। বড় ভাগ্য যে বৌদি চোখে সত্য সত্যই লঙ্কাটা দেন নাই।

শ্রী—

জাহাজ-ডুবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র তাঁহার নিরুদ্দেশ কালের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। আত্মীয়, বন্ধু এবং পৌরবর্গ মিলিত হইয়া নিতান্ত কৌতুহলাবিষ্টচিত্তে সে কাহিনী শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সকলের হয়ত ছেলে বেলাকার কথা সব মনে থাকে না। কিন্তু আমার খুব ছোট বেলাকার কথা পর্য্যন্ত সমস্ত মনে পড়ে! আমার বয়স যখন পাঁচ কি ছয়, শঙ্কর যখন আমাকে কোলে নিয়ে এই গঙ্গার ধারে বেড়াতো, তখনকার কথা পর্য্যন্ত আমার সব মনে আছে। তারপর নোয়াখালিতে যাওয়ার কথা, সে ত স্পষ্টই মনে রয়েছে। শঙ্করের সঙ্গে রোজই বড়াতে যেতুম, রোজ নতুন নতুন যায়গা দেখে বেড়াতুম। একদিন এমনি বেড়াতে বেড়াতে সহর ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে পড়ি। তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ দু'জন লোক আমাদের কাছে এসে, একজন শঙ্করের সঙ্গে কথা কইতে লাগল, আর একজন আমার হার খুলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। শঙ্কর তখন তার পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে লোকটার উপর এসে পড়লো। আর একজন আমাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। আর শঙ্করের সঙ্গে যে কথা কইছিল, সে তাড়া তাড়ি পকেট থেকে রিভলভার বের করে

শঙ্করকে গুলি করলে। শঙ্কর রক্তাক্তদেহে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো। দূর থেকে তা দেখেই আমি ভয়ে মূর্চ্ছা গেলুম। পরে যে কি হল তা আর আমি বলতে পারি না। দস্যুরা যে আমাকে কেমন করে কোথায় নিয়ে এল, সে-সব কিছুই আমি জানতে পারলুম না। যখন আমার জ্ঞান হ'ল, তখন চেয়ে দেখলুম, একটা ভাঙ্গা চালা-ঘরে ছেড়া চেটাইয়ের উপরে আমি পড়ে রয়েছি; দরজার কাছে বসে দস্যুরা তামাক খাচ্ছে। আমাকে যারা নিয়ে এসেছিল, তারা ছাড়া আরও দু'তিন জন ছিল। আমি কেঁদে উঠতেই তাদের একজন একখানা দা হাতে করে উঠে এসে চোখ রাঙ্গিয়ে বল্লে, "চুপ করে থাক। নইলে এই দা দিয়ে এক কোপে কেটে ফেলব। আর যদি চুপ করে থাকিস্, তা হলে তোর বাপের কাছে দিয়ে আসব।"

বাবার কাছে দিয়ে আসবে শুনে কিছু আশ্বস্ত হলুম; ভয়ে চুপ করে রইলুম। চক্ষু মুছে জিজ্ঞাসা করলুম, "কখন আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে?" উত্তরে সে বল্লে "রবি-বার।" রবিবারের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতুম 'কবে রবিবার হবে?' তারা বলত, 'এখনো দেরী আছে।" হায়! তখন জানতুম না যে, সে রবিবার আর আমার জীবনে হবে না! তাদের স্তোকবাক্যে রবিবারে বাবা-মার কাছে যেতে পাব মনে করে, সেই আশার পথ চেয়ে থাকতুম। কেন বলতে পারি না, তারা আমার গলার হার খুলে নিয়েই নিশ্চিন্ত হলো, খুন করলে না! ভগবানের দয়ায়ই হোক, আর পরমায়ুর জোরেই বলুন, আমি দস্যুদের হাত থেকে বেঁচে গেলুম। তারা কখনও এক জায়গায় থাকত না; দু'দিন এখানে, দু'দিন ওখানে, এই রকম নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতো। সেখানে তাদের আরও লোকজন সব থাকতো। আবার কোথাও বা কেউই থাকত না। তারা দু'জনেই কেবল আমাকে নিয়ে থাকত। ক্রমশঃ আমি বড় হয়ে উঠলুম, তাদের ফায়-ফরমাস খাটতুম, তামাক সাজতুম, ভাত রাঁধতেও শিখলুম। একটু কোন কাজের ত্রুটি হলে তারা আমাকে মারত, গালাগালি দিত। কখন কখন তারা আমাকে একলা রেখেই কোথায় চলে যেত। মাঝে মাঝে টাকা, সোণা-রূপার গহনা নিয়ে এসে আমার সাম্নেই ভাগ বাটরা করে নিত। বুঝতে পারতুম,এ-সব তাদের মহাজনির টাকা। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আমার এমন ঘৃণা-বিদ্বেষ জন্মাতে লাগ্‌ল যে, আর তাদের সঙ্গে একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছা হ'ত না। যখন একা থাকতুম্ তখন মনে হতো, এইবার পালিয়ে বাবার কাছে যাই; কিন্তু আমার তখনকার বয়সে পথ চিনে বাড়ী আসা সাধ্যা-তীত। বাড়ীঘর, বাপ-মা, সব কথাই মনে আছে, কিন্তু রাস্তা জানি না; তাতে আমাকে যে কত দেশদেশান্তরের ব্যবধান রয়েছে, সেটুকু বোঝবার সামর্থ্যও তখন হয় নি। তখন আমার বয়স, বোধ হয়, বছর দশেক হবে। দস্যুরা একদিন আমাকে একা রেখে কোথায় গিয়েছে। মাঝে মাঝে তারা এই রকম যেত। যখন আমি একা থাকতুম, তখন একা একা বসে গান করতুম। গান যে কোথায় শিখে-ছিলুম, সে-কথা ঠিক বলতে পারি না। বোধ হয়, ভিখারি বৈষ্ণবদের কাছে হ'বে। কিন্তু গান গাইতে গাইতে নিজের দুঃখটাকে যেন

একটু হাল্‌কা বলে মনে হ'ত। বেশ লাগ্‌ত, তাই গাইতুম। একদিন এইরকম একা বাটীর দরজার কাছে বসে গান গাইলাম। বাড়ীটা খুব সরু গলির ভিতর। একটা বড় পাথরের বাড়ী। আগে জানতুম না, পরে শুনলুম সে জায়গাটা কাশী। দস্যুদের সঙ্গে কত যায়গা বেড়িয়েছি, কিন্তু কোন যায়গারই নাম জানতুম না, তত বুদ্ধি তখন হয় নি। যাই হোক, সেদিনে আমার জীবনের কি শুভ মুহূর্ত্ত আস্‌ল তা বল্‌তে পারি না। সে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মহিমা—আমার চিরস্মরণীয় দিন। সে-দিনের কথা মনে হলে এখন পর্য্যন্ত আমি ঈশ্বরের অপার করুণার প্রত্যক্ষ পরিচয় দেখতে পাই। আমি দরজার কাছে বসে গান করছি—কি গান তা মনে নেই, তবে বোধহয়, খুব মর্ম্মস্পর্শী, খুব করুণ,খুব দুঃখব্যঞ্জকই হ'বে। আর আমি তখন ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষের মুখে এমন গান শুনে, দয়া কিংবা বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল কি না জানিনা, যাই হোক, আমার এই গান শুনে একটী সাধু মহাপুরুষ আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সাধু বলতে আপনারা হয় তো মনে করবেন, মাথায় এক-মাথা জটা, বাঘছাল-পরা, চিমটে-হাতে লোটা-কম্বলধারী একজন গাঁজাখোর সন্ন্যাসী। কিন্তু তা না। ইনি সে ধরণের সাধু ন'ন। ইনি একজন প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষ! পরে এঁর পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। ইনি কলকাতার কোনও বিখ্যাত বড়লোকের ছেলে। জন-সমাজে এঁর নাম বিশেষ পরিচিত। ইনি হিন্দুধর্ম্মের অধোগতি দেখে এই ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করবার জন্ত দৃঢ়সংকল্প হ'ন। ইনি বেদ উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এঁর হৃদয়ের মূল মন্ত্র প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা। বাহ্য বেশ ভূষায় এঁর কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না;—খুব সাধারণ,নিতান্ত সাদা-সিধে; যথার্থই রাজর্ষি তিনি। এত বিষয়ের ভিতর থেকেও নিজে বিষয় ভোগ করতেন না। সকল বিষয়ে লিপ্ত থেকেও তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁর যে রকম চরিত্র নিজের চক্ষের সামনে দেখেছি, তা বড় আশ্চর্য্য! এ-যুগে সে রকম প্রকৃতির মানুষ নেহাৎ বিরল। তিনি আমার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের পকেট হতে একটী টাকা বার করে অতিস্নেহমাখা সুরে বল্লেন, "বালক! পয়সা নেবে?" আমার মলিন ছিন্নবেশ দেখে, বোধ হয়, তিনি আমাকে ভিখারিরের ছেলে মনে করেছিলেন। আমার কিন্তু তাঁর এ-কথা শুনে অভিমানে চখে জল এল,—আমি কি ভিকিরি! আমি যে বড় লোকের ছেলে, সে অহঙ্কারটুকু আমার সেই বাল্য হৃদয়টাকেও তখন পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় ঘিরে রেখেছিল। অশ্রু আমার সেই বাল্য-কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল। আমি কোন কথা কইতে পারলুম না, ঘাড় নেড়ে জানালুম-'না।' আমার চখে জল দেখে তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয় যেন গলে গেল; তিনি আরও কোমল মিষ্টস্বরে তাঁর ডান হাতখানি আমার মাথার উপর রেখে বল্লেন, "নেবে না? কাদ্‌ছ কেন তুমি? তোমার কে আছে?" আমি তাঁর প্রথম দুই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শেষ প্রশ্নের উত্তর দিলুম, "এখানে আমার কেউ নেই, চোরে আমাকে চুরি করে এনেছে।"

আমার কথা শুনে তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন; বল্লেন, "চোরে তোমাকে চুরি করে এনেছে? তোমার গায়ে বুঝি খুব গহনা ছিল?" আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'হাঁ'। তিনি কিছুক্ষণ

চুপ করে থেকে বল্লেন, "তোমার বাবার নাম কি?" আমি বল্লুম 'উপেন বাবু।'

'সাত বছর বয়সে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলুম, কাজেই ভালরূপে পিতৃপিতামহের পরিচয় দেবার উপযুক্ত নাম তখন শিখিতে পারি নি। তিনি আমার কথা শুনে হেসে বল্লেন, "ভাল নাম কি?" আমি ভাবিলাম ভালনাম? ভালনাম আর কি তাতো জানি না। বাবার ত ঐ একটাই নাম। উপেনবাবু বলেই ত সবাই তাঁকে ডাকে।

'তিনি একটু চিন্তি হইয়া বল্লেন, "তোমার নাম?" আমি বল্লাম—শ্রীঅমর কুমার বসু। নিজের নামটি কথা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই মা শিখিয়েছিলেন, কাজেই সেটি বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?" আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম—গঙ্গার ধারে। তখন আমার বোঝ্‌বার শক্তি ছিল না যে, আমার কথা শুনে তিনি কিছুই বুঝ্‌তে পারলেন না। তখন মনে হয়েছিল আমি সব কথাই তাঁকে বলেছি, আমার সমস্ত পরিচয়ই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক্, তিনি একটু ভেবে আমাকে বল্লেন, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে খোকা?"

সে কথা শুনে তখন আমার মনে যে কি আনন্দ হ'ল,তা প্রকাশ করে বলতে পারি না। তাঁর সেই দিব্যকান্তিময় শান্তোজ্জ্বল সৌম্য প্রতিমূর্ত্তি দেখামাত্র আমার সে কিশোরহৃদয়ে যেন কেমন গাঢ় ভক্তির দাগ বসে গিয়েছিল। তাঁকে যেন আমার কত আপনার জন বলে মনে হতে লাগ্‌ল। আমি তাঁর কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর একটা হাত ধরে আগ্রহভরে বলে উঠলাম, "যাব যাব। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন?" তিনি খুব স্নেহমাখা স্বরে দুইহাতে আমার হাতদুটি ধরে বল্লেন্ 'যাব।'

আমার আর কালবিলম্ব সইল না। 'আমি প্রাণপণে তাঁর হাতখানি চেপে ধরে বল্লুম, "চলুন, চলুন, শীগ্‌গির চলুন, নইলে এখুনি তারা এসে প'ড়বে।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কোথায় গেছে?"

'আমি বল্লুম—"তা জানি না। মাঝে মাঝে তারা আমাকে একলা ফেলে রেখে যায়, আমাকে কিছু বলে যায় না। তারা এলে আর আমাকে যেতে দেবে না। শীগ্‌গির এখান থেকে আমায় নিয়ে পালিয়ে চলুন। আমাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বল্লেন, "আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া আর তাদের সাধ্য নেই।" আমি তাঁর সে কথায় আস্থা-স্থাপন করতে না পেরে ভয়ে ভয়ে বল্লুম, "আপনি জানেন্ না তাদের; তারা সব পারে। শঙ্করকে খুন করে শঙ্করের কাছ থেকে আমাকে নিয়ে এসেছিল।"

'তিনি আবার চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাই নাকি?" তবে তো তাদের দেখতে পেলে খুব ভালই হয়, পুলিশে ধরিয়ে দিই।"তিনি আমার হাত ধরে আমরা যে বাড়ীটাতে থাক্‌তুম্ সেই বাড়ীর ভিতর ঢুকে বাড়ীখানা বেশ করে দেখে নিয়ে আমার হাত ধরে নিয়ে চল্লেন।

'কাশীতে তাঁর একটা বাড়ী ছিল। বাড়ীখানা খুব বড়, কিন্তু লোকজন বেশী ছিল না; দু'চার জন চাকর-বাকর মাত্র! বাহ্য আড়ম্বর তিনি মোটেই ভাল বাসিতেন না।

তিনি আমাকে যে কত যত্ন করতে লাগিলেন, সে কথা বলিতে পারি না ; ঠিক নিজের ছেলের মতন করে রাখলেন। সেইদিন থেকেই আমার জন্তে একজন ভাল পণ্ডিত নিযুক্ত করে দিলেন, আমি তাঁর কাছে লেখা-পড়া শিখিতে লাগলুম। তিনি যখন পণ্ডিতদের সঙ্গে বসে শাস্ত্র-চর্চ্চা করতেন, তার কিছু বুঝতে না পারলেও আমার তা শুনতে বড় মিষ্ট লাগ্‌তো ; একমনে বসে বসে শুনতুম। আমার আগ্রহ দেখে তিনি বড় সন্তুষ্ট হতেন। আমাকে যত্ন করে সরল সরল কথাগুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর কাছে সেই সব কথা শুনে শুনে আমার মন যেন কেমন এক নূতনভাবে তৈরি হতে লাগল। পুলিসের হাঙ্গামায় পড়লে তাঁর আধ্যাত্মিক কাজে বিঘ্ন ঘটবে বলে তিনি আর পুলিশে দস্যুদের কথা কিছু জানালেন না; কিন্তু বাবার ঠিকানা জানবার জন্তে, বাবাকে আমার খবর দেবার জন্তে অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কোন ফলই হোল না। তিন বৎসর পরে তিনি তাঁর কাশীর বাড়ী থেকে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে চলে এলেন ; আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ; এসে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। আমি দিনের বেলায় স্কুলে ইংরেজী আর সন্ধ্যার পরে পণ্ডিতের কাছে বাড়ীতে সংস্কৃত পড়তে লাগলুম। কত দিন এম্নি করে কেটে গেল। তিনি বাবার কোনও সন্ধান করে উঠ্‌তে পারলেন না। আমার তাঁদের জন্তে মনের সে রকম ব্যাকুলতা ক্রমশঃ কেটে যেতে লাগল। তাঁর মধুর উপদেশে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে আমি যেন একটা নূতন জীবন লাভ করতে লাগলুম। মনের দুঃখকষ্ট বিষাদ-মলিনতা দিন দিন কোথায় চলে যেতে লাগল। তখন সমস্ত জগৎ-সংসারটাকেই আপনার বলে মনে হতে লাগল। আমার ক্ষুদ্রত্ব চলে গিয়ে নিজেকে বিশাল বিশ্বের মাঝে বিলিয়ে দেবার জন্তে প্রস্তুত হতে লাগলুম। দিন-রাত্রি পূর্ণানন্দ ভোগ করতে লাগলুম। আহা সে কি সুখ! কি আনন্দ! ভগবানের প্রতিকথা যেন কানে স্পষ্টরূপে শুনতে পেতুম। তিনি যে ঘরে বসে পণ্ডিতদের সঙ্গে ঈশ্বর-নিরূপণের বিচার করতেন, সেই ঘরের ভিত্তিগাত্রে এক-খানি ছবিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—

"হইলে হে ব্রহ্ম-দরশন
শাশ্বত অমৃতসুখে পূর্ণ এ জীবন।"
ওই দেখ রিপুগণ করে পলায়ন—
কোথা মৃত্যু, কোথা শোক ?—অনন্ত জীবন !"

আমি সেই চিত্রখানি দেখে আর শ্লোকটি পড়ে যেন নবজীবন লাভ করতুম। আমার দেহে নূতন শক্তির সৃষ্টি হল। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সভাসমিতি নিমন্ত্রণ প্রভৃতি যেখানে যা হতো, তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-তত্ত্বের কথা, ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের কথা ভিন্ন বাজে কথা কোথাও হতো না। তাঁর পুণ্যময় সহবাসে আমার হৃদয়ের শ্রান্তিকরতা কোথায় লীন হয়ে গেল। বিশ্বময় সেই একমেবাদ্বিতীয়ং দেখতে লাগ্‌লাম। আহা! জানি না কোন শুভ মুহূর্ত্তে, কি পুণ্যফলে সেই মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলুম! যতদিন গুরুদেব জীবিত ছিলেন, তাঁর আশ্রয়েই ছিলুম। তারপর তিনি যখন দেহত্যাগ করলেন, তখন সেই মহানুভব গুরুদেবের আশ্রম ছেড়ে নিজেকে

বিশ্বনাথের কাজে নিয়োজিত করবার জন্যে অনন্ত সংসারের যাত্রী হয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

যে-দিন নিজের ছেলেকে ফিরে পেয়েছিলেন, সে-দিন কমলাদেবীর মনে যে-রকম আনন্দ হয়েছিল, আজ ভগ্নীর ছেলেকে পেয়ে তার চেয়ে যে কম আনন্দ তাঁর হয়েছিল, তা মনে হয় না। তিনি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভগবানের মনে যা ছিল, তা হয়েছে; এখন যদি তিনি দয়া করেছেন, তা হলে—"

বাধা দিয়া উপেন্দ্রবাবুর পুত্র বলিলেন, "মাসীমা! ভগবানের দয়া আমি প্রতিদিন অনুভব কচ্ছি। তাঁর দয়াতেই বেঁচে রয়েছি, কোন দিনই তাঁর দয়ার অভাব মনে করি নি ত!"

কমলা দেবী বলিলেন, "সে যাই হোক্, বাবা, এইবার তুমি বিয়ে করে সংসারী হও। আমরা দেখে সুখী হই।"

অমরের মুখে যেন একটা গাঢ় বিষাদের ছায়াপাত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "আবার বিয়ে মাসীমা! না এ হতেই পারে না!"

তাঁর কথার ভাবার্থ ঠিক অবগত হইতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে রাধাগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা, এ হতে পারে না? আমাদের সকলেরই ইচ্ছে তুমি বিয়ে করে সংসারী হয়ে তোমার বাপের ভিটে বাজায় কর। অমর তো তার বাপের সঙ্গে চল্লো!"

উপেন্দ্রবাবুর পুত্র বলিলেন, "বিয়ে তো করেছিলুম জ্যেঠা ম'শাই!"

রা।● করে ছিলে? মা তবে কোথায়?

উ-পু। আমার মহানুভব গুরুদেব তাঁর নিজের ভাই-ঝির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে সেও আমাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেছে। বিবাহ করতে আর আমার ইচ্ছে নেই। সংসারে বাঁধা থাকতেও আর আমার ইচ্ছে নেই। বিষয়ভোগ করবার উপযুক্ত পাত্র অমর, আমি অমরকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, অমর তার মেসম'শায়ের বিষয় এবং আমার মেস-ম'শায়ের বিষয়—দুই বিষয়ের মালিক হয়ে সুখে তার কর্ত্তব্য পালন করুক।

অমরকুমার এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; এবার মিনতির সুরে বলিলেন, "না দাদা, এত বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না। আপনার বোঝা আপনি নিয়ে আমাকে হাল্কা করে দিন।"

সস্নেহে তিনি অমরকুমারের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "অমর! চিরদিন ফকিরি করেই এসেছি, ফকিরি করতেই জানি; বিষয়রক্ষা করতে হয় কি করে, তা তো জানি না, ভাই! প্রজা-পালন করবার উপযুক্ত পাত্র তুমি!"

অমরকুমার বলিলেন, "আমি যে নিজের চিন্তাতেই মগ্ন, দাদা! ও'জায়গার ভার চালাব কেমন করে? নিজের স্বার্থ নিয়েই আমি ব্যস্ত!"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "অমর! তুমি স্বার্থপর? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন বাঙ্গালার সকল জমীদার তোমার মতনই স্বার্থপর হন্। তা'হলে এ দরিদ্র বঙ্গবাসীর দুঃখ-দৈন্য অনেক-পরিমাণে লঘু হবে।

অমর আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত

হইলেন; ঘাড় নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বড়র ভার আমি ছোট হয়ে বইতে পারি? কেন, দাদা? আপনার পায়ে পড়ি, আপনার ভার আপনি নিন্।"

সস্নেহে তিনি বলিলেন, "অমর! আমি অনেক সৌভাগ্যে শেকল কেটে অনন্ত আকাশে উড়্তে শিখেছি, বড় সুখের আস্বাদ পেয়েছি, আমাকে এ-সুখে বঞ্চিত করিস্ নি ভাই! আর আমাকে টেনে এনে শেকল পরিয়ে দিস্ নি! মাপ কর ভাই! এই জন্যেই ত আমি তোদের সঙ্গে দেখা কর্‌তুম্ না। জানি, আমি দেখা দিলে তোরা আর আমাকে ছেড়ে দিবি না! কিন্তু এ বাঁধনে আমার যে কত কষ্ট হবে, তোরা তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না।"

পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া গৃহবাসী হইবার জন্য তাঁহাকে সকলেই অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শেষে তিনি এই পর্য্যন্ত বলিলেন, "যদি কখনও কিছুর অভাব হয়, তা হলে অমরকে জানাব।"

এমন সময় 'অমরকুমারের শিশু-পুত্রটি টলিতে টলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কোলে বসাইয়া বলিলেন, "আমার বিষয়-সম্পত্তি সর্ব্বস্ব এই শিশুকে দান করলুম। তোমার ছেলেটির নাম কি, অমর?"

অমর উত্তর করিবার পুর্ব্বেই শিশু তাহার আধ আধ ভাষায় বলিল, "শ্রী অদিত কুমাল বসু (অজিত কুমার বসু)।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন। অমর শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার বাপের মতন হতে পারবে ত বাবা?"

শিশু সানন্দে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি বাবাল মত খুব বল হব!"

তিনি বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন তোমার বাপের মতন সকলপ্রকারেই বড় হতে পার।"

(সমাপ্ত)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ

বিশ্ববিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে বঙ্গের এক উজ্জ্বল রবি, ভারতের গৌরব ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার রাত্রি ১টার সময় তাঁহার আলিপুরস্থ বাসভবনে তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত তোড়কোণা-নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে স্যার রাসবিহারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জগবন্ধু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। স্যর রাসবিহারী অতিশয় অল্প-বয়সেই মাতৃহীন হন। তাঁহার গর্ভধারিণীর নাম পদ্মাবতী। রাসবিহারীর বাল্য-শিক্ষা বৰ্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জিলা-স্কুলেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন

এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেন; তৎপরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইঁহার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আর কেহ ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি, এল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি সুবর্ণ-পদক লাভ করেন। ১৮৭১খৃষ্টাব্দে 'অনার্স-ইন-ল'-নামক অতি দুরূহ আইন-পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক'-রূপে ভারতীয় বন্ধকী-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণাপূর্ণ ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন, তাহাতে ব্যবস্থা-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বক্তৃতাগুলি "Law of Mortgages in British India"-নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে উহা বিশেষজ্ঞগণ-কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হস্তান্তর-বিষয়ক আইন-প্রণয়ন-কালে ভারতবর্ষের তদানীন্তন ব্যবস্থাসচিব ডাক্তার হুইট্‌লি ষ্টোক্‌স্ স্যার রাসবিহারীর গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল পরীক্ষক এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "ডক্টর অব্ ল"—এই গৌরবান্বিত উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত সভায় কার্য্য করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯১ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন; দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের বাসগৃহের অংশ-বিক্রয় সম্বন্ধে একটী নূতন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের 'বজেট' প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকল্টি অব্ ল'র সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশংসনীয় পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়কে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী পুনরায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইন পুনর্গঠনে রাসবিহারী গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। এই কার্য্যে সাহায্যের জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহাত্মা রাসবিহারী অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি-বিতরণ-সভায় এসিয়াবাসীর অসত্য-প্রবণতার নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্যার রাসবিহারী যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন,তাহা চিরস্মরণীয়। দেশভক্ত রাসবিহারী তাঁহার আজীবন উপার্জ্জিত অর্থ দেশের উন্নতি কল্পে ও নানা হিতকর কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে পঞ্চাশ হাজার টাকা, তারকনাথ পালিতের শিল্প বিদ্যালয়ে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, দেশালাইয়ের কারখানায় এবং, অন্যান্য দেশহিতকর অনুষ্ঠানেও প্রভূত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে একুশ লক্ষ টাকা দান করিয়া তিনি বঙ্গের শিক্ষার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই দানের পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর অব্ ফিলজফি নামক সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে "নাইট উপাধি প্রদান করেন।

স্যর রাসবিহারীর মাতৃভক্তিও প্রগাঢ় ছিল। তিনি জননী পদ্মাবতীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে মেদিনীপুরে একটী শ্মশান-ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও এতদ্দেশীয় মহিলাগণের মধ্যে যিনি বি, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে 'পদ্মাবতী মেডেল' নামে একটী মেডেল প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

জন্মস্থান রাসবিহারীর অতিপ্রিয় ছিল। জীবিতাবস্থায় তিনি স্বদেশে একটী বিদ্যালয় ও একটী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দেড় লক্ষ টাকা এবং, তাহার বিস্তৃত পুস্তকালয়ের আইন-পুস্তক ব্যতীত সমুদায় পুস্তকগুলি এই বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। নিজগ্রামে শিবের মন্দির রক্ষা ও পূজার জন্য তিনি পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে কৃষিবিদ্যা বিস্তারের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা এবং শুনা যাইতেছে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় আট লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। এইরূপে রাসবিহারী তাহার আজীবন উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা দেশমাতার সেবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার দানের কথা শ্রবণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয় হইতে স্বতঃই ধন্যবাদের বাণী উচ্চারিত হইতেছে এবং সকলেই বলিতেছেন্ 'দাতা চিরং জীবতু'।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ দুইবার দার-পরিগ্রহ করেন। প্রথমে সাধু শিবচন্দ্র দেবের দৌহিত্রী ৺অমর লাল মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। উভয় পত্নীই নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

স্যার রাসবিহারী ইউরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তিনি দেশীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই।

বঙ্গমাতার ক্রোড়ের যে স্থান এই সন্তান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আবার কে পূর্ণ করিবে জানি না! জগদীশ্বর এই প্রতিভাশালী, যশস্বী, স্বদেশভক্ত সন্তানের আত্মাকে শান্তি বিধান করুন ও তাঁহার উপযুক্ত স্থানে তাঁহাকে রক্ষা করুন।

সংবাদ।

১। কটকের কুমারী জি, ডি, হাজরা আইনের শেষ পরীক্ষায় এ বৎসর উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যার মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম বি. এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন।

২। লর্ড রেডিং ২রা এপ্রেল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। লর্ড রেডিং বোম্বাই হইতে দিল্লী ও দেরাদুন এবং দেরাদুন হইতে পাঞ্জাব পরিদর্শনান্তর সিমলায় গমন করিবেন।

৩। ২রা এপ্রেল প্রাতে ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড রেডিং সপত্নীক বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে নামিয়া ভারতের পুরাতন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের নিকট হইতে ভারতের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা এবং সম্রাট্-প্রতিনিধির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বাইবন্দরে পদার্পণ করিয়াই তিনি ভারতবাসীকে উদ্দেশ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন "সুবিচার সম্বন্ধে যে বৃটীশের সুনাম আছে, আমার কার্য্যকাল-মধ্যে কখনও সে সুনাম নষ্ট হইবে না।"

৪। ভারতের বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহার উচ্চতর পদবী লাভ হইয়াছে। লর্ড চেমসফোর্ড এত দিন "ব্যারণ" ছিলেন, এবার "ভাই কাউন্ট"-পদবী লাভ করিলেন।

৫। সিমলার সিবিল সার্জ্জন মেজর এফ, এ, এফ বারনার্ডো সি, বি, ই, সি, আই, ই, এম, ডি, এফ, আর, সি, এস, আই, এম, এস কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্ষবিদায়।

আজ পুরাতন বর্ষের বিদায়ের দিনে ইহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া ও হিসাব করিয়া দেখিলাম, আজ যে বৎসর চলিয়া যাইতেছে, তাহার অঙ্ক কেবলই দুঃখ, বিপ্লব ও বেদনায় ভরা! এই বর্ষে ভারত কত ক্ষতি, কত অশান্তি ভোগ করিয়াছে! কত কৃতবিদ্য সুযোগ্য সন্তানকে ভারতমাতা হারাইয়াছেন! এই পুরাতন বর্ষের অঙ্কেই নব্য-ভারত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, রায় ললিনাক্ষ বসু বাহাদুর, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। ইঁহাদের স্থান আর কি কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে? পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে কি ভারতের সকল অশান্তির আগুন নির্ব্বাপিত হইবে! বর্ষ, তোমার অঙ্কে অনেক স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা অঙ্কিত হইয়া রহিল। এই সকল চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আজ তুমি বিদায় লও। আমাদের বংশধরগণ অতীতের এই পৃষ্ঠা খুলিয়া আবার তোমাকে একদিন স্মরণ করিবে। আজ আমরা তোমাকে সেই আশায় আশান্বিত করিয়া বিদায় দিই।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১২শ কল্প—১ম ভাগ।

১৩২৭ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।